উলুমুল কুরআন

(তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি)



শাইখুল ইসলাম মুফতী ত্বাকী উসমানী

[1]সূচিপত্র

উলুমুল কুরআন

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট মুহাক্কিক
মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী
বহুল প্রচলিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অনুবাদক
মুফতি শফিকুল ইসলাম
মুহতামীম দারুল উলূম, ঢাকা

সম্পাদনা
হারামাইন সম্পাদনা পর্ষদ।

মাকতাবাতুল হারামাইন
প্রকাশক, আমদানীকারক, সরবরাহকারক।
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবা ঃ ০১৭১৫৮৮৯০৭৮-০১৮৩২৭৯১৭১৯.

সূচিপত্র

উলুমুল কুরআন

মূল:

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট মুহাক্কিক

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী

বহুল প্রচলিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অনুবাদক

মুফতি শফিকুল ইসলাম

মুহতামীম দারুল উলুম, ঢাকা

প্রকাশক	:	মাকতাবাতুল হারামাইন। ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড, ২৬ নং দোকান, বাংলাবাজার, ঢাকা।
স্বত্ব	:	[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
প্রথম প্রকাশ	:	মার্চ-২০১৭ইং
বর্ণবিন্যাস	:	হারামাইন কম্পিউটার। ৭/বি, বাংলাবাজার (২য়তলা) ঢাকা-১১০০ [কম্পিউটার মার্কেটের বিপরীতে]
প্রচ্ছদ	:	হারামাইন ডিজাইন। ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুদ্রণ	:	বুশরা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স।

প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০১৭ঈ.

দ্বিতীয় প্রকাশ- মার্চ ২০১৮ঈ.

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৪০০ .০০টাকা মাত্র।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আমরা শুধু তারই প্রশংসা করি এবং তার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি ও তার নিকটই ক্ষমা চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিবেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারবে না। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম আর্দশ হল রাসূলের আদর্শ। আর সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হল মনগড়া ও নব প্রবর্তিত বিষয় তথা বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই হল গোমরাহী। আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিনাম জাহান্নাম।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের অনেক শুকরিয়া যে, মাকতাবাতুল হারামাইন বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ দ্বীনি আরবী কিতাবের আমদানি ও প্রকাশনার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলছে। বর্তমানে আমরা-আমাদের দ্বীনি খেদমতকে আরো ব্যাপক করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটের চাহিদা পূরণে হক্কানী আলেম-ওলামাদের তত্ত্বাবধানে ইসলামী বাংলা বই প্রকাশ করার সংকল্প নিয়ে কয়েকটি বই প্রকাশ করতে পেরেছি বলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যার মধ্যে " উলুমূল কুরআন বইটি" অন্যতম।

এই বইটিতে আল্লামা ত্বকী উসমানী সাহেব উলুমে কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি-সুন্দর ও সাবলীলভাবে বক্ষ্যমান বইটিতে কবিরা গুনাহসমূহ আলোকপাত করেছেন। যা আমরা বাংলাভাষায় অনুবাদ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছি।

আশা করি পাঠক উক্ত বইগুলো পড়ে উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। এবং আমাদেরকে ও দোয়ায় শরীক করে নিবেন।

বিনীত

প্রকাশক

মাওলানা রফিকুল ইসলাম

তাং জানুয়ারী ২০১৭-ঈ.

انتساب

ইনতেসাবে সংযুক্ততা

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী শফী রহ এর খেদমতে অর্পন

যার সত্ত্বা আমার জন্য একজন আদর্শবান অধিকন্তু একজন উপমাহীন পিতা যার মাঝে সর্বদা একজন আদর্শ উসতায ও এক সূক্ষ্মদর্শী শায়েখ ও মুরুব্বীর স্নেহ মমতা বিদ্যমান। আল্লাহ জমীনের বুকে যার চাইতে প্রিয় মানুষ আমার নিকট আর কেহ নাই এবং আকীদার ক্ষেত্রে তাঁর চাইতে বড় কোন মারকাজ নাই। আল্লাহ তাঁর হেফাযত করুন]।

আমার এই কিঞ্চিত শ্রম তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকেই তাঁর প্রতি প্রতি সম্বন্ধ করে বিনীত আবেদন করছি।

اگر سیاہ دلم داغ لالہ زار توام
و گر کشادہ جبینم گل بہار توام

মুহাম্মদ তাকী উসমানী

সূচিপত্র

আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী রহ. সুউচ্চ প্রশংসা ও দোয়া।

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين

দুরুদ ও সালামের পর পবিত্র কুরআনে কারীমের উলুম সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিখ্যাত আলেমদের আরবী ভাষায় ভাল ভাল বই প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এগুলো থেকে কার্যত আলেম ওলামাগণই বেশী উপকৃত হতে পারেন। অধিকন্তু এই কিতাবগুলো পুরাতন নিয়মে পুরাতন চাহিদা ও পুরাতন রুচিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে এগুলো সে যুগের চাহিদাকে পরিপূর্ণভাবে পূরণ করেছে। এবং উন্নত ও উপকৃত হয়েছে।
কিন্তু দিল্লীতে যখণ স্যার সায়্যেদ আহমদ খানের তাফসীর প্রকাশ করা হলো।
এবং সেই তাফসীরে যখন উম্মতের আকীদার উপর আঘাত করত: এবং নতুন প্রজন্মের সামনে মিথ্যা, অবাস্তব ও মনগড়া মতবাদ পেশ করা হলো এমনকি নবুয়্যতকে (ব্যক্তি অর্জিত সম্পদ) বলা হলো এবং মুজেজা, জান্নাত, দোযখ, ফেরেশতা ও শয়তানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হলো।
এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতার জন্য নতুন উসূল (মূলনীতি) তৈরী করা হলো তখন মহান রাব্বুল আলামীন মাওলানা আবদুল হক হক্কানী দেহলভী দেওবন্দীকে দাঁড় করালেন যিনি (فتح المنان) ফতহুল মান্নান নামে এক চমৎকার তাফসীর লিখলেন। এবং ইহার শুরুতে (بيان فى علوم القرأن) বয়ান ফি উলুমিল কুরআন নামে তুলনাহীন একটি তাফসীরের মূলনীতি সম্বলিত ভূমিকা সংযোজন করে দিলেন।
তাফসীরের প্রথম খণ্ডে ইহার সারসংক্ষেপ সংযোজন করলেন ফলে অত্যান্ত সুন্দরভাবে সে প্রয়োজন পূরণ হলো।
কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবৎ এই অভাব অনুভব হচ্ছিল যেন পরবর্তী প্রজন্মের দিকনির্দেশনার জন্য নতুন আঙ্গিকে একটি কিতাব এবং কুরআনী সত্যতাকে প্রকাশ করার জন্য একটি পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত ভূমিকা সম্বলিত একটি কিতাব লিবিবদ্ধ হউক যাতে থাকবে ওহী, শানে নুযুল, কুরআনের নাজিলের ধারাবাহিকতা, সাত ক্বেরাত, ইজাজুল কুরআন ইত্যাদি কুরআনের সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়াদি অন্তরদৃষ্টির আন্দাজে প্রকাশ করা হবে যার মধ্যে প্রাশ্চাত্যের মুসতাশরিকীনদের মস্তিস্ক প্রসৃত সন্দেহ ও বানোয়াটি বিদ্ধেষমূলক সন্দেহ ও সংশয়ের তৃপ্তি মূলক দাতভাঙ্গা জবাব থাকবে এবং

সূচিপত্র

সাথে সাথে পাশ্চ্যাত্যবাদীদের আদলে গড়ে উঠা প্রাচ্যদের বাজে ধ্যান ধারণার জবাব থাকবে।

আলহামদুলিল্লাহ সেই বিশাল এবং অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনাব মাওলানা মুফতী তাক্বী উসমানী সাহেব মারেফুল কুরআনের শুরুতে অত্যান্ত সুন্দরভাবে বিস্তারিত ভূমিকা পেশ করেছেন এবং দ্বীনি ও ইলমী প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করে উম্মতের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ইলম ও কলমে পরিপূর্ণ বরকত এবং অধিক পরিমাণে তাওফিকে ইলাহী দান করুক। অত্র ভূমিকার কিছু অংশ আমি ধারাবাহিকভাবে অধ্যায়ন করেছি। আর বাকী কিছু অংশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ অনেক খুশি হলাম এবং আন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া বের হয়ে এলো-

হে আল্লাহ আমাদের ও তাঁকে আপনার রেজামন্দীতে দ্বীনের খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আর দরূদ ও সালাম দুজাহানের সর্দার খাতেমুন্নাবিয়্যিন জনাব মুহাম্মাদ (সা) এর উপর বর্ষিত হউক। এবং তার পরিবার পরিজন সাহাবায়ে কেরাম ও সকল উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর বর্ষিত হউক।

মুহাম্মাদ ইউসূফ বিন্নুরী
মাদ্রাসা আরাবিয়্যা ইসলামিয়্যাহ করাচী।
জুমারাত, ১২ই জুমাদিউল উলা ১৩৯৬ হিজরী

সূচিপত্র

মুফতী শফী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ ফজল করম যে মারেফুল কুরআনের আদলে আমাকে পবিত্র কুরআনে কারীমের খেদমত করার তাওফিক দান করেছেন। এবং এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, এর দ্বারা আল্লাহর রহমতে মুসলমানদের উপকার হচ্ছে। আর যখন এই তাফসীরখানা পূণরায় দ্বিতীয়বার প্রকাশ হতে চলছিল তখন আমার মনে জাগছিল যে ইহার শুরুতে উলুমূল কুরআন শিরোনামে একটি ভূমিকা সংযোজন করা হউক। কিন্তু আমার অসুস্থতা ও দূর্বলতার কারণে এ মহতী কাজটি আঞ্জাম দেওয়া আমার সাধ্যে হচ্ছিল না। বিধায় আমার এই অভিপ্রায়কে পূর্ণ করার জন্য আমার প্রিয় সন্তান মুহাম্মদ ত্বাকীকে দায়িত্ব প্রদান করি। তখন সে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে মারেফুল কুরআনের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছিল। আর সেই সময় সে যে উলুমূল কুরআন সম্পর্কে শুভ সূচনা করেছিল পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তায়ালার ফজলে আজ তা পূর্ণরূপ নিয়ে উলুমূল কুরআন নামে পুস্তক আকারে প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

বস্তুত উলুমূল কুরআন একটি বিস্তৃত বিষয় যে সম্পর্কে আরবীতে বড় বড় কিতাব রচিত হয়েছে। এমনকি উর্দূতেও অনেকগুলো রচিত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ের উপর এমন একটি কিতাব রচিত হওয়ার দরকার ছিল যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পুরোপুরি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে আধুনিক কালের প্রাচ্য পন্ডিত ও সংস্কার পন্থিদের আমাদানীকৃত সন্দেহ সৃষ্টিকারী সকল মতবাদের জ্ঞানগর্ভ জবাবও থাকবে। তাছাড়া বর্তমান যুগের যে সকল লোক যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও কুরআনুল কারীমের মনগড়া তাফসীর লিখছেন এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ উসূল ও আইন-কানুনকে যেভাবে পদদলিত করা হচ্ছে সেই দৃষ্টি কোন থেকেও এটা জরুরী ছিল যে তাফসীরের উসূল সমূহে আধুনিক বিষয়গুলোকে সংযাজন করে প্রকাশ করা যাতে পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামীতা সৃষ্টি হওয়ার বিষয়াদির প্রতি দিক নির্দেশনা থাকবে।

মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া যে, এই কিতাবটির মাঝে সময়ের সেই মহান চাহিদা পূরনে আমার ধারণার চাইতেও অনেক বেশী পুরো করে দিয়েছে। এবং আমি মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আশাবাদী যে, যদি এ কিতাবখানা সত্য অনুসন্ধানী এবং ন্যায় নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে পাঠ করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা তাফসীর শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জিত হবে। এবং এ সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝি সন্দেহ ও অপব্যাখ্যা যা প্রাচ্য-পন্ডিতদের পক্ষ থেকে অজ্ঞতাবশত সাধারণ লোকের অন্তরে সৃষ্টি হয় যেগুলোর জন্য সন্তোষজনক মীমাংসা পাওয়া যাবে।

সূচিপত্র

প্রকৃত পক্ষে এই কিতাব রচনার দায়িত্ব আমার প্রিয় সন্তানের উপর অর্পন করার কারণ হলো আমার ধারাবাহিক অসুস্থতা এবং দূর্বলতা এবং একথাও মনে ছিল যে পিতা অক্ষমও হয়ে থাকলে ও ছেলে পূর্ণতা দান করবে। উক্তিটি সত্য হলেও হতে পারে। পরবর্তীতে কিতাবটির পান্ডুলিপি যখন আমার সামনে পেশ করা হলো তখর আমার দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কারণে তা নিজে দেখতে পারলমা না তারপরও অনেকগুলো আলোচনা পড়িয়ে শুনে আমার আনন্দের সীমা রইলনা আল্লাহর অনেক শুকরিয়া এই পুরা কিতাবটি মাশাআল্লাহ যেভাবে প্রস্তুত হয়েছে। আমি যদি নিজেও আমার সুস্থ অবস্থায় লিখতাম তাহলেও এমন অর্থবহ করে লিখতে পারতাম না। কারণ এর দুটি কারণ রয়েছে।

প্রথমতঃ এতে যে সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বিশাল পাহাড়সম পড়াশুনা করা হয়েছে তা আমার সাধ্যে কুলাত না।

আর যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি নেওয়াও হয়েছে এবং যেগুলোর বিবরণ প্রতি অধ্যায়ে এবং পৃষ্টার টিকাতে প্রদত্ত হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজে তা অনুমান করা যায়।আর দ্বিতীয় কারণ এর থেকে অধিক স্পষ্ট যে আমি ইংরেজী ভাষা না জানায় প্রাচ্য-পন্ডিতদের সেই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেওয়াকেফ ছিলাম সেগুলোকে সে কুরআন ও উলুমূল কুরআন সম্পর্কে তাদের বিশাক্ত উক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। কেননা আমার ছেলে ইংরেজীতে এম, এ, এল, এল, বিতে উচ্চস্থান নিয়ে পাস করেছে সেহেতু সেসেই সকল উক্তিগুলো বের করে সময়ের চাহিদা পূরন করে দিয়েছে।

মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট হৃদয় থেকে এ দোয়াটি করছি যেন আমার এই চখের মনিটিকে পূর্ণ সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াত দান করেন এবং সব ধরনের বালা-মসিবত এবং দৃশ্য-অদৃশ্য সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রেখে বেশী বেশী করে ইলমে দ্বীনের খিদমাত করার তাওফিক দান করেন। এবং সর্ব ক্ষেত্রে সততা, ইখলাস এবং আপনার পূর্ণ সন্তুষ্টি দান করেন। অধিকন্তু এই গ্রন্থটিকে আপনার ফজ্‌ল ও করম দ্বারা কবুল করতঃ তার ও আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। এবং মুসলমানদের এর দ্বারা অধিক উপকৃত করুন।

والله المعان

বান্দাহ মুহাম্মদ শফী (আফাল্লাহু আনহু)

দারুল উলূম করাচী ১৪. হি

১লা জুমাদিউস সানী-১৩৯৬ হিজরী

[সূচিপত্র]

ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعدُ :

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের ওপর অবিরত বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক। আমার আন্তরিক কামনা হলো, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন।

আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদের পর আমি

পবিত্র কুরআন মাজীদ সমগ্র মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এত বড় এক নেয়ামত এবং অনুগ্রহ, পৃথিবীর এমন কোন বড় ধন-সম্পদ নাই, যা তার সমপর্যায়ের হতে পারে। এটা এমন এক ব্যবস্থাপত্র; যার তেলাওয়াত, শোনা ও শোনানো, শেখা ও শেখানো, এর উপর আমল করা এবং যে কোনো উপায়ে এর প্রচার ও প্রকাশের খেদমতের আঞ্জাম দেওয়া, ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানের জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

সহীহ মুসলিম শরীফ সহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা একদা আসহাবে সুফ্ফায় বসা অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কে এই বিষয়টি পছন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন 'বুহতান' কিংবা 'আকীক' (বাজারে)-এ গমন করবে এবং কোনো পাপ কাজে সম্পৃক্ত হওয়া কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ব্যতিরেখে উন্নত মানের দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে?" আমরা আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের মধ্যে সকলেই পছন্দ করবে।" নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে (পবিত্র কুরআন মাজীদের) দু'টি আয়াত নিজে শিখে বা শেখায়, তবে এটা তার জন্য দুই উষ্ট্রী অপেক্ষা অধিক উত্তম। তিন আয়াত শিখলে তিনটি উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম। আর যদি চার আয়াত শিখে তবে চারটি উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম।"

নবীজী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত, এর অর্থগত জ্ঞান অর্জন করা, সেই অনুযায়ী আমল করা এবং ইহার প্রচার ও প্রসার সম্পর্কিত যেসব ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছেন এবং উম্মতকে যেভাবে ইহার উপর আমলের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন- উপরোক্ত হাদীস এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাত্র। হাদীস ভাণ্ডার এ ধরনের বহু হাদীস দ্বারা সমৃদ্ধ। এ জন্যই উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র কুরআনুল কারীম এবং ইহার শিক্ষা-দীক্ষার এমন এমন দিক থেকে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং

সূচিপত্র

এর শব্দমালা ও অর্থকে সংরক্ষণ করার নিমিত্তে এমন নযীরবিহীন প্রাণান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেখে আমাদের বিবেক হতচকিত হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের অর্থ ও ব্যাখ্যা তো বলা বাহুল্য, এই উম্মত মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত এই কিতাবের শব্দমালা, হরকত, সাকিন, এবং অক্ষরগুলোকে ঠিক ঠিকভাবে যবান থেকে উচ্চারণ করার উদ্দেশ্যে ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন এমন ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যার উদাহরণ দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্ম এবং ভাষায় নযীরবিহীন। এক তাজভীদ ও ক্বেরাত বিষয়ক জ্ঞানের কথাই বিবেচনা করুন, এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ এবং ইহার সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করার নিমিত্তে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে যে, এগুলো দ্বারা আলাদা একটি পাঠাগার স্থাপন করা যেতে পারে।

মোটকথা, যত দিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের খেদমত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ একটি হলো ওই সকল গ্রন্থ, যা "উলুমূল কুরআন" বিষয়ের উপর লিখা হয়েছে।

বস্তুত "উলূমূল কুরআন" এক সুপ্রশস্ত ব্যাপক ও সমৃদ্ধ ইলম। এতে তাফসীর শাস্ত্রের সূচনাকালীন আলোচনা ও মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়। যেমন, নবীজী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি কিভাবে পবিত্র কুরআন নাযিল হতো? ওহীর হাকীকত কি? মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই গ্রন্থ কোন্ তারতীবে অবতীর্ণ হয়েছে? কতকাল সময় ধরে এর অবতরণ সম্পন্ন হয়েছে? মাক্কী সূরা ও মাদানী সূরা দ্বারা কি উদ্দেশ্য বুঝানো হয়েছে? শানে নুযূল এর মানে কি? পবিত্র কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে এর অবস্থান কি? পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াত মানসূখ আছে কি না? পবিত্র কুরআনের 'বিভিন্ন হরফ' ও 'বিভিন্ন ক্বেরাত' দ্বারা কি উদ্দ্যেশ্য বুঝানো হয়েছে ? পবিত্র কুরআন মাজীদ কোন ধরনের বিষয়বস্তু দ্বারা সমৃদ্ধ? মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কিভাবে এ মহাগ্রন্থকে সংরক্ষিত রেখেছেন ? এর লিখন ও মুদ্রণ কতগুলো ধারা অতিক্রম করেছে? পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর করার নীতিমালা ও আদবসমূহ কি কি? আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই কিতাবকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য উপযুক্ত পন্থাসমূহ কি কি ? এবং এই ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ ভুল-ভ্রান্তি মানুষকে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেয় ? এগুলো এবং এই ধরনের আরো অনেক জিজ্ঞাসা তথা প্রশ্নের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া হয় "উলূমূল কুরআন" নামক গ্রন্থটিতে।

সূচিপত্র

আরবী ভাষায় এই বিষয়বস্তুর উপর রচিত আল্লামা যারকাশী (রহ.)-এর "আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন" (চার খণ্ড) আল্লাহ সূয়ূতী (রহ.)-এর "আল-ইতকান" (দুই খণ্ড) এবং শায়খ যুরকানী (রহ.)-এর "মানাহিলুল ইরফান" (দুই খণ্ড) আজও এ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত গ্রন্থ এবং স্বীয় বিষয়বস্তুর উপর উৎসগত মর্যাদা সমুন্নত রাখে। উর্দূ ভাষাতেও এ বিষয়ের উপর একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার মধ্যে আল্লামা আবদুল হক হক্কানী (রহ.) রচিত "আল-বয়ান ফী উলূমিল কুরআন" সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং বহুল পঠিত।

কিন্তু কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীও পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই এই দীর্ঘ দিন যাবৎ এ প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল যে, বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য সমাজের চিন্তাধারার প্রভাবে উপরোক্ত বিষয়ের উপর নতুন নতুন যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, সেগুলোকে সামনে রেখে এ বিষয়বস্তুর উপর নতুন কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন করা হোক। তবে ঘুণাক্ষরেও আমার মনের মাঝে এ কল্পনা ছিল না যে, এই চাহিদা পূরণে আমি অধমেরও কোনো অংশদারিত্ব তথা অবদান থাকতে পারে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, এ সৌভাগ্য মহান আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে রেখেছিলেন। আর তা অর্জনের সুযোগ এভাবে হয়েছে যে, অধমের সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (মাদ্দাযিল্লুহুম) উর্দূ ভাষায় তাফসীরে "মা'আরিফুল কুরআন" লিপিবদ্ধ করেন। যা আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আর কোনরূপ দ্বিধা ও সংকোচ ছাড়াই বলা যায় যে, তা সালফে-সালেহীনের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে একটি অতুলনীয় উর্দূ তাফসীর। তাই তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটাকে পাঠকসমাজে সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। যখন এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করার সময় ঘনিয়ে এল, তখন আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আমাকে আদেশ করলেন যে, এর শুরুতে "উলূমূল কুরআন" সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য।

আমি তাহার নির্দেশ পালনার্থে এই ভূমিকা লিখতে শুরু করি। তখন সেই পূর্বের আকাঙ্খা পুনরায় নতুন করে আমার মনের গহীনে জেগে উঠল এবং সংক্ষিপ্তকরণের বহু রকমের চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভূমিকাটি দীর্ঘ হতে লাগল। যখন পাণ্ডুলিপির প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেল অথচ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় তখনও অবশিষ্ট ছিল, তখন মনে হলো যে, এত দীর্ঘ ভূমিকা তাফসীরের প্রারম্ভে সংযোজন করা যথাপোযুক্ত হবে না। অতএব শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের ইঙ্গিতে তাফসীরের ভূমিকার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংক্ষিপ্ত পরিসরে

সূচিপত্র

আলাদাভাবে সংকলন করি, যা তাফসীরের প্রারম্ভে ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। আর এই বিস্তারিত ভূমিকাটিকে স্বতন্ত্র রচনার আকৃতি দিয়ে দেই। নিজের হাজারো রকমের ব্যস্ততা ও নানাবিধ কারণে এ গ্রন্থ সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সময় লেগে গেছে। তারপরও এটা মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অসীম করুণা ও অনুগ্রহ যে, যতগুলো বিষয় আমি এই গ্রন্থে উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম, তার সবগুলোই মোটামোটি কমবেশী এতে সংকলিত করা হয়েছে।

তথাপিও আমি এ কথা তো দাবী করতে পারি না যে, "উলুমূল কুরআন" বিষয়ে বর্তমান যুগে যে নতুন গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন ছিল, সেই শূন্যতা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যথাযথভাবে পূরণ করে দিয়েছে। তবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অসীম রহমত ও দয়ার বরকতে আমি এতটুকু আশাবাদী যে, বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর জন্য যথেষ্ট উপকরণাদি এতে পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ। আমি এ গ্রন্থে "উলূমূল কুরআন" সম্পর্কিত সেসকল প্রসিদ্ধ মাস'আলা গুলোর তাহকীকও একত্রিত করার চেষ্টা করেছি, যেগুলোর পূর্ণ বিবরণের জন্য বহু গ্রন্থের শরাণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হতো। আরও কিছু নতুন আলোচনাও সংযোজন করেছি। যদি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীজনদের নিকট তা যথেষ্ট ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, তবে এটা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অপার অনুগ্রহ মাত্র। নতুবা কমপক্ষে এগুলোর একটি উপমা বা নিদর্শণ তো অঙ্কন করে দিতে সক্ষম হয়েছি। ভবিষ্যতে আলেম উলামা ও চিন্তাবিদগণ হয়তো সেগুলোকে পূর্ণতার মর্যাদার পৌছে দিতে সক্ষম হবেন বলে আশা রাখি। আর যদি পবিত্র কুরআনুল কারীম বুঝার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি কারো নূন্যতম উপকারেও আসে, তবে আমার সামান্য শ্রমের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাবে বলে আশা পোষণ করি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট এই দু'আর আরজি পেশ করছি যে, মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে স্বীয় দরবারে কবুল করে মর্যাদা দান করেন এবং আমার জন্য এটা যেন পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের মুক্তির পাথেয় হিসেবে পরিগণিত হয়। আমীন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

বিনীত

আহকার মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

খাদেমুত তুলাবা, দারুল উলূম করাচী,১৪

২৯ জুমাদাল উলা ১৩৯৬ হিজরী

সূচিপত্র

মাওলানা তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

মাওলানা তাকী উসমানী ৫৪ শাওয়াল ১৩৬২ জিজরী মুতাবেক ১৯৪৩ সালের ৫ অক্টোবর ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থান জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে তাঁর পরিবার হিজরত করে পাকিস্তান গমন করে। তাঁর বাবা হলেন পাকিস্তানের বিখ্যাত .আলেম মুফতি শফি। মাওলানা তাকী উসমানী পাঁচ ভাইবোনের মাঝে দ্বিতীয়। তাঁর বংশধারা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে।

শিক্ষাজীবন ঃ

পরিবারে মায়ের কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। মার কাছেই তিনি উর্দূ ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আট বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম করাচিতে ভর্তি হন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকেই দরসে নেযামি সিলেবাসের সর্বোচ্চ স্তর দাওরা হাদিস সমাপন করেন। দাওরা হাদিসের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় তিনি সর্বকালের সেরা নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

এরপর তিনি তাঁর পিতা মুফতি শফী উসমানীর তত্বাবধানে ইসলামী ফিকহে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলুম করাচী থেকে ফিকহ ও ফতোয়ার ওপর তাখাসুস (পি. এইচ, ডির সমমানের ডিগ্রি) সম্পন্ন করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিজ্ঞানে বি. কম এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি পাশ করেন।

এছাড়া তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্য এম. এ ডিগ্রিও অর্জন করেন। (১) তিনি শায়খ হাসান মাশাত, মুফতী মুহাম্মাদ শফী উসমানী, মাওলানা ইদ্রীস কান্দলভী, মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী এবং শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার ইজাযত (অনুমতি) গ্রহণ করেন।

তাসওউফ ঃ

তাসওউফের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেওবন্দের আলিমদের ধারা অনুসারে তিনি আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর খলিফা শায়খ ডা. আব্দুল হাই আরিফীর হাত বাইআত (ষীষত্ব) হন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ডা. আব্দুল হাই আরিফী মৃত্যুবরণ করেন। তখন তিনি আশরাফ আলী থানভী এর আরেক খলিফা মাসীহুল্লাহ খান থেকে বাইআত গ্রহণ করে।

কর্মজীবন (সম্পাদনা)

সূচিপত্র

১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদিস সমাপনের পর থেকেই তিনি দারুল উলুম করাচিতে অধ্যাপনা করে আসছেন।

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরিয়া এ্যাপ্লাইট বেঞ্চের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মিজান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে। তাকী উস্‌মানী আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি (ওআইসির একটি শাখা সংস্থা) এর একজন স্থায়ী সদস্য। ৯ বছর তিনি আন্তর্জাতি ফিকহ একাডেমির ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে মাওলানা তাকী উসমানীকে দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনীতি সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধানমন্ত্রি ইসলামী অর্থনীতিতে তাঁর অবদান ও অর্জনের কারণে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। প্রতি সপ্তাহের রবিবার তিনি করাচীর দারুল উলুম মাদরাসায় তাযকিয়াহ তথা আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বয়ান করেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলুম করাচীতে সহীহ বুখারী, ফিকহ এবং ইসলামী অর্থনীতির দরস প্রদান করেন। ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট যুলফিকার আলী ভুট্টোর আমলে পাকিস্তান ন্যাশলাল এ্যাসেম্বলি কর্তৃক কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ব্যাপারে আলিমদের মধ্য হতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে হদ্দ, কিসাস এবং দিয়ত সম্পর্কিত আইন প্রণয়নে তিনি অগ্রবর্তি ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি উর্দূ মাসিক পত্রিকা আল-বালাগ এবং ১৯৯০ সাল থেকে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা আল-বালাগ ইন্টারন্যাশনালের প্রধান সম্পাদক পদে আছেন। ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আরবি, উর্দূ এবং ইংরেজী ভাষায় ষাটের অধিক গ্রন্থের চরয়িতা। তার রচিত অধিকাংশ বই বাংলায় অনুদিত হয়েছে।

বর্তমান ব্যস্ততা

দারুল উলূম করাচির শায়খুল হাদিসও নাযেমে মুহতামিম ঃ

চেয়ারম্যন, আন্তর্জাতিক ষ্ট্যান্ডাড শরীয়াহ কাউন্সিল, ইসলামিক অর্থনৈতিক একাউন্টিং ও পরিদর্শন সংস্থা, বাহরাইন।

স্থায়ী সদস্য, আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি, জেদ্দা (ও আই সির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান)

চেয়্যারম্যন, সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনোমিকস, পাকিস্তান (১৯৯১ থেকে)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম তথা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম এমনই এক ঐশীগ্রন্থ, সমস্ত সৃষ্টিজগতে যার কোন তুলনাই হয় না। পবিত্র কুরআন মাজীদের ভাষাগত বিন্যাস ও আলঙ্কার, রচনা শৈলী এবং উপস্থাপন ভঙ্গি এক কথায় সকল দিক দিয়েই এতই সমৃদ্ধ ও উচ্চমান সম্পন্ন যে, দুনিয়ার কোন ভাষা এবং সাহিত্য ইহার মাধুর্যতা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে অক্ষম। পবিত্র কুরআন মাজীদ, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা কতৃক প্রেরিত অমূল্য সম্পদ, যার কোন তুলনাই হয় না। ইহা এমনই এক ব্যবস্থাপত্র, যার তিলাওয়াত, তর্জমা, তাফসীর, শেখা এবং শেখানো, ইহার উপর আমল করা এবং যে কোন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে ইহার প্রকাশ, প্রচার ও প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দেওয়া ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনের জন্যই পরম সৌভাগ্য ও মর্যদার বিষয়। আর এই জন্যই পবিত্র কুরআনুল কারীম নাজিল হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ নানাভাবে ইহার খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে আসছে। জগত বিখ্যাত লেখক ও মনীষীদের রচিত হাজার হাজার গ্রন্থ। সেই সকল গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি হলো বক্ষমান গ্রন্থ "উলুমূল কুরআন" ইহার রচয়িতা হলেন বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন, যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, ইলমী চেতনা এক আদর্শের অন্যতম ধারক ও বাহক এবং কালজয়ী ইসলামী লেখক, শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ত্বাকী উসমানী সাহেব। যার সম্পর্কে পাঠক সমাজে সর্বজন বিদিত যে, তিনি ইসলামী নানাধিক শাখা প্রশাখার যে বিষয়েই কলম ধরেছেন, সেটারই হক পুরোপুরি আদায় করে ছেড়েছেন। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনা সমূহের মধ্যে "উলুমূল কুরআন" গ্রন্থটি অন্যতম। ইহার মধ্যে তিনি কুরআন বিষয়ক যাবতীয় ইলম ও উসূলে তাফসীরের মূলনীতি সমূহ বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি এই সংক্রান্ত নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তি সমূহের প্রতিও আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন- তাঁর সূচিন্তিত মতামত সুগভীর ইসলামিক প্রজ্ঞা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। বা সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে "উলুমূল কুরআন" সংক্রান্ত অপরাপর বড় বড় গ্রন্থ ও সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে বিমুখ করে দিয়ে এ বিষয়ের মূলবিষয় ও সারাংশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে যথাযথ সাহায্য সহযোগিতা লাভে ধন্য করবে বলে আশা পোষণ করি। ইনশাআল্লাহ।

দিবালোকের ন্যায় প্রতিয়মান যে, তাফসীরুল কুরআন কে ভালভাবে বোধগম্য করার জন্য উলুমুল কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন একটি অপরিহার্য বিষয়। এব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ণ ও গবেষণা ছাড়া তাফসীরুল কুরআন নিজে

সূচিপত্র

বুঝা ও তাসফীর করা অসম্ভব ও ঝুকিপূর্ণ কেননা যারাই উলুমে কুরআন তথা তাফসীরে মূলনীতি অনুস্মরণ না করে তাফসীর লিখেছে কিংবা তাফসীর করেছে তাদেরই পদস্খলন ঘটেছে।

আলোচ্য এই কিতাবটি মূলত উলুমুল কুরআন ও উসুলে তাফসীরের ওপর ভিত্তি করে লেখা। উসুলে তাফসীরের বেড়াজাল অতিক্রম করে যে সকল তাফসীর কারক তাদের কল্পিত চিন্তাধারা, বিশেষ করে জড়বাদী মতাদর্শের অনুসারী, সেই সকল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের মনগড়া উক্তির বিজ্ঞানসম্মত জবাব দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে যখন স্যার সৈয়দ আহমদ খানের তাফসীর প্রকাশিত হলো, সেই তাফসীর দ্বারা যখন উম্মতের আকিদা বিশ্বাসের ওপর আঘাত করা হলো এবং নতুন প্রজন্মের সামনে মিথ্যা ও মনগড়া মতবাদ উপস্থাপন করা হলো। নবুওয়াতকে 'কাসবী' বা উপার্জিত বলা হলো,মু'জিযা, জান্নাত ও জাহান্নাম, ফিরিশতা ও শয়তানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হলো এবং কুরআনী সত্যতার জন্য নতুন উসুল তৈরি করা হলো; তখন আব্দুল হক হাক্কানী রহ. "ফাতহুল মান্নান" নামে একটি উৎকৃষ্ট তাফসীর লিখে তার দাতভাঙ্গা জবাব দিলেন। কিন্তু যুগপরিক্রমায় নিত্যনতুন সমস্যা আর অভিযোগ জড়বাদী মতাদর্শের লোকদের পক্ষ থেকে আসতে থাকে যা নতুন প্রজন্মকে করতে পারে দিকভ্রান্ত । তাই এই অভূতপূর্ব জটিলতার সমাধান কল্পে প্রয়োজন ছিল পথ-নির্দেশনার নতুন ধারায় এমন কিতাব যা কুরআনী সত্যতাকে প্রকাশ করার জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ। আমি মনে করি এই কিতাবটি পূর্ণমাত্রায় সেই অভাব পূরণে সক্ষম হয়েছে।

আল্লামা মুফতী ত্বাকী উসমানী সাহেব তার কালজয়ী উলুমূল কুরআন গ্রন্থটি দুই অংশে বিভক্ত করেছেন প্রথম অংশে তিনি কুরআনে পরিচিতি এর অধিনে আটটি পরিচ্ছেদ স্থাপন করে কুরআনের পরিচিতি, ইতিহাস, সাত হরফ, নাসেখ-মানসুখ, পবিত্র কুরআনের সংরক্ষনের ইতিহাস। তেলাওয়াত এই সম্পর্কে সংশয় ও এর জবাব কুরআনের বিষয়াবলী সত্যতা ও বিষয় বস্তুর উপর বিস্তারিত সারগর্ভ অত্যাবশ্যকীয় যেগুলো মুমিন হওয়ার জন্যও জরুরী। আর দ্বিতীয় অংশে তাফসীরের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি চারটি পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছেন যেগুলোতে তিনি তাফসীর শাস্ত্র ও এর গ্রহণযোগ্য, অগ্রহনযোগ্য উৎস তাফসীরের আবশ্যকীয় কতিপয় মূলনীতি, প্রাথমিকযুগের নির্ভরযোগ্য অনির্ভরযোগ্য কতেক মুফফাসিরীনদের আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ তিনি পূর্বযোগের ও পরবর্তিযুগের কয়েকটি নির্ভলযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং কেহ যদি এ বিষয়াবলী

সূচিপত্র

জানার জন্য শুধু মাত্র এগ্রন্থটির উপর নির্ভর করে তথাপিও সে এ বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ও তৃপ্তি পাইবে ।

নিম্নে পরিচ্ছেদ অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ।

১ম পরিচ্ছেদ কুরআন পরিচিতি ।

কিতাবের শুরুতেই কুরআনের নাম ও তার তাৎপর্য, অহীর প্রয়োজনীয়তা, অহীর প্রকারভেদ, অহীর আগমনের তরীকা এবং অহী,কাশফ ও ইলহামের পরিচয়সহ নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ "কুরআন নাযিলের ইতিহাস"

পাশাপাশি শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাপারে কতকের মনের ভ্রান্তি-অপনোদন করা হয়েছে । তার কথার অর্থ শানে নুযূলের অবহেলা নয়, বরং বিভিন্নতার হাকীকত বর্ণনা করা ।

পরবর্তীতে "শানে নুযূল ও বর্ণনার বিভিন্নতা" নামক শিরোনামে সাহাবায়ে কেরাম থেকে একই আয়াতের বিভিন্ন "শানে নুযূল" বর্ণিত হওয়ার কিছু ছুরত/বিবরণ ও কারণ বর্ণনার পাশাপাশি "তারজীহ" দেয়ার মূলনীতি-বিবরণ প্রদান করা হয়েছে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কুরআনের সাত হরফ ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃএ অধ্যায়টি "নাসিখ ও মানসুখ" শিরোনামে "নসখ"/ রহিতকরণের

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ কোরআন সংরক্ষণ সম্পর্কিত সংশয় ও তার জবাব ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'কুরআন সংরক্ষণ বিষয়ক সন্দেহ এবং তার জবাব' শিরোনামে প্রাচ্যপন্ডিতদের থেকে আসা অভিযোগগুলো খন্ডন করেছেন।

এ অধ্যায়টি প্রাচ্যবিদদের কোরআন সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ভুল বিশ্লেষিত বিষয়, অবান্তর এবং বানোয়াট সকল প্রশ্নের জবাবদান নিয়ে আলোচিত হয়েছে । এতে প্রাচ্যবিদদের গোয়ার্তুমি, হঠকারিতা ইত্যাদির বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।এতে মোট ১১টি প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা তারা কোরআন অসংরক্ষিত ছিল বলে দাবি করে থাকে,

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ কুরআনের সত্যতা ।

এ অধ্যায়টি কুরআন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নানান ধরণের প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা রয়েছে ।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ

সূচিপত্র

এখণ্ডে তাফসীর করার ক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা এবং তাফসীর গ্রন্থ ও মুফাসসিরীনের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ তাফসীর শাস্ত্র ও তার উৎস।

এতে তাফসীর শাস্ত্রে অধ্যায়নরত, ইচ্ছুক এবং অগ্রহীদের জন্য পাথেয় রয়েছে। বিস্তারিতভাবে এতে আলোচিত হয়েছে তাফসীর শাস্ত্রের পরিচিতি; শব্দ বিশ্লেষণ, নামকরণের কারণ, তার সংজ্ঞাসহ তার আলোচ্যবিষয়সমূহ, যথাঃ ১। কুরআনের শব্দমালা ও পঠন পদ্ধতি, ২। তার শব্দগত অর্থ, ৩। শব্দগত আহকাম, ৪। শব্দের বাক্যগত আহকাম, ৫। তারকীবী অবস্থায় শব্দের সামষ্টিক অর্থ, ৬। অর্থের পূর্ণতা, তাফসীর ও তাবীলের মধ্যে পার্থক্য। এছাড়াও আলোচিত হয়েছে তাফসীরের মূল উৎসসমূহের বিস্তারিত বিবরণ, যথাঃ ১। স্বয়ং কুরআন, ২। হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ৩। আসারে সাহাবা, ৪। আসারে তাবেয়ীন, ৫। আরবী ভাষা, ৬। সুস্থ বিবেক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাফসীর শাস্ত্রে অগ্রহণযোগ্য উৎস।

এছাড়াও এতে প্রাসঙ্গিকভাবে এমনসব মূল্যবান বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে, অধ্যায়টিতে তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎসসমূহ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিনা করা হয়েছে, যথাঃ

১। ইসরাইলী রেওয়ায়াত।

২। সূফীগণের তাফসীর। ৩। তাফসীর বির-রায় বা মনগড়া তাফসীর। এটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

এরপর তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার কারণ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যথাঃ

১। অযোগ্যতা।২। কুরআনকে নিজের চিন্তাধারার অধীন করা।৩। সমকালীন দর্শণে প্রভাবান্বিত হওয়া। ৪। কুরআনের বিষয়বস্তুকে ভুল মনে করা।

এ পরিচ্ছেদে তাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করা হয়েছে,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাফসীরের কয়েকটি আবশ্যকীয় মূলনীতি।

এতে এমন কিছু নীতি উল্লেখ করা হয়েছে, যার অজ্ঞতার ফলে ধোকায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নে সেগুলোর শিরোনামভিত্তিক আলোচনা করা হল, যথাঃ

১। কুরআন কারীম ও রূপক অর্থ। এতে রূপকের অধীনস্ত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২। কুরআনুল কারীম ও আকলী দলীল। নকলী দলীল।

৩। শরয়ী বিধিবিধান ও বিবেকবুদ্ধি।

সূচিপত্র

এবং "শরঈ বিধান হেকমত ও কল্যাণের উপর নিভ্ররশীল নয়" নামক শিরোনামে সংস্কারমূলক কিছু আলোচনা ।

১. স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি এবং হেদায়াত ও গোমরাহী

২. ইসলামী বিধি-বিধানের রহস্য ও দ্বীনের ক্ষেত্রে সেগুলোয় অবস্থান

৩. শরঈ বিধান হেকমত ও কল্যাণের উপর নির্ভরশীল নয়

৪. শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'অনুসরণের পরীক্ষা'

৪ । শরঈ বিধিবিধানের আসল উদ্যেশ্য "অনুসরণের পরীক্ষা" । ৫ । কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যার সঠিক পদ্ধতি ।৬ । কালের বিবর্তণ ও শরঈ আহকাম ।৭ । যুগ পরিবর্তনের অর্থ । ৮ । বিবেক-বুদ্ধির সঠিক কর্মপরিধি ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃপ্রাথমিক যুগের কয়েকজন মুফাসসির ।

এতে বিভিন্ন সাহাবা এবং পরবর্তীস্থরের মুফাসসিরীনের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, তাদের অবস্থান এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় খণ্ডে তাফসীরের পরিচিতি,

কিতাবের শেষদিকে প্রথম যুগের কিছু মুফাসসির সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করার পাশাপাশি কিছু দুর্বল বা বিতর্কিত মুফাস্সিরদের নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন । এবং পরিশেবে মুতাআখখিরীন (পরবর্তীদের) কতিপয় তাফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন ।

এতে বিস্তারিতভাবে তাফসীরের এমনসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে কুরআনের তফসীরে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভট কথাবার্তা, কল্পকাহিনীর প্রবেশ ঘটেছে । যদ্বারা উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ইসলামের উপর কল্পকাহিনীনিভ্ররতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীনতার অভিযোগ উত্থাপিত হয় ।

এর "পরবর্তীদের তাফসীর গ্রন্থসমূহ" নামক শিরোনামে কতক তাফসীরগ্রন্থের বিবরণ দান এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন । সেগুলো হচ্ছে, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফ্সীরে কাবীর, তাফসীরে আবুস-সাউদ, তাফসীরে কুরতুবী, রুহুল মা'আনী, পাশাপাশি উর্দূ তাফসীরগ্রন্থ "তাফসীরে বয়ানুল কুরআন" ও "মাআরিফুল কুরআন"-এর ব্যাপারে কিছু কথা বলেন ।

কতিপয় ব্যক্তিগত অভিমতঃ

দুটি বিষয়ে অস্পষ্ট মনে হয়েছে । যেমন- বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রকারভেদ উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, "আল্লামা ইবনে আরাবী রহ. এমন এক প্রকার বর্ণনা করেছেন যা জমিনে বা আসমানে কোথাও নাযিল হয়নি । সূরা সাফফাত এর ৩টি আয়াত ও সূরা যুখরুফ এর ১টি আয়াত এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত । তবে আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন যে, তিনি এ

সূচিপত্র

ব্যাপারে কোন সনদ খুজে পাননি"। এরপর লেখক এ ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি। এখানে লেখকের নীরবতা বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে ফেলেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'নুজুলের পুনরুক্তি এবং তার বিশেষত্ব' শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে মুহতারাম লেখক সূরা তাওবার ১১৩ নং আয়াতের ৩টি শানে নুজুল উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে ১টি হলো- রসূলুল্লাহ সা. একদিন কবরস্থানে গমন করেন। একটি কবরের কাছে বসে অনেকক্ষন যাবৎ মোনাজাত করতে এবং কাঁদতে থাকলেন। তারপর বললেন, যে কবরের পাশে আমি বসেছিলাম সেটি ছিল আমার মায়ের কবর। আমি আমার প্রভুর কাছে তাঁর জন্য দোআ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে অনুমতি পাওয়া যায়নি, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

তারপর টিকায় এই হাদিসের প্রতি দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "সুতরাং এই বর্ণনাটি মওজু বলা যায় না এবং না একে আকিদাগতভাবে কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ের ভিত্তি বলা যেতে পারে। অথচ আহলে সুন্নতের একটি বৃহৎ দল অনেক দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে এই কথার পক্ষে যে, রসূলুল্লাহর সা. পিতামাতা মিল্লাতে ইবরাহীমের ওপর মৃত্যুবরণ করার কারণে মুমিন ছিলেন"। এখানেও অস্পষ্টতা থাকার কারনে পাঠকের ভুল ধারনা সৃষ্টি হতে পারে যে, যারা রসূলুল্লাহর সা. পিতামাতা মুশরিক হওয়ার পক্ষে তারা এই দুর্বল হাদিসের উপর ভিত্তি করে একথা বলেন। কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয় বরং ভিন্ন সহীহ ও সরীহ হাদিস এর পক্ষে রয়েছে।

পরিশেষে বলব-বইটির বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ত্বাকী উসমানী সাহেব বিস্তৃতভাবে লিখেছেন যে বিষয়ে আনুষাঙ্গিক সব কিছু নিয়ে আসছেন এবং বহু কিতাবাদি গবেষণা করে পূর্ববর্তীদের তথ্য উপাত্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে এযুগের চাইদা মাফিক সুচারুভাবে সারাংশ ও সারনির্যাস হিসেবে বইটিতে উপস্থাপন করেছেন ফলে বইটি জামে মানে পরিপূর্ণ এমনকি সকল শ্রেণী পেশার লোকদের খোরাকে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি এ বিষয়ের উপর কোন বই না পড়ে শুধু এই বইটির উপর নির্ভর করলেও তার জন্য যথেষ্ট হইবে।

আশা করি বইটি অধ্যয়নে সকলেই উপকৃত হবেন। আমীন

বিনীত

হারামাইন সম্পাদনা পর্ষদ

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম

পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

বিষয়

কুরআন মাজীদের পরিচিতি :.....৩৪

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ :.....৩৪

পবিত্র কুরআনুল কারীমের নাম ও নামকরণের তাৎপর্যঃ..... ৩৬

ওহী ও উহার হাকীকত :.....৩৮

ওহী প্রয়োজনীয়তাঃ..... ৩৮

ওহীর মূলকথাঃ.....৪০

ওহীর শিক্ষা :.....৪৩

ওহীর প্রকারভেদঃ:.....৪৩

১। আত্নিক ওহীঃ :.....৪৪

২।সরাসরি আল্লাহ পাকের কালাম বা বাণীঃ.....৪৪

৩. ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত ওহীঃ ৪৪

রাসূল (সা.)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি ঃ.....৪৫

১। ঘন্টা ধ্বনি ন্যায়ঃ.....৪৬

২. মানব রূপে ফেরেশতার আগমন :.....৪৮

৩. আসলরূপে ফেরেশতার আগমন :.....৫০

৪. সত্য স্বপ্ন :.....৫০

৫. আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম :.....৫১

৬. অন্তরে বার্তা গেঁথে দেওয়া :.....৫১

ওহী কাশফ ও ইলহাম প্রসঙ্গ :.....৫২

মাতল ও গাইরে মাতলূ ওহী :.....৫৩

ওহীর উপর বুদ্ধিভিত্তিক সংশয় : ৫৫

কুরআনের শুধু অর্থই কি ওহী ? :.....৬০

* উলূমুল কুরআন *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন নাযিলের ইতিহাস
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ :.....৬৪
প্রথম ধাপে অবতীর্ণ :.....৬৭
দ্বিতীয় ধাপে অবতীর্ণ :.....৬৭
সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত :.....৬৮
মাক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহ :.....৭২
মাক্কী ও মাদানী আয়াতের বিশেষত্ব :.....৭৪
কুরআন নাযিলের স্থান ও কাল :.....৭৬
১. 'নাহারী' আয়াত :.....৭৭
২.'লাইলী' আয়াত :.....৭৭
৩. 'সয়ফী' আয়াত : ৭৭
৪. 'শীতায়ী' আয়াত : ৭৭
৫. 'ফেরাশী' বিছায়ায় আয়াত : ৭৮
৬. 'নাওমী' নিদ্রাআবস্থায় আয়াত :.....৭৮
৭. 'সামান্ডী' আয়াত :.....৭৯
৮. 'ফেযায়ী' বা শুন্যে অবতীর্ণ আয়াত:.....৭৯
কুরআনুল কারীমের পর্যায়ক্রমিক অবতরণ :.|.....৭৯
কুরআন অবতীর্ণের বিন্যাস ও বর্তমান বিন্যাস :.....৮১
শানে নুযূল বা অবতীর্ণ প্রেক্ষাপট : ৮৪
শানে নুযূলের গুরুত্ব ও উপকারিতা : ৮৫
আসবাবে নুযূল ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর আলোচনা :
.....৯১
শানে নুযূল এবং আহকামের উমূম ও খুসূস :.....৯৩
শানে নুযূল ও বর্ণনার বিভিন্নতা : ৯৭
পুনঃ অবতরণ ও এর তাৎপর্য : ১০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল কুরআনের সাত হরফ :.....১০৭
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ :.....১০৭
সাত হরফের মর্মার্থ :.....১১০
"সাত হরফ"-এর সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা :.....১১৭

* উলূমুল কুরআন *

এই বক্তব্যটির অগ্রাধিকারের কারণসমূহ :.....১২০
এই বক্তব্যের উপর উত্থাপিত অভিযোগ ও সেগুলোর জবাবঃ.....১২২
প্রথম অভিযোগ : ১২২
দ্বিতীয় অভিযোগ :.....১২৩
সাত হরফ দ্বারা কি সহজবোধ্যতা তৈরি হলো? :.....১২৩
তৃতীয় অভিযোগ :.....১২৫.
চতুর্থ অভিযোগ :.....১২৬..
“হরুফে সাব’আ” এখনো সংরক্ষিত নাকি পরিত্যক্ত? :.....১২৮
হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর চিন্তাধারা ও এর নিন্দনীয় খারাপী দিকগুলো.....১২৮
ইমাম তহাতী (রহ.)-এর মতামত :.....১৩২
সর্বোত্তম বক্তব্য :.....১৩৪
এই মতামতের প্রবক্তা যারা :.....১৩৪
এ বক্তব্যের দলীলসমূহ :.....১৪৪
এ বক্তব্যের উপর আরোপিত সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব:.....১৪৮
কুরাইশী ভাষায় লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য : ১৫১
মুরাদিফ সমার্থবোধক শব্দ দ্বারা তেলাওয়াতের মাসআলা :.....১৫২
উপরোল্লিখিত ফলাফলটি তিনটি ভূমিকা থেকে আহরিত হয় ঃ.....১৫৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর মুসহাফ :.....১৫৫
গবেষণার ফলাফল :.....১৬০
সাত হরফের ব্যাপারে একটি ভুল ধারণার অবসান : ১৬১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাসিখ ও মানসুখ বা রহিত ও রহিতকারী:.....১৬৪.
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ: ১৬৪
এতে "নাসিখ ও মানসুখ" শিরোনামে
“নসখ" রহিতকরণের :.....১৬৪
নাসিখ ও মানসূখ বা রহিত ও রহিতকারী .....:১৬৫
নসম বা রহিতকরণের হাকীকতঃ ১৬৫
প্রামাণিক ও যৌক্তিকভাবে নসখের স্বীকৃতি :.....১৬৫
নখসের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামাদের পরিভাষাগত পার্থক্য : ১৬৭
পবিত্র কুরআনুল কারীমে 'নসখ'-এর আলোচনা:.....১৬৮
পবিত্র কুরআনে কারীমে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা:.....১৭৩

আলোচনার ফলাফল :.....১৭৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস :.....১৭৮
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ :.....১৭৮
রাসূলে কারীম (সা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ : ১৮০
নববী যুগে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধকরণ :.....১৮৪
প্রথম ধাপ :
হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন জমা করণের ?..১৮৭
দ্বিতীয় ধাপ :
হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন :.....১৯২
তৃতীয় ধাপ :
তেলাওয়াত সহজীকরণের পদক্ষেপ :.....১৯৮
চতুর্থ ধাপ :
নুকতা :.....১৯৮
হরকত :.....২০০
মনযীল :.....২০১
পারা :.....২০১
আখমাস ও আশার :.....২০২
রুকুর চিহ্ন :.....২০২
ওয়াক্ফ বা যতিচিহ্ন সমূহ :.....২০৩
পবিত্র কুরআনুল কারীমের মুদ্রণ :.....২০৫
পঞ্চম ধাপ :
কেরাতগুলো ও সেগুলোর সংকলন : ২০৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোরআন সংরক্ষণ সম্পর্কিত সংশয় ও তার জবাব :.....২১৪
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ : ২১৪
প্রাথমিক যুগের কিছু আয়াত সংরক্ষিত নেই :.....২১৬
প্রথম অভিযোগ :
একদা একটি আয়াত রাসূল (সা.)-এর স্মরণ ছিল না :.....২১৯
দ্বিতীয় অভিযোগ
সূরায় নিসা'য় সূরা আনআমের উদ্ধৃতি :.....২২০

তৃতীয় অভিযোগ :
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উপর মারগোলিয়থের একটি অপবাদ :..২২৩
চতুর্থ অভিযোগ :
হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছ থেকে কিছু
আয়াত হারিয়ে গিয়েছিলঃ.....২২৪
পঞ্চম অভিযোগ :
নববী যুগে হাফেযদের সংখ্যা :.....২২৫
ষষ্ঠ অভিযোগ :
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং মু'আওয়াযাতাইন : ২২৬
সপ্তম অভিযোগ :
সিদ্দীকি খেলাফত আমলে কুরআন সংকলন ::.....২৩০
অষ্টম অভিযোগ :
সিদ্দিকী খেলাফত যুগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়নঃ..২৩৪
নবম অভিযোগ:
বিভিন্ন ধরনের ক্বেরাত অস্তিত্ব লাভ করল কিভাবে::.....২৩৬
দশম সংশয়ঃ
পবিত্র কুরআনুল কারীমের শায ক্বেরাত ও তার হাকীকত :.....২৪০
একাদশ অভিযোগ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এ পরিচ্ছেদের
সারাংশ:.....:.....২৪৩
কুরআনের সত্যতা: :.....২৪৪
রাসূৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর রিসালাত.....২৪৪
পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রাসূল সা: এর আগমনের সু-সংবাদ:.....২৪৫
পবিত্র কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব ::.....২৪৯
পবিত্র কুরআন মাজীদের অলৌকিক বৈশিষ্ট্যঃ:.....২৫৫
পবিত্র কুরআন মাজীদের শব্দগত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ::.....২৫৬
১.উদাহরণ ::.....২৫৬
২.উদাহরণঃ:.....২৫৮
৩.উদাহরণ ::.....২৫৮
৪. উদাহরণ ::.....২৫৯
পবিত্র কুরআনে বাক্যগঠন সম্পর্কিত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য:.....২৬১
কালাম পাকের বর্ণনাশৈলীর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য:.....২৬১

আল কুরআনের শব্দ বিন্যাস-গত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য:.....২৬৭
পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভবিষ্যদ্বাণী:.....২৭০
রোমানদের বিজয়::.....:.....২৭০
মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ::.....:.....২৭২
ইহুদীদের মৃত্যু কামনা::.....২৭৩
পবিত্র কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণ: :.....২৭৪
পবিত্র কুরআন মাজীদের তথ্য উন্মোচন: :.....২৭৭
কুরআনের সত্যতা ও পশ্চিমা লেখকবৃন্দদের স্বীকারোক্তি::..২৭৮
রাসূল সা: ও আহলে কিতাব: :.....২৮৪
পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপর কয়েকটি সংশয় উত্থাপন:.২৮৮
হযরত মারিয়াম(আ:) এর পিতার নাম::.....২৮৯
ফেরআউনের উজির হামান:.....২৯০

অস্টম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিষয়বস্তু :.....২৯৩
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ :.....২৯৩
পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে :.....২৯৪
ধর্মবিশ্বাস ::.....:..... ২৯৪
প্রথম বিষয়বস্তু : আকাইদ (ইতিবাচক দিক) ::.....২৯৪
(১) নালী বা উদ্ধৃতিমূলক দলীল ::.....:.... ২৯৫
(২) মানতিকী দলীল বা যুক্তিনির্ভর :.....:.....২৯৬
(৩) কেয়াসে ইতেস্নায়ী বা পার্থক্যকরন কেয়াসী দলীল : ২৯৮
(৪) সাবর ও তাকসীম অনুসন্ধানও বিভাজন রীতি:।.....২৯৮
(৫) তাসলীম স্বীকৃতি ভিত্তিক দলীল::.....৩০০
(৬) ইন্তেকাল -পরিবর্তন ভিত্তিক দলীল: :.....৩০০
(৭) চাক্ষুষ দলীল : প্রত্যক্ষ অবলোকন ভিত্তিক দলীল :...৩০১
(৮) তারেবা তথা অভিজ্ঞতালব্ধ দলীল ::.....৩০৪
আকাইদ (অস্বীকৃতি অংশ) ::.....:.....৩০৫
(১) মূর্তি পূজারী মুশরিক ::.....:.....৩০৫
(২) ইহুদীজাতী ::.....:.....৩০৭
(৩) খ্রিস্টানজাতী : :.....:.....৩০৯
(৪) মুনাফিক সম্প্রদায় ::.....:.....৩১০

দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হলো:
আহকাম: বিধি-বিধান ::.....:.....৩১১
শানে নুযূল : আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ::.....৩১২
তৃতীয় বিষয়বস্তু
কিসাস : ঘটনাবলী ::.....:.....৩১৪
অতীতের ঘটনাবলী ::.....:.....৩১৪
একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন ও তার জবাব :.....৩১৫
ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য স্বতন্ত্র ঘটনাবলী :.....:....৩১৭
চতুর্থ বিষয়বস্তু :
উপমা ও উদাহরন ::.....৩১৮

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসূলে তাফসীর, বা কুরআন তাফসীরের মূলনীতি:.....৩২০
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ:.....:.....৩২০
ইলমে তাফসীর শাস্ত্র ও ইহার উৎস :.....:.....৩২১
তাফসীর পরিচিতিঃ:.....:.....৩২১
উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে “তাফসীর শাস্ত্র”
নিম্নোক্ত বিষয়াবলী নিয়ে সমৃদ্ধ.....৩২১
তাফসীর ও তাভীল প্রসঙ্গ::.....৩২৩
এসম্পর্কে কয়েকটি মতামত এখানে তুলে ধরা হলো :.....৩২৩
তাফসীরের মূল উৎস ::.....৩২৪
প্রথম উৎস : স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীম :.....৩২৫
দ্বিতীয় উৎস : হাদীসে নববী (সা.) ::.....৩৩০
তৃতীয় উৎস :সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ::.....৩৩৪
চতুর্থ উৎস : তাবেঈনদের বাণী ও উক্তি ::.....৩৩৬
পঞ্চম উৎস : আরবী ভাষা ::.....:.....৩৩৭
ষষ্ঠ উৎস : সুস্থ বিবেক ::.....:.....৩৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

তাফসীর শাস্ত্রে অগ্রহণযোগ্য উৎস :.....:.....৩৪০

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ :..:.....৩৪০
তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার কারণ নিয়ে
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে:.....৩৪০
তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎস ::.....:.....৩৪০
প্রথম ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ::.....:.....৩৪২
কা'বুল আহবার কে ছিলেন? :.....:.....৩৪৪
ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ ::.....৩৪৬
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ::.....৩৪৮
দ্বিতীয় সূফীয়ায়ে কেরামদের তাফসীর :.....৩৪৯
তৃতীয় তাফসীর বির-রায় বা মনগড়া তাফসীর ::.....৩৫২
তাফসীরের ক্ষেত্রে গোমরাহীর উপকরণ ::.....৩৫৪
প্রথম কারণ : অযোগ্যতা :.....৩৫৫
কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা যোগুলোর নিরসন জরুরী :.....৩৫৭
১.কুরআন অত্যন্ত সহজসাধ্য বিষয় ::.....৩৫৭
২. উলামায়ে কেরাম ও ঠিকাদারী:.....৩৫৯
৩. উলামায়ে কেরাম ও পোপতন্ত্র:.....৩৬১
দ্বিতীয় কারণ : কুরআনুল কারীমকে স্বীয় চিন্তাধারার
অধীন করা : ৩৬৬
তৃতীয় কারণ : সমকালীন দর্শনে প্রভাবান্বিত হওয়া : :.....৩৬৭
মু'জিযা প্রসঙ্গ ::.....৩৭১
বিবেক পরিপন্থী ও বিবেকোর্ধ্ব তাফসীর :.....৩৭৪
চতুর্থ কারণ : পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তুকে
ভুল মনে করা.....৩৮১

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

তাফসীরের কয়েকটি আবশ্যকীয় মূলনীতি.....৩৮৯
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ....:.....:.....৩৮৯
প্রথম পবিত্র কুরআনুল কারীম ও (রূপক) মাযাজ অর্থ.....৩৯০
কোন বীর-পুরুষের আগমন, যার প্রভাবে কাঁপছে রণাঙ্গন?.৩৯০
দ্বিতীয়. পবিত্র কুরআনুল কারীম ও আকলী দলীল ::.....৩৯৯
১. অকাট্য আকলী দলী.....:.....৪০০
২.ধারণানিরবভর আকলী দলীল:.....৪০১
৩.কল্পনা-প্রসূত আকলী দলীল:.....:.....৪০১
১. অকাট্য নকলী দলীল:.....:.....৪০২

২.ধারণানিরবভর নকলী দলীল:.....:.....৪০২
৩. কল্পনা প্রসূত নকলী দলীল:.....৪০৩
তৃতীয়ঃ, শরঈ বিধি-বিধান ও আকল (যুক্তি):.....৪১০
১. স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি এবং হেদায়াত ও গোমরাহী ::.....৪১২
২. ইসলামী আহকামের হেকম এবং
দীনের মধ্যে সেগুলোর অবস্থান.....৪২০
৩. শরঈ বিধান হেকমত ও কল্যাণের উপর নির্ভরশীল
নয়.....৪২১
৪. শরঈ বিধি-বিধানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'অনুসরণের
পরীক্ষা.....৪২৫
৫. কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যার সঠিক নিয়মনীতি ::.....৪২৯
৬. কালের বিবর্তন ও শরঈ আহকাম.....৪৩১
৭. যুগ পরিবর্তনের অর্থ ::.....৪৩৪
৮. বিবেক-বুদ্ধির সঠিক কর্মপরিধি ::.....৪৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক যুগের কয়েকজন মুফাসসির :.....৪৪০
এ পরিচ্ছেদের সারাংশ .....:..... ৪৪০
প্রথম যুগের কয়েকজন মুফাসসির :.....৪৪১
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) .....:...৪৪১
গোল্ড যিহারের একটি ভুল ধারণা :.....৪৪৪
প্রচলিত "তাফসীরে ইবনে আব্বাস"-এর মর্যাদাগত অবস্থান:....৪৪৫
হযরত আলী (রা) .....:.....৪৪৬
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ৪৪৬
হযরত উবাইব ইবনে কা'ব রা.....৪৪৭
সাহাবা-পরবর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ.....৪৪৮
১. হযরত মুজাহিদ (রহ.).....:.....৪৪৯
২. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.).....৪৪৯
৩. হযরত ইকরিমা (রহ.).....:..... ৪৫০
হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর উপর উষ্কাপি অভিযোগের
হাকীকতঃ ৪৫১
গোল্ড যিহারের আরেকটি বিভ্রান্তি :.....৪৫৪
৪. হযরত ত্বউস (রহ.) .....:.....৪৫৬
৫. হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ্ (রহ.).....৪৫৭
৬.হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) ৪৫৮
৭. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) ৪৫৯

৮. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) :.....:.....৪৬২
৯. হযরত আবুল আলিয়া (রহ.) .....:.....৪৬২
১০. হযরত উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রহ.) :.....৪৬৩
১১. হযরত হাসান বসরী (রহ.) .....:.....৪৬৩
১২. হযরত কাতাদাহ (রহ.) .....:.....৪৬৪
১৩. হযরত কা'ব আল-কারযী (রহ.) .....:.....৪৬৫
১৪. হযরত আলকামাহ্ (রহ.) .....:.....৪৬৬
১৫. হযরত আসওয়াদ (রহ.) .....:.....৪৬৬
১৬. মুররা আল-হামদানী (রহ.) .....:.....৪৬৭
১৭. হযরত নাফে' (রহ.) .....:.....৪৬৮
১৮. হযরত শা'বী (রহ.) .....:.....৪৬৯
১৯. হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (রহ.) .....:.....৪৬৯
২০. হযরত ইবনে জুরাইজ (রহ.) .....:.....৪৭০
২১. হযরত যাহহাক (রহ.) .....:.....৪৭১
প্রথম যুগের কতিপয় দুর্বল ও বিতর্কিত মুফাসসির বৃন্দুঃ.....৪৭২
১. সুদ্দী কাবীর .....:.....৪৭৩
২. সুদ্দী সগীর :.....:.....৪৭৫
৩. মুকাতিল .....:.....৪৭৬
৪. হযরত রবী' ইবনে আনাস (রহ.) ৪৮০
৫. আতিয়্যাহ আল-আওফী.....:.....৪৮১
৬.আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রহ...৪৮৩
৭. কালবী.....৪৮৪
পরবর্তীদের কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থসমূহ :.....:.....৪৮৭
১. তাফসীরে ইবনে কাসীর :.....:.....৪৮৮
২. তাফসীরে কাবীর .....:.....৪৯০
৩. তাফসীরে আবি-সাঊদ :.....:.....৪৯২
৪. তাফসীরে কুরতুবী :.....:.....৪৯২
৫. রূহুল মা'আনী :.....:.....৪৯৩
(উর্দূ তাফসীর সমূহ):.....৪৯৫

(সমাপ্ত)

আলোচিত গ্রন্থটি খন্ড হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১মঃ খন্ড কুরআন পরিচিতি। ২য়ঃ খন্ড কুরআন তাফসীর/ব্যাখ্যার মূলনীতি।

جلد اول

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

কুরআনুল কারীম ঃ

- ওহী
- কুরআন অবতীর্ণ
- নাসেখ মানসূখ
- কুরআন সংরক্ষণ
- কুরআনের সত্যতা
- কুরআনের বিষয় বস্তু

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন মাজীদের পরিচিতি ঃ تعارف

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ

এ পরিচ্ছেদে দু'টো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক, হাকীকত, দুই, সংশয় নিরসনকল্পে জবাব। প্রথমাংশের আলোচ্য বিষয় কোরআনের হাকীকত ও বিষয়বস্তু, তৎসম্পর্কিত নানান বিষয় ও ইতিহাস, দুর্বোধ্য কিছু বিষয়ালোচনা, কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ও আত্মপ্রশান্তিদায়ক বিষয়াদির উল্লেখ ও অপবাদের জবাব-প্রদান ইত্যাদি।

এতে আলোচনা করা হয়েছে কোরআনের নামসমূহ এবং সেগুলোর স্বার্থকতা নিয়ে। এতে কোরআনের নাম ৫৫ থেকে ৯০টি পর্যন্ত বর্ণিত হওয়ার হাকীকত/ কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তার আসল নাম গিয়ে দাঁড়ায় মোট ৫টিতে, যথাঃ আল-কোরআন, আল-ফোরকান, আয-যিকর, আল-কিতাব, আত-তানযীল। পক্ষান্তরে গুণবাচক নামগুলোকে আসল নামের সাথে একত্রিত করায় সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় অতি উচ্চে।

অতঃপর তিনি কোরআন শব্দ-বিশ্লেষণের পাশাপাশি তার হেকমতও তুলে ধরেন। এই কিতাব হচ্ছে এমন, যাকে কখনও বাতিল দাবিয়ে রাখতে পারবে না। বরং শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তা বারবার পঠিত হবে, যার দিকে ইঙ্গিত করে "আল-কোরআন" নামক শব্দটি।

অতঃপর আলোচনায় এসেছে ওহীর হাকীকত, বা পরিচয়, তার প্রয়োজনীয়তা ও শব্দের বিশ্লেষণ এবং তার শিক্ষা। এতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ওহী সাধারণত দ্বীনী প্রয়োজন মেটাতেই আগমন করে থাকে। তবে তা প্রয়োজনবোধে দুনিয়াবি অনেক কিছুও শিক্ষা দেয়।

তারপর আলোচনা করা হয়েছে ওহী ও তার প্রকার এবং তার নাযিলগত প্রকারভেদ নিয়ে। মূল ওহী তিন প্রকার, যথাঃ

১. আত্মিক ওহী। ২. সরাসরি আল্লাহর কালাম। ৩. ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রেরিত ওহী। এবং নাযিলের ক্ষেত্রে ওহীর প্রকারভেদ প্রকার, যথাঃ

একঃ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়। দুইঃ মানবাকৃতিতে ফিরিশতার আগমন। তিনঃ স্বরূপ আকৃতিতে ফিরিশতা-আগমন। চারঃ সত্য স্বপ্ন। পাচঃ আল্লাহর কালাম ছয়ঃ অন্তরে বার্তা প্রেরণ।

এর অধীনে তিনি ওহী এবং ইলহামের ব্যাপারে পার্থক্যকারী বক্তব্য রেখেছেন, যা অতি উপকারী। নবী-রাসূলগণের অন্তরে প্রেরিত পয়গামের ব্যাপারে তারা

সূচিপত্র

নিশ্চিত থাকেন কার পক্ষ থেকে এই কথা ঢালা হয়েছে, পক্ষান্তরে ওলী-আওলিয়ারা এটা নিশ্চিত হন না যে, এর প্রেরক কে। যার কারণে নবীগণের ইলহাম-পালন ফরজ হলেও ওলী আউলিয়াদেরটা সে পর্যায়ে পৌছে না।

এরপর তিনি আলোচনা করেন উম্মতের নিকট প্রেরণকৃত ওহীর দু'প্রকার নিয়ে, তথা মাতলূ, বা পঠিত এবং গায়রে মাতলূ, বা অপঠিত। অতপর তিনি সে সকল লোকদর বক্তব্য খন্ডন করেছেন।

যারা গায়রে মাতলু ওহীকে শরীয়ত মানতে রাজী নয়। সেটিকে তারা কেবল একজন রাষ্ট্রপতির আদেশ-নিষেধ হিসেবে গণ্য করতে চান। সেই সম্প্রদায়ের দর্শণ খণ্ডনে তিনি তুলে ধরেন হাদীসের প্রামাণিকতার দলীল-প্রমাণ। এরপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে আসেন।

অতঃপর পশ্চিমা ধারায় প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ ওহীর অনুধাবন নিজেদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে এতে সংশয় রাখেন, অথচ ওহী আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) ব্যতীত পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কারও পক্ষে সম্ভবও নয়! আবার কেহ কেহ সরাসরি একে কিচ্ছা-কাহিনী বলে উল্লেখ করে ফেলেন। এই আধুনিক বিজ্ঞানের এ যুগে তার আলোচনা করতে লজ্জাবোধ তো সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)! এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সংকলক যুক্তিনিভ্র আলোচনা এনে দিলের অস্থিরতা দূর করে দিতে চেষ্টা করেছেন।

বিশেষ করে আত্মিক ওহী, যার মধ্যে ইলহাম প্রবিষ্ট, সে ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত Hyptonism এর উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোধগম্য করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ যদি অন্য মানুষের অন্তরে নিজের কথা ঢেলে দিতে পারে, তবে মহান "রাব্ব" কি পারবেন না! অবশ্যই পারবেন।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

পবিত্র কুরআনুল কারীমের নাম ও নামকরণের তাৎপর্য ঃ

আল্লামা আবুল মাআলী (রহ.)[১] তার স্বীয় কিতাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমের ৫৫টি নাম উল্লেখ করেছেন[২]। কেউ কেউ আবার পবিত্র কুরআনুল কারীমের নাম ৯০-এর চেয়েও অধিকের কথা বলেছেন। বস্তুত তাঁরা পবিত্র কুরআনুল কারীমের সিফাত বা গুণগত নামসমূহ যেমন– মাজীদ, কারীম, ইত্যাদিকেও আসল নাম গণনা করত এগুলোর সংখ্যা ৯০ পর্যন্ত দাড় করিয়েছেন। অন্যথায় পকৃত অর্থে পবিত্র কুরআনুল কারীমের নাম সর্বমোট ৫টি। যথা–

১. আল-কুরআন। ২. আল-ফুরকান। ৩. আয-যিক্‌র। ৪. আল-কিতাব। ৫. আত্-তানযীল।[৩]

কেননা পবিত্র কুরআনুল.কারীম স্বয়ং ৫টি নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে।[৪] এ সকল নামের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হলো "আল কুরআন"। এমনকি স্বয়ং মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনই একষট্টি স্থানে নিজের কালামকে এ নামেই পরিচয় দিয়েছেন।[৫]

মূলত উৎসগত দিক থেকে "কুরআন" শব্দটি قَرَأَ-يَقْرَأُ থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একত্রিত করা।

পরবর্তীতে এ শব্দটি 'পাঠ করা' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেননা, পাঠ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অক্ষর ও শব্দমালাকে একত্রিত করতে হয়।[৬] قَرَأَ-يَقْرَأُ -

---

১. আবুল মাআলী হলো তাঁর উপনাম। পূর্ণনাম আযীযি ইবনে আবদুল মালিক। উপাধি 'শাইযালা'। তিনি হিজরী পঞ্চম শতকের শাফেঈ মাযহাব অনুসারী একজন বিজ্ঞ আরেম। তাঁর রচিত গ্রন্থ "আল-বুরহান ফী মুশকিলাতিল কুরআন" থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লামা যারকাশী (রহ.) ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ৪৯৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। ("ওফায়াতুল আইয়ান" ইবনে খাল্লিকান : ১/৩১৮)

২. দেখুন, "আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন" দ্রষ্টাব্য। ১/৫১) আল্লামা সুয়ূতী রচিত মাতবাআ হিজাযী, কায়রো ১৩৬৮ হিজরী।

৩. "মানাহিলুল ইরফান।" : ১/৮, আল্লামা যুরকানী (রহ.) রচিত মাতবাআ ঈসা আল বাবী আল হালাবী ১৩৭২ হিজরী।

৪.'আল-ফুরকান'-এর জন্য সূরা আলে ইমরানের ২য় আয়াত, وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ 'আয-যিক্‌র'-এর জন্য সূরা আলে ইমরানের ৫৮তম আয়াত وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ, সূরা হিযরের ৬ষ্ঠ আয়াত نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ এবং সোয়াদের ৮ম আয়াত ইত্যাদি فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي, 'আল-কিতাব'-এর জন্য সূরা বাকারার ১ম আয়াত ذَٰلِكَ الْكِتَابُ, নাহলের ৬৪তম وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ও ৮৭ তম আয়াত, 'আত্-তানযীল'-এর জন্য সূরা ইয়াসীনের ৫তম আয়াত(৫) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, ওয়াকিয়ার ৮তম আয়াত এবং আল-হাক্কার ৬৯তম আয়াত দেখুন।

৫. সূত্রঃ "ফাতহুর রহমান লিতালিবে আয়াতিল কুরআন" পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯, জন্য দেখুন, ইলমী যাদাহ আল-হাসানী : আল-মাকতাবাতুল আহলিয়া, বৈরুত,১২২৩ হিজরী।

৬. "আল-মুফরাদ ফী গরীবিল কুরআন" পৃঃ ৪১১ আর রাগীব আল ইসফাহানী (রহ.) : আসাহহুল মাতাবি' করাচী ১৩৮০ হিজরী।

এর মাসদার বা মূল উৎস قِرَاءَةٌ (কিরাআতুন) ব্যতীত قران (কুরআন) শব্দেও ব্যবহৃত হয়। যেমন .মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেন–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

'নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমার দায়িত্বে।' ঃ

আর আরবী ভাষায় মাসদার কখনো কখনো ইসমে মাফউল (Past Participle)এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর এই অর্থেই আল্লাহর কালামকে "কুরআন" বলা হয়। 'পঠিত কিতাব।'[৭]

পবিত্র কুরআনুল কারীমকে "কুরআন"বলে নামকরণের অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো, মূলত আরবের কাফের সম্প্রদায়ের বক্তব্যকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এই গ্রন্থকে "কুরআন" বলে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তারা বলত–

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ

'কাফিরেরা বলেঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।'[১]

এখানে কাফেরদের প্রত্যাখ্যানমূলক শব্দের বিপরীতে "কুরআন" নামকরণ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের দাওয়াতকে এই ধরণের হীন আওয়াজ দ্বারা দাবিয়ে রাখা যাবে না। বস্তুত এই কিতাব পাঠ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত পাঠ করা হবে। আর একারণেই এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সমগ্র বিশ্বে পবিত্র কুরআনুল কারীমই হচ্ছে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

মহা পবিত্র আল-কুরআনুল কারীমের পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে করা হয়ে থাকে–

المنزل على الرسول المكتوب فى المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهة

অর্থাৎ 'মহান আল্লাহর সেই মহাবাণী যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, মাসাহিফের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এবং সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌছেছে।'[২]

প্রকাশ থাকে যে, এ সংজ্ঞাটি সকল আহলে ইলমের সর্বসম্মত সংজ্ঞা। এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

---

[৭]. "আল ইতকান : পৃঃ ৫২ ও "মানাহিলুল ইরফান" ১ম খণ্ড পৃঃ ৭) এই শব্দটির মূল ধাতু নিরূপণে আরো বেশ কয়েকটি মতামত রয়েছে। তবে কোনোটিই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

[১]. সূরা হা-মীম আস সিজদা : ২৬)

[২]. "আত-তালভীহ্ মাআত তাওযীহ্" ১/২৬, মাতবাআ মুস্তফা আল-বাবী, মিসর।

ওহী ও উহার হাকীকত ঃ وحی اور اس کی حقیقت

মহা পবিত্র আল-কুরআনুর কারীম যেহেতু দু'জাহানের সর্দার নবী কারীম (ﷺ)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই ওহী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা অত্যাবশ্যকীয়।

ওহীর প্রয়োজনীয়তা ঃ

প্রত্যেকটি মুসলমানই এ বিষয় সম্পর্কে সম্মক অবগত যে, মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষার জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তার উপর বিশেষ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে গোটা বিশ্বকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তাই পৃথিবীতে আগমনের পর মানুষের জন্য দু'টি কাজ অবধারিত হয়ে যায়।

প্রথমতঃ তার চারপাশে এ বিশ্বের যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

আর দ্বিতীয়তঃ এ বিশ্বের সৃষ্টরাজিকে ব্যবহার করতে গিয়ে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের বিধি-নিষেধকে সামনে রাখা। এবং এমন কোনো কাজ না করা, যা মহান আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আর উল্লেখিত দায়িত্ব দু'টি সম্পাদনের জন্য মানুষের জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক। কারণ এ বিশ্ব জগতের হাকীকত এবং এ সকল সৃষ্টরাজির কোন্‌টির কি বৈশিষ্ট্য ও এগুলো দ্বারা উপকৃত হবার পদ্ধতি কি? যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবীর কোনো বস্তুকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ কথা না জানবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি কোন্ পথে? তিনি কোন্ কাজটিকে পছন্দ করেন আর কোন্‌টিকে অপছন্দ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা অসম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে তার মধ্যে এমন তিনটি বস্তু দান করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে সে উপরোক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রথমত হচ্ছেঃ মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তি অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক। দ্বিতীয়ত হচ্ছেঃ সকল মেধা শক্তি ও বিবেক। তৃতীয়ত হচ্ছেঃ ওহী। যেমন, মানুষ অনেক বিষয়ের জ্ঞান পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আবার অনেক বিষয়ের জ্ঞান মেধাশক্তির মাধ্যমে লাভ করে থাকে। আর যে সকল বিষয়ের জ্ঞান এ মাধ্যম দু'টি দ্বারা অর্জন করা যায় না, সেগুলোর জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়।

বস্তুত জ্ঞান-অর্জনের উপরোক্ত তিনটির মাধ্যমের ক্রমধারা কিছুটা এমন যে, প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা ও বিশেষ পরিধি ও পরিমণ্ডল রয়েছে। এ

সীমা ও পরিধির বাইরে মাধ্যমগুলো নিষ্ক্রিয়। যেমন, যেসকল বস্তুর জ্ঞান মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জন করে থাকে নিছক মেধাশক্তি দ্বারা সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, যেমন এ মুহূর্তে আমার সামনে একজন লোক বসে আছে। আমার দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, সে একজন মানুষ। আমার চোখই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তার রঙ ফর্সা, কপাল প্রশস্ত, চুলগুলো কালো, ঠোঁট দু'টো হালকা এবং চেহারা সুন্দর।

আর যদি এ বিষয়গুলোর জ্ঞান নিজের পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তি বাদ দিয়ে শুধু মেধাশক্তির মাধ্যমে লাভ করার চেষ্টা করা হয়, যেমন চোখ দু'টি বন্ধ করে ওই ব্যক্তির গায়ের রঙ, শারীরিক গঠন-প্রকৃতি ও সমগ্র দেহের কথা কল্পনা করা হয় তাহলে আদৌ সে এসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারবে না।

ঠিক একইভাবে যেসব বস্তুর জ্ঞান মেধাশক্তির মাধ্যমে লাভ হয়, সেগুলো নিছক পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন, আলোচিত ব্যক্তির ব্যাপারে আমার এ কথাও জানা আছে যে, তার কোনো না কোনো একজন "মা" অবশ্যই আছেন। সাথে সাথে এ কথাও আমার জানা আছে যে, তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। যদিও এ মুহূর্তে আমার সামনে না আছে তার মা আর না দেখি আমি তার সৃষ্টিকর্তাকে।

কিন্তু আমার আকল ও মেধাশক্তি আমাকে বলে দিচ্ছে যে, এ ব্যক্তি নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে না। আমি যদি এখানে আমার বিবেক ও মেধাশক্তিকে বাদ দিয়ে নিজের চোখ বা দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে তার মা ও তার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে বেড়াই, তাহলে এ বস্তুর জ্ঞান অর্জন করা কখনো করোপক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা তাকে সৃষ্টি করার দৃশ্য এ মুহূর্তে আমার চোখের সামনে আসা সম্ভবপর নয়।

মোটকথা, যে পর্যন্ত পঞ্চইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক রয়েছে, সে পর্যন্ত বিবেক ও মেধাশক্তি কোনো দিক-নির্দেশনা দিবে না। যেখানে গিয়ে পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তি অক্ষম হয়ে পড়ে, সেখান থেকে বিবেক ও মেধাশক্তির কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু এই বিবেক ও মেধাশক্তির দিক-নির্দেশনা ও নির্দিষ্ট সীমার বাইরে নয়। বরং নির্দিষ্ট একটি সীমায় গিয়ে সে থেমে যায়। আবার এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলোর জ্ঞান না পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে অর্জন করা যায় আর না বিবেক ও মেধাশক্তি দ্বারা। যেমন, সেই আলোচিত ব্যক্তির ব্যাপারে আকল ও মেধাশক্তি তো বলে দিয়েছে যে তার একজন স্রষ্টা রয়েছেন, কিন্তু ওই ব্যক্তিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে তার উপর কি কি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে? তার কোন্ কাজ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পছন্দনীয় আর কোন্ কাজ তাঁর অপছন্দনীয়? ইন্দ্রিয়শক্তি

সূচিপত্র

ও মেধাশক্তি যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালালেও এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। মানুষকে এই প্রশ্নাবলীর জবাব দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হু যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তার নামই হলো "ওহী"।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ওহী হচ্ছে মানুষের জ্ঞান অর্জনের সর্বোচ্চ মাধ্যম। যা তার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সেসব প্রশ্নাবালীর জবাব দিয়ে থাকে, ইন্দ্রিয়শক্তি ও মেধাশক্তির মাধ্যমে যেগুলোর সমাধান সম্ভব হয় না। তাই ওহীর জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া মানুষের কোনো বিকল্প নেই।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা বিবরণ দ্বারা এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মানুষের দিক-নির্দেশনার জন্য কেবল ইন্দ্রিয়শক্তি ও মেধাশক্তিই যথেষ্ট নয়; বরং তার হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনার জন্য মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হু প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। আর যেহেতু ওহীর দিক-নির্দেশনার সূচনাই হয় সেখান থেকে, যেখানে বিবেক ও মেধাশক্তি অকেজো, কাজেই ওহীর প্রত্যেকটি বিষয়ই বিবেক ও মেধাশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে এমনটি জরুরি নয়। যেভাবে কোনো বস্তুর রঙ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বিবেক ও মেধাশক্তির কাজ নয়; বরং ইন্দ্রিয় শক্তিই তার জন্য যথেষ্ট। তদ্রূপ দ্বীনি আকীদাগত অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি শুধুমাত্র ওহীর উপর। কাজেই সেগুলো উপলব্ধি করার জন্য শুধু বিবেক ও মেধাশক্তির উপরই নির্ভর করা সমীচীন নয়।[৩]

ওহীর মূলকথা ঃ وحی کا مفہوم

ওহীর মাফহুম ও হাকীকতের উপর চিন্তা-গবেষণা করার জন্য প্রথমত জেনে রাখা আবশ্যক। وحی (ওহয়ুন) ও ایحاء (ঈহাউন) আরবী ভাষার দু'টি শব্দ। শব্দ দু'টির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দ্রুততার সাথে ইঙ্গিত করা। চাই সে ইঙ্গিত কোনো চিহ্নিত বস্তু দ্বারা হোক, চাই নিরর্থক ধ্বনি উচ্চারণ করার দ্বারা হোক, চাই কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করে হোক অথবা লিখিত কিংবা চিত্রাঙ্কণের মাধ্যমে হোক। প্রত্যেক অবস্থাতেই আভিধানিকভাবে তার উপর এই শব্দ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়।[১০]

---

৩. "তামহীদু আবী শাকূর সালেমী" পৃঃ ৬৮-৭২ এখানে ওহীর প্রয়োজনীয়তার উপর খুবই সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন–এবং মাওলানা শামসুল হক আফগানী (রহ.) রচিত "উলূমুল কুরআন" পৃঃ ৩-১৮, প্রকাশনা বিভাগ, মাদরাসা ফারুকিয়া ভাওয়ালপুর, ১৩৮৯ হিজরী।

১০. আয-যুবাইদী ঃ "তাজুল আরূস" ১/৩৮৪, দারু লিবিয়া, বেনগাজি–১৩৮৬ হিজরী। আর-রাগিব (রহ.) রচিত ঃ "আল-মুফরাদাত।"

যেমন, পবিত্র আল-কুরআনে এই অর্থেই হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

অর্থ: 'অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল।'[৪]

এই আয়াতে وحى, ওহী শব্দের অর্থ করা হয়েছে "ইঙ্গিত" বা "ইশারা"। আর এটা স্পষ্ট যে, এ ধরনের ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সম্বোধিত ব্যক্তির হৃদয়ে কোনো বিষয়ের জ্ঞান ঢেলে দেওয়া। এ জন্য وحى ও ايحاء শব্দ দু'টি 'অন্তরে কোনো কিছু ঢেলে দেওয়া' বা 'আত্মস্থ' করার অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। পবিত্র কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে ওহী শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন–

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

'তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি এলহাম করেছেন যে, পাহাড়ে, বৃক্ষে আর উঁচু চালে বাসা তৈরি কর।'[৫]

এমনকি শয়তান অন্তরে যে ওয়াসওয়াসা বা কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে তার জন্যও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

'আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়।'[৬]

পবিত্র কুরআন মাজীদে আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

'এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে।'[৭]

মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হু ফেরেশতাদের প্রতি যে সম্বোধন করেন সেটাকেও ايحاء বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

---

৪. সূরা মারইয়াম : ১১
৫. সূরা নাহল : ৬৮
৬. সূরা আনআম : ১১২
৭. সূরা আনআম : ১২১

সূচিপত্র

'আর যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে এ সংবাদ দেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।'[৮]

নবী-রাসূল ব্যতীত অন্যান্য মানুষের অন্তরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে জ্ঞান ঢেলে দেওয়া হয় সেটাকেও ওহী শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ

'আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইংগিতে নির্দেশ করলামঃ শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাক।'[৯]

তবে ওহী শব্দের উপরোক্ত সবগুলো অর্থ অভিধানিক অর্থ।

শরীয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

كلام الله المنزل على نبي من انبيائه

"আল্লাহ প্রদত্ত এমন বার্তা, যা তাঁর কোনো নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।[১০]

বস্তুত এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, ى, ওহী শব্দটি শরীয়তের পরিভাষায় এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো জন্য এখন আর তা প্রয়োগ করা বৈধ নয়। হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) বলেছেন, ى, এবং ايحاء। উভয়টি পৃথক পৃথক শব্দ। শব্দ দু'টির ব্যবহারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।ايحاء। শব্দটির ব্যবহার আম বা ব্যাপক। নবী-রাসূল ছাড়াও অন্য কারো প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত বা কারো অন্তরে কোনো কথা ঢেলে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই শব্দটি নবী ও অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়।

পক্ষান্তরে কেবল নবী-রাসূলগণের অন্তরে কোনো কথা ঢেলে দেওয়াকে ى, (ওহী) বলা হয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনুল কারীম ايحاء। শব্দটি নবী-রাসূল ও সাধারণ মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আর ى, শব্দটি শুধু নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।[১১]

বস্তুত সারকথা হলো, "ওহী" এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হু তাঁর কথা ও নির্দেশবাণী নিজের কোনো প্রিয় বান্দা ও রাসূলগণের প্রতি প্রেরণ করেন এবং সেই মনোনীত রাসূলের মাধ্যমে সমগ্র জাতির নিকট পৌছিয়ে দেন। আর ওহী যেহেতু মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হু ও তাঁর বান্দার

---

৮. সূরা আনফাল : ১২

৯. সূরা কাসাস : ৭

১০. "উমদাতুল কারী" ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮, দারুত তাবাআ আল-আমেরা, ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হিজরী। বদরুদ্দীন আল আইনী (রহ.) রচিত।

১১. হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) রচিত ঃ "ফয়যুল বারী" : ১/১৯, মাতবারে হিজাযী কায়রো ১৩৫৭ হিজরী।

মধ্যবর্তী একটি ত্রুটিমুক্ত পবিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তা একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরামই শুধু প্রত্যক্ষ করে থাকেন, বিধায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওহীর সঠিক হাকীকত অনুধাবন করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। অবশ্য ইহার প্রকারভেদ ও অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে এর সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এখানে শুধু সেগুলোর উপরই আলোকপাত করা হবে।

ওহীর শিক্ষা ঃ وحی کی تعلیمات

মূলতঃ ওহীর মাধ্যমে বান্দাদেরকে ওইসব বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যা তারা নিছক নিজেদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও মেধাশক্তির মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হয় না। সে বিষয়গুলো নিরেট যেমন ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত হতে পারে, তেমনি হতে পারে পার্থিব প্রয়োজন সংক্রান্ত। নবী-রাসূলগণের প্রতি ওহী সাধারণত প্রথম প্রকারের হয়ে থাকে। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী জাগতিক প্রয়োজনীয় বিষয়ও ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আ.)-কে নৌযান তৈরির নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

'আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর।'[১২]

এর দ্বারা জানা গেল যে, তাঁকে পবিত্র ওহীর মাধ্যমে নৌযান তৈরির প্রকৌশলী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হযরত দাউদ (আ.)-কে লৌহবর্ম তৈরির প্রকৌশলী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-কে বিশেষ বস্তুসমূহের জ্ঞানও ওহীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। এমনকি এক বর্ণনায় এমনও রয়েছে যে, সর্ব প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানও ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৩]

ওহীর প্রকারভেদ ঃ وحی کی اقسام

হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) বলেন, ওহী সাধারণতঃ তিন প্রকার।[১৪] যথা–

১. (وحی قلبی) আত্মিক ওহী।

২. (کلام الٰہی) সরাসরি আল্লাহর কালাম বা বাণী।

৩. (وحی ملکی) ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত ওহী।

---

১২. সূরা হুদ : ৩৭

১৩. "আন-নিবরাস আলা শরহিল আকাইদ" পৃ: ৪২৭-৪২৮, অমৃতস্বর ১৩১৮ হিজরী। আবদুল আযীয ফারহারী (রহ.) রচিত

১৪. হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর "ফয়যুল বারী" ১/১৪-১৮ হতে সংকলিত ওহীর মৌলিক এই তিনটি প্রকার। ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত আলোচনা এবং প্রকারত্রয়ের নামকরণ আমাদের পক্ষ হতে।

সূচিপত্র

আত্মিক ওহী ঃ وحی قلبی

ওহীর এই প্রকার সরাসরি মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলগণের অন্তরকে অনুগত করে তাতে কোনো বিষয় ঢেলে দেন। এতে যেমন ফেরেশতাদের কোনো মাধ্যম থাকে না, তেমন নবী-রাসূলগণের শ্রবণশক্তি ও ইন্দ্রিশক্তিরও কোনো দখল থাকে না। তাই এতে তাঁরা কোনো আওয়াজ বা ধ্বনি শুনতে পান না; বরং উদ্দিষ্ট বিষয়টি আত্মস্থ হয়ে যায়। সাথে সাথে তাঁরা এটাও অবগত হয়ে যান যে, এ বিষয়টি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত। এই বিষয়টি জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে আবার ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগেও হতে পারে। তাইতো নবীগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে স্বপ্নযোগে ওহীর মাধ্যমে নিজ পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

সরাসরি আল্লাহ পাকের কালাম বা বাণী ঃ کلام الٰہی

ইহা ওহীর দ্বিতীয় প্রকার। এ প্রকারে মহান আল্লাহ জাল্লা শান্‌হু সরাসরি তাঁর নবী-রাসূলগণকে স্বীয় বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য দান করেন। এ পদ্ধতিতেও ফেরেশতার কোনো মাধ্যম থাকে না। তবে নবীকে আওয়াজ বা ধ্বনি শুনিয়ে দেওয়া হয়। এ আওয়াজ সৃষ্টিজীবের আওয়াজের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র। যা মেধাশক্তি দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যে নবী এ ধরনের ওহী শ্রবণ করেন তিনিই কেবল এর অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করেন। ওহীর এ প্রকারের মাঝে যেহেতু নবীগণ সরাসরি মহান আল্লাহ জাল্লা শান্‌হুর বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন, তাই এ প্রকার অন্যান্য প্রকারের চাইতে অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।[১৪] এ কারণেই হযরত মূসা (আ.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে–

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

'আর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর সাথে অনেক কথাবার্তা বলেছেন।'[১৫]

ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত ওহী ঃ وحی ملکی

ইহা ওহীর তৃতীয় প্রকার। এ প্রকারে মহান আল্লাহ জাল্লা শান্‌হু স্বীয় পয়গাম বা বার্তা নবীগণের নিকট প্রেরণ করেন এবং ফেরেশতা তা পৌঁছে দেয়। কখনো কখনো ফেরেশতা দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। শুধু তার আওয়াজ শোনা

---

[১৪]. "মাদারিযুস সালেকীন' ১/৩৭, মাতবায়া আস-সুন্নাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, মক্কা মুকাররমা-১৩৫৭ হিজরী। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) রচিত।

[১৫]. সূরা নিসা : ১৬৪

সূচিপত্র

যায়। আবার কখনো কখনো মানবাকৃতির রূপ নিয়ে সামনে এসে বার্তা পৌছে দেয়। আবার কখনো কখনো এমনও হয় যে, ফেরেশতা তার প্রকৃত রূপ নিয়ে সরাসরি নবীর দূরিভূত হতো কিন্তু এমন কদাচিৎ হয়েছে।

পবিত্র কালামে পাকে নিম্নোক্ত আয়াতটি ওহীর এই তিনো প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করে অবতীর্ণ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ

'কোন মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম বা পর্দার আড়াল বা কোন দূত প্রেরণ ছাড়া। অতঃপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে সে (মনোনীত মানুষের কাছে) ওহী পৌছান যা তিনি (আল্লাহ) চান।"[১৬]

এই আয়াতে وحيا, অন্তরে বার্তা ঢেলে দেওয়া দ্বারা উপরোক্ত ওহীর প্রথম প্রকার তথা ওহীকলবী বা আত্মিক ওহীকে বুঝানো হয়েছে। "পর্দার অন্তরাল থেকে" দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার ওহী তথা সরাসরি কালামে ইলাহী মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীকে বুঝানো হয়েছে। আর "দূত প্রেরণ দ্বারা" তৃতীয় প্রকার ওহী ওহী মালাকী তথা ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত ওহীকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি : حضور پر نزول وحی کے طریقے

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহী অবতীর্ণ হতো।

সহীহ বুখারীর ২নং হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)[১৭] রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার নিকট কোন্ পদ্ধতিতে ওহী আসে? উত্তরে নবী কারীম (সা.) বললেন–

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ـ رضى الله عنه ـ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ـ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ ـ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً

হযরতআয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হারিস ইবনু হিশাম (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার

---

[১৬]. সূরা শুরা : ৫১

[১৭]. হযরত হারেস ইবনে হিশাম মর্যাদাবান সাহাবাদের একজন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং ১৫ হিজরীতে সিরিয়া বিজয় কালে শাহাদাত বরণ করেন। আল-কাসতালানী ঃ "ইরশাদুস সারী" ১/৫৭ বুলাক, মিসর-১৩২৩ হিজরী।

সূচিপত্র

প্রতি ওহী আসে কিভাবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই, আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন।[১৮]

১. ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় ঃ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ

ঘণ্টার প্রথম নিয়ম হচ্ছে নবী কারীম (সা)-এর নিকট এইধরণের শব্দ ঘন্টা বা জালে শব্দ হয়, তেমনি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ওহী আসার সময় সে রকম আওয়াজ হতো। হাদীসে শুধু এ টুকুই এসেছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বর্ণনা করা হয়নি। তাই নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, ওহীর এই প্রকারকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে ঘণ্টার ধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, ঘণ্টার আওয়াজের ন্যায় ধ্বনিটি মূলত ফেরেশতাদের আগমন ধ্বনি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাগণ ওহী নিয়ে আসার সময় নিজেদের ডানাগুলো গুটানোর ফড়ফড় শব্দ হয়। তাতেই এই আওয়াজ সৃষ্টি হতো।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এ মত প্রকাশ করেছেন যে, এখানে মূলত ওহীকে ঘণ্টার আওয়াজের সুর মূর্ছনার সাথে তুলনা করা হয়নি; বরং তুলনা করা হয়েছে তার ধারাবাহিকতার সাথে। অর্থাৎ যেমনিভাবে ঘণ্টার আওয়াজ বিরামহীনভাবে বাজতে থাকে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় না, ঠিক তেমনিভাবে ওহীর আওয়াজও বিরামহীনভাবে আসতে থাকে।[১৯] কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ মতামতগুলো কেবল ধারণা প্রসূত কেয়াসনির্ভর অনুমানমত। যেগুলোর উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত কোনো কথা বলা যাবে না।

তবে এপ্রসঙ্গে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) শায়খে আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘণ্টার আওয়াজের সাদৃশ্যের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটা উপরোক্ত ব্যাখ্যাবলী থেকে অধিক সূক্ষ্ম। তাঁর বক্তব্য হলো, এই সাদৃশ্য বা উপমা দুটি'দিক লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ আওয়াজের লাগাতার বা বিরামহীনতার ভিত্তিতে, যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ঘণ্টা যখন লাগাতার বাজতে থাকে তখন সাধারণত শ্রোতার জন্য সে আওয়াজের দিক নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ সে আওয়াজটা শ্রোতার কানে সবদিক থেকে আসছে বলে মনে হয়। আর মহান আল্লাহ পাক যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো দিক ও স্থানে অবস্থান করা হতে মুক্ত তাই

---

১৮. সহীহ বুখারী : ১/২ , আসাহ্হুল মাতাবে' করাচী।

১৯. দেখুন ঃ "ফাতহুল বারী" ১/১৬, আল মাতবাতুল বাহিয়্যাহ-১৩৪৮ হিজরী। হাফেয ইবনে হাযার রচিত ঃ

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর এই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর বাণীর আওয়াজ নির্দিষ্ট কোনো একদিক থেকে আসে না। বরং সবদিক থেকে আসে। এ পদ্ধতির যথাযথ উপলব্ধি প্রত্যক্ষ দর্শন ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মেধা ও বুঝশক্তির নিকটবর্তী করার জন্য রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টাকে ঘণ্টার ধ্বনির সাথে তুলনা করেছেন।[২০]

বস্তুত সর্বোপরি ওহী অবতরণের এই পদ্ধতির সঠিক হাকীকত একমাত্র মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হুই জানেন অথবা তাঁর রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও জানেন। হাদীস থেকে শুধু এ টুকুই জানা যায় যে, তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার এই বিশেষ পদ্ধতিতে ঘণ্টার আওয়াজ আসতো। সাথে সাথে হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, ওহী অবতরণের এই পদ্ধতিটি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য সবচেয়ে কষ্টকর হতো।

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) বলেন, "وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ" (এ পদ্ধতি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টকর) বাক্যটি থেকে জানা যায়, এমনিতে ওহী অবতীর্ণ হবার প্রত্যেকটি পদ্ধতিই কষ্টকর ছিল। তবে ঘণ্টার আওয়াজের পদ্ধতিটি তুলনামূলক সবচেয়ে কষ্টকর হতো। কারণ বক্তা ও শ্রোতার মাঝে কোনো না কোনো সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য। এখন যদি ফেরেশতা মানবাকৃতিতে চলে আসতো, তাহলে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অস্বাভাবিক কোনো বোঝা চেপে আসতো না। শুধু মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের বাণীর জালালিয়্যাতের বোঝাটাই পতিত হতো। পক্ষান্তরে ফেরেশতা যখন মানবাকৃতিতে না আসে; বরং তার আওয়াজ সরাসরি মহান আল্লাহ পাকের বাণী শুনিয়ে দেয়, তাহলে তা অস্বাভাবিকভাবেই একটি অবস্থার সৃষ্টি হতো। সে বার্তা সম্পর্কে পরিচিত হতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য বেশ কষ্টদায়ক হতো।[২১] যেমন উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) উপরোক্ত হাদীসের শেষে গিয়ে বলেন–

قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ. فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

'আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি প্রচন্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।[২২]

ওহীর এই পদ্ধতিতে কখনো কখনো এমন কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হতো যে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই অবস্থায় যে জন্তুর উপর

---

২০. "ফয়যুল বারী" : ১/১৯-২০
২১. "ফাতহুল বারী" ১/১৬
২২. সহীহ বুখারী : ১/২

সূচিপত্র

সওয়ার থাকতেন, তাঁর ভারে ক্লান্ত হয়ে ওই জন্তুটি বসে যেত। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মাথা মুবারক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর উরুর উপর রেখেছিলেন। এমতাবস্থায়ই ওহী নাযিল হতে লাগল। এতে হযরত যায়েদ (রা.) নিজের উরুর উপর এ পরিমাণ বোঝা অনুভব করলেন, যেন তা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম।[২৩]

মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় নবীয়ে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই বর্ণনা করেন, যখন এ প্রকারের ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন আমার এই অনুভূতি হয় যেন আমার রূহ [আত্মা] নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু হচ্ছে।[২৪]

কোনো কোনো সময় এই প্রকারের ওহী অবতরণ কালে অন্যান্যরাও ক্ষীণ ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেতেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, যখন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁর নূরানী চেহারা মুবারকের কাছে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় শব্দ শোনাযেত।[২৫]

২. মানব রূপে ফেরেশতার আগমন ঃ تمثيل الملك رجلا

ওহীর দ্বিতীয় পদ্ধতি যা উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, ফেরেশতা কোনো মানবাকৃতিতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছে দিতেন। এতে সাধারণত হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত দিহ্ইয়াতুল কালবী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর আকৃতিতে আগমন করতেন। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হযরত দিহ্ইয়াতুল কালবী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর আকৃতিতে আগমন করতেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হযরত দিহ্ইয়াতুল কালবী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে নির্বাচন করার সম্ভাব্য কারণ এই যে, তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে সুন্দর ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। এতটাই সুন্দর ছিলেন যে তিনি নিজ চেহারা ঢেকে চলতেন।[২৬] অবশ্য কোনো কোনো সময় অন্যদের আকৃতিতেও হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন করার প্রমাণ রয়েছে। যেমন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনায় হাদীসে জীব্রিলে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তির আকৃতিতে আগমন করেছিলেন।[২৭]

---

২৩. "আল ইতকান" ; ১/৪৬, কায়রো ১৩৬৮ হিজরী, ইবনে সাআদের উদ্ধৃতি সাথে। আস সুয়ূতী ঃ

২৪. আল-ফাতহুর রাব্বানী ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি সম্বলিত: ২০/২১১, "আস-সীরাতুন নবুবিয়্যাহ" শীর্ষক অধ্যায়, হাদীস নং ৪২, কায়রো-১৩৭৫ হিজরী।

২৫. আল-ফাতহুর রাব্বানী ঃ ২০/২১২

২৬. "উমদাতুল কারী" : ১/৪৭ ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হিজরী। আল আইনী (রহ.) রচিত ঃ

২৭. দেখুন ঃ "মিশকাতুল মাসাবীহ" : ১/১১ আসাহ্হুল মাতাবি' করাচী।

সূচিপত্র

কল্পনা, সেখানে উদ্দেশ্যটাই ছিল নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক অপরিচিত ব্যক্তির এতটা অন্তরঙ্গ কথোপকথনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আশ্চর্যান্বিত করা। এবং সর্বোপরি এ কথার উপর সবাই একমত যে, যে ফেরেশতা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন, তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ

তুমি বলঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে,।'[২৮]

এই আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-ই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। অবশ্য মাম আহমদ (রহ.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম শা'বী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা রেছেন যে, 'নবুওয়াতের প্রথম দিকে তিন বছর পর্যন্ত হযরত ইসরাফীল আ.) ওহী নিয়ে আগমন করতেন।[২৯] তবে তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনুল কারীম নাযিল করা হয়নি।

সমগ্র কুরআন মাজীদ হযরত জিবরাঈল (আ.)-ই নিয়ে এসেছেন।' তবে আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) সহ আরো অনেকেই এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) ব্যতীত অন্য কোনো ফেরেশতা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ওহী নিয়ে আগমন করেননি। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)-এর অভিমতও এ দিকেই বুঝা যায়।[৩০] উপরন্তু কোনো মারফূ হাদীস কিংবা কোনো সাহাবীর উক্তিতেও এই বর্ণনার কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) এই বর্ণনা গ্রহণ করার প্রতি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটাকে তিনি 'ফাতরাতে ওহী' বা ওহীর বিরতিকাল বলে উল্লেখ করেছেন'।[৩১]

মাটকথা, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার এই পদ্ধতিতে ফেরেশতা মানবাকৃতিতে আসতেন। আর ওহীর এই পদ্ধতিতে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষ কোনো অসুবিধা হতোনা। যেমন এপ্রসঙ্গে "সহীহ আবু আওয়ানা" (রহ.)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওহীর এই প্রকারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন–

---

[২৮] সূরা বাকারা : ৯৭

[২৯] "আল ইতকান" ঃ ১/৪৬ এবং কাসতালানী ঃ "ইরশাদুস সারী" : ১/৫৯

[৩০] "উমদাতুল কারী" : ১/৪৭-৪৮

[৩১] "ফাতহুল বারী" : ১/২২-২৩

সূচিপত্র

'এ পদ্ধতি আমার জন্য সবচেয়ে সহজ ঃ وهو اهونه علي'[৩২] ঃ

হযরত উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মাত্র দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আরো অন্যান্য হাদীস থেকে এ দু'টি পদ্ধতি ছাড়াও আরো কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। এমনকি আল্লামা হালিমী (রহ.)[৩৩] লিখেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ৪৬টি পদ্ধতিতে ওহী অবতীর্ণ হতো।[৩৪]তবে হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) বলেন, 'ওহীর বাহক তথা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বিভিন্ন রূপ নিয়ে আগমন করাকে পৃথক পৃথক পদ্ধতি হিসেবে ধরে নিয়ে তাঁরা এর সংখ্যা ৪৬ পর্যন্ত নিয়ে পৌছিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এর সংখ্যা এত পরিমাণ নয়।[৩৫]

মোটকথা আরো অন্যান্য হাদীস থেকে ওহী নাযিল হওয়ার আরো যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নে সেগুলো ধারাবাহিক ভাবে নিচে উপস্থাপন করা হলো–

৩. আসলরূপে ফেরেশতার আগমন ঃ فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا

ওহী অবতীর্ণের তৃতীয় পদ্ধতি ছিল এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো মানুষের আকৃতি ধারণ না করে নিজের প্রকৃত আকৃতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যেতেন। তবে তাঁর জীবনে মাত্র তিনবার ঘটেছিল।

প্রথম বার যখন তিনি নিজেই হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বার মিরাজ বা ঊর্ধ্বজগত ভ্রমণের সময়। তৃতীয় বার নবুওয়াতের একেবারে সূচনাকালে মক্কা মুকাররমার "আজইয়াদ" নামক স্থানে। প্রথম দু'টি ঘটনা তো সঠিক সনদ দ্বারা প্রমাণিত। তবে তৃতীয় ঘটনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল হবার কারণে সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান।[৩৬]

৪. সত্য স্বপ্ন ঃ الرؤيا الصالحة

ওহীর চতুর্থ পদ্ধতি ছিল এই যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্নযোগে যা কিছু প্রত্যক্ষ করতেন বাস্তবে তাই ঘটত। উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন–

---

৩২. "আল-ইতকান" : ১/৪৬

৩৩. "আল-মিনহাজ" গ্রন্থটি দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্বলিত একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ। (কাশফুয যুনূন নং ১৮৭১) তিনি হলেন, আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনুল হাসান-আল হালিমী আল-জুরযানী। (মৃত্যু ঃ ৪০৩ হিজরী)

৩৪. "ফাতহুল বারী" : ১/১৬) হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী।

৩৫. "ফাতহুল বারী" : ১/১৬) হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী।

৩৬. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ "ফাতহুল বারী" : ১/১৮-১৯

(أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)

'ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হবার সূচনা হয়। ওই সময় তিনি স্বপ্নযোগে যা কিছু প্রত্যক্ষ করতেন, প্রত্যুষে তা উদ্ভাসিত প্রভার ন্যায় বাস্তবায়িত দেখতে পেতেন।'[৩৭]

এ. ছাড়াও মদীনায়ে তৈয়েবাতে একবার এক মুনাফিক নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর যাদু করেছিল। ওই যাদু সম্পর্কে অবগতি এবং তা প্রতিহত করা উপায়ও নবীজীকে স্বপ্নযোগে মহান আল্লাহর তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৩৮]

৫. আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম ঃ كلام الٰهي

হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও সরাসরি মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হুর বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় শুধু মেরাজের সময় এ ঘটনা ঘটেছিল। এ ছাড়া স্বপ্নযোগেও একবার নবীজী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সামনা সামনি কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করে ছিলেন।[৩৯]

৬. অন্তরে বার্তা গেঁথে দেওয়া نفث في الروع

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ষষ্ঠ পদ্ধতি ছিল এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো রূপ ধারণ করে সামনে আসা ব্যতীত রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তরে কোনো বার্তা ঢেলে দিতেন। যেমন, এক বর্ণনায় তিনি ইরশাদ করেছেন–

إنّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعِي

'পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) আমার অন্তরে (এ কথা) ঢেলে দিয়েছেন।'[৪০]

'মুসতাদরাক হাকেম'-এর বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلْقَى فِي رُوعِيَ أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ

'জিবরাঈল (আ.) আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিই তার রিযিক পূর্ণ করা ব্যতীত অবশ্যই পার্থিব জগৎ ত্যাগ করবে না।'[৪১]

---

৩৭. সহীহ বুখারী : ১/২, হাদীস নং ৩।
৩৮. সহীহ বুখারী : ২/৮৫৭-৮৫৮, আসাহহুল মাতাবি' করাচী।
৩৯. "আল ইতকান" : ১/৪৬
৪০. "আল ইতকান" : ১/৪৬

সূচিপত্র

ওহী, কাশফ ও ইল্‌হাম প্রসঙ্গ ঃ وحی اور کشف والہام

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওহী একমাত্র নবী-রাসূলগণের সাথেই প্রযোজ্য। নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কেউ আধ্যাত্মিকতার যত উঁচু মাকামেই অবস্থান করুক না কেন তাঁর কাছে কখনো ওহী আসতে পারে না। অবশ্য মহান আল্লাহ জাল্লা শান্‌হু কোনো কোনো সময় তাঁর খাছ খাছ বান্দাদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে কিছু কথা জানিয়ে থাকেন। এ পদ্ধতিকে کشف 'কাশফ' বা الہام 'ইলহাম' বলা হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) কাশ্‌ফ ও ইলহামের মাঝে এই পার্থক্য নিরূপণ করেছেন যে, 'কাশ্‌ফ' ইন্দ্রিয়অনুভূতির সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থাৎ এর মাঝে কোনো বস্তু বা ঘটনা গোচরীভূত হওয়া। আর 'ইলহাম' সম্পর্ক রাখে অন্তরের সাথে। অর্থাৎ এতে কোনো বস্তু বা বিষয় গোচরীভূত হয় না। শুধু অন্তরে কোনো বিষয় প্রবিষ্ট করা হয়। এ কারণেই কাশ্‌ফ অপেক্ষা 'ইলহাম' অধিক বিশুদ্ধ হয়ে থাকে।[৪২]

প্রকাশ্যত ওহীর ষষ্ঠ প্রকার তথা 'অন্তরে ঢেলে দেওয়া' ইলহামে'র বেশি নিকটবর্তী। কারণ উভয়টার পদ্ধতি এক যে, অন্তরে কোনো কথা বা বিষয় ঢেলে দেওয়া হয়। তবে উভয়ের মাঝে প্রকৃত পার্থক্য এই যে, ওহী শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণের নিকটই আসে এবং সাথে সাথে এ কথাও অবগত হয়ে যায় যে, কে এটাকে অন্তরে ঢেলে দিল? কেননা পূর্বে উল্লিখিত 'মুসতাদরাক হাকেমে'র বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন,"রুহুল কুদুস" [পবিত্র আত্মা] আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন।"

পক্ষান্তরে ইলহামে'র মাঝে কে ঢেলে দিল তা নির্ণয় করা যায় না। ব্যস, শুধু এটুকু অনুভব হয় যে, অন্তরে এমন একটি কথা এসেছে যা ইতোপূর্বে ছিল না।[৪৩]

এপ্রেক্ষিতে নবী-রাসূলগণের ওহী শতভাগ সুনিশ্চিত থাকে এবং তা অনুসরণ করা ফরয। পক্ষান্তরে আল্লাহর বিশেষ বান্দা বা বুযুর্গের ইলহাম একীনযোগ্য নয়। তাই এটা যেমন দ্বীনি বিষয়ের কোনো দলীল হতে পারে না, তেমনি এর অনুসরণ করাও ফরয নয়। এমনকি কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে যদি এমন কোনো বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় যা কুরআন-সুন্নাহর প্রসিদ্ধ বিধান পরিপন্থী, তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা কারো মতেই জায়েয নেই।[৪৪]

---

৪১. আল-হাকেম: "আল-মুসতাদরাক [ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়]": ২/৪, দায়েরাতুল মাআরিফ, ১৩৪০ হিজরী।

৪২. "ফয়যুল বারী" : ১/১৯

৪৩. "আল-ওহীউল মুহাম্মাদী"পৃ :৩৮, রশীদ রেজা রচিত ঃ মাতবাআ আল-মানার, মিসর ১৩৫৪ হিজরী।

৪৪. আশ্‌-শাতেবী ঃ "আল-ইতেসাম" ১/৩৫১, মাতবাআ আল-মানার, মিসর-১৩৩১ হিজরী।

মাতলূ ও গাইরে মাতলূ ওহী : وحی متلو اور غیر متلو

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তা দুই প্রকারের ছিল। প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত। যার শব্দ ও অর্থ উভয়ই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। যা সর্বকালের জন্য কুরআনুল কারীমে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে এর একটি নোক্তা বা বিন্দু-বিসর্গও পরিবর্তন করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। এই ওহীকে উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় (وحی متلو) "ওহীয়ে মাতলূ" বলা হয়। অর্থাৎ ওই ওহী, যা তেলাওয়াত বা পাঠ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ওই ওহী যা পবিত্র কুরআনুল কারীমের অংশ হয়নি; তবে এর মাধ্যমে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বহু হুকুম-আহকাম দেওয়া হয়েছে।

এই ওহীকে (وحی غیر متلو) "ওহীয়ে গাইরে মাতলূ" বলা হয়। অর্থাৎ এমন ওহী যা কুরআনের ন্যায় পাঠ করা হয় না।

সাধারণত ওহীয়ে মাতলূকে কুরআনুল কারীমে ইসলামী আকীদা বিষয়ক মূলনীতি ও বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রদানের উপর ক্ষান্ত করা হয়েছে। আর সেসব শিক্ষার বিস্তারিত বর্ণনা ও শাখাগত মাসআলা-মাসায়িল অধিকহারে ওহীয়ে গাইরে মাতলূ দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। তো এই ওহী অথাৎ "ওহীয়ে গাইরে মাতলূ" যা বিশুদ্ধ হাদীসরূপে সংরক্ষিত আছে। এগুলোর মূল বিষয়টা রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তবে তা ব্যক্ত করার জন্য যে শব্দচয়ন করা হয়েছে, তা তাঁর নিজস্ব।[৪৫]

এক হাদীসে নবী কারীম (صلی اللہ علیہ وسلم) ইরশাদ করেন–

أوتيت القرآن ومثله معه

'আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং এর সাথে এর মতোই আরো ও দেওয়া হয়েছে।'

এখানে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সাথে যে "অন্যান্য শিক্ষা"-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই.'ওহীয়ে গাইরে মাতলূ।"

ইসলামী বিধি-বিধানের আংশিক ও শাখাগত বিষয়াবলীর বিস্তারিত বর্ণনা যেহেতু গাইরে মাতলূ ওহীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। তাই যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করা সত্ত্বেও ইসলামী বিধি-বিধান উপেক্ষা করে স্বাধীন জীবন যাপন করতে আগ্রহী, তারা কিছু দিন থেকে এই সুর তুলেছে যে, 'ওহীয়ে গাইরে মাতলূ' বলতে কিছু নেই।

---

৪৫. "আল ইতকান" : ১/৪৫

মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর যত ওহী অবতীর্ণ হয়েছে সবগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীমে সংরক্ষিত আছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের বাইরে যেসব বিধান রাসূলে আকরাম (সা.) দিয়েছেন, তা নিছক একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। যা শুধু সে যুগের মুসলমানদের জন্যই পালনীয় ছিল। বর্তমান যুগে তা পালন করা আবশ্যকীয় নয়!

বস্তুতঃ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ পাক প্রদত্ত ওহী শুধু কুরআনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং কুরআনের আয়াতের বাইরেও ওহীর মাধ্যমে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অনেক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ দাবীর সমর্থনে নিম্নে কুরআনে কারীমার আয়াত দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হলো–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

'আর যে কিবলার উপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এ জন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নেই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তার পেছনে ফিরে যায়।'[৪৬]

প্রত্যেক মুসলমান এ কথা জানে যে, মদীনায় থাকা অবস্থায় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত "বাইতুল মুকাদ্দাস"-এর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছিলেন। অতঃপর যখন পুনরায় বাইতুল্লাহ'র দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের বিধান আসল, তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, 'আমি বাইতুল মাকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ এ জন্যই দিয়েছিলাম, যাতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কারা ওই নির্দেশ পালন করে আর কারা অস্বীকার করে?'

এখানে দেখার বিষয় হলো, এ আয়াতে মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হু বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়াটাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে, এই নির্দেশটাও আমিও দিয়েছিলাম। এখন যদি পবিত্র কুরআনুল কারীমের 'আল-হামদু' থেকে শুরু করে 'আন-নাস' পর্যন্ত সবটুকু অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে কোথাও এ নির্দেশ পাওয়া যাবে না যে,"তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় কর।" এ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হুও নির্দেশটি এমন ওহী দ্বারা দিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোথাও উল্লেখ নেই। আর সেই ওহীর নামই হচ্ছে, (وحی غیر متلو) "ওহীয়ে গাইরে মাতলূ।"

---

[৪৬]. সূরা বাকারা : ১৪৩

কালামে পাকের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) ۖ

"স্মরণ কর- যখন নবী তার স্ত্রীদের কোন একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতঃপর সে স্ত্রী যখন তা (অন্য একজনকে) জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ এ ব্যাপারটি নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (তার স্ত্রীর কাছে) কিছু কথার উল্লেখ করল আর কিছু কথা ছেড়ে দিল। নবী যখন তা তার স্ত্রীকে জানাল তখন সে বলল, 'আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিল?" নবী বলল, "আমাকে জানিয়ে দিলেন যিনি সর্বজ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।"[৪৭]

এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জনৈকা সহধর্মিনী একটি কথা রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর থেকে গোপন করতে চেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে নবীজীকে ওই কথাটি জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে এ কথাটা কে জানিয়ে দিল? তিনি বললেন, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহই আমাকে কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ওই গোপন বা লুকানো কথাটি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ওহীর মাধ্যমে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ পুরো কুরআনুল কারীমের কোথাও তা উল্লেখ নেই। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সংবাদটা তাঁকে "ওহীয়ে গাইরে মাতলূ"-এর মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের আরো বহু আয়াত দ্বারা "ওহীয়ে গাইরে মাতলূ"-এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে এখানে শুধু দু'টি আয়াতের উপরই ক্ষান্ত করা হলো। সত্যানুসন্ধানই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এই দু'টি আয়াতই অনস্বীকার্যভাবে এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, বস্তুত "ওহীয়ে গাইরে মাতলূ"ও ওহীর আরেকটি প্রকার। (وحی غیر متلو) "ওহীয়ে মাতলূ"-এর ন্যায় তা সুনিশ্চিত এবং অনুসরণ করা ওয়াজিব।

ওহীর উপর বুদ্ধিভিত্তিক সংশয়ঃ وحی پر عقلی شبہات

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত আলোচনা ছিল ওহী এবং ওহীর হাকীকত সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, ওহী মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পক্ষ হতে এমন সব বিষয়ের পথ-নির্দেশনার একটি রূপ, যার উপলব্ধি নিছক বিবেক-বুদ্ধি ও

---

৪৭. সূরা তাহরীম : ৩

মেধাশক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। আর ওহীর দর্শন যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ ব্যতীত আর কারো হয় না, তাই এর যথাযথ অনুধাবনও অন্যান্যদের জ সম্ভব নয়।

এ কারণেই আজকের বিশ্ব, যা পশ্চিমা চিন্তা-চেতনার সর্বগ্রাসী সয়লাবে প্রভাবিত, তাদের কাছে ওহীভিত্তিক জ্ঞান অচেনা ও অপরিচিত বলে মনে হয় এবং তারা এটাকে সংশয় ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কিছুলোক তো খোলাখুলিভাবে ওহী ও ইলহামকে অস্বীকার করে (নাউযুবিল্লাহ) এগুলোকে কিচ্ছা-কাহিনী বলে আখ্যা দিয়েছে। আবার কেউ কেউ সরাসরি ওহীকে অস্বীকার না করলেও বিজ্ঞানের উন্নতির এ যুগে এর আলোচনা করতে লজ্জাবোধ তো অবশ্যই করে! তাই এখানে সংক্ষিপ্তাকারে জেনে নেওয়া হউক যে, নিরেট বিবেক ও যুক্তির আলোকে ওহীর অবস্থান কি?

আমাদের দৃষ্টিতে ওহীর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সর্বপ্রথম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, এ মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আছেন, নাকি কারো সৃষ্টি করা ছাড়া এমনিতেই স্বয়ংকীয়ভাবে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে? ওই সকল বস্তুবাদী লোক যারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, তাদের সাথে ওহীর বিষয়ে আলোচনা করা তো একদম নিরর্থক। যে নাস্তিক আল্লাহর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না, তার জন্য এটা সম্ভবই নয় যে সে ওহীর বাস্তবতার উপর গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে চিন্তা-গবেষণা করে তা মনে-প্রাণে মেনে নিবে। তাই এমন ব্যক্তির সাথে তো সবকিছুর আগে মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। থাকল ওই সকল লোক যারা মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী বা আস্তিক। এদের জন্য ওহীর যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাবনা ও বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

আপনি যদি এ কথার প্রতি বিশ্বাসী হন যে, এ মহা বিশ্ব ও তাতে যা রয়েছে সবই এক মহাশক্তিধর স্রষ্টার সৃষ্ট এবং তিনি তাঁর নিপুণ প্রজ্ঞার সাথে এ বিশ্ব প্রকৃতির সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত নিয়ম-রীতির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনিই কোনো এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন! তাকে এটা বলে দেননি যে, কেন সে এ পৃথিবীতে আগমন করেছে? এখানে তার জিম্মায় কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে? তার গন্তব্যস্থল কোথায়? তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? কিভাবে সে তার জীবনের কাঙ্খিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিল করবে? কোনো একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কি এমনটি করতে পারে যে, সে তার কোনো এক চাকরকে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সফরে পাঠাল, অথচ

সূচিপত্র

সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে না তাকে পাঠানোর সময় কিছু বলে দিল, না পরবর্তীতে কোনো লোক মারফত তাকে জানানো হলো যে, কি উদ্দেশ্যে তাকে পাঠানো হয়েছে? এবং সফরের সময় তার দায়িত্ব বা কর্তব্য কি?

যদি একজন সাধারণ বিবেকসম্পন্ন মানুষও এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ না করতে পারে, তাহলে সে মহান পবিত্র সত্ত্বার ব্যাপারে এ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে, যার নিপুণ প্রজ্ঞার মাধ্যমে এ মহা বিশ্বের সকল নিয়ম-শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে? এটা কি করে সম্ভব যে, যে মহান সত্ত্বা আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রের ন্যায় এমন এমন বিস্ময়কর সুশৃঙ্খল নিয়ম চালু করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট পয়গাম পাঠানোর জন্য এমন কোনো ব্যবস্থাপনাও করতে পারেন না, যার মাধ্যমে মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে? যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিপুণ প্রজ্ঞার প্রতি ঈমান থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এ কথাও মানতে হবে যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দেননি। বরং তাদের দিক-নির্দেশনার জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থাপনা অবশ্যই তৈরি করেছেন। বলা বাহুল্য, নিয়মতান্ত্রিক সেই ব্যবস্থাপনার নামই হলো, ওহী ও রিসালাত।

এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, ওহী শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম নয়; বরং যুক্তিগতভাবেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যা অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

বাকি থাকল এই অভিযোগ যে, "উপরে ওহীর যে সব পদ্ধতির আলোচনা হয়েছে, তা আমাদের বোধগম্য নয় এবং আমরা তা প্রত্যক্ষ করিনি।" বস্তুত এটা ওহীকে না মানার জ্ঞানগত ও যুক্তিসম্পন্ন কোনো দলীল নয়। যুক্তিগতভাবেই যে বিষয়টি প্রয়োজনীয় এবং যার বাস্তবতা অনস্বীকার্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সে বিষয়টিকে শুধু এ কথার ভিত্তিতে অস্বীকার করা যাবে না যে, আমরা তা প্রত্যক্ষ করিনি।

আজ থেকে কয়েকশ' বছর পূর্বে যদি কারো সামনে এই আলোচনা করা হতো যে অচিরেই মানুষ উড়োজাহাজে চড়ে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব মাত্র কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে এটাকে রূপকথা হিসেবে আখ্যায়িত করতো। তবে কি তার অস্বীকার ও প্রত্যক্ষ না করার কারণে উড়োজাহাজের বাস্তবতা বিলীন হয়ে গেল? জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা এলাকার হাজার হাজার মানুষ আজও এমন রয়েছে যারা এ কথা

সূচিপত্র

বিশ্বাস করতে মোটেও প্রস্তুত নয় যে, মানুষ চাঁদে গিয়েছে! কিন্তু তাদের অস্বীকার করার কারণে কি এ ঘটনা ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল?

আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া লাগেনি এমন কোনো মফস্বলে তথা (গাম এলাকার) কোনো মানুষের কাছে কম্পিউটার সিস্টেমের বিস্তারিত বর্ণনা দিন এবং তাকে বলুন, কীভাবে এ যন্ত্রটি মানব মস্তিষ্কের ন্যায় কাজ করে? শেষ পর্যন্ত সে আপনার বর্ণনায় সংশয় ও সন্দেহই প্রকাশ করতে থাকবে। তবে কি এ ব্যক্তির সংশয় ও সন্দেহের কারণে কম্পিউটারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল? যদি না হয়ে থাকে এবং বাস্তবেই এমনটি হবে না, তাহলে ওই ওহী যুক্তির আলোকে যার প্রয়োজন স্বীকৃত এবং অনস্বীকার্য, যা প্রত্যক্ষ করেছেন দুনিয়ার একলক্ষ চব্বিশ হাজার মহা সত্যবাদী আম্বিয়ায়ে কেরাম; শুধু সংশয় ও সন্দেহের ভিত্তিতে সেই ওহীকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

অবশেষে প্রশ্ন হলো, ওহীর এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে জ্ঞানগত ও যৌক্তিক দুর্বোধ্যতা কি? (নাঊযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি ওহীর এই পদ্ধতিগুলোর উপর সক্ষম নন? দুনিয়ার প্রযুক্তিবিদরা যদি তাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণের জন্য টেলিফোন, তার, টেলিপ্রিন্টার, রেডিও ও টেলিভিশনের মতো কল্পনাতীত বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে (নাঊযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কি এ শক্তি নেই যে, তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট সংবাদ প্রেরণের জন্য এমন কোনো পদ্ধতি ও মাধ্যম অবলম্বন করবেন, যা উপরোক্ত যে কোনো মাধ্যম থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং গতিশীল ও বিশ্বাসযোগ্য হবে?

ওহীর হাকীকতই হচ্ছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বাণী কোনো মাধ্যম বা মাধ্যম ছাড়াই তাঁর পয়গাম্বরগণের অন্তরে ঢেলে দেন।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এ কথাটিকে মেনে নিতে যুক্তিগ্রাহ্য আপত্তিটা কোথায়? ওহীর বাস্তবতা প্রমাণের জন্য কোনো মানুষের আবিস্কৃত ও ব্যবহারিক উদাহরণ উপস্থাপন করতে কি আমরা দ্বিধাবোধ করি। তথাপি বিষয়টি বুঝার জন্য আমরা মানুষের ব্যবহারিক এমন একটি প্রক্রিয়া উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি, যার মাঝে একজন মানুষ অপর একজন মানুষের মন-মস্তিষ্ক অনুগত ও অধীনস্ত করে তাতে যা ইচ্ছে তাই ঢেলে দিতে পারে?

এই প্রক্রিয়াটিকে সুফিয়ায়ে কেরাম (আধ্যাত্মিক সাধকগণের)-এর পরিভাষায় "তাসাররুফে খেয়ালী" বলা হয়। সুফিয়ায়ে কেরামের আলোচনায় এর অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রক্রিয়াবলে অন্য ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তাকে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তা

বাতলিয়ে নেয় বা করিয়ে নেয়। বস্তুবাদী লোকেরা বহু কাল যাবত তাসাররুফের এই শক্তিকে অস্বীকার করে আসছিল। আর এদের অনুসরণ ও দেখ-দেখায় বহু মুসলমানও বিষয়টিকে কল্প-কাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেসমার (Mesmer)-এর আবির্ভাব ঘটে।[৪৮] তিনি মানুষের মস্তিষ্ককে নিজের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেন। ১৭৫৭ সালে তিনি তার এক গবেষণালব্ধ একটি প্রবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করেন যে, এক ধরনের সংবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে তিনি (Anima Masnetism) বা 'সংবেদন প্রক্রিয়া' বলে নামকরণ করেন। ফ্রান্সে অবস্থান করে তিনি এর সফল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও লাভ করেন।

কিন্তু তিনি তার সমকালীন যুগের মানুষকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারেননি। অতঃপর ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে জেম্‌স ব্রাইড (James Braid) নামে আরো এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। যিনি মস্তিষ্ক অধীনস্তকরণ প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নতুনভাবে করে এর নামকরণ করেন (Hypnotised) বা "সম্মোহন প্রক্রিয়া।"

প্রকাশ থাকে জেম্‌স ব্রাইডের আবিস্কৃত এই সম্মোহন প্রক্রিয়ার বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এর চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে, যে ব্যক্তির উপর এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ সম্মোহিত ব্যক্তির শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ অচল ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে এবং এর ফলে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল ইন্দ্রিয়শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তবে এই প্রক্রিয়ার একটি মধ্যবর্তী ধাপ ও স্তর রয়েছে। যার মধ্যে দেহ অনুভূতি শূন্য হয় না; বরং নড়াচড়া করার শক্তি থাকে। এই স্তরের সম্পর্কে ওয়ার্লড ফ্যামিলী এনসাইক্লোপিডিয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

"সম্মোহন প্রক্রিয়া যদি কম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তাহলে সম্মোহিত ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর চিন্তা-ভাবনা করার উপযোগী থাকে। যেমন, এমতাবস্থায় তার জন্য এটা সম্ভব যে, সে (সম্মোহন প্রক্রিয়া প্রয়োগকারী ব্যক্তির নির্দেশনা অনুযায়ী) নিজেকে নিজে অন্য এক ব্যক্তিরূপে জ্ঞান করবে। বিশেষ কোনো

---

৪৮. তার পুরো নাম ফ্রেডরিক এন্টোন মেসমার (ঋৎবফৎরপয অহঃড়হ গবংসবৎ) তিনি সুইজারল্যান্ডের একটি ঝিল কন্সেটন্সের অদূরে ১৭৭৩ ইং সনের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১৫ ইং সনের মার্চ মাসে মীর সাম্বার্গ শহরে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি প্রথমত চিকিৎসা শাস্ত্রকে নিজের থিসিস হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মস্তিষ্কের সংবেদন প্রক্রিয়ার একজন বিশেষজ্ঞ: বরং আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। [ওয়ার্লড ফ্যামিলি ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১২ তম খণ্ড, ৩৪২৫ পৃষ্ঠা, মাশীগান আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ১৯৫৭] তার নামের দিকে সম্বন্ধ করে এ শাস্ত্রের নাম রাখা হয়েছে "মসমারিজম।"

সূচিপত্র

বস্তু তার দৃষ্টিগোচর হবে (যা সেখানে উপস্থিত নেই)। অথবা অস্বাভাবিক কোনো ইন্দ্রিয়শক্তির নিজের মধ্যে অনুভব করতে শুরু করবে। এ সবের কারণ হচ্ছে একটা যে, ওই সময় সম্মোহিত ব্যক্তি প্রক্রিয়া প্রয়োগকারী ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যায়।"[৪৯]

জেম্‌স ব্রাইডের গবেষণা ও সফল অভিজ্ঞতার পর "সম্মোহন প্রক্রিয়া"কে ওই সকল বস্তুবাদী লোকেরাও মেনে নিয়েছিল যারা প্রথমে তা অস্বীকার করতো। আর বর্তমানে তো এ প্রক্রিয়া জনসাধারণের জন্য চিত্তাকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোটি কোটি শ্রমিক এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছে। রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এ প্রক্রিয়া দ্বারা কাজ নেওয়া হচ্ছে।

আর সেই "তাসাররুফে খেয়ালী" মুসলমান সুফিয়ায়ে কেরামের মাঝে যা শত শত বছর পূর্ব থেকে চলে আসছে– যেটাকে মানুষ স্রেফ কল্পনাপূজা বলে উড়িয়ে দিত, এখন "সম্মোহন প্রক্রিয়া"-এর সত্যতা প্রমাণের পর তা এক বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে।

এখন আমাদের যুগের 'যুক্তিবাদী' বুদ্ধিজীবিগণও এ সত্যকে মেনে নিয়েছেন, যাদের কাছে মুসলানদের সকল অস্বাভাবিক বিষয়াবলীকে কল্পনাপূজা এবং পাশ্চাত্যের সকল গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক সত্যতা বলে মনে হয়।

যা হোক উপস্থাপনার বিষয় ছিল, 'সংবেদন প্রক্রিয়া' হোক অথবা 'সম্মোহন প্রক্রিয়া'ই হোক এর হাকীকত তো এটাই যে, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে নিজের চিন্তাধারা ও কথাবার্তা তার মন-মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে মহান সত্ত্বা মানুষের তাসাররুফে খেয়ালী বা সংবেদন-সম্মোহন প্রক্রিয়ার এত শক্তি রেখেছেন যে, তারা সাধারণ থেকে সাধারণ উদ্দেশ্যে, এমনকি কখনো কখনো সম্পূর্ণ অনর্থক কাজে একে অপরের মন-মস্তিষ্ক অধীনস্ত করে নেয়। তাহলে কি স্বয়ং সে সত্ত্বা এ ব্যাপারে সক্ষম নন যে, মানবজাতির দিক-নির্দেশনার জন্য নবী-রাসূলগণের অন্তরকে তাঁর অধীনস্ত করে দিয়ে তাতে স্বীয় বাণী ঢেলে দিবেন?

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيم

"আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটাতো এক গুরুতর অপবাদ।"

কুরআনের শুধু অর্থই কি ওহী ? ؟کیا قرآن کے صرف معنی وحی ہیں؟

উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী দুই প্রকার। প্রথমতঃ "ওহীয়ে মাতলূ।" (পঠিত ওহী) অর্থাৎ কুরআনুল কারীম। দ্বিতীয়তঃ "ওহীয়ে গাইরে মাতলূ।" (অপঠিত ওহী) এই দ্বিতীয় প্রকার ওহী সাধারণত এমন হয়েছে যে, এর

---

[49]. The World Family Encyclopeedia 1957 P. 3426 V. 12.

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হতো আর তা ব্যক্ত করার জন্য শব্দ নির্বাচন করতেন হযরত জিবরাঈল (আ.) কিংবা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাপারটা এমন নয়। শব্দগত ও অর্থগত উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা পুরোপুরি মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কালাম বা বাণী। এর বিষয়বস্তু যেমনিভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ, তেমনি এর শব্দও মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে নাযিলকৃত। কুরআনুল কারীমের শব্দ নির্বাচন, রচনাশৈলী ও স্তর বিন্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে না আছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কোনো দখল আর না আছে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো দখল।

যারা ওহীর ব্যাপারে বস্তুবাদী লোকদের আপত্তি ও প্রশ্নবাণে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, আমাদের যুগে তাদের কেউ কেউ এ দাবী করেছে যে, 'কুরআনুল কারীমের শুধু মাফহূম (তথা মর্ম ও মূলকথা) ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এর শব্দ নির্বাচন, রচনাশৈলী ও স্তর বিন্যাস ইত্যাদি সবকিছু হযরত জিবরাঈল (আ.) কিংবা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে হয়েছে।' তাদের এই ধারণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বাতিল এবং কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের সম্পূর্ণ বিরোধী।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের বহু আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দ ও অর্থ উভয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হলো।

১. পবিত্র কুরআনুল কারীম বহু স্থানে নিজের একটি গুণ "আরবী" হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ এটাকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।[৫০] এখন এটা তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে, যদি কুরআনের শুধু মাফহূম বা মর্ম ও অর্থই ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে (আমি এটাকে আরবী কুরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি।)-এর কোনো অর্থই থাকে না। কারণ "আরবী" হওয়াটা শব্দের সিফাত বা গুণ, অর্থের নয়।

২. পবিত্র কুরআনুল কারীমের একাধিক জায়গায় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশেষ তিনটি দায়িত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)

---

[৫০]. দেখুন ঃ সূরা নাহল : ১০৩, সূরা শুআরা : ১৯৫, সূরা ইউসুফ : ২, সূরা ত্বহা : ১১৩, সূরা রাদ : ৩৯, সূরা যুমার : ২৮, সূরা হা-মীম সাজদা : ৩, সূরা শুরা : ৭, সূরা যুখরুফ : ৩ ইত্যাদি।

'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫১]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর পৃথক পৃথক দু'টি দায়িত্ব ছিল। একটি হলো, তাদেরকে শুধু মহান আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত বা পাঠ করে শোনানো। অপরটি হলো, তাদেরকে সেগুলোর শিক্ষা দেওয়া। আর এটা তো পরিষ্কার কথা যে, তেলাওয়াত তা পাঠ করা শুধু শব্দেরই হয়ে থাকে; অর্থের নয়। কাজেই রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অর্পিত সর্বপ্রথম দায়িত্ব পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দের সাথে, অর্থের সাথে নয়।

৩. পবিত্র কুরআনুল কারীম বিভিন্ন স্থানে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে "আল-কিতাব" শব্দটি ব্যবহার করেছে। আর বস্তুত আত্মিক বিষয়াবলীর জন্য "কিতাব" শব্দের প্রয়োগ হয় না; বরং যখন সে বিষয়াবলীকে শব্দের ছাঁচে সাজানো হয় তখনই সেটাকে কিতাব বলা হয়। এর দ্বারাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

৪. সূরায়ে "কেয়ামাহ" থেকে বুঝা যায় যে, যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আগমন করতেন, তখন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটাকে আত্মস্থ করার জন্য তাড়াহুড়া করে একই শব্দ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করতেন। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

'কুরআন তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তুমি তোমার জিহবাকে দ্রুত আন্দোলিত করো না। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর, অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।'[৫২]

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যে সমস্ত শব্দাবলী নিয়ে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন করতেন, তা আল্লাহ তা'আলার কালাম (বাণী) ছিল। এ জন্যই রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এর শব্দাবলী আত্মস্থ করানো, এর তেলাওয়াত বা পদ্ধতি শিক্ষা

---

৫১. সূরা বাকারা : ১২৯

৫২. সূরা কেয়ামাহ : ১৬-১৯

দেওয়া এবং এর ব্যাখ্যা করা– এই তিনটি দায়িত্বই স্বয়ং মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন স্বীয় জিম্মায় নিয়েছেন।

এই সুস্পষ্ট দলীলগুলোর আলোকে এ ধারণা একেবারেই বাতিল হয়ে যায় যে, 'পবিত্র কুরআন ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়নি।' এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে শায়েখ মুহাম্মদ আবদুল আযীম যুরকানী (রহ.) এক চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি লিখেন–

"এই আলোচনার সারকথা হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দ ও অর্থ উভয়ই সর্বসম্মতিক্রমে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। "হাদীসে কুদসী"-এর ব্যাপারেও প্রসিদ্ধ মত এটাই যে, এর শব্দাবলীও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে। অবশ্য নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসগুলোর শুধু অর্থটাই ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আর শব্দগুলো নবী কারীম (সা.)-এর নিজের। আর যে সকল হাদীস রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে ইজতেহাদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন সেগুলোর শব্দ ও অর্থ উভয়ই তাঁর নিজস্ব।"[৫৩]

প্রকৃতপক্ষে যেসব লোক পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাদের এই ভুলের মূল উৎস হচ্ছে, ওহীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের শব্দাবলীর অবতরণ তাদের বোধগম্য নয়। কিন্তু ওহীর হাকীকত, যুক্তির আলোকে এর প্রয়োজনীয়তা এবং ওহীর ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের জবাবে উপরে যেসব কথা লিখা হয়েছে, সেগুলোকে সামনে রাখলে এই সন্দেহ স্বয়ংক্রীয়ভাবে দূরীভূত হয়ে যায়।

ওহী যদি বাস্তবেই এক প্রয়োজনীয় বিষয় হয় এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর উপর সক্ষম হন, তাহলে এমন কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে যে, তিনি পবিত্র কুরআনের অর্থটা নবীর অন্তরে ঢেলে দিতে সক্ষম, আর ওহীর মূল বক্তব্য নবীজী আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজস্ব (নাউযুবিল্লাহ)।[৫৪]

কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের সুদৃঢ় দলীলের আলোকে তাদের এ বক্তব্যগুলো সম্পূর্ণ বাতিল। উল্লিখিত বুযুর্গদ্বয়ও এ বক্তব্যের প্রবক্তাদের কোনো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেননি। বরং بَعْضُهُمْ (তাদের কেউ কেউ বলেছেন) বলে তাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। আর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) তো সরাসরি এই বক্তব্যগুলো খন্ডন করেছেন। একারণে এ সকল অভিমত বাতিল পন্থিদের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

---

৫৩. "মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন" : ১/৪৪, ঈসা আল-বাবী, মিসর ১৩৭২ হিজরী।

৫৪. "আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন" : ১/২২৯, "আল ইতকান" : ১/৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন নাযিলের ইতিহাস ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ এ পরিচ্ছেদে প্রথমেই এতে আলোচনা করা হয়েছে কোরআন "লওহে মাহফুজ" থেকে দুনিয়ায় অবতরণের পদ্ধতিগত বর্ণনা। এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে আল-কোরআনে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত শব্দদয় "ইনযাল" এবং "তানযীল"-এর মধ্যে কী পার্থক্য! অতঃপর ওহীকে নাযিলের অবস্থানগত দিক দিয়ে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করণ, যথাঃ একঃ কোরআন কারীম "লওহে মাহফুজ" থেকে দুনিয়ার আসমান "বাইতুল ইজ্জত" নামক স্থানে অবতীর্ণ হওয়া, পাশাপাশি বর্ণনা করা হয়েছে তার হিকমত। দুইঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা। অতঃপর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা উল্লেখ, মাক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ, যেমনঃ "কাল্লা (কক্ষনও নয়!)" শব্দ ও সিজদার আয়াত থাকা, আদম (আলাইহিস সালাম) ও ইবলিসের ঘটনা বর্ণিত হওয়া ইত্যাদি মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, মুনাফিকদের ব্যাপারে বর্ণনা ইত্যাদি মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য, এছাড়াও আরও কতক উসূলী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, যদ্বারা মাক্কী-মাদানী সূরার পৃথকীকরণ সহজ হয়, পাশাপাশি সূরাসমূহের মধ্যে ভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য থাকায় কতকের এই মতও খণ্ডন করা হয়েছে যে, "যেমন পরিবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া কোরআন মানবরচিত হওয়ার দিকে ঈঙ্গিত প্রদান করে" এধরণের বক্তব্য নিয়ে (নাউজুবিল্লাহ)। এছাড়াও এতে আলোচনায় এসেছে কুরআন নাযিলের কাল ও স্থানগত বর্ণনা, যথাঃ "নাহারী, লাইলী (রাত্রিকালীন), সয়ফী, শীতায়ী, ফেরাশী, নাওমী, সামাভী, ফেযায়ী আয়াত, কোরআন অবতরণকালীন ও বর্তমানের বিন্যাস এবং এতে প্রাচ্যবিদদের প্রচেষ্টা-প্রচেষ্টা ও তার ফলাফল, আসবাবে (শানে) নুযূলের ক্ষত্রে লক্ষ্য করে, কোরআনের আয়াতের প্রকারভেদ, তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা, যেমনঃ আহকামের নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগতিলাভ, মর্ম পর্যন্ধির জন্য আবশ্যকতা, কোরআনের উপর অসঙ্গত ধারণার অপনোদন ত্যাদি, পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে একই আয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন "শানে যূল" বর্ণিত হওয়ার প্রকৃত কারণ।

পাশাপাশি শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাপারে কতকের মনের ভ্রান্তি-অপনোদন করা হয়েছে। এবং যে তার কথার অর্থ শানে নুযূলের অবহেলা নয়, বরং বিভিন্নতার হাকীকত বর্ণনা করা।

পরবর্তীতে "শানে নুযূল ও বর্ণনার বিভিন্নতা" নামক শিরোনামে সাহাবায়ে কেরাম থেকে একই আয়াতের বিভিন্ন "শানে নুযূল" বর্ণিত হওয়ার কিছু উদাহরণ ও কারণ বর্ণনার পাশাপাশি "তারজীহ" দেয়ার মূলনীতি-বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি তাফসীর শাস্ত্রে আগ্রহী তালেবে ইলম ভাইদের জন্য বেশ উপকারী।

যেমন ঃ

১. সাহাবা এবং তাবিয়ীনে কেরাম কোনো মাসআলার অন্তর্ভুক্তি বুঝাতে আয়াত উল্লেখ করার পর বলতেন, "নাযালাতিল আয়াতু ফি কাযা"আয়াতটি এই বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ এর মাধ্যমে ধোকায় পড়ে যেতে হয় যে, আয়াতটির "শানে নুযূল" এই ঘটনা/বিষয়। এর জটিলতা নিরসনকল্পে উদাহরণসহ উসূলীমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

২. "শানে নুযুল" নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদীসের দুর্বলতা ও সবলতার প্রতি খেয়াল রাখা হবে। ৩. হাদীস সমমানের হলে অন্যান্য "করীনাহ"র দিকে নজর দিতে হবে। ৪. আবার কখনও একই আয়াতের একাধিক "শানে নুযূল"ও হতে পারে। যেমন "লিআন" সংক্রান্ত আয়াত। ৫. কখনও একই ঘটনার প্রেক্ষিতে একাধিক আয়াতও নাযিল হয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্নজন অংশবিশেষ করে বর্ণনা করায় তাতে দোদুল্যমানতা জাগে। ৬. আবার কখনও একাধিক ঘটনার জন্যে একই আয়াতও কয়েকবার নাযিল হয়ে থাকে।

আরও আলোচিত হয়েছে "শানে নুযূল" বিশিষ্ট্য আয়াতসমূহের প্রকারভেদ, যথাঃ ১. নির্দিষ্ট্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাযিলকৃত আয়াতের "মিসদাক" কেবল সেই হবে। যেমন আবূ লাহাব।

২. অনির্দিষ্টভাবে গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অন্য দলীলের মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া গেছে, সেক্ষেত্রেও "ইত্তিফাক" যে, তার হুকুম কেবল উক্ত ব্যক্তির উপরই প্রযোজ্য হবে। ৩. বিশেষ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তবে তার শব্দগুলো ব্যাপক, পাশাপাশি কোনো দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আয়াতটি উক্ত ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট্য নয়। এক্ষেত্রে সমস্ত উম্মতই এর আওতাভুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ আনা হয়েছে "যিহার" এর আয়াত। ৪. বিশেষ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তার শব্দগুলোও ব্যাপক, এবং কোনো দলীলের মাধ্যমে জানা যায় না যে, আয়াতটি উক্ত ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট্য কি-না। এক্ষেত্রে উলামায়ে উম্মতের ইখতিলাফ, পাশাপাশি ফলপ্রসু সমাধানও নিয়ে আসা হয়েছে।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

কুরআন নাযিলের ইতিহাস : تاريخ نزول قران

পবিত্র কুরআনুল কারীম মূলত মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম। তাই সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তা লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত আছে। এপ্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদে হয়েছে–

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

'(কাফিররা অমান্য করলেও এ কুরআনের কোনই ক্ষতি হবে না) বস্তুতঃ এটি সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহ্ফূযে সুরক্ষিত আছে।'[৫৫]

অতঃপর পবিত্র কুরআনুল কারীম দু'ধাপে 'লাওহে মাহফূয' থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম ধাপে সম্পূর্ণ কুরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের "বাইতুল ইজ্জত"-এ নাযিল করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। "অবতীর্ণ" হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

একটি হলো, إنزال (ইন্যাল)। আরেকটি হলো, تنزيل (তান্যীল)। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুর পুরোটা একই সঙ্গে নাযিল করে দেওয়া। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে, ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাযিল করা। অতএব, পবিত্র আল-কুরআনুল কারীম যেখানেই নিজের জন্য প্রতম শব্দটি [ইন্যাল] ব্যবহার করেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণত 'লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হওয়া।' পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

'নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে।'[৫৬]

আর যেখানে দ্বিতীয় শব্দটি (তান্যীল) ব্যবহার করেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাযিল হওয়া। যেমন, কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ الإسراء: 106

'আর কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে।'[৫৭]

বস্তুত কুরআন নাযিলের এ দু'টি পর্যায় স্বয়ং কুরআনুল কারীমের বর্ণনাভঙ্গি থেকেও বুঝা যায়। এ ছাড়া ইমাম নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আবি

---

৫৫. সূরা বুরূজ : ২১-২২
৫৬. সূরা দুখান : ২
৫৭. সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৬

সূচিপত্র

শাইবা, তবারাণী ও ইবনে মারদূইয়া প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে এটাই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম প্রথমবার একসাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার ধীরে ধীরে [তেইশ বছরে] রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযিল হয়েছে।[৫৮]

প্রথম ধাপে অবতীর্ণ ঃ پہلا نزول

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বর্ণনা থেকে এত টুকু জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রথম পর্যায়ের নাযিল লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে "বাইতুল ইজ্জত" নামক স্থানে হয়েছে। তবে এই বাইতুল ইজ্জতে কুরআন কিভাবে নাযিল হয়েছে? আর সেখানে নাযিলের তাৎপর্য ছিল কি? এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। অবশ্য কোনো কোনো আলেম এর বিভিন্ন হেকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

যেমন আল্লামা আবু শামাহ (রহ.) এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এর দ্বারা কুরআনুল কারীমের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। আর ফেরেশতাগণকেও এ কথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, এটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ কিতাব। যা জগৎবাসীর হেদায়াতের জন্য নাযিল করা হচ্ছে।"

আল্লামা যুরকানী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, এভাবে দু'পর্যায়ে পবিত্র কুরআনুল কারীম নাযিল করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, এ কিতাব সর্বপ্রকার সংশয় ও সন্দেহের উর্ধ্বে। উপরন্তু নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দুই স্থানে তা সুরক্ষিত রয়েছে। একটি হলো, লাওহে মাহফূয ও আরেকটি হলো, "বাইতুল ইজ্জত।"[৫৯]

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হেকমত ও নিগূঢ় রহস্যাবলী জানার সাধ্য কার? এর মাঝে আরও কি কি রহস্য লুকায়িত আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। আর আমাদেরকে সেগুলোর পেছনে পড়ার কোনো প্রয়োজনও নেই। তবে আমাদেরকে এ টুকু সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পবিত্র লাইলাতুল কদরের রজনীতে প্রথম "ধাপে নাযিল" হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধাপে অবতীর্ণ ঃ دوسرا نزول

এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, প্রিয় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দ্বিতীয় পর্যায়ের অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমিক অবতরণ তখন থেকে আরম্ভ হয়েছিল,

---

৫৮. আল-ইতকান : ১/৪১
৫৯. মানাহিলুল ইরফান : ১/৩৯

সূচিপত্র

যখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স চল্লিশ বছর ছিল। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে এই অবতরণও শুরু হয়েছিল লাইলাতুল কদর থেকেই।[৬০] আর এটা ছিল সেই ঐতিহাসিক দিন, যে দিনের (এগারো বছর পর) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

'আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি তার প্রতি, যেদিন দু'টি দল মুখোমুখি হয়েছে।'[৬১]

এভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অবতরণের সূচনালগ্নের ব্যাপারে স্বয়ং আল-কুরআন থেকেই নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

১. অবতরণের সূচনা রমযান মাস থেকে হয়েছে।

২. শবে কদরে অবতরণের প্রথম সূচনা হয়েছিল।

৩. ওই তারিখে প্রথম নাযিল হয়েছিল, যে তারিখে পরবর্তীতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

তবে সেই রাতটি রমযানের কোন তারিখ ছিল? এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, তা ছিল রমযানের সতের তারিখ। কোনো বর্ণনায় ঊনিশতম তারিখ। আবার কোনো কোনো বর্ণনা মতে সাতাশতম তারিখ।[৬২]

সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত : سب سے پہلے نازل ہونیوالی اریت

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী প্রিয় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সর্বপ্রথম কুরআনের যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়, তা ছিল "সূরা আলাক'-এর প্রথম পাঁচ আয়াত। সহীহ বুখারীতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি 'সত্য স্বপ্নে'র মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। এরপর থেকেই তাঁর ভেতর নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

ওই সময়ে নবী কারীম হেরা গুহায় কয়েকটি রাত কাটিয়ে দিতেন এবং ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। এ অবস্থাতেই একদিন হেরা গুহায় নবী কারীম (সা) নিকট আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেশতা আগমন করলেন

---

৬০. প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (সা.) রবিউল আউয়াল মাসে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) এর যথাযথ ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (সা.)-এর প্রতি সত্য স্বপ্নের আগমন শুরু হয়েছিল। ছয় মাস পর্যন্ত লাগাতার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। অতঃপর রমযান মাসে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হতে শুরু করে। "আল ইতকান" : ১/৪২

৬১. সূরা আনফাল : ৪১

৬২. দেখুন, "তাফসীরে জামেউল বয়ান" : ১০/৭ মিসর। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) রচিত

এবং সর্বপ্রথম বললেন, اِقْرَأْ (অর্থাৎ আপনি পড়ুন)। নবী কারীম (সা.) জবাবে বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।'

এর পরের ঘটনা রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমার জবাব শুনে ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, اِقْرَأْ (আপনি পড়ুন।) আমি জবাবে আগের কথাই বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।' ফেরেশতা আমাকে আবারও জড়িয়ে ধরলেন এবং পূর্বের ন্যায় এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اِقْرَأْ (আপনি পড়ুন।) আমি জবাবে বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি তৃতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ভীষণ চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। তারপর বলতে লাগলেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3} ..

'তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।'[৬৩]

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতগুলো নিয়ে যখন ঘরে ফিরলেন তখন তাঁর পবিত্র অন্তর ভয়ে ধড়ফড় করছিল্ তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন– زملونى زملونى (আমাকে চাদরে আবৃত কর। আমাকে চাদরে আবৃত কর।) ঘরের লোকেরা তাঁকে চাদরাবৃত করে দিলেন। এভাবে তাঁর ভয় কেটে গেল।[৬৪] এই আয়াতগুলো ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত। এরপর তিন বছর যাবৎকাল ওহী অবতরণ বন্ধ থাকে। এই সময়টাকে "ফাতরাতুল ওহী" বিরতিকাল বলা হয়। তারপর ওই ফেরেশতা যিনি হেরা গুহায় এসেছিলেন নবীজি তাঁকে আসমান ও জমিনের মাঝে পুনরায় দেখতে পেলেন। তিনি নবীজিকে "সূরা মুদ্দাসসির"-এর আয়াতসমূহ শুনিয়ে দিলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ছাড়াও হাদীসের প্রায় সবগুলো কিতাবেই বিশুদ্ধ সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য সমস্ত উলামায়ে কেরামের নিকট বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটিই যে, প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল তা ছিল 'সূরা আলাকে'র প্রথম দিকের আয়াতগুলো। এরপর সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে আরো তিনটি মতামতও পরিলক্ষিত হয়। যেগুলোর উপর হালকা দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া উচিত।

---

৬৩. সূরা আলাক : ১-৩

৬৪. "সহীহ বুখারী" : হাদীস নং ৩, 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়।

সূচিপত্র

১. সহীহ বুখারীর "কিতাবুত তাফসীর"-এ উল্লিখিত হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত একটি বর্ণনার বাহ্যিক আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সর্বপ্রথম সূরায়ে মুদ্দাসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই কোনো কোনো আলেম বলে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে সূরা মুদ্দাসসির সূরা আলাক্বের আগে।

কিন্তু হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) এই ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে বলেছেন, বস্তুত বুখারী শরীফের "কিতাবুত তাফসীর"-এ হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এতে দু'টি বাক্য বর্ণনা করা হয়নি। অথচ এই রেওয়ায়েতটিই ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম যুহরীর সনদ সূত্রে "ওহীর সূচনা" শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ওই বর্ণনায় হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন-

فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي

'হঠাৎ (আমি দেখতে পেলাম) যে ফেরেশতা হেরাগুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, তিনি তখন কুরসিতে বসে ছিলেন।'

এ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, হেরা গুহায় সর্বপ্রথম সূরা ইকরা বা আলাক্বের আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। সূরা মুদ্দাস্‌সির তারপর নাযিল হয়।[৫৫]

অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে যে, "ফাতরাতুল ওহী"-র পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা হলো"সূরা মুদ্দাসসির।" অতএব, যেসব রেওয়ায়েত হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়া ওহী হলো' يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, "ফাতরাতুল ওহী" ওহী বিরতি কালীন সময়ে সময় পার হওয়ার পর এটাই ছিল সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ওহী।

অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে, সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে যে সূরা নাযিল হয়েছে তা ছিল সূরা মুদ্দাসসির। কেননা সূরা ইকরা (আলাক্ব) পূর্ণাঙ্গরূপে একবারে নাযিল হয়নি।

২. ইমাম বায়হাকী (রহ.) "دلائل النبوة" গ্রন্থে হযরত আমর ইবনে হুবাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে মুরসাল সূত্রে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কে বলতেন, "আমি যখনই নির্জনে অবস্থান করি, তখন কে

---

৫৫. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন। "ফুলযুল বারী" ১/২৫, "ফাতহুল বারী" : ১/২৩।

যেন আমাকে 'হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মাদ!' বলে ডাকে। এভাবে একদিন আমি যখন নির্জনে অবস্থান করছিলাম তখন সে বলে উঠল–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (3)

এভাবে সম্পূর্ণ সূরা ফাতেহা পাঠ করে ফেললেন।[৬৫]

আর এই রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে আল্লামা যমখশরী (রহ.) লিখেছেন যে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে "সূরায়ে ফাতেহা।" এমনকি তিনি এ মতকে অধিকাংশ মুফাসসিরীনের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৬] কিন্তু হাফেজ ইবনে হাযার (রহ.) তাঁর এই মতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, যমখশরী (রহ.)-এর এই মত সঠিক নয়। কেননা সূরায়ে ফাতেহাকে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ওহী বলার প্রবক্তা খুবই কম। বরং অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মত হচ্ছে সূরা ইকরা (আলাক্ব)-ই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ওহী।[৬৭]

ইমাম বায়হাকী (রহ.) উল্লিখিত যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেটার ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেন যে, যদি এই রেওয়ায়েত সঠিক হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত তা সূরা ইকরা ও সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।[৬৮]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হতে পারে অন্যান্য আয়াতের ন্যায় সূরা ফাতেহাও দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ইকরা অবতীর্ণ হবার পূর্বে একবার এবং এরপরে আরেকবার।

তখন এ কথা মেনে নিতে হবে যে, সূরা ফাতেহা প্রথম বার কুরআনের অংশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি; বরং একজন ফেরেশতা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তা (সুসংবাদ হিসেবে) শুনিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে উপযুক্ত সময়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অংশের মর্যাদা নিয়ে নিময়তান্ত্রিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।[৬৯]

যাই হোক, উপরোক্ত এই তিনটি রেওয়ায়েত ব্যতীত বাকী অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা ইকরা [আলাক]-এর প্রাথমিক আয়াতগুলোই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এ মতের সমর্থনে বহু রেওয়ায়েত উপস্থাপন করেছেন।[৭০]

---

৬৫. "আল-ইতকান" : ১/১৫

৬৬. আয-যমখশরী : "আল-কাশশাফ আন হাকায়িকী গাওয়ামিযিত তানযীল" : ৪/৭৭৫, কায়রো-১৩৬৫ হিজরী।

৬৭. "ফাতহুল বারী" : ৮/৫৮০, কিতাবুত তাফসীর, সূরা ইকরা।

৬৮. "ফাতহুল বারী" : ৮/৫৮০, কিতাবুত তাফসীর, সূরা ইকরা।

৬৯. "ফয়যুল বারী" : ১/২৫

৭০. "আল-ইতকান" : ১/২৪

মাক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহ : مکی اور مدنی آیات

আপনারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরাসমূহের শিরোনামে হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোনো সূরার সাথে 'মাক্কী' এবং কোনো সূরার সাথে 'মাদানী' লিখা রয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক।

অধিকাংশ তাফসীর বিশারদদের পরিভাষা অনুযায়ী 'মাক্কী' আয়াত বলতে সেসব আয়াতকে বুঝায়, যা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে। কারো কারো মতে যেসব আয়াত মক্কা নগরীতে নাযিল হয়েছে সেগুলো 'মাক্কী।' আর যেগুলো মদীনা নগরীতে নাযিল হয়েছে সেগুলো 'মাদানী।' কিন্তু অধিকাংশ তাফসীর বিশারদদের পরিভাষা অনুযায়ী এ ধারণা সঠিক নয়।

কারণ এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা মক্কা নগরীতে নাযিল হয়নি; কিন্তু হিজরতের পূর্বে নাযিল হবার কারণে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি হিজরতের পথে মদীনা নগরীতে পৌঁছার পূর্বে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলোকেও 'মাক্কী' বলা হয়।

অনুরূপভাবে বহু আয়াত এমনও রয়েছে যা মদীনা নগরীতে নাযিল হয়নি; অথচ সেগুলোকে 'মাদানী' বলা হয়। যেমন, হিজরতের পর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহু সফরে বের হয়েছেন, যেগুলো মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরত্বের ছিল। সেসকল স্থানে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে 'মাদানী'ই বলা হয়। এমনকি যেসব আয়াত মক্কা বিজয়, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় স্বয়ং মক্কা নগরী বা তার আশপাশের এলাকায় অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকেও 'মাদানী' বলা হয়।[৭১] যেমন–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

এই আয়াতটিকে মাদানী বলা হয়; অথচ এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে।[৭২]

সারকথা, মাক্কী ও মাদানী'র বিভক্তিকরণ যদিও স্থানভিত্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো কালভেদে বিভক্ত হয়েছে। হিজরত সম্পূর্ণ হবার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো 'মাক্কী।' আর যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো 'মাদানী।'

যদিও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সরাসরি এমন কোনো রেওয়ায়েত বর্ণিত নেই যার মধ্যে কোনো আয়াত বা সূরাকে তিনি মাক্কী বা মাদানী বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে যেসব সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাবেঈন (রহ.) কুরআনুল

---

৭১. "আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন" : ১/১৮৮

৭২. "মানাহিলুল ইরফান" : ১/১৮৮

কারীমের শব্দ ও অর্থ সংরক্ষণে নিজেদের জীবন ব্যয় করেছেন, তাঁরাই সূরা ও আয়াতের ব্যাপারে এ কথাটিও বলে দিয়েছেন যে, কোনটি মাক্কী ও কোনটি মাদানী? যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শপথ করে বলেন, 'সেই মহান সত্ত্বার শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে আমার এই জ্ঞান আছে যে, সেটি কোন্ প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে?[৭৩] হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে জানি যে, সেটি রাতে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি দিনে? উন্মুক্ত স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি পাহাড়-পর্বতে?[৭৪]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ সূরা ও আয়াতের ব্যাপারে সাধারণত সাহাবায়ে কেরামই বলে দিয়েছেন যে, তা মাক্কী নাকী মাদানী? এতদ্ব্যতীত কোনো কোনো আয়াত বা সূরার ব্যাপারে অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারাও মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়টি জানা যায়। যেমন, যেসব আয়াতে বদর যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে, স্পষ্ট তো এটাই যে তা মাদানীই হবে। আর যেসব আয়াতে বিশেষভাবে মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করে কিছু বলা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশ মাক্কীই হবে। অতএব, কোনো কোনো সময় এ ধরনের কেয়াস ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেও কোনো আয়াতকে মাক্কী বা মাদানী বলে সাব্যস্ত করা যায়। আর কেয়াস যেহেতু অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তাই কোনো কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মাঝে মতপার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়েছে। কারো নিকট মাক্কী আর কারো নিকট মাদানী।

আবার কোনো কোনো সূরার পুরোটাই মাক্কী অথবা পুরোটাই মাদানী। যেমন, সূরা মুদাস্‌সিরের পুরোটাই মাক্কী। আর সূরা আলে-ইমরানের পুরোটাই মাদানী। আবার কোনো কোনো সূরার তথাপিও মাক্কী বলা হয়, কিন্তু তার কয়েকটি আয়াত মাদানী। যেমন, সূরা আ'রাফ মাক্কী।

কিন্তু এর কয়েকটি আয়াত অর্থাৎ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ থেকে .وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ-এর শেষ পর্যন্ত কয়েকটি আয়াত মাদানী। আবার কখনো এর বিপরীত হয়ে থাকে অর্থাৎ পুরো সূরা মাদানী। কিন্তু তার কয়েকটি আয়াত মাক্কী। যেমন, সূরা হজ মাদানী।

কিন্তু এর চারটি আয়াত অর্থাৎ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى পর্যন্ত মাক্কী।

---

৭৩. "আল-ইতকান" : ১/৯

৭৪. প্রাগুক্ত : ২/১৮৭

সূচিপত্র

এ আলোচনা থেকে এটাও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, কোনো সূরার মাক্কী বা মাদানী হওয়াটা সাধারণত তার আয়াতের আধিক্যের বিচারে হয়ে থাকে। আবার কখনো এমনও হয় যে, যে সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে সেটাকে মাক্কী বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও তার পরবর্তী আয়াতসমূহ হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে।[৭৫]

মাক্কী ও মাদানী আয়াতের বিশেষত্ব ঃ مکی ومدنی آیتوں کی خصوصیات

মুফাসীরীনগণ মাক্কী ও মাদানী সূরা সমূহের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে সেগুলোর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন, যেগুলোর আলোকে সামান্য দৃষ্টি বুলালে সহজেই বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী নাকি মাদানী? এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু হলো, কুল্লী স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। আর কিছু হলো, আকছারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কুল্লী স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি সমূহ নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

১. যে সকল সূরাতে ﴿ (কক্ষনো নয়) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর মাক্কী। এই শব্দটি ১৫টি সূরায় ২৩ বার ব্যবহার হয়েছে। আর এই সবগুলোই পবিত্র কুরআনুল কারীমের শেষ অর্ধাংশে রয়েছে। যেমন, আল্লামা দায়রানী (রহ.) রচিত একটি কবিতায় তা ফুটে উঠেছে–

ومازلت كلا بيثرب فاعلمن ولم تات فى القران فى نصفه الاعلى

অর্থাৎ'জেনে রাখ, মদীনাতে ﴿ নাযিল হয়নি এবং কুরআনের প্রথমাংশে তা ব্যবহারও হয়নি।'

২. যেসব সূরায় সিজদার আয়াত রয়েছে সেগুলো মাক্কী। (এই মূলনীতি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী। কারণ তাঁদের নিকট 'সূরা হজ্বে' সিজদা নেই। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত অনুযায়ী সূরা হজে সিজদা আছে এবং তা 'মাদানী।' তাই তা এ মূলনীতির আওতামুক্ত থাকবে।)

৩. সূরা বাকারা ব্যতীত অন্যান্য যেসব সূরায় হযরত আদম (আ.) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে মাক্কী।

৪. যেসব সূরায় জিহাদের অনুমতি বা বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো মাদানী।

৫. যেসব সূরায় মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মাদানী। তবে কতক আলেম এই মূলনীতি থেকে 'সূরা আনকাবুত'কে আলাদা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে আসল কথা হলো, সূরা আনকাবুত সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে

---

৭৫. "মানাহিলুল ইরফান" : ১/১৯২

মাক্কী। কিন্তু যেসব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মাদানী।[৭৬]

যেসকল বিশেষতগুলো আকছারী বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে সেসকল) মূলনীতিগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. মাক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত- يَا أَيُّهَا النَّاسُ (হে লোক সকল!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর মাদানী সূরাগুলোতে সাধারণত। يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (হে মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

২. মাক্কী আয়াত ও সূরাগুলো সাধারণত ছোট ছোট ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে মাদানী সূরা ও আয়াতগুলো বড় বড় ও বিশদবিবৃত।

৩. মাক্কী সূরাগুলোতে বেশিরভাগ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রমাণ, হাশর-নশর ও শেষ বিচারের চিত্র বর্ণনা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধৈর্য ও সান্ত্বনা প্রদান এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী সম্বলিত। এবং এগুলোতে বিধি-বিধান খুব কম বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মাদানী সূরাগুলোতে পারিবারিক, সামাজিক নিয়মনীতি-আইন-কানুন, জিহাদ ও কিতাবের বিধি-বিধান এবং রাষ্ট্রীয় বিচার-আচার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. মাক্কী সূরাগুলোতে বেশিরভাগ মূর্তিপূজারীদের মুকাবিলা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মাদানী সূরাগুলোতে ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের মুকাবিলা করা হয়েছে।

৫. মাক্কী সূরা গুলোর বর্ণনা শৈলী বেশ অলঙ্কারপূর্ণ এবং এগুলোতে উদাহরণ-উপমা ও রূপক ব্যবহার অনেক বেশি। এমনকি শব্দ ভান্ডারের ব্যাপক সমাবেশও ঘটেছে এগুলোতে। পক্ষান্তরে মাদানী সূরাগুলোর বর্ণনাভঙ্গি তুলনামূলক বেশ সহজ-সরল।

মাক্কী ও মাদানী সূরা সমূহের বর্ণনাশৈলীর এ পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে অবস্থা, পরিবেশ ও সম্বোধিত ব্যক্তিদের রুচির তারতম্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। মাক্কী জীবনের যেহেতু মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল মূর্তিপূজক মুশরিকরা এবং ইসলামী কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাও অস্তিত্ব লাভ করেনি, তাই তখনকার দিনে অবতীর্ণ আয়াতসমূহে আকাইদ বা ধর্মীয় বিশ্বাসের সংস্কার, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন, মূর্তি পূজার দলীলভিত্তিক প্রত্যাখ্যান এবং কুরআনুল কারীমের অলৌকিকত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। পক্ষান্তরে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করেছিল।

---

৭৬. "মানাহিলুল ইরফান" : ১/১৯১

সূচিপত্র

মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিচ্ছিল। আর অত্যন্ত জ্ঞানগত ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এবং সর্বোপরি আদর্শিক মোকাবিলাটা ছিল আহলে কিতাব বা ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে। তাই এ সময়কার আয়াতসমূহে বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির শিক্ষা এবং আহলে কিতাবদের ভ্রান্ত ধারণার যুক্তিপূর্ণ জবাব দানের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আর বর্ণনাভঙ্গিটাও সেই অনুযায়ী অবলম্বন করা হয়েছে।

যে কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই অবস্থার তারতম্যের আলোকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির বিভিন্নতা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু যেসব প্রাচ্যবিদদের অন্তরে ইসলাম শত্রুদের আগুন জ্বলতে থাকে তারা মাক্কী ও মাদানী সূরার বর্ণনাশৈলীর এই তারতম্যের ব্যাপারেও মনগড়া ফলাফল বের করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। যেমন, কোনো কোনো পাশ্চাত্য ধর্ম গবেষক এ থেকে এই মন্তব্য করেছেন যে, 'পবিত্র কুরআনুল কারীম স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা। আর একারণেই অবস্থা ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণে তার বর্ণনাশৈলীরও রূপ পরিবর্তন হয়েছে। যদি তা মহান আল্লাহর কালামই হতো, তাহলে তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রভাবিত হতো না।' (নাঊযুবিল্লাহ)

কিন্তু যার অন্তরে সামান্যতম ইনসাফ ও বিবেকের ছোঁয়া লেগেছে, সে এই শত্রুতামূলক আপত্তির অসারতা সহজেই বুঝতে পারবে। ইলমে বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে, مقتضى الحال সম্বোধিত ব্যক্তি এবং অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী কালাম বা বাক্য প্রয়োগ করা। সব ধরনের ব্যক্তির সামনে, সব ধরনের পরিবেশে একই রীতিতে কথা বলা পুরানো যুগের স্বাদ-রুচিহীনতা এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের মৌলিক রীতিনীতি সম্পর্কে বে-খবর থাকারই প্রমাণ বহন করে। আর মহান আল্লাহ পাকের কালামে এ ধরনের স্বাদহীনতা ও অনভিজ্ঞতার ছাপ ওই ব্যক্তিই খুঁজে পায়, যারা সমালোচনার জন্যই সমালোচনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কুরআন নাযিলের স্থান ও কাল ঃ نزول کا وقت اور مقام

পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোকে মাক্কী ও মাদানী হিসেবে বিভক্তিকরণ ছাড়াও স্থান, কালও পাত্রভেদে মুফাসসিরগণ আরো কিছু কিছু প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন, "হাযারী আয়াত।" অর্থাৎ ওই সব আয়াত যা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আবাসস্থান মক্কা বা মদীনায় নাযিল হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ আয়াত এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। "সাফারী আয়াত।" ওই সব আয়াত যা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সফরে থাকা অবস্থায়

নাযিল হয়েছে। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতটি মক্কা বিজয়কালীন সফরে অবতীর্ণ হয়েছে–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এ ধরনের প্রায় চল্লিশটি আয়াত একত্রিত করেছেন।[৭৭] উপরোক্ত প্রকার দু'টি ছাড়াও স্থান-কালভেদে পবিত্র কুরআনুল কারীমের নিম্নলিখিত প্রকারগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন।

১. 'নাহারী' আয়াত ঃ অর্থাৎ ওই সকল আয়াত যা দিনের বেলা অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাবীব বলেন, অধিকাংশ আয়াত এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

২. 'লাইলী' আয়াত ঃ অর্থাৎ ওই সকল আয়াত যা রাতের বেলা অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, সূরা আলে-ইমরানের শেষের দিকের আয়াত–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ

এই আয়াতটি রাতের বেলা অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) আল-ইতকান গ্রন্থে এ প্রকারের অতিরিক্ত উদাহরণ দিতে গিয়ে এক ডজনের মতো আয়াত উল্লেখ করেছেন।

৩. 'সয়ফী' আয়াত ঃ অর্থাৎ ওই সকল আয়াত যা গরমের মৌসুমে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, সূরা নিসার শেষ আয়াত–

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ

সহীহ মুসলিমে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতটি গরমের মৌসুমে অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, ওই আয়াতটি বিদায় হজ্বের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, বিদায় হজের সময় যত আয়াত নাযিল হয়েছে, সবগুলোই ছিল 'সয়ফী' বা গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াত। যেমন–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا.

৪. 'শীতায়ী' আয়াত ঃ অর্থাৎ ওই সকল আয়াত যা শীতের মৌসুমে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, সূরা নূর-এর আয়াত–[৭৮]

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ

এই আয়াতগুলোতে উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এগুলো শীতের সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনটি সহীহ বুখারীতে স্বয়ং উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)

---

৭৭. দেখুন, "আল-ইতকান" ১/১৯-২১

৭৮. মায়েদা আয়াত নং ৩

সূচিপত্র

থেকেই বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা আহযাবে বর্ণিত খন্দক যুদ্ধের ঘটনা সম্বলিত আয়াতগুলোও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, খন্দকের যুদ্ধও শীতকালীন সময়েই সংঘটিত হয়েছিল।

৫. 'ফেরাশী' বিছানায় অবতীণ আয়াত ঃ অর্থাৎ ওই সকল আয়াত যা রাসূলে খোদা (ﷺ)-এর প্রতি এমন সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন তিনি নিজের বিছানায় ছিলেন। যেমন

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

এই আয়াতটি নবী কারীম (ﷺ) বিছানায় শায়িত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এর উপমা হিসেবে এটি ছাড়াও আরো দু'টি আয়াত উল্লেখ করেছেন।

৬. 'নাওমী' নিদ্রাবস্থায় অবতীণ আয়াত ঃ কেউ কেউ 'নাওমী' নামেও আয়াতের একটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ওই সকল আয়াত যা ঘুমন্ত অবস্থায় রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে তাঁরা সহীহ মুসলিম শরীফের ওই বর্ণনাকে উল্লেখ করেছেন, যা হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, একবার নবীয়ে পাক (ﷺ) আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন। এক পর্যায়ে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে মাথা মুবারক উঠিয়ে বললেন, আমার উপর এই মাত্র একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এ বলে নবী কারীম (সা.) সূরা কাউসার তেলাওয়াত করলেন–

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ {1} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {2} إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

[৭৯]তবে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, ঘুমন্ত অবস্থায় নবীয়ে পাক (ﷺ)-এর প্রতি কোনো আয়াতই অবতীর্ণ হয়নি। উপরোক্ত বর্ণনায় "নিদ্রাচ্ছন্ন" বলে যে অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মূল হাদীসে তার জন্য اغفاءة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ইমাম রাফেঈ (রহ.) সহ আরো অনেকে বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিদ্রা নয়। বরং ওই বিশেষ অবস্থা, ওহী নাযিল হবার সময় নবী কারীম (ﷺ)-কে যা আচ্ছন্ন করতো। (তাই উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা উপলব্দি করা যে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.)ও ইমাম রাফেঈ (রহ.)-এর এই মতকে সমর্থন করেছেন।[৮০])

---

৭৯. সূরা কাউসার

৮০. "আল-ইতকান" ১/২৩

সূচিপত্র

৭. 'সামাভী' আয়াত ঃ অর্থাৎ ওই সকল আয়াত যা মেরাজের সময় নবী কারীম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আসমানে থাকা অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে শুধু সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যা থেকে জানা যায় যে, সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি মেরাজের রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৮১]

৮. 'ফেযায়ী' বা শুন্যে অবর্তীণ আয়াত ঃ অর্থাৎ শূন্যে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ ঃ আল্লাহ ইবনে আরাবী (রহ.) ওহীর প্রকারের মধ্যে এমন একটি প্রকারও বর্ণনা করেছেন যা জমিনেও নাযিল হয়নি এবং আসমানেও নাযিল হয়নি। বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি বা শূন্যে নাযিল হয়েছে। তাঁর মতে সূরা সফ্ফাতের তিন আয়াত–

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الخ.....

থেকে শেষ পর্যন্ত এবং সূরা যুখরুফ এর এক আয়াতে–

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا. الخ.....

প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন, আমি এ ব্যাপারে ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় কিছু পাইনি।

কুরআনুল কারীমের পর্যায়ক্রমিক অবতরণ ঃ قرآن کریم کا تدریجی نزول

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর সম্পূর্ণ কুরআন একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। বরং অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। কখনো কখনো জিবরাঈল আমীন (আ.) একেবারে ছোট্ট একটি আয়াত; এমনকি কখনো কখনো আয়াতের একটি অংশ নিয়েও আগমন করতেন। আবার কখনো কখনো একাধিক আয়াত একসাতে নিয়ে আসতেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে ছোট যে অংশ পৃথকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো– غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [৮২] যা দীর্ঘ একটি আয়াতের অংশ। আবার অন্য দিকে সূরা আনআম পুরোটা এক সাথেই অবতীর্ণ হয়েছে।[৮৩]

কেউ কেউ আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ.)-এর একটি রেওয়ায়েত দ্বারা এই সন্দেহে পড়ে যান যে, জিবরাঈল (আ.) একসাথে পাঁচ আয়াতের বেশি নিয়ে আসেননি। কিন্তু আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) এই ধারণার অপনোদন করতে গিয়ে বলেন, পাঁচ আয়াতের বেশিও একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে।

---

৮১. "প্রাগুক্ত" ১/২৪

৮২. সূরা নিসা : ৯৫

৮৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/১২২

যেমন, ইফ্‌কের ঘটনা সম্পর্কিত দশটি আয়াত একসাথে অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অবশ্য এমনটি হতো যে, জিবরাঈল আমীন (আ.) রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একসাথে পাঁচ আয়াত করে মুখস্ত করাতেন। যখন পাঁচ আয়াত মুখস্ত হয়ে যেত, তখন আরো পাঁচ আয়াত শুনিয়ে মুখস্ত করাতেন। যেমন, ইমাম বায়হাকী (রহ.) হযরত আবুল আলীয়া (রহ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, 'পবিত্র কুরআনুল কারীমের পাঁচ আয়াত পাঁচ আয়াত করে শিখে নাও। কেননা, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরাঈল (আ.) থেকে পাঁচ আয়াত পাঁচ আয়াত করে মুখস্ত করতেন।[৮৪]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের সম্পূর্ণটা একসাথে নাযিল না করে কেন অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হলো? খোদ আরবের মুশরিকরাই রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এই প্রশ্ন করেছিল। কেননা তারা পুরো একটি কাসীদা (কবিতা) একই সাথে শুনে অভ্যস্ত ছিল। তাই কুরআনের এই ধীরগতির ও পর্যায়ক্রমিক অবতরণ তাদের জন্য একটি আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। উপরন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের পূর্বে তাওরাত, যাবূর ও ইনজিল সম্পূর্ণটাই একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলোর মধ্যে এ ধরনের পর্যায়ক্রমিক ধীর গতির পদ্ধতি ছিল না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই প্রশ্নের জবাব খোদ কুরআনের মাঝেই দিয়েছেন।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

'কাফিররা বলে- তার কাছে পুরো কুরআন এক সাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি। তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা সুদৃঢ় করার জন্য আমি তোমার কাছে তা ধীরে ধীরে পরিকল্পিত স্তরে ক্রমশঃ আবৃত্তি করিয়েছি। তারা আপনার কাছে যে কোনো বিষয় নিয়েই আসুক না কেন, আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'[৮৫]

ইমাম রাযি (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমের পর্যায়ক্রমে নাযিল হবার যেসব হেকমত বর্ণনা করেছেন, এখানে সেগুলোর সারমর্ম উল্লেখিত করাই যথেষ্ট হবে।

তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারীম পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে নাযিল হবার কয়েকটি হেকমত ও স্বার্থকতা ছিল।

---

৮৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ "আল-ইতকান" : ১/৪৪

৮৫. সূরা ফুরকান : ৩২-৩৩

সূচিপত্র

১. যেহেতু নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন উম্মী বা নিরক্ষর। লেখাপড়া জানতেন না। তাই পুরো কুরআন যদি একসাথে অবতীর্ণ করা হতো, তাহলে তা স্মরণ রাখা এবং আত্মস্থ করা নবীজীর জন্য মুশকিল হয়ে যেত। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.) লেখাপড়া জানতেন। তাই তাঁর প্রতি একসঙ্গে গোটা তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে।

২. যদি গোটা কুরআন একসঙ্গে অবতীর্ণ হতো তাহলে সাথে সাথে এর সকল বিধানের প্রয়োগ করাও আবশ্যক হয়ে পড়তো। আর সেটা পর্যায়ক্রমিক অবতরণের হেকমত ও রিচক্ষণতা পরিপন্থী, শরীয়তে যার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৩. নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যহ বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হতেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বার বার কুরআন নিয়ে আগমন করাটা সেসব কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করাকে সহজ করে দিত এবং তাঁর অন্তর দৃঢ় হবার কারণ হতো।

৪. পবিত্র কুরআনুল কারীমের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জবাব এবং বিভিন্ন প্রকার ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই সেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হবার পর অথবা ঘটনা সংঘটিত হবার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে এক দিকে যেমন উত্তরোত্তর মুমিনদের অন্তঃর্দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছিল, অপর দিকে সমকালীন বিভিন্ন ঘটনা প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কুরআনের সত্যতার বিষয়টি তাঁদের কাছে আরো অধিকতর উদ্ভাসিত হয়ে যেত।[৮৬]

শেষ হেকমতটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হলো- (সম্পাদক)

ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب

কুরআন অবতীর্ণের বিন্যাস ও বর্তমান বিন্যাস ঃ

বর্তমানে পবিত্র কুরআনুল কারীম যে তারতীব বা বিন্যাস ধারায় আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর এই তারতীব ও বিন্যাস ধারায় অবতীর্ণ হয়নি। বরং প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতরণের ক্রমধারা ছিল এর চেয়ে ভিন্ন। এমন হতো যে, যখনই কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, তখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওহী লেখকদের বলে দিতেন, এই আয়াতটিকে অমুক সূরার অমুক স্থানে লিপিবদ্ধ কর। ফলে তাঁর নির্দেশিত স্থানেই ওই আয়াত লেখা হতো। অবতীর্ণ আয়াতের তারতীব বা ক্রমধারা সংরক্ষণের চেষ্টা যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেননি, তেমনি তাঁর সাহাবারাও করেননি।

---

৮১. "আত-তাফসীরুল কাবীর" ইমাম রাযি ঃ ৬/৩৩৬

তাই যখন কুরআন পরিপূর্ণ হয়ে গেল তখন মানুষের স্মরণই থাকল না যে, কোন্ আয়াত কোন্ তারতীব ও ক্রমধারায় অবতীর্ণ হয়েছে? এ জন্যই এখন আংশিকভাবে কোনো কোনো সূরা বা আয়াতের ব্যাপারে এ কথা জানা যায় যে, এর তারতীব কি ছিল? কিন্তু পূর্ণ কুরআন অবতরণের তারতীব ও ক্রমধারা নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করা যায় না।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) "আল-ইতকান" গ্রন্থে কিছু কিছু রেওয়ায়েতের সাহায্যে সূরাগুলো অবতরণের ক্রমধারা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।[৮৭] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই রেওয়ায়েতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, কোন্ সূরাটি মাক্কী আর কোন্ সূরাটি মাদানী? বস্তুত অবতরণের ক্রমধারা এগুলো থেকে বিস্তারিত জানা যায় না। নিকট অতীতে কোনো কোনো প্রাচ্যবিশারদও অবতরণের ক্রমধারা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। সর্বপ্রথম প্রাচ্যবিশারদ বিখ্যাত জার্মানী পন্ডিত নোলডেকে এ কাজের সূচনা করেন।[৮৮] তারপর বহু পাশ্চাত্য লেখকদের নিকট তা এক চিত্তাকর্ষক বিষয়ের রূপ লাভ করে। উইলিয়ম মূরও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৮৯] এমনকি জে, এম, রাডওয়েল পবিত্র কুরআনুল কারীমের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, তাতে সূরাগুলোর প্রসিদ্ধ ক্রমধারা বর্ণনা না করে "নোলডেকে"-এর সন্দেহপূর্ণ ঐতিহাসিক ক্রমধারা উল্লেখ করেছেন।[৯০] বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হার্টওইগ হার্শফোল্ড শুধু সূরাই নয়; বরং আয়াতগুলোরও ঐতিহাসিক ক্রমধারা নির্ধারণের চেষ্টা চালিয়েছেন।[৯১] এ ছাড়াও রেজিস ব্লাশিয়ার তার ফ্রান্সিসী অনুবাদে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।[৯২] রিচার্ড বিলও এ ক্ষেত্রে পশ্চাত্য দুনিয়ায় বেশ সুনাম কামিয়েছেন।[৯৩] প্রাচ্যবিশারদদের এই চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে। আর সম্ভবত তাদের এই

---

৮৭. আল-ইতকান : ১/১০-১২। অর্থাৎ মুবাইদের স্পেনের অজ্ঞাত জনৈক আলেম রচিত "..." -এর একটি পাণ্ডুলিপিকে "..." নামকরণ করে ছেপেছে। এর মধ্যেও কুরআন নাযিলের ক্রমধারা সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে।-(অর্থাৎ মুবাইদর সংকলিত "মুকাদ্দামাতানে ফী উলূমিল কুরআন" মাকতাবা খানজী মিসর ঃ ১৯৫৪ ইং পৃ: ১২-১৬। কিন্তু এ রেওয়ায়েতগুলো নির্ভরযোগ্য নয়।

88. Noldeke. Theodor, Geschichte des Qurans, Gottingen. 1860.

89. Muir. William. The Life of Mohammed.

90. Rodwwell. J. M. The Koran (translated) London. 1953.

91. Hirschfold. Hartwig. New Researches into the composition and exegesis of the Qoran. (1902)

92. Blachere. Regis. Coran traduction selon unessaide reclassement sourates. Paris. 1947-51.

93. Bell. Richard. Translation of The Quran (1937-39).

সূচিপত্র

গবেষণায় প্রভাবিত হয়েই কোনো কোনো মুসলমানও কুরআন অবতরণের ক্রমধারার গবেষণার কাজ শুরু করেছেন।[৯৪]

কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এ সকল চেষ্টা এমন এক কাজে নিজের সময় ক্ষেপণ করার নামান্তর, যার মাঝে কখনো নিশ্চিত সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। উপরোল্লিখিত প্রাচ্য বিশারদগণ যেসব চেষ্টা চালিয়েছেন, সেগুলোর বেশিরভাগই এবারতের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। আর একজনের অনুমান যেহেতু অন্যজনের অনুমানের চেয়ে ভিন্নরূপ হয়ে থাকে, তাই তাদের বর্ণিত ক্রমধারার মাঝেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এ সব অনুমান থেকে বিশেষ কোনো কার্যকর ফায়দা অর্জন করা মুশকিল।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যবিশারদদের এ সব চেষ্টা-প্রচেষ্টার পেছনে বিশেষ এক ধরনের মানসিকতা কাজ করছে। তারা মনে করে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম আজও বিন্যাসহীন রয়েছে। এর আসল তারতীব ও বিন্যাস সেটাই যে ক্রমধারায় তা অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভিন্ন জিনিসে লিখা হতো, তাই সেই তারতীব ও ক্রমধারা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

রাডওয়েল তার অনূদিত কুরআনের ভূমিকায় লিখেছেন, 'পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্তমান বিন্যাসের কারণ হচ্ছে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তিনি যখন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আয়াতগুলো সংকলন করেন, তখন সে ক্রমধারায় যা পেয়েছেন সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই এতে ইতিহাস নির্ভর কিংবা অর্থগত তারতীব ও বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়নি।'[৯৫] অতএব,তার দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্তমান বিন্যাস সম্পূর্ণ মনগড়া (নাঊযুবিল্লাহ)। যা তিনি নিজ ধারণা মতে 'গবেষণা'র মাধ্যমে দূর করতে চাচ্ছেন!!

অথচ বিভিন্ন ঘটনাবলীর এসব প্রতিচ্ছবি কেবল ধারণা-প্রসূতই নয়; বরং সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদির সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতের এই তারতীব ও বিন্যাস ওহী দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, যখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি কোনো আয়াত নাযিল হতো, তখন তিনি ওহী লেখকদেরকে তা লিখে নেওয়ার নির্দেশের সাথে সাথে এ কথা বলে দিতেন যে, এই আয়াতটিকে অমুক সূরার

---

৯৪. ইয়াকুব হাসান রচিত : 'কাশশাফুল হুদা' পৃ: ১৭৫-১৮২।

৯৫. জড়ফাবিষব, ঔ. গ. ঞযব কড়ৎধহ (ঃৎধহংষধঃবফ) খড়হফড়হ, ১৯৫৩ চ. ২.

সূচিপত্র

অমুক আয়াতের পরে লিখে নাও।[৯৬] আর সাহাবায়ে কেরামও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাতানো ওই তারতীব ও ক্রমধারা অনুযায়ীই পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্ত করেছিলেন। এ কথা বলা একেবারেই ভুল যে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত যে ক্রমধারায় আয়াতগুলো পেয়েছেন, সে অনুযায়ীই লিপিবদ্ধ করেছেন। কারণ যদি এমনটিই হতো তাহলে বর্তমান কুরআনের সর্বশেষ আয়াতটি হওয়া উচিত ছিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا الخ

কেননা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সর্বশেষে এই আয়াতটি পেয়েছিলেন। অথচ এই আয়াতটি সূরা আহযাবের সংযুক্ত রয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত যায়েদ (রা.) ও তাঁর সাথীদের সামনে যখন কোনো আয়াত পেশ করা হতো, তখন তাঁরা আয়াতটিকে ওই স্থানেই লিপিবদ্ধ করতেন, যেখানে লিপিবদ্ধ করার জন্য স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন। অবশ্য সূরাগুলোর তারতীব ও বিন্যাসের ব্যাপারে মুফাসসিরগণের দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে এটাও ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণ নিজেদের আলোচনা ও ইজতেহাদের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করেছেন। তবে অধিকতর সঠিক কথা এটাই মনে হয় যে, অনেকগুলো সূরার তারতীব ও ক্রমধারা তো ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কোনো কোনো সূরার ব্যাপারে কোনো দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। যেমন সূরা তাওবা। সে বিধায় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণ নিজেদের ইজতেহাদের মাধ্যমে সূরা আনফালের পরে সূরা তওবাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৯৭]

শানে নুযূল বা অবতীর্ণ প্রেক্ষাপট ঃ اسباب نزول

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলো দু'ধরনের।

১. কিছু আয়াত এমন রয়েছে যেগুলো আল্লাহ তাআলা নিজেই নাযিল করেছেন। বিশেষ কোনো ঘটনা বা কারো কোনো প্রশ্ন এগুলো নাযিল হবার কারণ নয়।

২. আবার এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো বিশেষ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে কিংবা কারো কোনো প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। যেটাকে ওই আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট বলা হয়। এই প্রেক্ষাপটকেই মুফাসসিরগণের পরিভাষায় "আসবাবে নুযূল" বা "শানে নুযূল" বলা হয়। যেমন সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে–

---

৯৬. সুনানে আরবাআ ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে ফাতহুল বারী : ৯/১৮

৯৭. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : ফাতহুল বারী : ৯/৩২-৩৫

সূচিপত্র

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

'এবং মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা এবং নিশ্চয়ই মু'মিন কৃতদাসী মুশরিক মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে।'[৯৮]

উক্ত আয়াতটি বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। জাহেলী যুগে হযরত মারসাদ ইবনে আবী মারসাদ গানাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সাথে 'ইনাক' নামী এক নারীর সম্পর্ক ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ মদীনায় চলে আসলেন। ওই নারী মক্কায় থেকে গেল। একবার কোনো কাজে হযরত মারসাদ মক্কায় আসলে ইনাক তাঁকে পাপকর্মের প্রতি আহ্বান জানাল। হযরত মারসাদ তার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ইসলাম আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য তুমি যদি চাও, তাহলে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমতি ক্রমে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। মদীনায় পৌছে হযরত মারসাদ (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর নিকট বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং নিজের পছন্দের কথা প্রকাশ করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তা মুশরিক নারীদের বিবাহ করতে নিষেধ করে দেয়।[৯৯] কাজেই এই ঘটনাটিই উপরোক্ত আয়াতের "সববে নুযূল" বা "শানে নুযূল।"

শানে নুযূলের গুরুত্ব ও উপকারিতা ঃ شانِ نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد:

ইলমে দ্বীনে অপরিপক্ব কিছু কিছু লোক শানে নুযূলের তাৎপর্য ও উপকারিতাকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলে, 'পবিত্র কুরআনুল কারীম নিজেই এত স্পষ্ট ও উদ্ভাসিত যে, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য শানে নুযূল সম্পর্কে জানার কোনো প্রয়োজন নেই।' কিন্তু তাদের ধারণা একবারেই ভুল ও ভ্রান্ত। 'পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের জন্য শানে নুযূল সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন এক আবশ্যকীয় শর্তের মর্যাদা রাখে। এর উপকারিতাও সীমাহীন ও অসংখ্য। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি আলোকপাত করা হচ্ছে–

১. আল্লামা যারকাশী (রহ.) বলেন, শানে নুযূল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রথম উপকারিতা হচ্ছে, এর দ্বারা আহকামের হেকমত তথা নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় এবং এটা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ জাল্লা শান্হু এই হুকুমটি কোন প্রেক্ষাপটে এবং কেন নাযিল করেছেন।[১০০] যেমন, সূরা নিসায় বিবৃত হয়েছে–

---

৯৮. সূরা বাকারা : ২২১

৯৯. "আসবাবুন নুযূল" পৃ: ৩৮, আল-ওয়াহেদী ঃ মুসতফা আল-বাবী, মিসর : ১৩৭৯ হিজরী।

১০০. "আল-বুরহান ফী উলূমীল কুরআন" : ১/২২

সূচিপত্র

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

'হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।'[১০১]

যদি শানে নুযূলের রেওয়ায়েত সামনে না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা যখন মদ পান করা সম্পূর্ণ হারাম তখন এ কথা বলার কি প্রয়োজন আছে যে, 'তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকট. যেয়ো না।'? এ প্রশ্নের জবাব কেবল শানে নুযূল থেকেই পাওয়া যাবে।

এ আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, মদপান করা হারাম হবার পূর্বে একবার হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কয়েকজন সাহাবাকে নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে আহারান্তে মদ পান করা হলো। এমতাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হলো। তখন একজন সাহাবী নামাযের ইমামতি করলেন। নেশাগ্রস্ততার কারণে নামাযে কুরআন তেলাওয়াতে ভুল হয়ে গেল। এই প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করেই উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।[১০২]

২. অনেক সময় শানে নুযূল ব্যতিরেকে আয়াতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করাই সম্ভবপর হয় না। যদি শানে নুযূল সামনে না থাকে তাহলে মানুষ আয়াতের সম্পূর্ণ ভুল অর্থ বুঝে নিতে পারে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ

'আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা।'[১০৩]

যদি এই আয়াতের শানে নুযূল সামনে না থাকে, তাহলে বাহ্যিকভাবে এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযে বিশেষ কোনো এক দিকে মুখ ফিরানো আবশ্যক নয়। পশ্চিম-পূর্ব সবই আল্লাহ তাআলার মালিকানায়। আর তিনি সবদিকেই আছেন। তাই যে দিকেই মুখ ফিরাবে নামায আদায় হয়ে যাবে। অথচ যুক্তিগতভাবেই এই ধারণাটি ভুল। স্বয়ং কুরআনই অন্য স্থানে কাবা শরীফের দিকে মুখ করার আবশ্যকতা বর্ণনা করেছে।

---

১০১. সূরা নিসা : ৪৩

১০২. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৫০০ মাতবায়া মুসতফা মুহাম্মদ : ১৩৫৬ হিজরী।

১০৩. সূরা বাকারা : ১১৫

এসকল জট একমাত্র শানে নুযূলের মাধ্যমেই খুলে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন মুসলমানদের কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কাবা শরীফের দিকে পরিবর্তিত হলো, তখন ইহুদীরা এই প্রশ্ন তুলল যে, 'এ পরিবর্তনের হেতু কি?' তাদের এই প্রশ্নের জবাবেই উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।[১০৪] আয়াতের সারমর্ম হলো, সব দিকই মহান আল্লাহ তা'আলারই গড়া। আর আল্লাহ সব দিকেই আছেন। তাই তিনি যে দিকেই মুখ করতে নির্দেশ দিবেন সে দিকে মুখ ফিরানো ওয়াজিব। এখানে কেয়াস-অনুমান ও সংশয়-সন্দেহের দখল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

২. এ ভাবে সূরা মায়েদার এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا

'যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের উপর কোন পাপ নেই যদি তারা (হারাম থেকে) বিরত থাকে, আর ঈমান আনে ও সৎকাজ করে,[১০৫]

যদি এই আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দিকে লক্ষ্য করা হয় তাহলে এ কথা বলা যাবে যে, মুসলমানদের জন্য কোনো বস্তুই খাওয়া বা পান করা হারাম নয়। যদি অন্তরে ঈমান ও আল্লাহর ভয় থাকে এবং সৎকর্মশীল হয় তাহলে মানুষ যা চায় তাই পানাহার করতে পারবে।

আর যেহেতু এই আয়াত মদ্যপান হারাম হবার পরপরই এসেছে তাই কেউ এ কথাও বলতে পারে যে, এ আয়াত ঈমানদার ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য (নাউযুবিল্লাহ) মদ্যপানের অনুমতিও প্রদান করেছে। আর এটা শুধু সন্দেহ বা সম্ভাবনা নয়; বরং কোনো কোনো সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত এই আয়াত থেকে ভুল বুঝের শিকার হয়েছেন এবং তাঁরা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনে গিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে এই আয়াত দ্বারা দলীল নিয়ে এ খেয়াল পেশ করলেন যে, মদ্যপানকারী ব্যক্তি যদি অতীতে সৎকর্মশীল হয় এবং তার সাধারণ জীবন-যাপন যদি সৎকর্মের মাঝে অতিবাহিত হয়, তাহলে তার উপর শরঈ দন্ড-বিধি প্রয়োগ করা যাবে না।.পরবর্তীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াতের শানে নুযূলের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁদের এই ভুল ধারণার অবসান ঘটান।[১০৬]

---

১০৪. আল-ইতকান : ১/৩৩

১০৫. সূরা মায়েদা : ৯৩

১০৬. আল-কুরতুবী ঃ আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন : ৬/২৯৭ কায়রো, মিসর ১৩৮৭ হিজরী।

বস্তুত এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো, যখন মদ্যমান ও জুয়া খেলা হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হলো, তখন কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম এই প্রশ্ন করলেন যে, যেসব সাহাবায়ে কেরাম মদ্যপান ও জুয়া খেলা হারাম হবার পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, অথচ মদ্যপান ও জুয়া খেলায় তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তাদের পরিণতি কি হবে? তাঁদের এই প্রশ্নের জবাবে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে যে, হারামের বিধান নাযিল হবার পূর্বে যে সকল মুমিন মদ্যপান করেছে বা জুয়ার সম্পদ ভোগ করেছে তাদের উপর কোনো আযাব হবে না। এই শর্তে যে, তারা মুমিন এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অন্যান্য আদেশ- নিষেধের উপর আনুগত্যশীল।[১০৭]

৩. আরো একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন। সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

'নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। কাজেই যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হাজ্জ অথবা 'উমরাহ করবে, তখন এ দু'টোর সাঈ করাতে তাদের কোনই গুনাহ নেই।'[১০৮]

এই আয়াতে 'তার উপর কোনো দোষ নেই' এ শব্দ কয়টি থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, হজ ও উমরার মাঝে সাফা ও মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করা জায়েয মাত্র। ফরয-ওয়াজিব কিছু নয়। এমনকি হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এ ভুল উপলব্দির শিকার ছিলেন। উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, জাহেলী যুগ থেকেই এই পাহাড় দু'টিতে দু'টি প্রতিমা স্থাপিত ছিল।

একটির নাম ছিল আসাফ আর অপরটির নাম ছিল নায়েলা। তাই সাহাবায়ে কেরামের এ সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, সাফা ও মারওয়ায় প্রতিমা স্থাপিত থাকার দরুণ এ দু'টি প্রদক্ষিণ করা নাজায়েয হবে না তো! তাঁদের এ সন্দেহ দূর করার জন্যই এই আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে।[১০৯]

এই উদাহরণগুলো শুধু উপমা স্বরূপ পেশ করা হলো। নতুবা এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ. দেওয়া যাবে, যেগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অনেক আয়াতের সঠিক অনুধাবন শানে নুযূল জানা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

৩. অনেক সময় পবিত্র কুরআনুল কারীমে এমন শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, শানে নুযূলের সাথে যার গভীর সম্পর্ক থাকে। যদি সেই আয়াত অবতীর্ণ

---

১০৭. প্রাগুক্ত ঃ ৬/২৯৪।

১০৮. সূরা বাকারা : ১৫৮

১০৯. মানাহিলুল ইরফান ঃ ১/১০৪

সূচিপত্র

হওয়ার সঠিক প্রেক্ষাপট জানা না থাকে, তাহলে সেই শব্দগুলো অনেক সময় নাঊযুবিল্লাহ অনর্থক, আবার কখনো অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়, যা থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বাগ্মিতা ও অলঙ্কারীত্বের উপর আঘাত আসে। যেমন সূরা তালাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবর্তী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও হবে তিন মাস। আর গর্ভধারিনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।'[১১০]

এই আয়াতের মধ্যে "যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে যে, এই শব্দগুলো থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো উপকারিতা পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি কোনো কোনো আহলে-জাহের এ শব্দগুলো দ্বারা এই অর্থ করেছেন যে, বয়োপ্রাপ্তা নারী, যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের গর্ভবতী হবার ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ না থাকে, তাহলে তাদের উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়।[১১১] কিন্তু শানে নুযূলই এই শব্দগুলোর প্রকৃত কারণ বাতলে দিচ্ছে।

হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যখন সূরা নিসায় মহিলাদের ইদ্দতের বর্ণনা দেওয়া হলো, তখন আমি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরয করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কোন মহিলা এমন রয়েছে যাদের ইদ্দত কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি। যেমন, ছোট বালিকা, যারা এখনো ঋতুস্রাবের বয়সে উপনীত হয়নি, বয়োপ্রাপ্তা মহিলা যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং গর্ভবতী মহিলা।' হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-এর এ প্রশ্নের জবাবে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে তিনো ধরণের নারীরাই ইদ্দতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।[১১২]

এ প্রকারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত–

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ

'অতঃপর মহান হাজ্জের করণীয় কার্যাবলী সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহর স্মরণে মশগুল হও, যেমন তোমরা নিজেদের বাপ-দাদাদের স্মরণে মশগুল থাক।'[১১৩]

---

১১০. সূরা তালাক : ৪
১১১. আল-ইতকান ঃ ১/৩০
১১২. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/৩৮১
১১৩. সূরা বাকরা : ২০০

সূচিপত্র

যদি শানে নুযূল সামনে না থাকে তাহলে এই আয়াতের 'যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে।'-এই অংশটিকে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। কারণ এ কথা বুঝে আসে না যে, এই বিশেষ স্থানে আল্লাহর স্মরণকে বাপ-দাদার স্মরণের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্যটা কি? কিন্তু শানে নুযূল দ্বারা এ জট খুলে যায়। প্রকৃত ব্যাপারে হচ্ছে, এখানে মুযদালিফায় অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। আর আরব মুশরিকদের প্রথা ছিল, তারা হজ্বের কার্য সম্পন্ন করার পর মুযদালিফায় এসে নিজেদের বাপ-দাদার গৌরবগাঁথা ও কীর্তিকলাপ বর্ণনা করত। উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বাপ-দাদার স্মরণের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণের নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৪]

৪. পবিত্র আল-কুরআনুল কারীমে এমন জায়গাও কম নয়, যেখানে বিশেষ কোনো ঘটনার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ঘটনাটি জানা না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্যই বোধগম্য হবে না। যেমন, পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

'আর আপনি (মাটির মুষ্টি) নিক্ষেপ করেননি যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।'[১১৫]

মূলত এই আয়াতে বদর যুদ্ধের একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফেরদের বেষ্টনীর সময় তাদের প্রতি একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। এতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[১১৬] কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, যদি এর শানে নুযূল মাথায় না থাকে, তাহলে আয়াতের মর্ম বুঝে আসবে কিভাবে? এখানে শানে নুযূলের সকল উপকারিতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু উপরোল্লিখিত উদাহরণগুলো দ্বারা এ কথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযূলে গুরুত্ব কতটুকু? একারণেই ইমাম মাহ্দী (রহ.) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আয়াতের শানে নুযূল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে অবগত না হওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আয়াতের মর্ম বর্ণনা করা সম্ভব নয়।'[১১৭]

অতএব, যে সকল লোক সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে শানে নুযূলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে

---

১১৪. আসবাবুন নুযূল : পৃ: ৩৪
১১৫. সূরা আনফাল : ১৭
১১৬. আসবাবুন নুযূল : পৃ: ১৩৩
১১৭. আসবাবুন নুযূল : পৃ: ৪

সূচিপত্র

অস্বীকার করেন, তারা হয়তো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। নতুবা শানে নুযূল থেকে মুক্ত হয়ে কুরআনে কারীমের বক্তব্যকে নিজের মনগড়া অর্থ প্রকাশ করার জন্যই এমনটি করে থাকেন।

اسباب نزول اور شاہ ولی اللہ:

আসবাবে নুযূল ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর আলোচনা ঃ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.).তাঁর রচিত "আল-ফাউযুল কাবীর" গ্রন্থে শানে নুযূলের উপর যে গবেষণালব্ধ আলোচনা করেছেন, কিছু লোক সেটাকে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা এ কথা বলতে শুরু করেছে যে, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযূলের কোনো গুরুত্ব দেননি।

অথবা এর গুরুত্বকে ছোট করে দেখেছেন। মূলত এ ধারণাটি হযরত শাহ সাহেবের আলোচনার মর্মার্থ না বুঝারই ফল। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, জমহুর উলামায়ে কেরামের ন্যায় তিনিও পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের জন্য শানে নুযূলের জ্ঞানার্জনকে আবশ্যকীয় শর্তরূপে নির্ধারণ করেছেন। দেখুন তিনি তার গ্রন্থে যে কথা লিখেছেন তা তুলে ধরা হলো।

ويذكر المحدثون فى ذيل الأيات القرأن كثيرا من الاشياء ليس من قسم سبب النزول فى الحقيقة. مثل: استشهاد الصحابة رضى الله عنهم فى مناظراتهم باية. أو تلاوته صلى الله عليه وسلم أية الاستشهاد فى كلامه الشريف او رواية حديث وافق الاية فى اصل الغرض او تعين موضع النزول. أو تعيين اسماء المذكورين بطريق الايهام. اوبطريق التلفظ بكلمة قرانية. او فضل سود وايات من القران. اوصورة امتثاله صلى الله عليه وسلم بامرمن اوامر القران ونحوذلك. وليس شئى من هذا فى الحقيقة من اسباب النزول.[118]

(এর সারকথা হচ্ছে, তাফসীরের কিতাবগুলো মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো একটি আয়াতের আওতায় অনেকসময় অনেকগুলো বর্ণনা উল্লেখ করেন, যেগুলো শানে নুযূলের সাথে সম্পর্ক রাখে না)। বরং সে বর্ণনাগুলোতে নিম্নোক্ত বিবয়গুলো শামিল হয়ে যায়।

১. অনেক সময় কোনো সাহাবী কোনো ইলমী আলোচনায় আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছিলেন। অথচ মুফাসসিরগণ সামান্য সামঞ্জস্যের কারণে এই আয়াতের অধীনে ওই ঘটনাটি উল্লেখ করে থাকেন।

---

[118] الفوزالكبير:ص:২৩২২ مكتبة فخرية: مرادباد১৩৫৮هج.

সূচিপত্র

২. কোন কোন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়াতটিকে কোনো ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। মুফাসসিরগণ সেটাকেও এই আয়াতের অধীনে উল্লেখ করে থাকেন।

৩. যে কথা কোনো আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, হুবহু সে কথাটিই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো হাদীসেও বর্ণণা করেছেন, তাফসীরের কিতাবগুলোতে সেই হাদীসটিকেও এই আয়াতের অধীনে উল্লেখ করে দেওয়া হয়।

৪. কখনো কখনো মুফাসসিরগণ কোনো 'রেওয়ায়েত' শুধু এ কথা বলার জন্য উল্লেখ করেন যে, আয়াতটি কোন্ স্থানে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে এই রেওয়ায়েতটিও তাফসীরের আওতায় অর্ন্তভূক্ত হয়ে থাকে।

৫. কোনো কোনো সময় পবিত্র কুরআনুল কারীম কিছু লোকের নাম উল্লেখ না করে অনির্দিষ্টভাবে তাদের আলোচনা করে। মুফাসসিরগণ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে তাদের নাম নির্দিষ্ট করে থাকেন।

৬. কখনো কখনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এটা জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের অমুক শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কি? তাফসীরের কিতাবে এ ধরনের রেওয়ায়েতও সন্নিবেশ করা হয়ে থাকে।

৭. কোনো কোনো হাদীসে এবং আয়াতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরা বা আয়াতের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এ সমস্ত রেওয়ায়েতকেও সংশ্লিষ্ট স্থানে সংযোজন করে থাকেন।

৮. কোনো স্থানে এমন হাদীসও তাফসীর হিসেবে বর্ণিত আছে যেগুলো দ্বারা জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনের এই হুকুমের উপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিভাবে আমল করেছেন।

হযরত শাহ সাহেব বলেন, এ জাতীয় বর্ণনাগুলো না তো শানে নুযূলের বর্ণনার অর্ন্তভূক্ত আর না তাফসীরকারদের জন্য এ সকল বর্ণনার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল থাকা আবশ্যক।

অবশ্য যেসব বর্ণনা বাস্তবেই আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া মুফাসসীরদের জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং এগুলো জানা ব্যতীত ইলমে তাফসীরে হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই। যেমন, সামনে গিয়ে শাহ সাহেব নিজেই বলেন–

انما شرط المفسر امران: الاول ماتعرض به الايات من القصص فلا يتيسر فهم الايماء بتلك الايات الابمعرفة تلك القصص. والثانى مايخصص العام منالقصة اومثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر فلا يتيسر فهم المقصود من الايات بدونها[11]

---

[11] الفوزالكبير:ص:২৩.

'মুফাসসিরের জন্য দু'টি বিষয়ে অবগত হওয়া আবশ্যকীয় শর্ত। প্রথমতঃ আয়াতে ইঙ্গিত বহনকারী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ অজ্ঞাত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আয়াতের ইশারা-ইঙ্গিত বুঝা সহজ হবে না। দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো ঘটনায় কখনো কখনো শব্দের ব্যাপকতা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু শানে নুযূলের মাধ্যমে শব্দটি ব্যাপকতা থেকে বিশেষরূপ ধারণ করে। অথবা বাক্যের বাহ্যিক মর্ম এক রকম থাকে কিন্তু শানে নুযূল অন্য কোনো মর্ম নির্ধারণ করে, এ জাতীয় রেওয়ায়েতসমূহের জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বুঝা ও তাফসীর করা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব ব্যাপার।'[১২০]

শানে নুযূল এবং আহকামের উমূম ও খুসূস ঃ سبب نزول اور احکام کا عموم و خصوص

পবিত্র কুরআনুল কারীমের যে সকল আয়াত কোনো শানে নুযূল বা ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, সেগুলো উমূম-খুসূস বা ব্যাপকত্ব ও বিশেষত্বের দিক থেকে ৪প্রকার।

১. ওই সকল আয়াত যেগুলোতে নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াতের বিষয়বস্তু ওই ব্যক্তির সাথেই সংশ্লিষ্ট। এ সব আয়াতের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত যে, ওই আয়াতের বিষয়বস্তু সেই বিশেষ ব্যক্তির সাথেই সীমিত থাকবে। অন্য কোনো ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন– পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত।'[১২১]

এই আয়াতের শানে নুযূল একেবারে প্রসিদ্ধ যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কুরাইশের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন আবু লাহাব বলেছিল–

تبا لك ألهذا دعوتنا

'ধ্বংস হোক তোমার, এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছ?'

এর উপর ভিত্তি করে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।[১২২] এতে বিশেষভাবে আবু লাহাবের নাম নিয়ে তার ধ্বংসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধমকি ও ধ্বংস তার জন্যই প্রযোজ্য হবে।

২. ওই সকল আয়াত যেগুলোতে বিশেষ কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায় কিংবা কোনো বস্তুর নাম উল্লেখ না করে বরং তার কিছু গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে

---

১২০. আল-ফাউযুল কাবীর : পৃঃ ২৩

১২১. সূরা লাহাব : ১

১২২. আসবাবুন নুযূল : পৃঃ ২৬১

এবং সে গুণাবলীর উপর কোনো হুকুম লাগানো হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত আছে যে, এর দ্বারা অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কিংবা নির্দিষ্ট বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারেও উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, এ আয়াতের বিষয়বস্তু বা হুকুম বিশেষভাবে শুধু ওই ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কিংবা বস্তুর সাথেই নির্দিষ্ট থাকবে, যা কুরআনের উদ্দেশ্য। অন্য কেউ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। চাই এসব গুণাবলী তার মাঝেও পাওয়া যায়। যেমন সূরা 'লাইল'-এ ইরশাদ হয়েছে–

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ

'অর্থ্যাৎ তা থেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশে নিজের ধন-সম্পদ দান করে'[১২৩]

সমস্ত উলামায়ে কেরাম এই ব্যাপারে একমত যে, এই আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যিনি দরিদ্র দাস-দাসীদের ক্রয় করে করে মুক্ত করে দিতেন।[১২৪] এখানে যদিও হযরত আবু বকরের নাম উল্লেখ নেই। তবে গুণাবলী তাঁরই বর্ণনা করা হয়েছে। আর হাদীসের বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। কাজেই এই আয়াতের ফযীলত প্রাপ্ত একমাত্র তিনিই। অন্য কেউ তাতে শরীক নেই। এ জন্য ইমাম রাযি (রহ.) এই আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সমগ্র মানব জাতির মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। কেননা, এই আয়াতে তাঁকে...(অধিকতর মুত্তাকী) বলা হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।'[১২৫]

সর্বোপরি এখানে হযরত আবু বকরের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এতদসত্ত্বেও সমস্ত মুফাসসিরীন এই আয়াতকে বিশেষ করে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। কারণ এখানে ব্যাপকতা থেকে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নির্দিষ্ট করার পক্ষে দু'টি দলীল রয়েছে। একটি হলো الاتقى শব্দের আলিফ-লামটি আহ্দী। অর্থাৎ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

---

১২৩. সূরা লাইল : ১৭-১৮

১২৪. প্রাগুক্ত : পৃ: ২৫৫

১২৫. সূরা হুযুরাত : ১৩

দ্বিতীয় দলীল হলো, হাদীসের বর্ণনা তাঁকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

অতএব, যদি অন্য কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে তার বিনিময়ে সে যত সওয়াবের অধিকারীই হোক না কেন, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত মর্যাদার অধিকারী সে কখনো হতে পারবে না।[১২৬]

৩. ওই সকল আয়াত যা বিশেষ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। তবে এর শব্দগুলো আম বা ব্যাপক। আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী কিংবা বহিরাগত কোনো দলীলের মাধ্যমে এটা জানা যায় যে, আয়াতের হুকুম শুধু এ ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ জাতীয় সকল ঘটনার ক্ষেত্রেই এই হুকুম প্রযোজ্য।

এ প্রকারের আয়াতের ব্যাপারেও সকল উলামা একমত যে, এ ক্ষেত্রে আয়াতের হুকুম তার শব্দগুলোর অনুগামী হয়ে ব্যাপকত্ব লাভ করবে। এর হুকুম শুধু শানে নুযূলের ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। যেমন, সূরা 'মুজাদালাহ'-এর প্রাথমিক আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে এ কথা সাব্যস্ত আছে যে, হযরত খাওলা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ব্যাপারে তা নাযিল হয়েছিল।[১২৭] তাঁর স্বামী তাঁকে বলেছিল

انت علی کظهر امی (তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো)। কিন্তু আয়াতে যে শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে এ কথার বর্ণনা দেয় যে, এ হুকুম শুধু খাওলা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক ওই ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যে তার স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করবে অর্থাৎ উপরেল্লিখিত শব্দগুলো বলবে। (এ সমস্ত লোকদের উপর ওয়াজিব হলো, তারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পূর্বেই একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা ষাটটি রোযা রাখবে কিংবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে।)

৪. ওই সকল আয়াত যা বিশেষ কোনো ঘটনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তার শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে আম বা ব্যাপক। আর আয়াত বা বহিরাগত কোনো দলীলের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না যে, এই আয়াতের হুকুম বা বিষয়বস্তু এ আয়াতের সাথেই নির্দিষ্ট নাকি এ ধরনের প্রত্যেক ঘটনার সাথে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য? এ ধরনের আয়াতের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মাঝে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো বক্তব্য হলো, এ ক্ষেত্রে আয়াতকে শুধু তার শানে নুযূলের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

---

[১২৬]. এ প্রকারের আরো বিশদ বর্ণনা ও উদাহরণের জন্য দেখুন, "আল-ইতকান" : ১/৩০

[১২৭]. আসবাবুন নুযূল : পৃ: ২৩১

কিন্তু জমহুর উলামা ও ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। তাঁদের বক্তব্য হলো, এ ক্ষেত্রে শানে নুযূলের বিশেষ ঘটনার পরিবর্তে শব্দমালা উমূম বা ব্যাপকত্ব ধর্তব্য হবে এবং আয়াতের শব্দমালার ব্যাপকতা যেসব ক্ষেত্রকে শামিল করবে, সেসব ক্ষেত্রেও আয়াতের হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। এই মূলনীতির জন্যই উসূলে ফিকাহ ও উসূলে তাফসীর বিশারদদের নিকট এ কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ আছে–

العبرة لعموم اللفظ، لا بخصوص السبب

'শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য, শানে নুযূলের নির্দিষ্ট ঘটনা নয়।'

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই মতপার্থক্য আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। অন্যথায় কার্যক্ষেত্রে এর বিশেষ কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ যারা কুরআনের আয়াতকে তার শানে নুযূলের ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ রাখেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁরাও এই আয়াতের হুকুমকে এ ধরনের অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে থাকেন। তবে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, জমহুর উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী হুকুমের উৎস হচ্ছে, ওই আয়াত। আর এরা অন্য কোনো শরঈ দলীল যেমন– হাদীস, ইজমা বা কেয়াসকে হুকুমের উৎস হিসেবে নিরূপণ করেছেন।

পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেখুন। সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে–

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

'যদি সে (ঋণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।'[১২৮]

এই আয়াতের শানে নুযূল হলো, বনূ আমর ইবনে উমাইরের কাছ থেকে বনূ মুগীরা কিছু ঋণ গ্রহণ করে ছিল। যখন শরীয়তে সুদ হারাম হয়ে গেল, তখন বনূ আমর বনূ মুগীরাকে বলল, আমরা সুদ তো বর্জন করেছি, তবে আসল ঋণ ফেরত দাও। তখন বনূ মুগীরা বলল, এ মুহূর্তে আমরা চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত। তাই আমাদেরকে কিছু অবকাশ দাও। বনূ আমর অবকাশ দিতে সম্মত হলো না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১২৯]

এই আয়াতের বিধান এখন সর্বসম্মতিক্রমে আম বা ব্যাপক। প্রত্যেক ঋণদাতার জন্য উত্তম হলো, ঋণগ্রহীতাকে অসচ্ছল দেখলে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, জমহুর উলামায়ে কেরামের

---

১২৮. সূরা বাকারা : ২৮০

১২৯. আসবাবুন নুযূল : ৫১

মতে হুকুমের এই ব্যাপকতা এ আয়াত থেকেই সাব্যস্ত হয়েছে। আর যারা আয়াতকে শানে নুযূলের ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ রাখেন তারা বলেন, আয়াতের বিধান তো শুধু বনূ আমরের জন্য ছিল। তবে অন্যান্য মুসলমানদের জন্য এ হুকুম ওই সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলোতে ঋণদাতাকে অবকাশ দেওয়ার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কার্যত এ মতবিরোধের মধ্যে বিশেষ কোনো ফলাফল পরিলক্ষিত হয় না।[১৩০]

শানে নুযূল ও বর্ণনার বিভিন্নতা : سبب نزول اور اختلاف روایات

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযূলের ধারাবাহিকতায় অনেক বড় একটি সমস্যা হলো এই যে, একই আয়াতের শানে নুযূল একাধিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি তাফসীরের মূলনীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়, সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন প্রকার সংশয় ও সন্দেহে নিপতিত হয়ে যায়। তাই এখানে বর্ণনার বিভিন্নতার হাকীকত সম্পর্কে জেনে নেওয়া অপরিহার্য। উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিকাহ-এর বিশেষজ্ঞগণ এ ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলোর সারাংশ পেশ করা হচ্ছে।

১. সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-গণ এবং তাবেঈন (রহ.)-গণের অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা কোনো আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে نزلت الآية في كذا (এ আয়াত অমুক মাসআলা বা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে) শব্দগুলো ব্যবহার করতেন। এই শব্দগুলো দ্বারা বাহ্যিকভাবে এ ধোঁকার সম্ভাবনা দেখা দেয় যে, এর দ্বারা তাঁরা আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করছেন। অথচ এর দ্বারা সব সময় শানে নুযূল বর্ণনা করা তাঁদের উদ্দেশ্য হয় না। বরং অধিকাংশ সময় এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, অমুক মাসআলা বা অমুক বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।[১৩১] যেমন, সূরা নিসায় মহান আল্লাহ পাক ইবলীসের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন–

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

'আর আমি তাদেরকে (মানুষকে) নির্দেশ প্রদান করব। ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করে দিবে।'[১৩২]

---

১৩০. এখানে এই মাসআলাটির সারকথা অত্যন্ত সংক্ষেপে পেশ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল্লামা যারকাশী (রহ.) রচিত "আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন" : ১/২৪, আল-ইতকান : ১/৩০, মানাহিলুল ইরফান : ১/১১৮-১২৭।

১৩১. ইবনে তাইমিয়া ঃ মুকাদ্দামাহ ফী উসূলিস তাফসীর, পৃঃ ৯।

১৩২. সূরা নিসা : ১১৯

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ইকরিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সহ অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি খাসী (অণ্ডকোষ বের করে ফেলা) হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৩৩] কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে কেউ অণ্ড-কোষ ছেঁটে খাসী হয়ে গেছে এবং ওই ঘটনাটি এই আয়াতের শানে নুযূল হয়েছে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'খাসী হওয়া' ওই সকল শয়তানী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে শয়তান (আল্লাহসৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন) করার দ্বারা ব্যক্ত করেছে। অন্যথায় এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, "আল্লাহ সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন" কেবল খাসী হওয়ার মধ্যেই সীমিত। বরং এর আরো অনেক প্রকার হতে পারে। যেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-গণ এবং তাবেঈন (রহ.)-গণের বর্ণনাশৈলী দ্বারা শানে নুযূলের ক্ষেত্রে দু'টি মূলনীতি স্পষ্ট হয়ে যায়।

(ক) যদি কোনো একটি আয়াতের তাফসীরে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি বর্ণনা থাকে এবং উভয় বর্ণনায় نزلت الآية في كذا (এ আয়াত অমুক মাসআলা বা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে) শব্দমালা ব্যবহার করা হয়, তবে বর্ণনা দু'টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে বাস্তবে এই দুই বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। বরং নিজ নিজ স্থানে উভয় বর্ণনাই সঠিক। কারণ উভয় বর্ণনার মধ্য হতে কোনোটি দ্বারা এই উদ্দেশ্য হয় না যে, এ ব্যাপারটি আয়াতের শানে নুযূল। বরং উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, এ বিষয়টি আয়াতের মর্মার্থ ও হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নিজের নেক বান্দাদের আলোচনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেছেন–

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

'তাঁদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে।'[১৩৪]

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টা নফল পড়ে কাটাতেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, যারা ইশার নামাযের অপেক্ষায় জাগ্রত

---

১৩৩. সুয়ূতী : আদ দুররুল মানসুর : ২/২২৩

১৩৪. সূরা সাজদা : ১৬

থাকতেন। আবার কোনো কোনোসাহাবায়ে কেরামের মতে এই আয়াত তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে।[১৩৫]

এখন বাহ্যিকভাবে এই মতানৈক্য শানে নুযূলের মতানৈক্য বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো আয়াতের বিভিন্ন উদ্দেশ্য। আর এ সবগুলো নেক আমল আয়াতের মর্মার্থের মধ্যে শামিল।

(খ) দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, যদি কোনো একটি আয়াতের তাফসীরে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়, একটির মধ্যে نزلت الأية فى كذا শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় সরাসরি কোনো ঘটনাকে আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে শানে নুযূলের জন্য এখানে দ্বিতীয় বর্ণনাটিই নির্ভরশীল। আর প্রথম বর্ণনা যেহেতু সরাসরি শানে নুযূলের মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই সেটাকে বর্ণনাকারীর নিজের ইজতেহাদ বা গবেষণা হিসেবে প্রযোজ্য হবে। যেমন, পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে–

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ফসলক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা যেভাবে চাও তোমাদের ফসলক্ষেত্রে গমন কর।'[১৩৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বক্তব্য উদ্ধৃতি করে বলেন–

انزلت فى اتيان النساء فى ادبارهن

(স্ত্রীর সাথে পশ্চাৎপথে সহবাস করার ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে)[১০৮] অথচ হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-সহ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণ সুস্পষ্টভাবে এর শানে নুযূল বর্ণনা করেন এই যে, ইহুদীদের ধারণা ছিল, 'যদি পশ্চাৎ দিক থেকে সম্মুখের অংশেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয় তাহলে সন্তান বিকলাঙ্গ হয়।' তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে নির্মূলের উদ্দ্যেশে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। আর এই আয়াত এটা স্পষ্ট করে দিল যে, সহবাসের স্থান ওই একটাই। অর্থাৎ সম্মুখের অংশ, যে পথ দিয়ে সন্তান জন্ম নেয়। তবে পথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।[১৩৭]

---

১৩৫. তাফসীরে জামেউল বয়ান : ২১/৫৭-৫৮ ইবনে জারীর

১৩৬. সূরা বাকারা : ২২৩

১০৮. আল-ইতকান : ১/৩২

১৩৭. আসবাবুন নুযূল : পৃ: ৪০-৪১

উপরোক্ত দু'টি বর্ণনার মাঝে যেহেতু হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বর্ণনা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট, তাই এটাই অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বক্তব্যকে তাঁর ইজতেহাদ ও গবেষণা বলে গণ্য করা হবে।[১৩৮]

আর মূলত এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই আয়াতের আলোকে পশ্চাৎ পথ দিয়ে সহবাস জায়েয। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এই আয়াতের আলোকে নারীদের সাথে সমকামিতা হারাম প্রমাণিত হয়।[১৩৯] (কেননা, এ আয়াতে নারীদেরকে (ফসলক্ষেত্র তথা সন্তান জন্মের মাধ্যম বলা হয়েছে। আর সমকামিতার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।)

২. শানে নুযূল নির্ধারণ করার দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, যদি দু'টি বর্ণনার মধ্য হতে একটি বর্ণনার সনদ সহীহ হয় আর দ্বিতীয় বর্ণনার সনদ দুর্বল বা অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে সহীহ সনদ সম্বলিত বর্ণনাটি গ্রহণ করে দুর্বল সনদ সম্বলিত বর্ণনাটি বর্জন করতে হবে। যেমন, সূরা দোহা'র প্রাথমিক আয়াতগুলো-

وَالضُّحَىٰ (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (3)

'সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম,তোমার প্রতিপালক তোমাকে কক্ষনো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও নন।'[১৪০]

এই আয়াতের শানে নুযূলে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.) হযরত জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন যে, একবার শারীরিক কোনো কষ্টের কারণে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বা দু'রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পারেন নি। এতে এক কাফের মহিলা এই অপবাদ দিল যে, (নাঊযুবিল্লাহ) 'মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে।'এ ঘটনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।

অপর দিকে ইমাম তবারানী (রহ.) ও ইবনে আবী শাইবা (রহ.) হাফস ইবনে মাইসারা (রহ.)-এর খালা হযরত খাওলা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, একবার একটি কুকুর ছানা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে এসে খাটের নিচে বসে গেল এবং ওখানেই সেটা মরে গেল। এ ঘটনার পর চার দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি কোনো ওহী নাযিল হয়নি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূলের ঘরে এমন কি ঘটনা ঘটল যে, জিবরাঈল আমার

---

১৩৮. আল-ইতকান : ১/৩২

১৩৯. মানাহিলুল ইরফান : ১/১০৮

১৪০. সূরা দুহা : ১-৩

সূচিপত্র

নিকট আসছে না? আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার উচিত ঝাড়ু দিয়ে ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। আমি যখন ঝাড়ু দিয়ে খাটের নিচ পরিষ্কার করছিলাম তখনই ঝাড়ুর আঘাতে কুকুর ছানাটি বেরিয়ে এল। এ ঘটনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে এই দ্বিতীয় বর্ণনাটি সনদের বিচারে সহীহ নয়। যেমন, হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) বলেন,'এর সনদে কোনো কোনো বর্ণনাকারী মাজহুল (অপরিচিত)। কাজেই গ্রহণযোগ্য শানে নুযূল সেটাই, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।'[১৪১]

৩. কখনো কখনো শানে নুযূলের ব্যাপারে বর্ণিত দু'টি বর্ণনার উভয়টিই সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। তবে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে। যেমন, একটির সনদ অপরটির তুলনায় অধিক শক্তিশালী। অথবা একটি রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী এমন যে ঘটনাস্থলে সরাসরি উপস্থিত ছিল। আর অন্য রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। এ ক্ষেত্রে ওই রেওয়ায়েতকেই গ্রহণ করা হবে যে রেওয়ায়েতের পক্ষে অগ্রাধিকারের কারণ পাওয়া যাবে। এ প্রকারের উদাহরণ হলো সূরা 'ইসরা'র নিম্নোক্ত আয়াত–

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)

'তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল,'রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (একটি হুকুম)। এ সম্পর্কে তোমাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।'[১৪২]

এই আয়াতের শানে নুযূলের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মদীনা তাইয়্যেবায় রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি খেজুর গাছের একটি ডালে ভর দিয়ে চলছিলেন। চলার এক পর্যায়ে আমরা ইহুদীদের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। তখন তারা পরস্পর বলছিল, আমাদের উচিত তাঁকে অর্থাৎ, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কিছু প্রশ্ন করা। এভাবে তারা এসে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আমাদেরকে "রূহ" সম্পর্কে অবগত করুন। এতে তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ পর মাথা মুবারক তুললেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন–

---

১৪১. আল-ইতকান : ১/৩৩

১৪২. সূরা ইসরা : ৮৫

সূচিপত্র

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, একবার মক্কার কুরাইশরা ইহুদীদেরকে বলল, আমাদেরকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যা আমরা তাঁকে [রাসূল (সা.) কে] জিজ্ঞেস করবো। তখন ইহুদীরা বলল, তাঁকে গিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

প্রথম রেওয়ায়েতটি থেকে জানা যায় যে, আয়াতটি পবিত্র মদীনা নগরীতে নাযিল হয়েছে। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, আয়াতটি মক্কা নগরীতে নাযিল হয়েছে। সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় রেওয়ায়েতই বিশুদ্ধ। কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েতে অগ্রাধিকারের এই কারণ বিদ্যমান রয়েছে যে, বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নিজে সশরীরে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর রেওয়ায়েত থেকে এটা বুঝা যায় না যে, তিনি স্বয়ং এ ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর রেওয়ায়েতই অগ্রাধিকার পাবে।[১৪৩]

৪. কখনো কখনো একই আয়াতের একাধিক শানে নুযূলও থাকে। অর্থাৎ পরপর এক জাতীয় কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হবার পর আয়াত নাযিল হয়। এখন কোনো বর্ণনাকারী এই আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে একটি ঘটনাকে উল্লেখ করেন। আবার অন্য বর্ণনাকারী অন্য কোনো ঘটনা উল্লেখ করেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, উভয় ঘটনাই আয়াতের শানে নুযূল।

যেমন, সূরা 'নূর'-এ লে'আনের আয়াতের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হেলাল ইবনে উমাইয়্যা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এসে নিজের স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয়–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الخ....[১৪৪]

অপর দিকে ইমাম বুখারী (রহ.)-ই হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ থেকে অন্য একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হযরত উওয়াইমির (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ প্রশ্ন করিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে

---

১৪৩. আল-ইতকান : ১/৩৪

১৪৪. সূরা নূর, আয়াত নং-৬

সূচিপত্র

অপর কোনো ব্যক্তির সাথে সঙ্গম অবস্থায় দেখতে পায় এবং সে তাকে হত্যা করে, তাহলে কি তার কাছ থেকে পূর্ণ কেসাস বা বদলা নেওয়া হবে? এ ধরনের ব্যক্তিকে কি করা উচিত? এর উত্তরে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর এই আয়াতটিই তিনি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন।

তৃতীয় আরেকটি রেওয়ায়েত 'মুসনাদে বায্যার'-এ হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ ধরনের প্রশ্ন-উত্তর হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাঝে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।[১৪৫]

প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই তিনটি ঘটনাই আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। তাই এর প্রত্যেকটিকেই আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে ধরা যায়।

৫. আবার কখনো কখনো এর বিপরীত এ রকম হয়ে থাকে যে, ঘটনা একটিই ঘটে থাকে, কিন্তু এর আওতায় কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এখন একজন বর্ণনাকারী এই ঘটনাকে উল্লেখ করে বলেন যে, এ ঘটনা প্রসঙ্গে অমুক আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আবার অন্য এক বর্ণনাকারী এই ঘটনাটি বর্ণনা করে অন্য এক আয়াত উদ্ধৃত করেন। এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে বর্ণনা দু'টিতে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বাস্তবে কোনো বৈপরীত্য নেই।

এ প্রকারের উদাহরণ হলো, ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম হাকেম (রহ.) হযরত উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, আমি একবার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হিজরত ইত্যাদি প্রসঙ্গে নারীদের কোনো আলোচনা আমি কুরআনে কারীমে দেখতে পাই না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে–

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ"

'তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক কোন কর্মীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না।'[১৪৬]

আবার হাকেম (রহ.) উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, আমি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পবিত্র কুরআনুল কারীমে কেবল পুরুষদেরই আলোচনা করা হয়েছে। নারীদের কোনো আলোচনা নেই। তখন এ প্রসঙ্গে

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

---

১৪৫. আল-ইতকান : ১/৩৪

১৪৬. সূরা আলে-ইমরান : ১৯৫

সূচিপত্র

আয়াতটি নাযিল হয়[১৪৭] এবং এটাও নাযিল হয়–[১৪৮]

أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى

পুনঃ অবতরণ ও এর তাৎপর্য ঃ تکرار نزول اور اس کی حقیقت

৬. কখনো কখনো এমন হয় যে, একই আয়াত একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েছে। আর প্রতিবারেই এর অবতরণ নতুন নতুন কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে হয়েছে। এখন একজন বর্ণনাকারী এক অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আবার অন্য একজন আরেক অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এতে বাহ্যিকভাবে বৈপরীত্য মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এ দুই বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ দু'টি ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে।

যেমন, ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন নবী কারীম (সা)-এর প্রিয় চাচা আবু তালেব মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন নবী কারীম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কাছে গিয়ে বললেন, চাচাজান! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে দিন। তারপর আমি মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করব।

তখন সেখানে আবু জাহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়্যাও উপস্থিত ছিল। তারা আবু তালেবকে ঈমানের প্রতি ঝুঁকতে দেখে সাথে সাথে বলে উঠল, "তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যেতে চাচ্ছ?" এরপর তারা দু'জন এ কথাটি বারবার আওড়াতে থাকল। এমনকি এক পর্যায়ে আবু তালেব বলে উঠল, "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই আছি।" রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বললেন, আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে এ থেকে বারণ না করা হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

'নবী এবং মুমিনদের জন্য এই এখতেয়ার নেই যে, তাঁরা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামরা করবে।'

অন্যদিকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত আলী থেকে 'হাসান' সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরিক পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তোমার পিতা-মাতা তো মুশরিক ছিল। কিভাবে তুমি তাদের জন্য দুআ করছ? সে জবাবে বলল,

---

১৪৭. এখানে সূরা আহযাবের ৩৫ নং আয়াত। এখানে অনেক নেক আমলের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে পুরুষ ও নারীর নাম উল্লেখ করেছেন।

১৪৮. আল-ইতকান : ১/৩৫

সূচিপত্র

হযরত ইবরাহীম (আ.)ও তো নিজের পিতার জন্য দু'আ করেছিলেন। অথচ তাঁর পিতা ছিল একজন মুশরিক। আমি এ কথা.রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে।

তৃতীয়তঃ ইমাম হাকেম প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। একটি কবরের পাশে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুআ করলেন এবং কান্না করলেন। তারপর বললেন, যে কবরের পাশে আমি বসে ছিলাম তা ছিল আমার আম্মাজানের কবর। আমি আমার পালনকর্তার কাছে তাঁর জন্য দুআ করার অনুমতি প্রার্থনা করলাম, কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। তখন এই আয়াত নাযিল হলো–

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُو

এখানে তিনটি ঘটনার সবটিকেই একই আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন–উপরোক্ত তিনটি ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি পৃথক পৃথকভাবে তিনবার নাযিল হয়।[১৪৯]

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন একটি আয়াত একবার নাযিল হয়েছে এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে আর রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামেরও তা আত্মস্থ হয়ে গেছে তাহলে দ্বিতীয় বার আবার এবং তৃতীয় বার আবার তা নাযিল করার ফায়দা কি?

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এ প্রশ্নের চমৎকার একটি জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, تكرار نزول "তাকরারে নুযূল" বা পুনঃ অবতরণের উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে মূলতঃ অবতরণ একবারই হয়েছে। কিন্তু যে ঘটনা প্রসঙ্গে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন সে ধরনেরই আরেকটি ঘটনা ঘটে তখন ওই আয়াতটি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র

---

১৪৯. উক্ত উদাহরণটি "আল-ইতকান" : ১/৩৪ থেকে উদ্ধৃত। কিন্তু এটা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তিনটি রেওয়ায়েতকেই সঠিক বলে ধরে নেওয়া হবে। অন্যথায় তৃতীয় রেওয়ায়েতটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কথাবার্তা রয়েছে। যেমন, হাফেয যাহাবী (রহ.) এ ব্যাপারে লিখেন, قلت ايوب بن باني ضعفه ابن معين [আমি বলছি, ইবনে মাঈন আইউব ইবনে হানীকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করেছেন।' (মুসতাদরাক : ২/৩৩৬) আইউব ইবনে হানী সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) জারাহ্ ও তা'দলী বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত উদ্ধৃত করেছেন। (তাহ্যীবুত তাহ্যীব : ১/৪১৪) তাই এই রেওয়ায়েতকে যেমন বানোয়াট বলা যায় না আবার তেমনি এর উপর আকীদা সংক্রান্ত কোনো মাসআলার ভিত্তিও রচনা করা যায় না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশাল একটি দল বহু দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলেন যে, রাসূলে কারীম (সা.)-এর পিতা-মাতা মিল্লাতে ইবরাহীমির উপর ইন্তেকাল করার ভিত্তিতে তাঁরা মুমিন ছিলেন। স্বয়ং আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন।

সূচিপত্র

অন্তরে দ্বিতীয়বার আবার ঢেলে দেওয়া হয়। যার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, এই ঘটনায়ও ওই আয়াত দ্বারা দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

অন্তরের মধ্যে এই আয়াতটা পুনঃ উপস্থিত হওয়াটা যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে তাই এটা ওই قلبي و "অন্তকরণ" যা ওহীরই একটি প্রকার। যার বিস্তারিত আলোচনা 'ওহীর পদ্ধতি' শিরোনামে অতিবাহিত হয়েছে। এভাবে নাযিল হওয়াটাকে মুফাসসিরীনে কেরাম "নুযূলে মুকাররাব" বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। যতবার তা মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে, ততবারই তা অবতীর্ণ হয়েছে বলে ধরা হয়।[১৫০]

শানে নুযূলের রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে যেসব বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় উপরোল্লিখিত ৬টি মূলনীতির অনুসরণে সাধারণত সহজেই তা বিদূরিত হয়ে যায়। আর এই ৬টি মূলনীতি আত্মস্থ থাকলে রেওয়ায়েতের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে মুশকিল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবতারণা হয় না।

১৫০. আল ফাউযুল কাবীর : পৃ: ২২

সূচিপত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল কুরআনের সাত হরফ ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ এ পরিচ্ছেদটি আল-কোরআনের একটি দুর্বোধ্য আলোচনা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইলমী অংশ, যাতে আহলে ইলমদের জন্য ইলমী খোরাক রয়েছে, মা'শা'আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, "নিশ্চয় এ কুরআনকে সাত হরফে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং সেগুলোর মধ্য হতে তোমাদের সহজ-সাধ্য পন্থা অবলম্বন করে পাঠ কর!" উল্লেখিত হাদীসটি উল্লেখের পর সংকলক বলেন, "এই হাদীসে কুরআনুল কারীম সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়া দ্বারা কী উদ্যেশ্য? এটি অসংখ্য মতামতের কেন্দ্রবৃন্দু এবং বিশাল পরিধি বিশিষ্ট একটি আলোচনা।

আর নিঃসন্দেহে তা কুরআনুল কারীমের দুর্বোধ্য ও কঠিনতম আলোচনার একটি" অতঃপর উল্লেখিত হাদীসটি "মুতাওয়াতিরুল মা'না" হওয়া এবং বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করেন। আরও আলোচনা করেন সাত হরফের ব্যাপারে বিভিন্নজনের মতামত নিয়ে। যেমনঃ কারও মতে তা দ্বারা সাত কেরাতকে বুঝানো হয়েছে, আবার কারও মতে তা দ্বারা কেরাতগুলোকেই বুঝানো হয়েছে, তবে সাত সংখ্যাটি "সাত"ই বুঝানো উদ্যেশ্য নয়, বরং এখানে আধিক্যতা উদ্যেশ্য, অন্য কারও মতে তাদ্বারা আরবের সাত কবীলার ভাষারীতিকে বুঝানো হয়েছে, কিন্তু এসমস্ত মতামত উল্লেখ করার পর তিনি সেগুলোকে যুক্তিনিভরভাবে খণ্ডণ করেন। কেননা কোরআন শুধু কুরাইশী ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং "সাত হরফ" "সাত কেরাত" থেকে ভিন্ন কিছু। ৪র্থ নং মতটি ইমাম তহাভীর, যা "সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যায় কিয়াসের নিকটবর্তী, অর্থাৎ মুরাদেফ(সমার্থক) শব্দ উদ্যেশ্য। তবে ৫ম মতটির প্রতি তিনি গ্রহণযোগ্যতার মতামত ব্যক্ত করেন এবং তা ইমাম মালেকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন। এ মতের বক্তব্য হল, উক্ত সাত হরফ দ্বারা নিম্নোক্ত সাতটি বিষয়ের অনুমতি বুঝায়, যথাঃ ১। একবচন ও বহুবচন, ২। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, ৩। এরাব, ৪। সরফী অবস্থা, ৫। নাহভী হরফ, ৬। হরফ بدلية এর ইখতেলাফ ৭। সুরভঙ্গিমার

বিভিন্নতা, যেমন তাখফীফ, তাফখীম ইমালা, মদ্দ, কসর, ইজহার, ইদগাম ইত্যাদি।

অতঃপর উল্লেখিত শেষোক্ত মতটিকে অগ্রাধিকারদানের কারণসমূহ উল্লেখসহ তার উপর আপত্তিকারীদের জবাব প্রদান, সাত হরফ দ্বারা সহজতার ক্ষেত্র, তা কি এখনও সংরক্ষিত আছে কি-না তার ব্যাপারে মতামত পেশ করণ, পর্যালোচনা এবং সর্বোত্তম বক্তব্য যা সংরক্ষিত হওয়া বুঝায়, পাশাপাশি শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে দলীলাদি উপস্থাপন এবং আপত্তির জবাব প্রদান, কুরায়শী ভাষায় কোরআন লিপিবদ্ধ করার কারণ, মুরাদেফ শব্দ দ্বারা তেলায়াত করার মাসআলা, হযরত ইবনে মাসউদের মাসহাফ এবং "কোরআন কারীম অবিকৃত থাকার ওয়াদা সত্ত্বেও সাত হরফ নিয়ে এতবড় ইখতিলাফ কীভাবে হয়ে গেল" সেই ভ্রান্তিটির সংশয়-নিরসন নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

আল কুরআনের সাত হরফ ঃ قرآن کے سات حروف

একটি সহীহ হাদীসে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

'নিশ্চয় এ কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব সেগুলোর মধ্য হতে তোমরা সহজ-সাধ্য পন্থা অবলম্বন করে পাঠ কর।'[১৫১]

এই হাদীসে কুরআনুল কারীম সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়া দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এসম্পর্কে অনেকগুলো মতামত পাওয়া যায় এবং এটি একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয় এবং বিশাল পরিধি বিশিষ্ট একটি আলোচনা। এবং নিঃসন্দেহে তা কুরআনুল কারীমের দুর্বোধ্য ও কঠিনতম আলোচনার একটি। এখানে সম্পূর্ণ আলোচনা উদ্ধৃত করা তো মুশকিল। তথাপিও সংশ্লিষ্ট কিছু অত্যাবশকীয় বিষয়গুলো পেশ করছি।

আমাদের উল্লেখিত যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে অর্থের দিক থেকে তা মুতাওয়াতির। (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সনদ সূত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত) যেমন, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম হাদীসটির তাওয়াতুর হবার বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন। হাদীস ও কেরাতের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা ইবনে জাযারী (রহ.) বলেন, আমি একটি পৃথক গ্রন্থে এই হাদীসের সবগুলো সূত্র একত্রিত করেছি। আর সেগুলোর আলোকে হাদীসটি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিযাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), মুআয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবু বাক্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), সামুরা ইবনে জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), ওমর ইবনে আবী সালামা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবু জাহাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবু তালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও উম্মে আইউব আনসারীয়্যাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত।[১৫২]

এতদ্ব্যতীত বহু মুহাদ্দিস এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন যে, সম্মানিত ব্যক্তিগণ দাঁড়িয়ে যান, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এই হাদীস শুনেছেন, "পবিত্র কুরআনুল কারীম সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। যার প্রত্যেকটিই

---

১৫১. সহীহ বুখারী, কাসতালানীসহ ৭/৪৫৩ 'ফাযায়িলে কুরআন' অধ্যায়।

১৫২. আন-নাশরু ফী কিরাআতিল আশ্‌র ১/২১ ইবনে জাযারী ঃ

সূচিপত্র

নিরাময়কারী ও যথেষ্ট।" তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণের বিরাট একটি দল দাঁড়িয়ে গেলেন, যাদের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব ছিল।[১৫৩]

সাত হরফের মর্মার্থ ঃ حروف سبعہ کا مفہوم

পূর্বের হাদীসে সর্ব প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, সাত হরফে কুরআন নাযিল হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত ও চিন্তাধারার কঠিন মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আল্লামা ইবনে আরাবী (রহ.) এ ব্যাপারে পঁয়ত্রিশটি মতামত একত্রিত করেছেন।[১৫৪] সেগুলোর মধ্য হতে কিছু প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মতামত এখানে পেশ করা হলো–

১. এপ্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সুপ্রসিদ্ধ সাতজন ক্বারীগণের সাত ক্বেরাত। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল ও ভ্রান্ত। কেননা, তাওয়াতুর বা নিরবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় সাব্যস্ত কেরাতসমূহ শুধু 'সাত ক্বেরাতে'র মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আরো বহু ক্বেরাত তাওয়াতুর সূত্রে সাব্যস্ত আছে। এ সাত ক্বেরাত তো শুধু এ কারণেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আল্লামা ইবনে মুজাহিদ (রহ.) একটি গ্রন্থে ওই সাতজন কারীর ক্বেরাতকে একত্রিত করেছেন। এর দ্বারা তাঁর না এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্বেরাতকে সাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা আর না তিনি ওই সাত হরফের ব্যাখ্যা এই 'সাত ক্বেরাত' দ্বারা করেছেন। যেমন, এর বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

২. উপরোক্ত আলোচনা ভিত্তিতেই কোনো কোনো আলেম এই খেয়াল ব্যক্ত করেছেন যে, 'হরফ' দ্বারা সকল কেরাতকে বুঝানো হয়েছে। তবে 'সাত' শব্দ দ্বারা বিশেষ করে 'সাত সংখ্যা'কেই বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা সংখ্যার আধিক্য বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় 'সাত' শব্দটি অধিকাংশ সময় কোনো বস্তুর শুধু সংখ্যাধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানেও হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কুরআনুল কারীম শুধু সাত হরফের উপরই নাযিল হয়েছে। বরং উদ্দেশ্য হলো, কুরআনুল কারীম বহু পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কেরামের মধ্য হতে কাযি আয়ায (রহ.)-এর অভিমত এটাই।[১৫৫] আর শেষ যুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)ও এই মতের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।[১৫৬] কিন্তু উক্ত মতটি এ জন্য সঠিক বলে মনে হয় না যে, বুখারী ও মুসলিম-এর এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী বর্ণিত আছে যে–

---

১৫৩. প্রাগুক্ত

১৫৪. যারকাশী ঃ আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন : ১/২১২

১৫৫. আওজাযুল মাসালিক : ২/৩৫৬ সাহারানপুর।

১৫৬. মুসাফ্ফা শরহে মুয়াত্তা : ১/১৮৭ দিল্লী ১২৯৩ হিজরী।

সূচিপত্র

"أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

'জিবরাঈল আমাকে এক হরফের উপর কুরআনুল কারীম আবৃত্তি করিয়েছেন। ফলে আমি তার শরণাপন্ন হলাম এবং আমি হরফ বৃদ্ধির আবেদন করলাম। তিনি বৃদ্ধি করতে থাকলেন। এমনকি তা সাত হরফে গিয়ে পৌছেছে।'[১৫৭]

এর বিস্তারিত আলোচনা সহীহ মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এভাবে বর্ণিত. আছে যে, প্রিয় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনূ গিফারের কূপের কাছে ছিলেন--

فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ . وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ . فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ . ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ . ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ . إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

'অতঃপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জিবরাঈল (আ.) আসলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনার (গোটা) উম্মত যেন এক হরফের উপরই কুরআনুল কারীম পাঠ করে। এতে তিনি বললেন, আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মাগফিরাত প্রার্থনা করছি। আমার উম্মত এতে সক্ষম হবে না। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট আসলেন। বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনার (গোটা) উম্মত যেন দুই হরফের উপর কুরআনুল কারীম পাঠ করে। এতে তিনি বললেন, আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মাগফিরাত প্রার্থনা করছি। আমার উম্মত এতে সক্ষম হবে না।

আবার তৃতীয়বার জিবরাঈল (আ.) আসলেন এবং বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনার (গোটা) উম্মত যেন তিন হরফের উপর কুরআনুল কারীম পাঠ করে। এতে তিনি বললেন, আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মাগফিরাত প্রার্থনা করছি। আমার উম্মত সক্ষম হবে না। চতুর্থবার আবার জিবরাঈল (আ.) আসলেন এবং বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনার (গোটা) উম্মত যেন সাত

---

[১৫৭]. মানাহিলুল ইরফান : ১/১৩৩।

সূচিপত্র

হরফের উপর কুরআনুল কারীম পাঠ করে। অতঃপর তারা যে হরফের উপরই পাঠ করবে, তাদের ক্বেরাত সঠিক হবে।'[১৫৮]

এই রেওয়ায়েতগুলোর পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, এখানে 'সাত' শব্দটি দ্বারা সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়নি; বরং নির্দিষ্ট করে 'সাত' সংখ্যাটিকেই বুঝানো হয়েছে। তাই এই হাদীসগুলোর আলোকে উপরোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এমনকি জমহুর উলামায়ে কেরামও এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. আবার অন্যান্য উলামায়ে কেরাম, যেমন হাফেয ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)সহ আরো অনেকে বলেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসে সাত হরফ দ্বারা আরব জাতির গোত্রগত সাত ভাষাকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু আরব জাতি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের ভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও অন্য গোত্রের সাথে ভাষার সামান্য গরমিল ছিল।

আর এই গরমিলটা এমন, যেমন জাতীয় একটি ভাষায় আঞ্চলিকতার কারণে তারতম্য সৃষ্টি হয়। তাই মহান আল্লাহ পাক ওই বিভিন্ন গোত্রের সহজ-সাধ্যের জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীমকে সাত ভাষায় নাযিল করেছেন। যেন প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ গোত্রীয় ভাষায় পাঠ করতে পারে।[১৫৯]

অধিকন্তু ইমাম আবু হাতেম সাজিসতানী (রহ.) ওই গোত্রগুলোর নামও নির্ধারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, কুরআনুল কারীম এই সাত গোত্রের সাত ভাষা অনুযায়ী নাযিল হয়েছে। গোত্র সাতটি হচ্ছে– (১) কুরাইশ। (২) হুযাইল। (৩) তাইমুর-রুবাব। (৪) আজ্‌দ। (৫) রবী'আ। (৬) হাওয়াজিন। (৭) সা'দ বিন বকর।

আর হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.) কারো কারো থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করে উপরোক্ত গোত্রগুলোর স্থলে নিম্নোক্ত গোত্রগুলো উল্লেখ করেছেন– (১) হুযাইল। (২) কেনানা। (৩) কায়েস। (৪) যব্বা। (৫) তাইমুর রুবাব। (৬) আসাদ ইবনে খুযাইমাহ। (৭) কুরাইশ।[১৬০]

তথাপিও বহু মুহাক্কিক আলেম যেমন, হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.), আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) ও আল্লামা ইবনে জাযারীসহ আরো অনেকে উক্ত মতটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথমতঃ এ জন্য যে, আরবের গোত্র তো অনেকগুলো ছিল। এর মধ্য হতে শুধু এ সাতটিকেই বেছে নেওয়ার হেতু কি?

---

১৫৮. মানাহিলুল ইরফান : ১/১৩৩

১৫৯. তাফসীরে ইবনে জারীর ১/১৫

১৬০. ফাতহুল বারী : ৯/২২, রুহুল মাআনী : ১/২১

সূচিপত্র

দ্বিতীয়তঃ হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত হিশাম ইবনে হাকীম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাঝে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত নিয়ে একসময় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল।

যার বিস্তারিত বর্ণনা সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তাঁরা উভয়েই ছিলেন কুরাইশ বংশের। আর নবী কারীম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও তাঁদের উভয়ের ক্বেরাতকে সত্যায়ন করেছেন এবং পবিত্র কুরআনুল কারীম সাত হরফে নাযিল হওয়াকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদি সাত হরফ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সাতটি গোত্রের ভাষাকেই বুঝানো হতো, তাহলে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত হিশাম ইবনে হাকীম (রা.)-এর মাঝে মতবিরোধের কোনো কারণই থাকতে পারে না। কারণ উভয়ই তো কুরাইশী ছিলেন।[১৬১]

যদিও আল্লামা আলূসী (রহ.) এর জবাব দিয়েছেন যে, 'হতে পারে তাঁদের দু'জনের মধ্য হতে যে কোনো একজনকে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশ ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় কুরআন পড়িয়েছেন।'[১৬২]

তবে এই জবাবটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ বিভিন্ন ভাষায় কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা যেন নিজ ভাষা অনুযায়ী সহজ-সাধ্যভাবে পড়তে পারে। তাই এ বিষয়টা রিসালাতের হেকমত থেকে অনেক দূরবর্তী মনে হয় যে, এক কুরাইশীকে অন্য ভাষায় পবিত্র কুরআনুল কারীম পড়ানো হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত ইমাম তাহাভী (রহ.) এর উপর আপত্তি করেন যে, যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, সাত হরফ দ্বারা সাত গোত্রের ভাষাকে বুঝানো হয়েছে তাহলে তা ওই আয়াতের বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে যাতে বলা হয়েছে–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

'আমি যখনই কোনো রাসূল প্রেরণ করি, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষায়ই প্রেরণ করি।' আর এ কথা তো সবারই জানা যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশী ছিলেন। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম শুধু কুরাইশী ভাষায়ই নাযিল হয়েছে।[১৬৩]

ইমাম তাহাভী (রহ.)-এর এ মতামতের সমর্থন এভাবেও হয় যে, যে সময়ে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দ্বিতীয়বার কুরআনুল কারীম সংকলনের ইচ্ছা করলেন

---

১৬১. আন নশরু ফিল কিরআতিল আশ্‌র : ১/২৫ ফাতহুল বারী : ৯/২৩

১৬২. রুহুল মাআনী : ১/২১

১৬৩. আত্ তাহাভী : মুশকিলুল আসার: ৪/১৮৫-১৮৬

সূচিপত্র

এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাহেব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতকে কুরআনের কপি তৈরির নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁদেরকে তিনি এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন–

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ. فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ

'পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যখন যায়েদ ইবনে সাবিত এবং তোমাদের মাঝে পরস্পর কোনো মতানৈক্য দেখা দিবে, তখন তোমরা কুরাইশদের ভাষায় লিখবে। কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই নাযিল হয়েছে।'[১৬৪]

দেখুন এখানে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, কুরআন শুধু কুরাইশদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, কুরআন যখন কুরাইশদের ভাষায়ই নাযিল হয়েছে, তাহলে এই 'মতানৈক্য' সৃষ্টি হবার উদ্দেশ্য কি? এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। এতদ্ব্যতীত এ বক্তব্যের প্রবক্তাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, "সাত হরফ" এবং "সাত ক্বেরাত" দু'টো পৃথক পৃথক বিষয়। কেরাতের মতানৈক্য, যা আজও বিদ্যমান সেটা শুধু এক হরফ অর্থাৎ কুরাইশদের ভাষায়ই। আর বাকি হরফগুলো হয়তো রহিত হয়েছে অথবা কল্যাণের জন্য মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যান্য আপত্তি ছাড়াও একটি আপত্তি এই হয় যে, গোটা হাদীসের ভান্ডারে কোথাও এ কথার প্রমাণ মিলে না যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতে দুই ধরনের মতানৈক্য ছিল।

একটি হচ্ছে "সাত হরফ" আরেকটি হচ্ছে "ক্বেরাত।" বরং হাদীসের ভান্ডারে যেখানেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দগত কোনো মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে শুধু "আহরুফ" (হরফ সমূহের)-এর মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথকভাবে "ক্বেরাতের" কোনো মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এসব কারণের ভিত্তিতে এ মতামতটিও অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে হয়।

৪. চতুর্থমত হলো, ইমাম তহাভী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারীম তো শুধু কুরাইশদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে যেহেতু আরববাসী বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে বিভক্ত ছিল তাই প্রত্যেকের জন্য এই একটি মাত্র ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করা বেশ কঠিন ছিল। তাই ইসলামের শুরু লগ্নে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা অনুযায়ী সমার্থবোধক শব্দ দ্বারা কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে। এমনকি যেসব লোকের জন্য কুরআনুল কারীমের মূল শব্দ

---

১৬৪. সহীহ বুখারী : (কুরআন সংকলন অধ্যায়)

সূচিপত্র

দ্বারা তেলাওয়াত করা মুশকিল ছিল তাদের জন্য স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমার্থবোধক শব্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেগুলো দ্বারা তারা তেলাওয়াত করতে পারে।

আর এই সমার্থবোধক শব্দগুলো কুরাইশদের ভাষা ও অন্যদের ভাষা থেকে চয়ন করা হয়েছিল। আর এগুলো এমন ছিল যে, تَعَالَ এর স্থলে هَلُمَّ অথবা اَقْبِلْ. يا কিংবা اُدْنُ يا পড়া হতো। সবগুলোর অর্থ একই থাকতো। কিন্তু এই অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, যখন সমস্ত আরববাসী কুরআনী ভাষায় পুরোপুরি অভ্যস্ত ছিল না। অতঃপর ধীরে ধীরে যখন কুরআনী ভাষার পরিধি বৃদ্ধি পেল তখন আরববাসী সে ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং তাদের জন্য কুরআনের মূল ভাষায় তেলাওয়াত করা সহজ হয়ে গেল। ওই সময়ে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের পূর্বে রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পবিত্র কুরআনুল কারীমের আখেরী দাওর করেন, যেটাকে 'عرضه اخيره' বলা হয়। তখনই সমার্থবোধক শব্দ দ্বারা কুরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। কেবল ওই পদ্ধতিই বাকি থাকে, যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছিল।[১৬৫]

এ মত অনুযায়ী "সাত হরফ" বিশিষ্ট হাদীসটি ওই যুগের সাথে সম্পৃক্ত, যখন তেলাওয়াতের মধ্যে সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহারের অনুমতি ছিল। আর এটার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম "সাত হরফে" অবতীর্ণ হয়েছে। বরং উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম এমন প্রশস্ত-তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে যে, নির্দিষ্ট একটা জামানা পর্যন্ত তা সাত হরফে পাঠ করা যেত। আবার "সাত হরফ" দ্বারাও এ উদ্দেশ্য নয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রত্যেক শব্দের সাতটি সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহারের অনুমতি আছে। বরং উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বেশির থেকে বেশি যতগুলো সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা যায়, সেগুলোর সংখ্যা হচ্ছে, "সাত"।

আবার সে অনুমতির অর্থ এটাও ছিল না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মর্জি মতো শব্দ প্রয়োগ করবে। বরং পরিবর্তিত শব্দগুলোও স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমনভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, যা তার জন্য সহজ-সাধ্য ছিল। সুতরাং শুধু ওই সকল সমার্থবোধক শব্দের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত ছিল।[১৬৬]

---

১৬৫. মুশকিলুল আসার : [তহাভী] : ৪/১৮৬-১৯১।

১৬৬. ফাতহুল বারী : ৯/২২-২৩

সূচিপত্র

ইমাম তহাভী (রহ.) ছাড়াও হযরত সুফিয়ান ইবনে উআইনা (রহ.), ইবনে ওয়াহাব (রহ.) এবং হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.)ও এ মতকে গ্রহণ করেছেন। বরং হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.) তো এ মতকে অধিকাংশ আলেমের দিকে সম্বন্ধ করেছেন।[১৬৭]

পেছনের সমস্ত মতামতের মধ্যে এই মতটি কেয়াসের অধিক নিকটবর্তী। এ মতের প্রবক্তাগণ নিজেদের স্বপক্ষে দলীল দিতে গিয়ে মুসনাদে আহমদের সেই রেওয়ায়েতকে উল্লেখ করেন, যা হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত-

أن جبريل قال: يا محمد، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال :على حرفين، حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف. فقال: كلها شاف كاف. ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة.أو آية رحمة بآية عذاب. كقولك: وتعالى وأَقْبِل وهلُم واذهب وأسرع وعَجِّل

অর্থ্যাৎ 'হযরত জিবরাঈল (আ.) (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে) বললেন, হে মুহাম্মাদ! কুরআনুল কারীমকে এক হরফের উপর পাঠ করুন। মীকাঈল (আ.) (রাসূল কে) বললেন, এর সাথে আরও (হরফ) সংযোজন করুন। ফলে তিনি সংযোজন করলেন। আর এভাবে তা সাথে গিয়ে পৌছল। জিবরাঈল (আ.) বললেন, এর প্রত্যেকটিই নিরাময়কারী, যথেষ্ট। যতক্ষণ না আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াতের সাথে এবং রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সাথে মিশ্রিত করবে। এটা এমন হবে যে, আপনি اَقْبِلْ (আসা)-কে هَلُمَّ -اِذْهَبْ- اسْرِعْ ও عَجِّلْ শব্দ দ্বারা আদায় করবেন।'[১৬৮]

এই মত ও বক্তব্যের উপর আর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তারপরেও এর মাঝেও একটি সমস্যা থেকে যায়। আর তা হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন যে ক্বেরাত আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় চলে আসছে, এ বক্তব্য অনুযায়ী সেগুলোর কোনো অবস্থান পরিষ্কার হয় না। যদি সে কেরাতগুলোকে "সাত হরফ" না বলে অন্য কিছু বলা হয় তাহলে তার স্বপক্ষে দলীল পেশ করা উচিত।

কিন্তু হাদীসের বিশাল ভান্ডারে "আহরুফ"-এর মতানৈক্য ব্যতীত পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দগত অন্য কোনো মতানৈক্যের আলোচনা পাওয়া যায় না। তাহলে নিজের পক্ষ থেকে এটা কি করে বলা যেতে পারে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে "আহরুফে সাবআ" ছাড়া অন্য আরেক প্রকার মতানৈক্যও ছিল! এ বক্তব্যের প্রবক্তাদের কাছ থেকে এ সমস্যার এমন কোনো সমাধান আমি পাইনি, যা মেনে নেওয়া যায়।

---

১৬৭. আয-যুরকানী : শরহে মুয়াত্তা : ২/১১

১৬৮. রেওয়ায়েতটি ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ নির্ভরযোগ্য। (আওজাযুল মাসালিক : ২/৩৫৭)

সূচিপত্র

"সাত হরফ"-এর সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা : سبعة احرف کی راجح ترین تشریح

লেখক বলেন আমার দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের "সাত হরফ"-এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো, যা হাদীসে "হরফের বিভিন্নতা" দ্বারা "ক্বেরাতের বিভিন্নতা"কে বুঝানো হয়েছে। আর "সাত হরফ" দ্বারা "ক্বেরাতের বিভিন্নতার" সাত প্রকারকে বুঝানো হয়েছে। তাইতো ক্বেরাতগুলো যদিও সাতের চেয়ে বেশি, কিন্তু ওই ক্বেরাতগুলোর মাঝে যে মতানৈক্য পাওয়া যায় তা সাত প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। (সেই সাত প্রকার ক্বেরাতের ব্যাখ্যা সামনে আসবে।)

আমাদের ইলম অনুযায়ী এই মত ও বক্তব্য মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কেরামের মাঝে সর্বপ্রথম ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট পাওয়া যায়। বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, আল্লামা নিযামুদ্দীন কিম্মী নিশাপুরী (রহ.) স্বীয় তাফসীর "গারায়িবুল কুরআন"-এ লিখেন, "আহরুফে সাব্আ'-এর ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.)-এর এ মাযহাব উদ্ধৃত আছে যে, এর দ্বারা কেরাতের নিম্নলিখিত সাত প্রকারের বিভিন্নতা ও মতানৈক্যকে বুঝানো হয়েছে।

১. একবচন ও বহুবচনের মতানৈক্য। এক কেরাতে শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে আবার অন্য কেরাতে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– كَلِمَاتُ رَبِّكَ এবং وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

২. পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের বিভিন্নতা। এক কেরাতে পুংলিঙ্গ এবং অন্য কেরাতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– لَا يُقْبَلُ এবং لَا تُقْبَلُ।

৩. এ'রাব তথা কারক ও বিভক্তি চিহ্নের বিভিন্নতা। কোনো ক্বেরাতে যের আবার কোনো কেরাতে যবর থাকে। যেমন– هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ এবং غَيْرَ اللهِ

৪. 'সরফী অবস্থা' বা শব্দ-প্রকরণের বিভিন্নতা। যেমন, এক ক্বেরাতে يَعْرِشُونَ এবং অন্য কেরাতে يُعَرِّشُونَ

৫. 'নাহভী হরফ' বা অব্যয় পদের বিভিন্নতা। যেমন, এক কেরাতে لٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ এবং অন্য কেরাতে لٰكِنِ الشَّيَاطِينُ।

৬. হরফ পরিবর্তনশীল শব্দের বিভিন্নতা। যেমন, يَعْلَمُونَ ও تَعْلَمُونَ এবং نُنْشِزُهَا এবং نَنْشُرُهَا।

৭. সুর-ভঙ্গিমার বিভিন্নতা। যেমন, তাখফীফ (জযম দিয়ে পড়া), তাফখীম (শেষ অক্ষর ছেড়ে দেওয়া), ইমালা (যের ও যবরের মধ্যবর্তী উচ্চারণ করা), মদ্দ (দীর্ঘস্বর করা) ক্বসর (হ্রস্ব স্বর করা), ইজহার (স্পষ্ট করা), ইদগাম (মিলিয়ে পড়া) ইত্যাদি।[১৬৯]

---

১৬৯. 'গারায়েবুল কুরআন ওয়া রাগায়েবুল ফুরকান' : টীকা ইবনে জারীর : ১/২১ মিসর। নিশাপুরী

অতঃপর আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.), ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.), কাযী আবু বকর আত্-তাইয়্যেব বাকিল্লানী (রহ.) এবং মুহাক্কিক ইবনুল জাযারী (রহ.) এই মতকে গ্রহণ করেছেন।[১৭০]

ক্বেরাতের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম, মুহাক্কিক ইবনুল জাযারী (রহ.) নিজের এই মত পেশ করার পূর্বে লিখেন–

"আমি এই হাদীসের ব্যাপারে অসংখ্য প্রশ্নে জর্জরিত ছিলাম। ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় এর উপর গভীর চিন্তা-গবেষণায় লিপ্ত ছিলাম। এমনকি মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমার জন্য এর এমন ব্যাখ্যা বিকশিত করে দিয়েছেন, যা সঠিক ও নির্ভুল হবে ইনশাআল্লাহ।"[১৭১]

এপ্রসঙ্গে সকল উলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, হাদীসে বর্ণিত "সাত হরফ" দ্বারা কেরাতের বিভিন্নতার সাত প্রকারকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সেই ক্বেরাতগুলোর প্রকারসমূহ নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হলো, প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী সেই ক্বেরাত বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এর মধ্যে যার অনুসন্ধান সবচেয়ে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ ও সর্বগ্রহণযোগ্য তিনি হলেন, ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.)। তিনি বলেন, ক্বেরাতের বিভিন্নতা (নিম্নোক্ত) সাত প্রকারেই সীমাবদ্ধ।

১. নাম বা বিশেষ্য শব্দসমূহের বিভিন্নতা। একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের বিভিন্নতা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। (এর উদাহরণ হলো- وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ যা অন্য কেরাতে وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ বলা হয়েছে।)

২. ফেয়েল বা ক্রিয়াপদের পার্থক্য ও বিভিন্নতা। কোনো ক্বেরাতে মাযি (অতীতকাল বাচক ক্রিয়া), কোনোটিতে মুযারি' (বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল বাচক ক্রিয়া আবার কোনোটিতে আমর (নির্দেশ বাচক ক্রিয়া) ব্যবহৃত হয়েছে। (এর উদাহরণ হলো, এক কেরাতে رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا। অন্য এক কেরাতে এর স্থলে রয়েছে– رَبُّنَا بَعَّدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا।)

৩. এ'রাব তথা কারক ও বিভক্তি চিহ্নের বিভিন্নতা। বিভিন্ন ক্বেরাতে বিভিন্ন কারক চিহ্ন বা হরকত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। (এর উদাহরণ হলো, ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ এবং ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ আর لَا يُضَارُّ كَاتِبٌ এবং وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ।)

---

১৭০. আবুল ফযল রাযি এবং ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর মতামত : ফাতহুল বারী : ৯/২৫-২৬, ইতকান : ১/৪৭ গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আর কাযী ইবনে তাইয়্যেব (রহ.)-এর মত তাফসীরে কুরতুবী ১/৫৮-এ দেখা যেতে পারে। ইবনে কুতাইবা,

১৭১. আন্ নশরু ফী কিরাতিল আশর : ১/২৬

সূচিপত্র

৪. শব্দের কম-বেশি হওয়ার বিভিন্নতা। এক ক্বেরাতে কোনো শব্দ কম আছে। আর অন্য ক্বেরাতে বেশি আছে। (যেমন, এক ক্বেরাতে وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى আছে। আর অন্য ক্বেরাতে وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى আছে। এখানে وَمَا خَلَقَ শব্দের উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে এক ক্বেরাতে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ আছে। আর অন্য ক্বেরাতে আছে تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ।

৫. তাক্‌দীম-তা'খীর বা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শব্দের বিভিন্নতা। এক ক্বেরাতে কোনো শব্দকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অন্য ক্বেরাতে সেটাকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। (যেমন, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ এবং وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

৬. বদল বা শব্দ পরিবর্তনের বিভিন্নতা। এক ক্বেরাতে এক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য ক্বেরাতে তার স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (যেমন, طَلْحٍ এবং [طَلْعٍ। আর فَتَبَيَّنُوا এবং فَتَثَبَّتُوا। অনুরূপভাবে نَنْشُرُهَا এবং نُنْشِزُهَا।

৭. উচ্চারনের সুর-ভঙ্গিমার বিভিন্নতা। যার মধ্যে তাফখীম, তারকীক, এমালা, কসর, মদ্দ, হাম্‌র, ইজহার ও ইত্যাদির বিভিন্নতা শামিল রয়েছে।[১৭২] (যেমন, موسى শব্দটিকে এক ক্বেরাতে এমালা করে مُوسَىٰ এর ন্যায় পড়া হয়। আবার অন্য ক্বেরাতে এমালা ব্যতীত।)

আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.), আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.) এবং কাযী আবু তাইয়্যেব (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত বিভিন্নতার কারণগুলোও এ বক্তব্যের সাথে মিলে যায়। তবে ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.)-এর অনুসন্ধান এ জন্য এত বেশি সমৃদ্ধ বলে মনে হয় যে, এতে কোনো প্রকারের মতানৈক্য ও বিভিন্নতা বাদ পড়েনি। পক্ষান্তরে বাকি তিনজন গবেষকের বর্ণিত কারণগুলোর মধ্যে শেষ প্রকার অর্থাৎ সুর-ভঙ্গিমার বিভিন্নতা বর্ণনা করা হয়নি। আর ইমাম মালেক (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত বিভিন্নতার মধ্যে সুর-ভঙ্গিমার বিভিন্নতার বর্ণনা তো করা হয়েছে, কিন্তু শব্দের কম-বেশি, পূর্ববর্তী-পরবর্তী এবং শব্দ পরিবর্তনের বিভিন্নতার বিষয়গুলো পুরোপুরি ফুটে উঠেনি।

এর বিপরীত ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.) অনুসন্ধান ও গবেষণায় এ সকল প্রকার বিভিন্নতা ও মতানৈক্য সুস্পষ্টভাবে গ্রন্থিত হয়েছে। বিদগ্ধ গবেষক ইবনুল জাযারী (রহ.) যিনি ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণা করার পর 'সাত হরফ'কে ক্বেরাতের সাত প্রকারের বিভিন্নতার উপর প্রয়োগ করেছেন, তিনিও ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.)-এর বক্তব্য বড় সম্মানের সাথে উদ্ধৃত করেছেন এবং এর উপর কোনো প্রকার অভিযোগ-আপত্তি

---

[১৭২]. ফাতহুল বারী : ৯/২৪

উত্থাপন করেননি। বরং তাঁর আলোচনার সমষ্টি থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবুল ফযল (রহ.)-এর অনুসন্ধান তাঁর নিজের অনুসন্ধানের চেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে।[১৭৩]

এতদ্ব্যতীত হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.)-এর বক্তব্য থেকেও অনুভূত হয় যে, তিনি উক্ত তিনটি বক্তব্যের মাঝে ইমাম রাযি (রহ.)-এর অনুসন্ধান ও বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা তিনি আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেন–هذا وجه حسن (এটা সর্বোত্তম ব্যাখ্যা)। অতঃপর ইমাম আবুল ফযল (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত সাত প্রকার বিভিন্নতা বর্ণনা করার পর লিখেন–قلت وقد اخذ كلام ابن قتيبة ونقحه

'আমার ধারণা, তিনি (ইমাম আবুল ফযল রাযি) ইবনে কুতাইবা (রহ.)-এর বক্তব্যকে গ্রহণ করে এটাকে সুসজ্জিত করেছেন।'[১৭৪]

শেষ যুগে শায়েখ আবদুল আযীম যুরকানী (রহ.)ও তাঁর এই বক্তব্যকে গ্রহণ করে এটাকে শক্তিশালী করার জন্য সংশ্লিষ্ট দলীল-প্রমাণাদি পেশ করেছেন।[১৭৫]

যা হোক, অনুসন্ধানের প্রকারের মাঝে মতানৈক্য আছে ঠিক; তবে ইমাম মালেক (রহ.), আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.), ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.), মুহাক্কিক ইবনুল জাযারী (রহ.) এবং কাযী বাকিল্লানী (রহ.) সকলেই এ কথার উপর এক মত যে, হাদীসে বর্ণিত "সাত হরফ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ক্বেরাতের ওই বিভিন্নতা যা সাত প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তবে আমার দৃষ্টিতে "সাত হরফ"-এর এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে উত্তম। হাদীসের মর্মার্থ এটাই বুঝে আসে যে, কুরআনুল কারীমের শব্দগুলো বিভিন্নভাবে পড়া যেতে পারে। আর এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো ধরন হিসেবে সাত প্রকার। ওই সাত প্রকারের নির্ধারণ যেহেতু কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না, তাই নিশ্চিতভাবে কোনো অনুসন্ধানের ব্যাপারে এ কথা বলা যাবে না যে, হাদীসে এ প্রকারকেই বুঝানো হয়েছে। তবে বাহ্যিকভাবে ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.)-এর অনুসন্ধান ও গবেষণা অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কারণ বর্তমান কালের ক্বেরাতের সবগুলো প্রকার এতে শামিল রয়েছে।

এই বক্তব্যটির অগ্রাধিকারের কারণসমূহ : اس قول کی وجوہ ترجیح

سبعة احرف "সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হাদীস, তাফসীর ও উলূমুল কুরআনের কিতাবসমূহে যতগুলো ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিতে

---

১৭৩. আন্ নশরু ফী কিরাতিল আশর : ১/২৭-২৮

১৭৪. ফাতহুল বারী : ৯/২৪

১৭৫. মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন : ১/১৫৪-১৫৬

সূচিপত্র

সেগুলোর মধ্যে এ বক্তব্যটি (সাত হরফ দ্বারা ক্বেরাতের বিভিন্নতার সাত প্রকারকে বুঝানো) সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, নির্ভরযোগ্য এবং মেনে নেওয়ার মতো। তার কারণগুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

১. এ বক্তব্য অনুযায়ী "হরফ" এবং "ক্বেরাত" পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় সাব্যস্ত করার প্রয়োজন পড়ে না। আল্লামা ইবনে জারীর (রহ.) ও ইমাম তহাভী (রহ.)-এর বক্তব্যসমূহে একটি যৌথ সমস্যা রয়েছে যে, এতে এ কথা মেনে নিতে হয় যে, কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের মাঝে দু'ধরনের মতানৈক্য রয়েছে। একটি হলো, হরফের মতানৈক্য। আরেকটি হলো, ক্বেরাতের মতানৈক্য হরফের মতানৈক্য তো এখন বিলুপ্ত আর ক্বেরাতের মতানৈক্য এখনো বহাল রয়েছে। অথচ হাদীসের এত বিশাল ভান্ডারে এমন একটি দুর্বল হাদীসও পাওয়া যায় না, যার দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, "হরফ" এবং "কেরাত" দু'টি পৃথক পৃথক বিষয়। হাদীসের ভান্ডারে শুধুমাত্র হরফের মতানৈক্যের কথা পাওয়া যায়। আর এর জন্যই অধিকহারে "ক্বেরাত" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "ক্বেরাত" যদি ওই "হরফগুলো" থেকে পৃথক হতো, তাহলে কোনো না কোনো হাদীসে এর প্রতি অবশ্যই ইঙ্গিত থাকত। পরিশেষে এ কথার কোন্ যুক্তি আছে যে, "হরফ"-এর মতানৈক্য সংক্রান্ত হাদীসটি প্রায় তাওয়াতুর বা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় এসে পৌঁছেছে, অথচ "ক্বেরাত"-এর পৃথক আলোচনা একটি হাদীসেও নেই? অতএব, নিজের ধারণা-প্রসূত কেয়াস দ্বারা এ কথা কিভাবে বলে দেওয়া সম্ভব যে, হরফের মতানৈক্য ও বিভিন্নতা ছাড়াও পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর মাঝে আরেক প্রকার ভিন্নতা ছিল?

উপরোল্লিখিত (ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.)-এর) বক্তব্যে এই সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। কারণ এতে "হরফ" এবং "ক্বেরাত"কে অভিন্ন প্রকার সাব্যস্ত করা হয়েছে।

২. আল্লামা ইবনে জারীর (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, সাত হরফের মধ্য হতে ছয় হরফ রহিত বা পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। একমাত্র কুরাইশী হরফই অবশিষ্ট রয়েছে। (বর্তমান কেরাত ওই কুরাইশী হরফের আদায়গত বিভিন্নতা)। এ বক্তব্যের দূর্বলতাগুলো আমরা সামনে বর্ণনা করবো। উপরোল্লিখিত শেষ বক্তব্যটিতে (অর্থাৎ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বক্তব্যটিতে) এসব নিন্দনীয় বিষয় নেই, কেননা এ বক্তব্য অনুযায়ী সাত হরফের সবগুলো আজও অবশিষ্ট ও সংরক্ষিত আছে।

৩. এই (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত) বক্তব্য অনুযায়ী কোনো প্রকার তাভীল বা জটিল ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে "সাত হরফ"-এর সঠিক অবিকৃত থাকে। পক্ষান্তরে অন্যান্য

সূচিপত্র

বক্তব্যের মাঝে হয়তো "হরফ"-এর অর্থের মধ্যে নতুবা "সাত" সংখ্যার মধ্যে তাভীল বা জটিল ব্যাখ্যা করতে হয়।

৪. "সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান এবং নববী যুগের নিকটবর্তী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম মালেক (রহ.)। আর আল্লামা নিশাপুরী (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনিও এই বক্তব্যেরই প্রবক্তা।

৫. আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.) এবং মুহাক্কিক ইবনুল জাযারী (রহ.) উভয়ে ছিলেন ইলমে কেরাতে সর্বজনস্বীকৃত ইমাম। আর তাঁরা উভয়েই এই বক্তব্যের প্রবক্তা। মুহাক্কিক ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর বক্তব্য তো পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, তিনি ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে চিন্তা-গবেষণা করার পর এই বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন।

اس قول پر وارد ہونیوالے اعتراضات اوران کا جواب

এই বক্তব্যের উপর উত্থাপিত অভিযোগ ও সেগুলোর জবাব ঃ

"সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বক্তব্যের উপর যেসব আপত্তি-অভিযোগ ও সমালোচনা উত্থাপিত হতে পারে সেগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিন।

প্রথম অভিযোগ ঃ

এর উপর প্রথম অভিযোগ করা হয়েছে যে, এ বক্তব্যে মতানৈক্য ও বিভিন্নতার যতগুলো প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে তার বেশির ভাগই "সরফী" এবং "নাহ্ভী" (শব্দ-প্রকরণ ও বাক্য-প্রকরণ)-এর প্রকারভেদের উপর ভিত্তিশীল। অথচ প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন সরফ-নাহুর এই বিষয়ভিত্তিক পরিভাষা ও প্রকারভেদ প্রচলিত ছিল না। ওই সময় অধিকাংশ মানুষ লেখা-পড়াও জানত না। এমতাবস্থায় বিভিন্নতার এই প্রকারগুলোকে "সাত হরফ" হিসেবে ধরে নেওয়াটা মুশকিল বলে মনে হয়।

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) এই আপত্তি উদ্ধৃত করার পর এর জবাব দিয়েছেন এভাবে–

ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة. لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا وإنما اطلع عليه بالاستقراء وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى

'অর্থ্যাৎ এর দ্বারা ইবনে কুতাইবা (রহ.)-এর বক্তব্যের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়াটা অপরিহার্য নয়। কেননা হতে পারে এটা কোনো ঘটনাক্রমে হয়ে

সূচিপত্র

গেছে। আর অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর পূর্বাভাব পাওয়া গেছে। আর এর মাঝে যে পরিপূর্ণ হেকমত লুকায়িত আছে তা গোপন নয়।"[১৭৬]

আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুযায়ী এই জবাবের সারাংশ হচ্ছে, এ কথাটি ঠিক যে, নববী যুগে এই পরিভাষাগুলো প্রচলিত ছিল না। আর হয়তো এ কারণেই রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। তবে এটা তো পরিষ্কার যে, এই বৈষয়িক পরিভাষাগুলো যে ভাবার্থ থেকে আহরিত, সেই ভাবার্থ তো ওই যুগেও বিদ্যমান ছিল।

আর যদি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেসব ভাবার্থের প্রতি লক্ষ্য করে বিভিন্নতার প্রকারসমূহকে "সাত"-এর মাঝে সীমাবদ্ধ করেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে? হ্যাঁ, ওই যুগে যদি বিভিন্নতার সাত প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা করা হতো তাহলে হয়তো তা সাধারণ মানুষের উপলব্ধি ঊর্ধ্বে হয়ে যেত। তাই রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বিস্তারিত বর্ণনা না করে শুধু এতটুকু বলেছেন যে, বিভিন্নতার এ প্রকারগুলো সাত প্রকারে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে যখন এ পরিভাষাগুলো প্রচলিত হয়ে গেল তখন উলামায়ে কেরাম পরিপূর্ণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্নতার এ প্রকারগুলোকে পারিভাষিক শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। আর এটা আমরা আগেই বলেছি, বিশেষ কোনো ব্যক্তির অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলা মুশকিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল। কিন্তু যখন বিভিন্ন লোকের অনুসন্ধান এটা প্রমাণ করে যে, বিভিন্নতার প্রকার মোট সাত প্রকার, তখন এ কথা নিশ্চয়তার নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, "সাত হরফ" দ্বারা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য ছিল "বিভিন্নতার সাত প্রকার।" চাই এর বিস্তারিত বর্ণনা ওই রকম না হোক, যা পরবর্তীতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে যখন "সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য অন্য কোনো প্রকার পাওয়া না যায়।

দ্বিতীয় অভিযোগ ঃ سات حروف کے ذریعہ کیا آسانی پیدا ہوئی؟ সাত হরফ দ্বারা কি সহজবোধ্যতা তৈরি হলো? ঃ

এই প্রধান্য (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত) বক্তব্যটির উপর দ্বিতীয় অভিযোগ এ হতে পারে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম তো সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। উম্মত যাতে সহজ-সাধ্যভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। আর এই সহজতা আল্লামা ইবনে জারীর (রহ.)-এর বক্তব্য অনুসারে তো বোধগম্য হয়। কেননা আরবে বিভিন্ন গোত্রের লোক ছিল। আর এক গোত্রের জন্য অন্য গোত্রের

---

[১৭৬]. ফাতহুল বারী : ৯/২৪

সূচিপত্র

ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত ছিল অত্যন্ত মুশকিল। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম রাযী (রহ.) এবং ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী সাত হরফ তো শুধু কুরাইশী ভাষার সাথেই সম্পৃক্ত। এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় না যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম যখন এক ভাষাতেই নাযিল করা উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে এতে ক্বেরাতের বিভিন্নতা অবশিষ্ট রাখার প্রয়োজনটা কি ছিল?

আর এ অভিযোগের ভিত্তি হলো এ কথার উপর যে, নবী কারীম (ﷺ) কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত হরফের যে সহজতা উম্মতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এতে আরবের গোত্রভিত্তিক ভাষার ভিন্নতা তাঁর দৃষ্টির সামনে ছিল। এ কথার উপর ভিত্তি করেই হাফেয ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) "সাত হরফ" দ্বারা আরবের "সাত ভাষা"-এর অর্থ করেছেন। অথচ এটা এমন একটা কথা যার সমর্থন কোনো হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এক হাদীসে, নবী কারীম (ﷺ) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সাত হরফের সহজ-সাধ্যতা প্রার্থনা করার সময় তাঁর লক্ষ্যবস্তু কি ছিল? ইমাম তিরমিযী (রহ.) সহীহ সনদ সূত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

'এক মৃত পাথরের নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে নবী কারীম, (ﷺ)-এর সাক্ষাত হলো। তখন তিনি জিবরাঈল (আ.)কে বললেন, আমি এমন এক নিরক্ষর জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি, যাদের মধ্যে রয়েছে- অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। রয়েছে– শিশু-কিশোররা। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি তাদেরকে নির্দেশ দিন, তারা যেন সাত হরফে কুরআন পাঠ করে।'[১৭৭]

তিরমিযী শরীফেরই অপর এক রেওয়ায়েতে এমন শব্দ এসেছে যে, রাসূলে আকরাম (ﷺ) জিবরাঈল (আ.) কে বলেছেন–

وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فَقَالَ: { يَا جِبْرِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ . مِنْهُمُ الْعَجُوزُ ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ . وَالْغُلَامُ . وَالْجَارِيَةُ . وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ } قَالَ: { يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ } .(2)

'অর্থাৎ আমি এমন এক নিরক্ষর জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি, যাদের মধ্যে রয়েছে– অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। রয়েছে– শিশু-কিশোররা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ও বালক-বালিকা। যারা কখনো কোনো কিতাব পড়েনি।'[১৭৮]

---

[১৭৭]. আন-নশরু ফী কেরআতিল আশর : ১/২০

[১৭৮]. তিরমিযী : ২/১৩৮, কুরআন মহল, করাচী।

সূচিপত্র

উল্লেখিত হাদীসের শব্দমালা সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, উম্মতের জন্য সাত হরফের সহজতা প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে এ কথা ছিল যে, তিনি এক নিরক্ষর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। যার মধ্যে সব ধরনের লোক রয়েছে। যদি পবিত্র কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের জন্য শুধু একটা পদ্ধতিই নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাহলে উম্মত মুশকিলে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কয়েকটি পন্থা রাখা হয়, তাহলে এটা সম্ভব যে কোনো লোক এক পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করতে সক্ষম না হলে অন্য পদ্ধতিতে সে তেলাওয়াত করবে।

এমনিভাবে তার নামায এবং তেলাওয়াতের ইবাদত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা অনেক সময় এমন হয় যে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোক বা অপড়ুয়া লোকদের যবানে একটি শব্দ আদায় করা কষ্টকর হয় এবং তাদের জন্য যের-যবরের সাধারণ পার্থক্যও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যই তিনি এই সহজতা কামনা করেছেন। যেমন, কোনো ব্যক্তি মা'রূফের সীগা আদায় করতে পারে না, তখন এর স্থলে অন্য কেরাত অনুযায়ী মাজহুলের সীগা আদায় করে নিবে। অথবা কারো জন্য একবচন শব্দ আদায় করতে কষ্ট হয়, তখন সে ওই আয়াতকেই বহুবচন শব্দ দ্বারা আদায় করবে। কারো জন্য সুর-ভঙ্গিমার কোন পদ্ধতি কষ্টকর হয়, তখন সে ভিন্নটা অবলম্বন করবে। এভাবে সমগ্র কুরআনে তার জন্য সাত প্রকারের সহজতা লাভ হয়ে যাবে।

আপনি হয়তো উপরোল্লিখিত হাদীসে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাত হরফের সহজতা প্রার্থনা করার সময় এ কথা বলেননি যে, "আমি যে জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত এবং তাদের প্রত্যেকের ভাষা আলাদা আলাদা। এ জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীমকে বিভিন্ন ভাষায় পড়ার অনুমতি দেওয়া হোক।" বরং এর উল্টো গোত্রভিত্তিক বিভিন্নতা থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে তিঁনি বয়সের তারতম্য এবং তাদের নিরক্ষর হবার বিষয়টার উপর জোর দিয়েছেন। এ বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাত হরফের সহজ-সাধ্যতার মধ্যে মূলভিত্তি গোত্রসমূহের ভাষাভিত্তিক ছিল না। বরং উম্মত অপড়ুয়া হওয়ার উপর লক্ষ্য রেখে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ সহজ-সাধ্যতা প্রদান করাই ছিল উদ্দেশ্য ছিল। যার দ্বারা উম্মতের সকল সদস্য উপকৃত হতে পারে।

তৃতীয় অভিযোগ ঃ

এই প্রধান্য (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত) বক্তব্যের প্রতি তৃতীয় অভিযোগ এই হতে পারে যে, কেরাতের বিভিন্নতার যে সাতটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, চাই সেটা ইমাম মালেক (রহ.)-এর বর্ণণা হোক অথবা আবুল ফযল রাযি (রহ.)-এর

সূচিপত্র

বক্তব্য হোক কিংবা আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.), মুহাক্কিক ইবনে জাযারী (রহ.) এবং কাযী আবুত তাইয়্যেব (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত হোক, সর্বাবস্থায় এখানে কেয়াস ও অনুমানের একটি অবকাশ থেকেই যায়। এ কারণেই তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্নতার এই সাত প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে দিয়েছেন। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল?

এর জবাব হচ্ছে, "সাত হরফ"-এর কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কোনো হাদীস বা সাহাবীর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় না। তাই এই অধ্যায়ে যত বর্ণনা রয়েছে, সবগুলোর ভাবার্থগুলো একত্রিত করে এর থেকে বিশেষ ফলাফল বের করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বক্তব্যটি বিশুদ্ধ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয়। কারণ এর উপর মৌলিক কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় না। বর্ণনাগুলোকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার পর আমাদের কাছে বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত যে, হাদীসে বর্ণিত "সাত হরফ" দ্বারা ক্বেরাতের বিভিন্নতার সাত প্রকারকে বুঝানো হয়েছে।

তবে রয়ে গেল ওই প্রকারগুলো নির্ধারণ ও নিরূপণ করার বিষয়টি। আর এ ব্যাপারে তো আমরা আগেই বলে এসেছি যে, এটা জানার জন্য গভীর অনুসন্ধানের বিকল্প কোনো পথ নেই। ইমাম আবুল ফযল রাযি (রহ.)-এর অনুসন্ধান আমাদের কাছে অবশ্যই সকল গুণাগুণসম্বলিত বলে মনে হয়। এতদসত্ত্বেও আমরা নিশ্চিতভাবে কারো অনুসন্ধানকেই বলি না যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল। কিন্তু এর দ্বারা এ মৌলিক হাকীকত প্রশ্নবিদ্ধ হয় না যে, "সাত হরফ" দ্বারা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য ছিল ক্বেরাতের বিভিন্নতার সাত প্রকার। যেগুলোর বিশদ বর্ণনার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করার না আমাদের কাছে কোনো পথ আছে আর না এর কোনো দরকার আছে।

চতুর্থ অভিযোগ ঃ

উল্লেখিত বক্তব্যের উপর চতুর্থ অভিযোগ এ হতে পারে যে, ওই বক্তব্যে "সাত হরফ" দ্বারা শব্দমালা ও সেগুলোর উচ্চারণের বিভিন্ন পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে। এতে অর্থগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। অথচ এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এর দ্বারা সাত ধরনের অর্থকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম তহাভী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বাণী রেওয়ায়েত করেন–

كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زاجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال. الخ....

'প্রথমে কিতাব এক দরজা দিয়ে এক হরফে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাত দরজা দিয়ে সাত হরফে। (সেই সাতটি হরফ হলো– ১. যাজির (কোনো কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী)। ২. আমের (কোনো বিষয়ে আদেশ প্রদানকারী)। ৩. হালাল। ৪. হারাম। ৫. মুহ্কাম (যার অর্থ জানা আছে)। ৬. মুতাশাবিহ্ যার নিশ্চিত কোনো অর্থ জানা নেই। ৭. আমছাল।

এ হাদীসের ভিত্তিতেই কোনো কোনো আলেম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সাত "হরফ'-এর তাফসীর "সাত প্রকারের অর্থ" দ্বারা করেছেন।

এর জবাব হলো, উপরোল্লিখিত রেওয়ায়েতটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম তহাভী (রহ.) এর সনদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সাথে আবু সালামার সাক্ষাতই হয়নি।[১৭৯]

এতদ্ব্যতীত পূর্ব যুগের যেসব বুযুর্গের কাছ থেকে এ ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাফেয ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) লিখেন–'এর দ্বারা "সাত হরফ" বিষয়ক হাদীসটি ব্যাখ্যা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং সাত হরফের আলোচনার বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে তাঁরা এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম এ ধরনের বিষয় দ্বারা সমৃদ্ধ।'[১৮০]

আর যারা "সাবআতু আহরুফ" বা সাত হরফের আলোচনা সম্বলিত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ ধরনেরই কথা বলেছেন, তাদের কথা যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই বাতিল। কারণ পেছনে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতি নযর বুলাতেই একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবে যে, হরফের বিভিন্নতা দ্বারা অর্থ ও বিষয়াবলীর বিভিন্নতাকে বুঝানো হয়নি। বরং আলফায বা শব্দমালার বিভিন্নতাকে বুঝানো হয়েছে। তাইতো, মুহাক্কিক আলেমগণের মধ্য হতে কেউ এ মতকে গ্রহণ করেননি; বরং এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৮১]

---

১৭৯. মুশকিলুল আসার : ৪/১৮৫

১৮০. তাফসীরে ইবনে জারীর : ১/১৫

১৮১. বিস্তারিত প্রত্যাখ্যানের জন্য দেখুন : আল-ইতকান : ১/৪৯

সূচিপত্র

حروف سبعہ اب بھی محفوظ ہیں یا متروک ہوگے؟

"হরূফে সাব'আ" এখনো সংরক্ষিত নাকি পরিত্যক্ত?

سبعة احرف বা সাত হরফের অর্থ নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, এ সাত হরফ এখনো অবশিষ্ট আছে নাকি নেই? এ বিষয়ে মুতাক্কাদিমীন বা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম থেকে তিনটি মতামত বা বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

১. প্রথম বক্তব্য হচ্ছে হাফেয ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) এবং তাঁর অনুসারীদের। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি যে, তাঁদের নিকট সাত হরফ দ্বারা আরবের গোত্রভিত্তিক সাত ভাষাকে বুঝানো হয়েছে। এ কথার উপর ভিত্তি করেই তিনি বলেন যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনুল কারীম সাত হরফে পড়া হতো। কিন্তু হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে যখন ইসলাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করল, তখন এ সাত হরফের তাৎপর্য সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে মানুষের মধ্যে বাক-বিতন্ডা শুরু হতে লাগল। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন হরফে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতো এবং একে অন্যের তেলাওয়াতকে ভুল আখ্যায়িত করত।

এ ফেতনাকে নির্মূল করার জন্য হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণের পরামর্শে গোটা উম্মতকে শুধু এক হরফ তথা কুরাইশী ভাষা অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াতের নিমিত্তে সাতটি মাসহাফ সুবিন্যস্ত করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। আর বাকি সব মাসহাফকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। যেন আর কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হতে না পারে। সুতরাং এখন কেবল কুরাইশী ভাষার হরফই অবশিষ্ট রয়েছে। আর অবশিষ্ট ছয় হরফ সংরক্ষিত রয়নি। আর ক্বেরাতের যে মতানৈক্য আজ পর্যন্ত চলে আসছে, সেগুলো সেই কুরাইশী এক হরফ আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি মাত্র।[১৮২]

حافظ ابن جرير کا نظریہ اور اس کی قباحتیں

হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর চিন্তাধারা ও এর নিন্দনীয় খারাপী দিকগুলো ঃ

এখানে হাফেয ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) যেহেতু নিজের চিন্তা ও মতকে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, তাই তাঁর এ বক্তব্য অত্যাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর আজ-

---

১৮২. তাফসীরে ইবনে জারীর : ১/১৫

সূচিপত্র

কাল সাত হরফের ব্যাখ্যা সাধারণত এর আলোকেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ মুহাক্কিক আলেমগণ[১৮৩] এ মতকে গ্রহণই করেননি; বরং অত্যন্ত কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ এ বক্তব্যে এমন কিছু সমস্যা দাঁড়ায়, যার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়না।

এ মতের উপর সর্ব প্রথম তো ওই আপত্তি আরোপিত হয়, যার আলোচনা আমরা আগেই করে এসেছি যে, এতে "হরফ" এবং "ক্বেরাত" দু'টিকে পৃথক পৃথক বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ কোনো হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২. দ্বিতীয় আপত্তি: এই হয় যে, হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) এক দিকে তো এটা মেনে নেন যে, সাত হরফের সবকটিই আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত। আবার অন্য দিকে বলেন, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে ছয় হরফের তেলাওয়াতকে বিলুপ্ত করে দেন! অথচ এ কথা মেনে নেওয়া খুবই মুশকিল যে, সাহাবায়ে কেরাম ওই হরফগুলোকেই একেবারে বিলুপ্ত করার জন্য একমত হয়ে গেলেন, উম্মতের সহজ-সাধ্যের জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আর জবাবে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যা নাযিল করেছিলেন!?

অথচ সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যমত নিঃসন্দেহে দ্বীনের অকাট্য দলীল, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর জন্য এটা সম্ভাব্য ব্যাপার বরে মনে হয় না যে, যে বিষয় কুরআন হওয়ার ব্যাপারটা তাওয়াতুর বা ধারাবাহিক পরম্পরায় সাব্যস্ত হয়েছে, তাঁরা সেটাকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য ঐক্যমত পোষণ করবেন!

হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) এই আপত্তির জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, 'প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে পবিত্র কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সাথে সাথে এ এখতেয়ারও দেওয়া হয়েছিল যে, তারা সাত হরফের যে কোনো একটিকে বেছে নিতে পারবে। তাইতো উম্মত সেই এখতেয়ার দ্বারা উপকৃত হয়ে সার্বজনীন কল্যাণার্থে ছয় হরফের তেলাওয়াতকে পরিত্যাগ করেছেন, আর এক হরফের সংরক্ষণের উপর একমত হয়েছেন। এ পদক্ষেপ দ্বারা ওই হরফগুলোকে রহিত করা এবং সেগুলোর তেলাওয়াতকে হারাম করে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের জন্য সার্বজনীন এক হরফকে নির্বাচন করা।'

---

১৮৩. সম্মানিত সেই আলেমগণের তালিকা সামনে আসবে।

সূচিপত্র

কিন্তু এ জবাবটিও এ জন্য দুর্বল বলে মনে হয় যে, প্রকৃত অবস্থা যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে এটা কি সমীচীন ছিল না যে, উম্মত নিজেদের আমলের জন্য এক হরফকে বেছে নিত আর বাকি ছয় হরফকে চিরতরের জন্য বিলুপ্ত করার পরিবর্তে কোনো এক স্থানে তা সংরক্ষণ করে রাখতো? যেন সে হরফগুলোর অস্তিত্ব একেবারেই খতম হয়ে না যায়। পবিত্র কুরআনে কারীমে বর্ণিত রয়েছে–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।'

যখন সাত হরফের সবগুলোই কুরআন ছিল তখন এই আয়াতের সুস্পষ্ট দাবী হলো, ওই সাত হরফও .কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে এবং কোনো ব্যক্তি যদি এগুলোর তেলাওয়াতকে ছেড়েও দিতে চায়, তবু তা একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না।

আল্লামা হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) এর উপমা দিতে গিয়ে একটি মাসআলা পেশ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম মিথ্যা শপথের কাফ্ফারা ক্ষেত্রে মানুষকে তিনটি এখতেয়ার দিয়েছে। চাইলে সে একজন দাসকে মুক্ত করতে পারবে, চাইলে দশজন মিসকীনকে আহার করাতে পারবে আর চাইলে দশজন মিসকীনকে বস্ত্র দিতে পারবে। এখন যদি উম্মত বাকি দু'টি প্রকারকে নাজায়েয না করে নিজেদের আমলের জন্য একটিকে গ্রহণ করে নেয় তাহলে তা তার জন্য বৈধ। ঠিক তদ্রূপ উম্মত সাত হরফের মধ্য হতে একটি হরফকে সার্বজনীনভাবে বেছে নিয়েছে।

কিন্তু এই উপমা পেশ করা এ জন্য সঠিক নয় যে, উম্মত যদি শপথের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে তিন প্রকারের যে কোনো একটি প্রকারকে এমনভাবে গ্রহণ করে যে, বাকি দু'টি প্রকারকে নাজায়েয তো বলে না; কিন্তু কার্যত সেগুলোর অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত থেকে যায় এবং লোকদের কেবল এ টুকু জানা থাকে যে, শপথের কাফ্ফারার আরো দু'টি প্রকার ছিল যেগুলোর আমলকে উম্মত পরিহার করেছে। কিন্তু সে প্রকারগুলো কি ছিল? তা জানে এমন লোকও বাকি না থাকে, তাহলে অবশ্যই উম্মতের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

অতঃপর এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, বাকি ছয় হরফকে পরিহার করার কি প্রয়োজন দেখা দিল? হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) বলেছেন যে, এই হরফগুলোর মতানৈক্যের কারণে মুসলমানদের মাঝে প্রচন্ড ঝগড়া বাঁধতো। এ জন্য হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণের পরামর্শে সকল হরফের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সেটাকে এক হরফে রূপান্তরিত করাকে

সূচিপত্র

সমীচীন বলে মনে করলেন। কিন্তু এটাও এমন এক কথা যেটাকে মেনে নেওয়া খুবই মুশকিল। হরফের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে মুসলমানদের মতবিরোধ তো স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও ছিল। হাদীসের ভান্ডারে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবী অপর সাহাবীকে ভিন্নভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন, তখন তাঁদের পরস্পরে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যেত।

এমনকি সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তো হযরত হিশাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাঁকে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে এসেছিলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হরফের এই মতবিরোধের কথা শোনে আমার অন্তরে অনেক বেশী সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাত হরফকে বিলুপ্ত করার পরিবর্তে সে হরফগুলোর অনুমোদনের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। আর এতে কোনো ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটেনি। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে এটা অসম্ভব যে, তাঁরা এই 'উসওয়ায়ে হাসানা' বা উত্তম আদর্শের উপর আমল করার পরিবর্তে ছয় হরফকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

তারপর আশ্চর্যের কথা হলো, আল্লামা ইবনে জারীর (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম মতবিরোধের ভয়ে ছয় হরফকে তো বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু ক্বেরাতগুলোকে (যা তাঁর বক্তব্য মতে হরফ থেকে আলাদা বিষয়) হুবহু বাকি রেখেছেন! যা আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়ে চলে আসছে। এখন প্রশ্ন হলো, বিভিন্ন হরফের উপর কুরআন তেলাওয়াত জারী রাখার ক্ষেত্রে যে মতবিরোধ ও মতানৈক্যের আশঙ্কা ছিল, ক্বেরাতের বিভিন্নতার মাঝে কি সেই আশঙ্কাটা ছিল না? যখন ওই ক্বেরাতগুলোর আলোকে কখনো কখনো এক একটি হরফকে বিশটি পদ্ধতিতে পড়া যায়।

যদি ছয় হরফকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের মাঝে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হবে এবং সবাই এক পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত করবে, তাহলে ক্বেরাতের বিভিন্নতাকে অবশেষে কেন বিলুপ্ত করা হলো না? যখন ক্বেরাতের মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিক্ষিপ্ততাকে বাঁধা দেওয়া যেত এবং মুসলমানদেরকে এটা বুঝানো যেত যে, এই সবগুলো পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করা জায়েয, তাহলে এই শিক্ষাটাই কেন সাত হরফের ক্ষেত্রে ফেতনার কারণরূপে উপলব্ধি হলো? প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাফেয ইবনে জারীর তবারী (রহ.)-এর বক্তব্যে "সাত হরফ" এবং "ক্বেরাত"-এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এমন বিস্ময়কর দু'টি আমলী সম্বন্ধ করতে হয়, যার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ বুঝে আসে না।

সূচিপত্র

উপরন্তু হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণের প্রতি এত বড় পদক্ষেপের সম্বন্ধ কোনো সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে নয়। বরং সংক্ষিপ্ত কিছু শব্দের কেয়াসনির্ভর ব্যাখ্যার মাধ্যমে করা হয়েছে। যে সকল রেওয়ায়েতে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কুরআন সংকলনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এ কথার উল্লেখ নেই যে, তিনি ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। বরং এর বিপরীত অনেক দলীল বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলোর বিশদ বর্ণনা সামনে আসবে। এখন কোনো সুস্পষ্ট ও সহীহ রেওয়ায়েত ব্যতীত এ কথা কিভাবে বলা সম্ভব হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম ওই ছয় হরফকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন, যা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বার বার আবেদনের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল?

আসল কথা হচ্ছে, যে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণ পবিত্র কুরআনুল কারীমের সংকলন ও বিন্যাসের মহান কাজে শুধু এ জন্যই গবেষণা করেছেন যে, প্রিয় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কাজ করে যাননি। যারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের এক একটি শব্দ সংরক্ষণের জন্য নিজেদের পুরো জীবন ব্যয় করেছেন এবং যারা রহিত তেলাওয়াতের আয়াতগুলোও সংরক্ষণ করে উম্মতের নিকট পৌছিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে এ কাজ হওয়াটা খুবই দূরবর্তী ব্যাপার যে, তাঁরা সবাই ছয় হরফকে বিলুপ্ত করার জন্য এভাবে একমত হয়ে যাবেন যে, আজ সেই হরফগুলোর কোনো নাম ও নিশানাও বাকি থাকবে না।

যে সকল আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছিল, সাহাবায়ে কেরাম সেগুলোকেও কমপক্ষে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে অবশিষ্ট রেখে আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তাহলে কি সেই কারণ যে, ওই "হরফগুলো" যেগুলোর ব্যাপারে হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) ও স্বীকার করেছেন যে, তা রহিত হয়নি– বরং কোনো কল্যাণার্থে কেরাত ও লিপিমালাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, সেগুলোর কোনো একটি উদাহরণ কোনো দুর্বল রেওয়ায়েতেও সংরক্ষিত হতে পারেনি!

এ কারণেই অধিকাংশ মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর এই ব্যক্তিগত বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যাদের বক্তব্যের বিশদ বিবরণ সামনে আলোচনায় আসবে।

ইমাম তহাভী (রহ.)–এর মতামত ঃ امام طحاوی کا قول

সাত হরফের ব্যাপারে ইমাম তহাভী (রহ.) দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মত অনুযায়ী পবিত্র কুরআনুল কারীম তো শুধু

সূচিপত্র

এক কুরাইশী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে উম্মতের সহজ-সাধ্যের জন্য এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে, তারা পবিত্র কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সাত পর্যন্ত সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করতে পারবে। এই সমার্থবোধক শব্দগুলোও স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই অনুমতি প্রদানকেই হাদীসে পবিত্র কুরআনুল কারীম "সাত হরফ" এর উপর নাযিল হয়েছে বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এই অনুমতি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। পরবর্তীতে মানুষ যখন কুরআনী ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেই সেই অনুমতি রহিত হয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বে যখন শেষ বারের মতো তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুশীলন করেন, তখন সমার্থবোধক শব্দগুলো রহিত হয়ে গেল। এখন শুধু সেই হরফগুলোই অবশিষ্ট রয়েছে, যেগুলোর উপর কুরআন নাযিল হয়েছিল। অর্থাৎ কুরাইশী হরফ। আর বাকি ছয় হরফ রহিত হয়ে গেছে।

আল্লামা হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর বক্তব্যের তুলনায় এই বক্তব্যটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম যে, এতে সাহাবায়ে কেরামে প্রতি রহিত করার সম্বন্ধ করা হয়নি যে, তাঁরা ছয় হরফকে রহিত করেছেন। বরং রহিত হবার সম্বন্ধ স্বয়ং নববী যুগের দিকে করা হয়েছে। তবে এ বক্তব্যের উপরও একটি প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, এই বক্তব্য অনুযায়ী ছয় হরফ মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত নয়। অথচ হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত হিশাম (রা.)-এর মাঝে যে মতবিরোধ হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে হযরত হিশাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে 'সূরা ফুরকান' নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ করলেন। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শুনে বললেন- هَكَذَا أُنْزِلَتْ [১৮৪] এই সূরা এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী তেলাওয়াত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শুনেও বললেন- هَكَذَا أُنْزِلَتْ (অর্থ্যাৎ এই সূরা এভাবেই নাযিল করা হয়েছে)।[১৮৫] এই শব্দমালা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উভয় পদ্ধতিটিই মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নাযিলকৃত ছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, যা পূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বক্তব্যেও ক্বেরাতের অবস্থানগত মর্যাদা ফুটে উঠেনি যে, তা সাত হরফের মধ্যে শামিল কি-না? যদি শামিল থাকে,তাহলে ছয় হরফের মতো এ ক্ষেত্রেও বলতে হবে যে, (নাঊযুবিল্লাহ) এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত নয়। অথচ এ

---

১৮৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল খুছুমাত- উমদাতুল কারী, পৃষ্ঠা: ২৫৮ খণ্ড ১২ মিশর।

১৮৫. সহীহ বুখারী, উমদাতুল কারী সহ : ১২/২৫৮

সূচিপত্র

কথা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। আর যদি শামিল না থাকে তাহলে ক্বেরাতের পৃথক অস্তিত্বের উপর কোনো দলীল নেই। কাজেই এ বক্তব্যের উপরও আত্মপ্রশান্তি লাভ হয় না।

৩. সর্বোত্তম বক্তব্য ঃ سب سے بہتر قول

তৃতীয় বক্তব্য হলো সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও গ্রহণ করার মতো। আর তাহলো সাত হরফ দ্বারা যেহেতু ক্বেরাতের বিভিন্নতার সাত প্রকারকেই বুঝানো হয়েছে [যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে], তাই এই সাত হরফ আজও পুরোপুরি সংরক্ষিত ও অবশিষ্ট আছে এবং এগুলোর তেলাওয়াতও করা হয়। অবশ্য এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেরাতসমূহের বিভিন্নতার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তাতে সমার্থবোধক শব্দের আধিক্য ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল, যারা কুরআনের ভাষায় তেলাওয়াত করতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়নি, তাদেরকে বেশি থেকে বেশি সহজতার অবকাশ দেওয়া।

পরবর্তীতে যখন আরবের লোকেরা কুরআনের ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন সমার্থবোধক শব্দের বহু মতানৈক্য বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সর্বশেষ বার হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দাওর করেন (যাকে হাদীসে আরযায়ে আখীরা বলা হয়) সে সময় অনেক ক্বেরাতই রহিত করে দেওয়া হয়েছে। যার দলীল সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে। কিন্তু যতগুলো ক্বেরাত সে সময় অবশিষ্ট ছিল, তার সবগুলোই আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় চলে আসছে এবং এগুলোরই তেলাওয়াত করা হয়।

"সাত হরফ"-এর জটিল আলোচনার মধ্যে এটা সেই কণ্টকমুক্ত পথ যার উপর হাদীসের সবগুলো রেওয়ায়েত আপন আপন স্থানে সঠিক হয়ে যায়। এবং সেগুলোর মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ বাকি থাকে না। আর না থাকে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো আপত্তি। এ ব্যাপারে সম্ভাব্য আরো যত সন্দেহাবলী রয়েছে, আমরা সামনে বিস্তারিতভাবে সেগুলোর উত্তর প্রদান করবো। যাতে এ বক্তব্যের যথার্থতা ভালোভাবে ফুলে উঠে। তবে এর আগে শোনে নিন যে, এ বক্তব্যের প্রবক্তাগণ কারা কারা? আমরা এখানে ওই মনীষীদের নাম এবং উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো, যারা এ বক্তব্য গ্রহণ করেছেন অথবা হাফেয ইবনে জারীর তবারী (রহ.)-এর বক্তব্যকে খন্ডন করেছেন।

এই মতামতের প্রবক্তা যারা ঃ اس قول کے قائلین

প্রকাশ থাকে যে, ইলমে ক্বেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত ইমাম, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে হাফেয ইবনে কাছীর (রহ.)-এর শাগরিদ এবং হাফেয ইবনে হাযার

(রহ.)-এর উস্তাদ, হাফেয আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইবনুল জাযারী (রহ.) (মৃত্যু : ৮৩৩ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থ "আন-নশরু ফী কিরাতিল আশ্‌র"-এ লিখেন–

وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة . فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها : فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة . وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السّبعة التي نزل القرآن بها . وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك . قال هؤلاء : ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن . وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام متضمنة لها لم تترك حرفا م

(قلت) :وهذا القول هو الذي يظهر صوابه ; لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له

'অর্থাৎ হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে মুসহাফ (পবিত্র কুরআনের কপি) প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে সাত হরফ শামিল ছিল কি-না, তা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। উলামায়ে কেরাম এতে মতবিরোধ করেছেন। ফুকাহা, ক্বারী এবং কালাম শাস্ত্রবিদদের একটি দলের মতামত হলো, সাত হরফ মাসহাফে উসমানীর মাঝে শামিল রয়েছে। এ কথার ভিত্তি এর উপর যে, উম্মতের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তারা ওই সাত হরফের মধ্য হতে কোনো একটি হরফকে বর্ণনা করা ছেড়ে দিবে, যেগুলোর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে।

আর সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সর্বসম্মতিতে উসমানী মাসহাফকে ওই সকল সহীফা থেকেই সংকলন করেছিলেন, যা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি কপি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে পাঠানো হয়েছিল এবং সেগুলো ব্যতীত যত সহীফা ছিল, সবগুলো পরিহার করার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। তাঁরা বলেন, না সাত হরফের মধ্য হতে কোনো একটির ক্বেরাতকে পরিহার করা জায়েয হবে আর না সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের কোনো অংশ ছেড়ে দেওয়ার উপর

সূচিপত্র

ঐক্যমত পোষণ করবেন। আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের অধিকাংশের মত এটাই যে, মাসহাফে উসমানী ওই সকল হরফকে নিয়ে শামিল, যা এর রসমেখতের মাঝে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ যখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পবিত্র কুরআনুল কারীমের দাওর করেছিলেন, এর সমস্ত শব্দ এ মাসহাফে সন্নিবেশিত হয়ে গেছে। সেগুলোর কোনো হরফই সেই মাসহাফ থেকে বাদ পড়েনি, আমার ধারণা, এটাই সে বক্তব্য যার বিশুদ্ধতা সুস্পষ্ট। কেননা বিশুদ্ধ হাদীসগুলো এবং প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতগুলো এর বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে এবং এর সাক্ষ্য প্রদান করে।"[১৮৬]

আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) বর্ণনা করেন–

واختلف الاصوليون هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف فمنعه الطبرى وغيره وقال انما يجوز بحرف واحد اليوم وهو حرف زيد ونحى اليه القاضى ابوبكر. وقال ابوالحسن الاشعرى اجمع المسلمون على انه لايجوز خطر ماوسعه الله تعالى من القراءة بالاحرف التى انزلها الله تعالى ولايسوغ للامة ان تمنع مايطلقه الله تعالى. بل هى موجود فى قراءتنا مفرقة فى القران غيرمعلومة فيجوزعلى هذا. وبه قال القاضى ان يقرأن بكل مانقله اهل التواترمن غيرتمييزحرف من حرف فيحفظ حرف نافع بحرف الكسائى وحمزة ولاحرج فى ذلك.

'অর্থাৎ বর্তমানে পবিত্র কুরআনুল কারীম সাত হরফের উপর পাঠকরা যাবে কিনা , এ ব্যাপারে উসূলী তথা নীতি নির্ধারক উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হাফেয ইবনে জারীর তবারী (রহ.) ও কতক উলামায়ে কেরাম তা অস্বীকার করে বলেন, বর্তমানে শুধু এক হরফের উপরই কুরআনুল কারীম পাঠ করা জায়েয। আর তা হচ্ছে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হরফ। কাযী আবু বকর রাযী (রহ.) এ মতের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.) বলেন, মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যেসব হরফের উপর কুরআন অবতীর্ণ করে সহজ-সাধ্য করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা জায়েয নেই। আর মহান আল্লাহ তা'আলা যে জিনিসের অনুমতি প্রদান করেছেন, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার উম্মতের অধিকার নেই।

---

১৮৬. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশ্‌র : ১/৩১

সূচিপত্র

বরং বাস্তবতা তো হলো এই যে, সাত হরফের সবগুলোই আমাদের প্রচলিত ক্বেরাতের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের মাঝে বিচ্ছিন্ন ও অনির্দিষ্টভাবে শামিল আছে। এ হিসেবে সে হরফগুলোর ক্বেরাত আজও জায়েয আছে। আর এটাই কাযী[১৮৭] সাহেবের মত। যত হরফ তাওয়াতুর বা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত আছে সেগুলোর প্রত্যেকটিই পড়া জায়েয। এক হরফ থেকে অন্য হরফের পার্থক্য করারও প্রয়োজন নেই। নাফে (রহ.)-এর ক্বেরাতকে কেসাই এবং হামযা (রহ.)-এর ক্বেরাতের সাথে মিলিয়ে যদি আত্মস্থ করা হয়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।'[১৮৮]

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.) কাযী আবু বকর (রহ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেন–

والسابع اختاره القاضى ابوبكر. وقال : الصحيح ان هذه الاحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى عليه وسلم وضبطها عنه الائمة واثبتها عثمان والصحابة فى المصحف

'অর্থাৎ সপ্তম বক্তব্যটি কাযী আবু বকর[১৮৯] (রহ.) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, সাত হরফের সবগুলোই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রসিদ্ধির সাথে বর্ণিত আছে। আইম্মায়ে কেরাম এগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এগুলোকে তাঁদের মাসহাফে বিদ্যমান রেখেছেন।'[১৯০]

আল্লামা ইবনে হায্ম (রহ.)ও হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর বক্তব্যকে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, ছয় হরফকে বিলুপ্ত করার বক্তব্যটি একেবারেই ভুল। হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যদি এমন করতেও চাইতেন তবুও সক্ষম হতেন না। কারণ মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে এ সাত হরফের হাফেযে ভরপুর ছিল। তিনি লিখেন–

واما قول من قال ابطل الاحرف الستة فقد كذب من قال ذلك فعل عثمان ذلك اوارده لخرج عن الإسلام ولما مطل ساعة بل الاحرف السبعة كلها عندنا قائمة كماكانت مثبوتة فى القرات المشهورة الماثورة

---

১৮৭. সম্ভবত এখানে কাযী ইয়াযকে বুঝানো হয়েছে।

১৮৮. উমদাতুল কারী : [কিতাবুল খুসূমাত] : ১২/২৫৮, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আন-নশরু ফী কিরআতিল আশ্‌র : ১/১৮-১৯।

১৮৯. সম্ভবত কাযী বকর বাকিল্লানী (রহ.) উদ্দেশ্য। কারণ এই ইবারতই ইমাম নববী (রহ.) কাযী বাকিল্লানী (রহ.)-এর নামে উদ্ধৃত করেছেন।

১৯০. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : ১/২২৩

সূচিপত্র

'অর্থাৎ আর যারা বলেন যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন, তারা একেবারেই ভুল বলেছেন। যদি হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এমনটি করতেন বা এর ইচ্ছা করতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতেন।[১৯১] বরং বাস্তবতা হলো, সাত হরফের সবগুলোই অবিকল আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে এবং মাশহুর ক্বেরাতের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে।'[১৯২]

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে'র বিখ্যাত ভাষ্যকার, আল্লামা আবুল ওলীদ বাজি মালেকী (রহ.) (মৃত্যু ৪৯৪ হি.) "সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যা "সাত ক্বেরাত" দ্বারা করার পর লিখেন–

فان قيل هل تقولون ان جميع هذه إلسبعة الاحرف ثابتة فى المصحف فان القراءة بجميعها جائزة قيل لهم كذلك نقول والدليل على صحة ذلك قوله عزوجل { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }. ولا يصح النفصال الذكر المنزل من قراءته فيمكن حفظه دونها وهما يدل على صحة ماذاهبنا اليه ان ظاهر قول النبى صلى الله عليه وسلم يدل على ان القرأن انزل على سبعة احرف تيسرا على من اراد قراءته ليقرا كل رجل منهم بماتيسر عليه وبما هواخف على طبعه واقرب الى لغته لمايلحق من المشقة بذلك المالوف من العادة فى النطق من المشقة بذلك المالوف من العاردة فى النطق ونحن اليوم مع عجمة السنتنا وبعدنا عن فصاحة العرب احوج.

'এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, "আপনাদের বক্তব্য কি এ রকম যে, এই সাত হরফ কি আজও মাসহাফে বিদ্যমান আছে? তাইতো আপনাদের মত অনুযায়ী সবগুলোর ক্বেরাত জায়েয।" তখন আমরা বলব, হ্যাঁ আমাদের বক্তব্য এটাই। আর এটা বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল হলো, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক)। আর পবিত্র কুরআনুল কারীমকে তার ক্বেরাত থেকে এভাবে পৃথক করা যাবে না যে, কুরআন তো সংরক্ষিত রয়েছে আর তার ক্বেরাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের বক্তব্যের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে আরো

---

[১৯১]. আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.)-এর এ উক্তি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বলা হবে যে, হযরত উসমান (রা.) ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন [নাউযুবিল্লাহ]। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর উক্তি মতে তিনি ছয় হরফকে বিলুপ্ত করেননি। বরং সেগুলোর কেরাতকে বর্জন করেছেন মাত্র। তাই যদিও হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর উক্তি সঠিক, কিন্তু এত কঠোর ভাষার উপযোগী নন।

[১৯২]. আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল : ২/৭৭-৭৮

এটি দলীল হলো এই যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে যে, পবিত্র কুরআনকে সাত হরফের উপর নাযিল করা হয়েছে, যাতে তেলাওয়াতকারীর জন্য সহজ হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ওই পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করতে পারে যে পদ্ধতি তার জন্য সহজ হয়। তার স্বভাব-রুচির দিক থেকে অধিক সহজ হয় এবং ভাষার দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী হয়। কেননা, কথোপকথনের মধ্যে যা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তা বর্জন করা খুবই কঠিন। বর্তমান যুগে আমরা অনারবী এবং আরবী ভাষার পান্ডিত্য থেকে দূরে থাকার কারণে এ সহজতার প্রতি আমরা অধিক মুখাপেক্ষী।[১৯৩]

ইমাম গাযালী (রহ.) তার স্বীয় উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (المستصفى)"আল-মুসতাস্‌ফা"-এ পবিত্র কুরআনুল কারীমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেন–

مانقل الينا بين دفتى المصحف على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا.

'অর্থাৎ মাসহাফের পার্শ্বদয়ের মাঝখানে সুপ্রসিদ্ধ সাত হরফের উপর ধারাবাহিক সূত্র পরাম্পরায় যা আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত হয়ে এসেছে (তাই কুরআন)।'[১৯৪]

এর দ্বারা পরিষ্কার স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম গাযালী (রহ.)ও আজ পর্যন্ত সাত হরফ বাকি থাকার প্রবক্তা।

আর মোল্লা আলী কারী (রহ.) (মৃত্যু: ১০১৪) লিখেন–

وكأنه عليه الصلوة والسلام كشف له ان القراءة المتواترة تستقر فى امته على سبع وهى الموجودة الان المتفق على تواترها والجمهور على ان مافوقها شاذ لا يحل القراءة به

'অর্থাৎ এমনও মনে হয় যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর বিষয়টা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাওয়াতুর বা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত কেরাতগুলো শেষ পর্যন্ত তাঁর উম্মতের মাঝে সাত হরফের উপরই বাকি থেকে যাবে। আর তাইতো আজ এগুলোই বিদ্যমান আছে এবং সবাই এগুলোর তাওয়াতুরের ব্যাপারে একমত। জমহুর .উলামায়ে কেরামের মত হলো, এগুলো ব্যতীত আর যত ক্বেরাত আছে তা (প্রায়) শায বা অপ্রচলিত এবং সেগুলোর তেলাওয়াত জায়েয নাই।'[১৯৫]

---

১৯৩. আল-মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা : ১/৩৪৭

১৯৪. আল-মুসতাসফা : ১/৬৫

১৯৫. মিরকাতুল মাফাতীহ : ৫/১৬

সূচিপত্র

এতে মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর এ কথাটি যদিও সঠিক নয় যে, 'সাত ক্বেরাত ব্যতীত বাকি অন্য সব ক্বেরাত শায বা অপ্রচলিত।' কারণ ইলমে ক্বেরাত বিশেষজ্ঞগণ কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৯৬] কিন্তু এর দ্বারা এটা নিশ্চিত জানা যায় যে, তাঁর মত অনুযায়ী সাত হরফ আজও বাকি আছে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি "সাত হরফ"-এর মাঝে 'সাত' সংখ্যাটি আধিক্যের অর্থের জন্য প্রয়োগ করেন। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন–"হাদীসের মধ্যে 'সাত' শব্দটি সংখ্যাধিক্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য নয়। 'দশ' ক্বেরাতের উপর আইম্মায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং দশ ক্বেরাতের প্রত্যেকটির জন্য দু'জন করে বর্ণনাকারী রয়েছেন। একজন অপর জনের সাথে মতবিরোধ করেন। ফলে ক্বেরাতের সংখ্যা বিশ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায়।"[১৯৭]

এই উক্তিতে যদিও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) জমহুর উলামায়ে কেরামের সাথে মতবিরোধ করে "সাত" সংখ্যাটিকে সংখ্যাধিক্যের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। (হয়তো বিশটি ক্বেরাতকে ক্বেরাতের বিভিন্নতার সাত প্রকারে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়নি) কিন্তু এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, হাদীসে যে হরফগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে শাহ সাহেবের নিকট সেগুলোই ক্বেরাত এবং সেগুলো রহিত বা পরিত্যক্ত হয়নি; বরং সেগুলো আজও বিদ্যমান আছে।

পক্ষান্তরে শেষ জামানায় দ্বীনি ইলমের ইমাম, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক এবং হাফেযে হাদীস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষায় মাসআলাটির স্বরূপ এমনভাবে উন্মোচন করেছেন যে, এটাকে শেষ হরফ বলা উচিত। এখানে আমরা তাঁর পুরো তাহকীক ও গবেষণাটি হুবহু উপস্থাপন করছি–

واعلم انهم اتفقوا على انه ليس المراد من سبعة احرف القرأة السبعة المشهورة بان يكون كل حرف منها قراءة من تلك القراءة. اعنى انه لاانطباق بين القراءت السبع والاحرف السبعة كما يذهب اليه الوهم بالنظر الى لفظ السبع فى الموضعين. بل بين ذلك الاحرف القراءة عموم وخصوص وجهى. كيف. وان القراءت لاتنحصرفى السبعة. كما صرح ابن الجوزى فى رسالة النشرفى قراءة العشر. وانمااشتهرت السبعة على الالسنة

---

[১৯৬]. আন-নশরু ফী কিরাআতিল আশর : ১/৩৩

[১৯৭]. আল-মুসাফ্ফা : পৃঃ ১৮৭

لانها التى جمعها الشاطبى ثم اعلم ان بعضهم فهم ان بين تلك الاحرف تغايرا من كل وجه. بحيث لاربط بينها وليس كذلك. بل قد يكون الفرق بالمجرد والمزيد واخرى الابواب، ومرة باعتبار الصيغ من العائب والحاضر. وطورا بتحقيق الهمزة وتسهيلها فكل هذه التغييرات يسيرة كانت اوكثيرة حرف براسه. وغلط من فهم ان هذه الاحرف متغايرة كلها بحيث بتعذر اجتماعها اما انه كيف عدد السبعة فتوجه اليه ابن الجوزى وحقق ان التصرفات كلها ترجع القسطلانى والزراقانى. بقى الكلام فى ان تلك الاحرف كلها موجودة اورفع بعضها وبقى البعض فاعلم ان ماقراة جبرئيل عليه السلام فى العرضة الاخير على النبى صلى الله عليه وسلم كله ثابت فى مصحف عثمان، ولما يتعين معنى الاحرف عند ابن جرير ذهب الى رفع الاحرف الست منها وبقى واحد فقط.

'অর্থাৎ জেনে রাখুন, সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, সাত হরফ দ্বারা প্রসিদ্ধ সাত কেরাত উদ্দেশ্য নয় এবং এমনও নয় যে, প্রত্যেক হরফ ওই সাত ক্বেরাতের মধ্য হতে একটি ক্বেরাত। ফলকথা, সাত ক্বেরাত ও সাত হরফ এক কথা নয়। যা প্রথম দৃষ্টিতে সাত হরফ দ্বারা এমন ধারণা জন্ম নেয়। বরং সাত হরফ ও সাত ক্বেরাতের মাঝে عموم وخصوص من وجه[১৯৮]- এর সম্পর্ক। আর ক্বেরাত যখন সাত সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তখন উভয়টা এক হতে পারে কি করে? যেমন, আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.) "আন-নশরু ফী কিরাআতিল আশ্‌র" কিতাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে "সাত কেরাত" শব্দটি মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণ হলো, আল্লামা শাত্বেরী (রহ.) এই সাত প্রকার ক্বেরাতকে গ্রন্থনা করেছেন। অতঃপর এ কথাটাও মনে রাখবেন যে, কোনো কোনো লোক মনে করে যে, সাত হরফের মাঝে পরস্পর সম্পূর্ণ "বিপরীতমুখী" সম্পর্ক, যে একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ বাস্তবতা এমন নয়।

বরং কখনো কখনো দুই হরফের মাঝে একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। আবার কখনো ব্যাকরণগত বিষয়ে। আবার কখনো গায়েব (নাম পুরুষ) ও হাযের (মধ্যম পুরুষ)-এর শব্দের পার্থক্য হয়ে থাকে। কখনো শুধু

---

১৯৮. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাত কেরাতের মধ্যে কোনো কোনো কেরাত সাত হরফের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সমস্ত মুতাওয়াতির কেরাত সাত হরফের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোনো কোনো কেরাত এমন আছে যা সাত হরফের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সাত কারীদের বিরল কেরাতসমূহ অথবা মতানৈক্যমুক্ত কেরাতসমূহ। আবার সাত হরফের কোনো কোনো মতভেদ এমন আছে যা সাত কেরাতের মধ্যে শামিল নয়। যেমন, ইমাম ইয়াকুব (রহ.), ইমাম আবু যাফর (রহ.) ও খালাফ (রহ.)-এর মুতাওয়াতির কেরাতসমূহ। এগুলো যদিও সাত হরফের মধ্য হতে; কিন্তু প্রসিদ্ধ সাত কেরাতের মধ্য হতে নয়।–মুহাম্মদ তাকী।

সূচিপত্র

হামযাকে বাকি রাখার ও সেটাকে তাসহীল করার পার্থক্য হয়। ব্যস, এ সকল পরিবর্তন চাই সাধারণ হোক কিংবা বড় বড়, সবই স্বতন্ত্র একটি হরফ।

আর যারা এ কথা মনে করেন যে, এ হরফগুলোর মাঝে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সম্পর্ক এবং এগুলোকে এক শব্দে একত্রিত করা সম্ভব নয়, তারা ভুল করেছেন। বাকি থাকল এ কথা যে, হাদীসে "সাত" সংখ্যাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাহকীক বর্ণনা করেছেন যে, এ সমস্ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাত প্রকার। এ মাসআলায় 'কাসতালানী' (রহ.) ও'যুরকানী' (রহ.)-(এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ) দেখে নিন।

এখন বাকি থাকল শুধু এ কথা যে, এ সকল হরফ এখন আছে নাকি কিছু হরফ বিলুপ্ত করা হয়েছে আর কিছু হরফ অবশিষ্ট আছে? সুতরাং এটা জেনে নিন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) পবিত্র কুরআনুল কারীমের اخيره عرضه সময় যতগুলো হরফ পাঠ করেছিলেন, তার সবগুলোই মাসহাফে উসমানীতে বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু ইবনে জারীর (রহ.)-এর নিকট হরফের অর্থ সুস্পষ্ট নয় তাই তিনি এ মাযহাব গ্রহণ করেছেন যে, ছয় হরফকে বিলুপ্ত করা হয়েছে আর এক হরফ অবশিষ্ট রয়েছে।'[১৯৯]

অনুরূপভাবে মিসরের পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ গবেষক আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) [মৃত্যু ১৩৭১ হিজরী] লিখেন–

والاول راى القائلين بان الاحرف السبعة كانت فى مبدأ الامر ثم نسخت العرضة الاخيرة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فلم يبق الاحرف واحد ورأى القائلين بان عثمان رضى الله عنه جمع الناس على حرف واحد ومنع من الستة الباقية لمصلحة. واليه نحا ابن جرير وتهيبه ناس فتابعوه لكن هذا راى خطير قام ابن حزم باشد النكير عليه فى الفصل وفى الاحكام وله الحق فى ذلك. والثانى راى القائلين بان هى الاحرف السبعة المحفوظة كما هى فى العرضة الاخيرة. الخ

'অর্থাৎ প্রথম মতটি (বর্তমান কেরাত এক হরফেরই বিভিন্ন রূপ) সেসব মনীষীর, যারা বলেন– সাত হরফ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। অতঃপর আরযায়ে আখীরার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগেই তা রহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে শুধু একটিই অবশিষ্ট রয়েছে। এই মতটি সেসব ব্যক্তিদেরও যারা বলেন, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সমস্ত মানুষকে এক হরফের উপর একত্রিত করেছিলেন এবং বিশেষ কল্যাণার্থে বাকি ছয় হরফকে বিলুপ্ত করেছিলেন। হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর মতও এটাই এবং এ

সূচিপত্র

ক্ষেত্রে বহু লোক তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর পিছু ধরেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক রায়।

আল্লামা ইবনে হায্ম (রহ.) "আল-ফছ্ল" এবং "আল-আহকাম"-এ এর কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছেন, যা তাঁর অধিকার ছিল। দ্বিতীয় মত হচ্ছে (বর্তমান ক্বেরাতই সাত হরফ) সেসব ব্যক্তিদের, যারা বলেন– এগুলোই সেই সাত হরফ আরযায়ে আখীরা থেকে যা সংরক্ষিত হয়ে আসছে।[২০০]

আমরা উপরোল্লিখিত এ সকল বক্তব্য ও মতামতগুলো বিস্তারিতভাবে এ জন্য পেশ করলাম যে, বর্তমান যুগে আল্লামা ইবনে জারীর তবারী (রহ.)-এর বক্তব্যটি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর আল্লামা ইবনে জারীর (রহ.)-এর সুমহান ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়ে তাঁকে সাধারণত সব ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে মনে করা হয়। এর ভিত্তিতেই আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর এ পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট বক্তব্যটি হয়তো মানুষ জানে না অথবা জানা থাকলেও সেটাকে একটা দুর্বল মত বলে মনে করা হয়। অথচ পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম মালেক (রহ.), আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.), আল্লামা আবুল ফযল রাজী (রহ.), কাযী আবু বকর ইবনে তাইয়্যেব (রহ.), ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.), কাযী ইয়ায (রহ.), আল্লামা ইবনে হায্ম (রহ.), আল্লামা আবুল ওলীদ বাজী (রহ.), ইমাম গাযালী (রহ.) ও মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর ন্যয় উলামায়ে কেরাম এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, সাত হরফের সবগুলো আজও সংরক্ষিত ও বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরযায়ে আখীরার সময় যতগুলো হরফ বাকি ছিল, তার মধ্য হতে কোনো হরফ না রহিত হয়েছে আর না পরিত্যক্ত হয়েছে। বরং মুহাক্কিক ইবনুল জাযারী (রহ.) নিজের এ বক্তব্যকে নিজের পূর্বে জমহুর উলামায়ে কেরামের রায় বলেও সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.), হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) এবং আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.)-এর বক্তব্যও এটাই। অনুরূপভাবে মিসরের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম আল্লামা নাযীত মুতীয়ী (রহ.), আল্লামা খাজরী দিম্ইয়াতী (রহ.) ও শায়েখ আবদুল আযীম যুরকানী (রহ.) ও এ বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন।[২০১] অতএব, প্রমাণপঞ্জির দিকে না তাকিয়ে শুধু ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা অত্যন্ত উঁচুমানের একটা বক্তব্য।

---

২০০. মাকালাতুল কাউসারী : পৃ: ২০-২১

২০১. মানাহিলুল ইরফানন : ১/১৫১

সূচিপত্র

এ বক্তব্যের দলীলসমূহ : اس قول کے دلائل

এখানে ঐ সকল দলীল উপস্থাপন করছি, যেগুলো দ্বারা এ বক্তব্যটি শক্তিশালী হবে অবশ্য। এর কিছু দলীল তো উপরোক্ত বক্তব্যগুলোতে এসে গেছে। অতিরিক্ত কিছু দলীল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত–{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (অর্থাৎ নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর আমিই তার সংরক্ষনকারী। সুস্পষ্টভাবে এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, কুরআনের যে সকল আয়াত স্বয়ং মহান আল্লাহ পাক রহিত করেননি সেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। অপর দিকে সে সকল হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরআনের সাত হরফ মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত ছিল। তাই উল্লিখিত আয়াতের সুস্পষ্ট দাবী হলো, ওই সাত হরফ কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা।

২. আর হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) যদি ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে শুধু এক হরফ দ্বারা কুরআন প্রস্তুত করে থাকেন, তাহলে স্পষ্ট করে কোথাও তার কোনো প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যাওয়া উচিত ছিল। অথচ এর কোনো প্রমাণ তো পাওয়া যায়ই না; বরং রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাসহাফে উসমানীর মাঝে সাত হরফের সবগুলোই বিদ্যমান ছিল। যেমন, রেওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ আছে যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) স্বীয় মাসহাফ হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক সংকলিত মাসহাফের অনুকরণে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করার উভয় কপিকে মিলানোও হয়েছিল। এ ব্যাপারে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন–

فعرضت المصحف عليها فلم يختلفا فى شئ

'আমি ওই সহীফাগুলো দ্বারা মাসহাফকে মিলিয়ে দেখেছি, উভয়ের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য (বেশ-কম) ছিল না।'[২০২]

এ কথা সুস্পষ্ট যে, হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) ও স্বীকার করেন যে, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর জামানায় সাত হরফের সবগুলোই বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সহীফাগুলোতে নিশ্চিতভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে সাত হরফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) যদি ছয় হরফকে বিলুপ্তই করে দিয়ে থাকেন তাহলে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এ কথা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, "উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য বা কম-বেশি ছিল না।"?

---

২০২. মুশকিলুল আছার : ৪/১৯৩

সূচিপত্র

৩. আল্লামা ইবনুল আম্বারী (রহ.) "কিতাবুল মাসাহিফ"-এ প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত উবায়দা সালমানী (রহ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন–

قراءتنا التى جمع الناس عثمان عليها هى العرضة الاخرى

'আমাদের ওই ক্বেরাত, যার উপর হযরত উসমান (রা.) মানুষকে একত্রিত করেছেন, সেটা ছিল "আরযায়ে আখীরা"-এর ক্বেরাত।'[২০৩]

হযরত উবায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এ বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, আরযায়ে আখীরা (হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কুরআনের শেষ দাওর)-এর সময় যে হরফগুলো বাকি ছিল, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ওই হরফের কোনোটিই ছাড়েননি।

এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরযায়ে আখীরা তো শুধু এক কুরাইশী হরফের উপরই হয়েছিল। আর এটার উপরই হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সবাইকে একত্রিত করেছিলেন। কিন্তু এ কথা খুবই দূরবর্তী যে, যে হরফগুলো রহিত হয়েছিল না, সেগুলো এই (আরযায়ে আখীরা) থেকে বাদ পড়ে যাবে।

৪. প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) থেকে আল্লামা ইবনে সা'দ (রহ.) এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন–

كان جبريل يعرض القرأن على النبى صلى الله عليه وسلم كل عام مرة فى رمضان فلما كان العام الذى توفى فيه عرضه عليه مرتين قال محمد فانا أرجوان تكون قرأءتنا العرضة الأخيرة.

'অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রতি বছর একবার রমযান মাসে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে কুরআন উপস্থাপন করতেন। যখন নবী কারীম (সা)-এর ইন্তেকালের বছর উপনীত হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) দু'বার কুরআন উপস্থাপন করেছেন। (মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন,) আমি আশাবাদী যে, আমাদের বর্তমান ক্বেরাত ওই আরযায়ে আখীরা অনুযায়ী।'[২০৪]

৫. হযরত আমের শা'বী (রহ.) ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন তাবেঈ। যিনি সাতশত সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম ইসতেফাদা অর্জন করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.) তাঁর থেকে এ ধরনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয় ছিলেন তাবেঈ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী ব্যক্তি। তাই এ ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মর্যাদা রাখে।

---

২০৩. কানযুল উম্মাল : ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৮৪

২০৪. ইবনে সা'দ রচিত আত-তবকাতুল কুবরা : ২/১৯৫

সূচিপত্র

৬. সারকথা সমগ্র হাদীসের ভান্ডারে আমরা কোনো একটি রেওয়ায়েতও এমন পাইনি, যা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে দু'ধরনের মতানৈক্য ছিল। এক. সাত হরফের মতানৈক্য। দুই. ক্বেরাতের মতানৈক্য। এর পরিবর্তে বহু রেওয়ায়েত দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, উভয়টি অভিন্ন বিষয়। কেননা, একই ধরনের মতানৈক্যের উপর একই সময়ে "ক্বেরাতের মতানৈক্য" ও "হরফের মতানৈক্য" শব্দ দু'টি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন–

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسمعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط]ص [562 :في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثني إسمعيل بن أبي خالد حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير

'একদা আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ক্বেরাত পাঠ করল, যা আমার কাছে অপরিচিত বলে মনে হলো। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করল। সে প্রথম ব্যক্তির ক্বেরাত ব্যতীত অন্য এক ধরনের ক্বেরাত পাঠ করল। আমরা যখন নামায সমাপ্ত করলাম তখন সবাই মিলে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি আরয করলাম যে, এ ব্যক্তি এমন এক ক্বেরাত পাঠ করেছে, যা আমার কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় আরেক

সূচিপত্র

ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যক্তির ক্বেরাতের চেয়ে ভিন্ন আরেক ধরনের ক্বেরাত পাঠ করল। তখন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়কে পড়ার নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়ে পাঠ করার পর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়ের ক্বেরাতকে সুন্দর হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন। এতে আমার অন্তরে মিথ্যাচারিতার এমন এমন ওয়াসওয়াসা আসতে লাগল, জাহেলী যুগেও যা আমার খেয়ালে আসতো না। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আমার এ অবস্থা দেখলেন, তখন তিনি আমার বক্ষে (মৃদু) আঘাত করলেন। এতে আমি ঘামে স্নাত হয়ে গেলাম এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমি এমন অনুভব করলাম, আমি যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে দেখছি। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার পালনকর্তা আমার নিকট পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, আমি কুরআনকে এক হরফে পাঠ করব।

প্রতি উত্তরে আমি আবেদন করলাম, আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। অতঃপর মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল অলামীন দ্বিতীয় বারের জন্য পয়গাম পাঠালেন যে, আমি কুরআনকে দুই হরফের উপর পাঠ করব। এর উত্তরেও আমি আবেদন করলাম, আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তৃতীয়বার পয়গাম পাঠালেন যে, আমি যেন এটাকে সাত হরফের উপর পাঠ করি।'[২০৫]

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উভয় ব্যক্তির তেলাওয়াতের মতানৈক্যকে বার বার ক্বেরাতের মতানৈক্য বলে উল্লেখ করেছেন। আর এটাকেই রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাত হরফের মতানৈক্য বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নববী যুগে কেরাতের মতানৈক্য ও হরফের মতানৈক্যকে এক ও অভিন্ন বিষয় বুঝা হতো। উপরন্তু এর বিপরীত এমন কোনো দলীল-প্রমাণ নেই, যা উভয়টার পৃথক হবার প্রমাণ বহন করে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উভয়টা এক ও অভিন্ন বিষয়। আর ক্বেরাত যখন সংরক্ষিত হওয়ার বিষয়টি তাওয়াতুর ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, তখন এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সাত হরফও আজও সংরক্ষিত।

উপরোল্লিখিত দলীল-প্রমাণগুলোর আলোকে এ কথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরযায়ে আখীরার সময় সাত হরফের যে অংশ বাকি ছিল, তার সম্পূর্ণটাই মাসহাফে উসমানীতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত তা সংরক্ষিত করা হয়নি। তবে এটাকে পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট করার জন্য এর উপর আরোপিত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

---

২০৫. সহীহ মুসলিম : ১/২৭৩

সূচিপত্র

اس قول پر وارد ہونیوالے سوالات اوران کا جواب

এ বক্তব্যের উপর আরোপিত সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব

প্রশ্ন ঃ যদি হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সাত হরফের সবগুলোকেই অবশিষ্ট রাখেন, তাহলে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কীর্তি কোন্‌টি ছিল যার জন্য তাঁকে "জামিউল কুরআন" বা কুরআনের সংকলক বলা হয়?

এপ্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে ঃ যদিও অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণের পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্থ ছিল, তথাপিও হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর যুগ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনুল কারীমের মানদন্ড মূলক কপি ছিল একটিই, যা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সংকলন করেছিলেন। তা আবার মাসহাফের আকৃতিতে ছিল না। বরং প্রত্যেকটি সূরা পৃথক পৃথক সহীফায় লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু কোনো কোনো সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ সহীফা পৃথক পৃথকভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এগুলোতে না ছিল রুসমেখতের মধ্যে কোনো মিল, সূরাগুলোর বিন্যাসের মধ্যে কোনো মিল আর না ছিল সাত হরফের মধ্যে কোনো সমন্বয়। বরং প্রত্যেকেই রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে হরফ অনুযায়ী কুরআন শিখেছিলেন, সেটাকেই নিজের মতো করে 'লিখে নিয়েছিলেন। বিধায় কোনো মাসহাফে একটি আয়াত এক হরফ অনুযায়ী লিখা হয়েছিল, পক্ষান্তরে অপর মাসহাফে অন্য কোনো হরফ অনুযায়ী লিখা হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত নববী যুগ নিকটবর্তী ছিল এবং মুসলমানদের সম্পর্ক ইসলামের মারকায বা পবিত্র মদীনার সাথে মজবুত সম্পর্ক ছিল, ততদিন পর্যন্ত মাসহাফ সমূহের এই মতানৈক্যের কারণে উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি এ জন্য সাধিত হয়নি যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আসল ভিত্তিটা মাসহাফের পরিবর্তে মুখস্থ শক্তির উপর ছিল। আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যখন ইসলাম দূর-দূরান্তের রাষ্ট্রসমূহে ছড়িয়ে পড়ল এবং নতুন নতুন লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন তারা শুধু একটি পদ্ধতিতেই কুরআন শিখল। আর এ কথাটির প্রচার তাদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করেনি যে, কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে। তাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে লাগল।

কোনো কোনো ব্যক্তি নিজের ক্বেরাতকে সঠিক এবং অন্যের ক্বেরাতকে ভুল মনে করতে লাগল। অপর দিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত মাসহাফগুলোও হরফ ও রসমেখতের দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের ছিল এবং সেগুলোতে সাত হরফকে একত্রিত করার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। এ কারণে

সূচিপত্র

এমন কোনো মানদন্ড মূলক কপিও বিদ্যমান ছিল না, যার মাধ্যমে সেসব মতানৈক্যের নিরসন সম্ভব ছিল।

এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) অনুভব করলেন যে, যদি এ অবস্থা চলতে থাকে এবং ব্যক্তিগত মাসহাফ গুলো বিলুপ্ত করে পবিত্র কুরআনুল কারীমের মানদন্ড মূলক একটি কপি ইসলামী বিশ্বে প্রেরণ না করা হয়, তাহলে বিরাট ফেতনা মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাই তিনি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করেন :

১. পবিত্র কুরআনুল কারীমের সাতটি মানদন্ড মূলক কপি প্রস্তুত করান এবং সেগুলোকে বিভিন্ন শহরে তা প্রেরণ করেন।

২. ওই মাসহাফগুলোর রুসমেখত (লিখন পদ্ধতি) এমনভাবে রাখেন যাতে সাত হরফের সবগুলো এতে নিবিষ্ট হতে পারে। যেমন, এ মাসহাফগুলো নুকতা ও হরকতশূন্য ছিল। যেগুলোকে প্রত্যেক হরফের অনুকরণে পাঠ করা যেত।

৩. ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত প্রাপ্য সবগুলো মাসহাফ পুড়িয়ে দাফন করে দেন।

৪. ভবিষ্যতে যত মাসহাফ লিপিবদ্ধ করা হবে, তা যাতে ওই সাত হরফের অনুকরণে হয়, এ আইন বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলো।

৫. হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক সংকলিত সহীফাগুলোতে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন আকারে সূরা লিপিবদ্ধ ছিল। হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সূরাগুলোকে বিন্যাস করে একই মাসহাফের আকৃতি দান করালেন।

এক্ষেত্রে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সকল পদক্ষেপ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, যেন গোটা ইসলামী বিশ্বে রুসমেখত ও সূরাগুলোর বিন্যাসের দিক থেকে সবগুলো মাসহাফ এক রকম হয়ে যায়। আর এগুলোতে সাত হরফ এমনভাবে একত্রিত হয়ে যায় যে, পরবর্তীতে কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো ক্বেরাতকে অস্বীকার করার বা কোনো অশুদ্ধ কেরাতের উপর চর্চা করার অবকাশ বাকি না থাকে। কখনো যদি কোনো কেরাতের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে মাসহাফের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাতে অতি সহজেই তা নিরসন করা সম্ভব। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর একটি বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়, যা ইমাম ইবনে আবী দাউদ (রহ.) কিতাবুল মাসাহিফ-এ বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন–

قال على بن ابى طالب رضى الله عنه لاتقولوا فى عثمان الا خيرا فوالله مافعل الذى فعل فى المصاحف الا عن ملا منا. فقال: ماتقولون فى هذه القراءاة.؟ فقد بلغنى ان بعضهم

সূচিপত্র

يقول: إن قراءتي خير من قراءتك. وهذا يكاد أن يكون كفرا. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد. فلا تكون فرقة. ولايكون اختلاف. قلنا: فنعم مارأيت

'অর্থ্যাৎ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তোমরা হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ব্যাপারে ভালো ব্যতীত কোনো সমালোচনা করো না। আল্লাহর শপথ! তিনি মাসহাফের ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সকলের উপস্থিতিতেই করেছেন। তিনি আমাদের নিকট পরামর্শ চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই ক্বেরাতের ব্যাপারে তোমাদের রায় কি? কারণ আমি জানতে পেরেছি যে কোনো কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলছে যে, "আমার ক্বেরাত তোমার ক্বেরাতের চেয়ে উত্তম।" অথচ এটা এমন কথা যা কুফরীর নিকট পৌছে যায়। তখন আমরা বললাম, এ ক্ষেত্রে আপনার রায় কি?

তিনি বললেন, আমার রায় হচ্ছে, আমরা মানুষকে একই মাসহাফের উপর সমবেত করে দেব। যাতে কোনো পার্থক্য ও মতানৈক্য বাকি না থাকে। আমরা বললাম, আপনি খুবই চমৎকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[২০৬]

এই হাদীসটি হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফ সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে সুস্পষ্ট একটি হাদীস। এতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, হযরত উসমান (রা.) نجمع الناس على مصحف واحد (আমরা মানুষকে একই মাসহাফের উপর সমবেত করে দেব)" বলে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, আমরা এমন একটি মাসহাফ প্রস্তুত করতে চাই, যা গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্য একই রকম হবে এবং এর মাধ্যমে পারস্পরিক মতানৈক্যের অবসান ঘটবে। এরপর কোনো বিশুদ্ধ ক্বেরাতকে অস্বীকার করার এবং রহিত বলার বা অপ্রচলিত ক্বেরাতের উপর চর্চা করার অবকাশ অবশিষ্ট থাকবে না।[২০৭]

অনুরূপ ইবনে আশতাহ (রহ.) হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে উদ্ধৃত করেন–

اختلفوا في القران على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون. فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال: عندي تكذبون به وتلحنون فيه. فمن تاى عني كان اشد تكذيبا وأكثر لحنا. ياأصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس امام.

'অর্থ্যাৎ হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি শিশুও শিক্ষকরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন, তোমরা

---

২০৬. "কিতাবুল মাসাহিফ" পৃ: ২২, ফাতহুল বারী : ৯/১৫ ইবনে আবী দাউদ (রহ.)

২০৭. আল-ইতকান : ১/৬১

সূচিপত্র

আমার কাছে থাকতেই (বিশুদ্ধ ক্বেরাতকে) অস্বীকার করছ এবং তাতে ভুল করছ! তাহলে যারা আমার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করছে, তারাতো আরো বেশি মিথ্যারোপ ও ভুল করতে থাকবে। সুতরাং হে মুহাম্মদের সাথীবৃন্দ! তোমরা একত্রিত হও এবং মানুষের জন্য এমন একটি অনুলিপি প্রস্তুত কর, মানুষ যার অনুসরণ করতে পারে।

এ বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো হরফ বিলুপ্ত করা হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁর তো এ ব্যাপারে আক্ষেপ ছিল যে, কোনো কেনো লোক বিশুদ্ধ ক্বেরাতকে অস্বীকার করছে। আর কেউ কেউ অশুদ্ধ ক্বেরাতের চর্চার উপর জোর দিচ্ছে। তাই তিনি মানদন্ড মূলক একটি কপি প্রস্তুত করতে চাইতেন। যা গোটা ইসলাম জগতের জন্য এক ও অভিন্ন রকম হবে।[২০৮]

لغت قریش پر لکھنے کا مطلب

কুরাইশী ভাষায় লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য ঃ

প্রকাশ থাকে যে,সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যখন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নেতৃত্বে কুরআনের মাসহাফ বিন্যাস দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নির্বাচন করলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন–

إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فى شئ من القران فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم

'যখন তোমাদের এবং যায়েদ ইবনে সাবেতের মাঝে কুরআনের কোনো অংশে মতানৈক্য হবে তখন তোমরা সেটাকে কুরাইশের ভাষা অনুযায়ী লিখবে। কেননা কুরআন তাঁদের ভাষাই নাযিল হয়েছে।'[২০৯]

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যদি সাত হরফের সবগুলোই অবশিষ্ট রাখতেন, তাহলে তাঁর এ নির্দেশের উদ্দেশ্য কি?

এর জবাব হচ্ছে ঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ওই বাক্য, যা দ্বারা হাফেয ইবনে জারীরসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বুঝে নিয়েছেন যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে মাসহাফে শুধু এক কুরাইশী হরফকে

---

২০৮. বহু উলামায়ে কেরাম হযরত উসমান (রা.)-এর এ পদক্ষেপের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। দেখুন, আল্লামা ইবনে হায্ম (রহ.) রচিত "الفصل فى الملل والأهوا والنحل ابن حزم" -এর ৭ম খণ্ডে ৭৭নং পৃষ্ঠা, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী (রহ.) রচিত "مناهل العرفان" এর দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ: ৬২ এবং মানাহিলুল ইরফান : ১/২৪৮-২৫৬।

২০৯. সহীহ বুখারী [ফাতহুল বারী সহ] : ৯/১৬

সূচিপত্র

অবশিষ্ট রেখেছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এ বাক্যটির উপর গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে এ কথা বুঝে আসে যে, এ বাক্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক নয় যে, তিনি বাকি ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। বরং সবগুলো রেওয়ায়েতের প্রতি সামগ্রিকভাবে তাকালে বুঝে আসে যে, এ বাক্য দ্বারা হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে রুসমেখতের দিক থেকে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তাহলে যেন কুরাইশী ভাষার রুসমেখত গ্রহণ করা হয়। এর প্রমাণ হলো, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নির্দেশনার পর সাহাবায়ে কেরামের দলটি যখন পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন তখন সমগ্র কুরআনুল কারীমের শুধু একটি স্থানে তাঁদের মাঝে মতানৈক্য হয়। ইমাম যুহ্‌রী (রহ.) এভাবে উল্লেখিত করেছেন-

فاختلفوا يومئذ فى التابوت والتابوه فقال النفر القرشيون التابوت وقال زيد بن ثابت التابوه فرفع اختلافهم الى عثمان فقال: اكتبوه التابوت فانه بلسان قريش نزل

'অতঃপর تابوت এবং تابوه শব্দের মধ্যে এসে তাঁদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কুরাইশী সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এটাকে (দীর্ঘ তা) দ্বারা লিখা হোক। আর যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন,(গোল তা দ্বারা) تابوت লিখা হোক। পরে তাঁদের এই মতানৈক্য হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কাছে গিয়ে পৌছল। তখন তিনি বললেন تابوت লিখ।কেননা কুরআন কুরাইশী ভাষায় নাযিল হয়েছে।[২১০]

অতএব, এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এবং কুরাইশী সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রুসমেখত-এর মতানৈক্য; ভাষাগত মতানৈক্য নয়।

মুরাদিফ সমার্থবোধক শব্দ দ্বারা তেলাওয়াতের মাসআলা ঃ

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবু বাক্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সাত হরফের মতানৈক্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা দেখে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই সাত হরফ মাসহাফে উসমানীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। কেননা তিনি বলেন-

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ

'হযরত জিবরাঈল (আ.) (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম))-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ কুরআনুল কারীমকে এক হরফের উপর পাঠ করুন। মিকাঈল (আ.) (রাসূ (সা.)-কে বললেন, এর সাথে আরও (হরফ) সংযোজন করুন। ফলে তি

---

২১০. কানযুল উম্মাল : ১/২৮২ হাদীস নং ৪৭৮৩

সূচিপত্র

সংযোজন করলেন। আর এভাবে তা সাত হরফ পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এর প্রত্যেকটিই নিরাময়কারী, যথেষ্ট। যতক্ষণ না আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াতের সাথে এবং রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সাথে মিশ্রিত করবে। এটা এমন হবে যে, আপনি تعال (আস)-কে اقبل هلم اسرع ও عجل শব্দ দ্বারা আদায় করবেন।'[২১১]

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাত হরফের মতানৈক্য মূলত সমার্থবোধক শব্দের মতানৈক্যই ছিল। অর্থাৎ এক হরফের ভিত্তিতে কোনো এক শব্দকে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার অন্য হরফের ভিত্তিতে সে শব্দেরই সমার্থবোধক অন্য আরেকটি শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ মাসহাফে উসমানীর মধ্যে যেসব ক্বেরাত সংকলিত হয়েছে, সেগুলোর মাঝে সমার্থবোধকের এই মতানৈক্য খুবই স্বল্প। ওই ক্বেরাত গুলোর মাঝে অধিকাংশই হরকত (কারক চিহ্ন), সীগা (শব্দরূপ), পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং উচ্চারণের মতবিরোধ সংঘটিত হয়েছে।

জবাব ঃ সাত হরফের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যে বক্তব্যটি গ্রহণ করেছি, এতে ক্বেরাত গুলোর মাঝে সাত প্রকারের মতপার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ওই প্রকারগুলোর মাঝে একটি প্রকার হলো, 'বদল' তথা সমার্থবোধক শব্দের মাধ্যমে পরিবর্তন করে পড়ার মতানৈক্য। হযরত আবু বাক্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এখানে সাত হরফের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। বরং এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন মাত্র। তাই মতানৈক্যের একটি মাত্র প্রকার অর্থাৎ শব্দের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন।

ক্বেরাতের বিভিন্নতার এই প্রকারটি অর্থাৎ শব্দের বিভিন্নতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক বেশি ছিল। যেহেতু গোটা আরববাসী কুরাইশী ভাষায় পুরোপুরি অভ্যস্ত ছিল না। তাই শুরুতে তাদেরকে এ সহজতা বেশি থেকে বেশি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শ্রবণকৃত পরিবর্তনশীল শব্দগুচ্ছ থেকে যে কোনো একটি শব্দ দ্বারা তেলাওয়াত করবে। তাই প্রথমে প্রথমে অধিকতর এমন ছিল যে, এক ক্বেরাতের মাঝে এক শব্দ এবং অন্য ক্বেরাতের মাঝে এর সমার্থবোধক অন্য শব্দ রয়েছে।

কিন্তু যখন মানুষ কুরআনের ভাষার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে উঠল, তখন ক্বেরাতের বিভিন্নতার এই প্রকারকে ধীরে ধীরে হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের পূর্বে রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দুইবার পবিত্র কুরআনুল কারীম দাওর করেন।

---

২১১. রেওয়ায়েতটি ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ নির্ভরযোগ্য। (আওজাযুল মাসালিক : ২/৩৫৭)

সূচিপত্র

ওই সময় অনেক শব্দ রহিত করা হয়েছে। আর এভাবে সমার্থবোধক শব্দগুলোর মতানৈক্যও হ্রাস পেয়ে গেল।

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজের মাসহাফে সে সকল সমার্থবোধক শব্দ সংকলন করেননি, যা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরযায়ে আখীরার সময় রহিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ সেগুলোর অবস্থান ছিল তেলাওয়াত রহিত হওয়া আয়াতসমূহের ন্যায়। অবশ্য ক্বেরাতের যে মতানৈক্য আরযায়ে আখীরায় অবশিষ্ট ছিল, হযরত ওসমান (রা.) সেগুলোকে হুবহু বহাল রেখেছেন। অতএব, হযরত আবু বাক্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হরফের বিভিন্নতার যে প্রকারটিকে উল্লিখিত হাদীসে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করেছেন, তা ওই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যার অধিকাংশ আরযায়ে আখীরার সময় রহিত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই তা মাসহাফে উসমানীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি এবং বর্তমান ক্বেরাতগুলোও সেগুলোকে শামিল করেনি।

مذکورہ بالا نتائج تین مقدمات سے مستنبط ہوتے ہیں:

উপরোল্লিখিত ফলাফলটি তিনটি ভূমিকা থেকে আহরিত হয়ঃ

১. আরযায়ে আখীরা (হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কুরআনের শেষ দাওর)-এর সময় পবিত্র কুরআনুল কারীমের বহু ক্বেরাত রহিত করা হয়েছিল।

২. হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মাসহাফে উসমানীকে আরযায়ে আখীরা অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন।

৩. হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফে সমার্থবোধক শব্দের ওই মতানৈক্য বিদ্যমান নেই যা হযরত আবু বাক্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় ভূমিকাটি তো একেবারে স্পষ্ট। আর দ্বিতীয় ভূমিকার প্রমাণপঞ্জি আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। যার মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্ট দলীল হচ্ছে হযরত উবায়দা সালমানী (রহ.)-এর এই ইরশাদ যে,"হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদেরকে যে ক্বেরাতের উপর সমবেত করেছেন, তা ছিল আরযায়ে আখীরা অনুযায়ী।[২১২]

এখন বাকি থেকে যায় প্রথম ভূমিকাটি। আর তা হলো, আরযায়ে আখীরার সময় অনেক কেরাত রহিত হয়ে গিয়েছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে মুহাক্কিক ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর এই ইরশাদ–

---

[২১২]. কানযুল উম্মাল : ১/২৮৬ হাদীস নং ৪৮৪

সূচিপত্র

ولاشك ان القرأن نسخ منه وغيرفيه فى العرضة الأخيرة فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة وروينابإسناد صحيح عن زرابن حبيش قال قال لى ابن عباس اى القراءتين تقرا؟ قلت الاخيرة قال فان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران على جبريل عليه السلام كل عام مرة قال فعرض عليه القران فى العام الذى قبض فيه النبى صلى الله عليه وسلم مرتين فشهد عبد الله يعنى ابن مسعود مانسخ منه ومابدل.

'অর্থ্যাৎ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আরযায়ে আখীরার সময় পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে অনেক কিছু রহিত হয়ে গেছে এবং এতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কেননা একাধিক সাহাবী থেকে এর স্পষ্টতা উদ্ধৃত রয়েছে। আমাদের কাছে সহীহ সনদসূত্রে হযরত যর ইবনে হুবাইশ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এ বক্তব্য পৌঁছেছে যে, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন ক্বেরাত পাঠ কর? আমি বললাম, শেষ ক্বেরাত। তিনি বললেন, প্রতি বছর রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ক্বেরাত শুনাতেন। যে বছর তিঁনি ইন্তেকাল করেছেন, সে বছর তিনি দুই বার হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। ওই সময় যা কিছু রহিত হয়েছে এবং যা পরিবর্তন হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার সাক্ষী ছিলেন।[২১৩]

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরযায়ে আখীরার সময় অনেক ক্বেরাত স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে রহিত করে দেওয়া হয়। হযরত আবু বাক্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সমার্থবোধক শব্দের যে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করেছেন, নিশ্চিত এর অধিকাংশই ওই সময় রহিত হয়ে গেছে। কেননা হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরযায়ে আখীরা অনুযায়ী মাসহাফ প্রস্তুত করেছিলেন। এর মধ্যে সমার্থবোধক শব্দের মতানৈক্য খুবই শায বা বিরল।

حضرت عبداللہ بن مسعود اوران کا مصحف

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর মাসহাফ ঃ

উপরোক্ত পর্যালোচনার উপর চতুর্থ প্রশ্ন এ হতে পারে যে, একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে মাসহাফ প্রস্তুত করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত সহীফাটিও আগুনে পোড়াননি। যদি হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছয় হরফকে বিলুপ্ত না করে থাকেন,

---

২১৩. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশ্‌র : ১/৩২, হাফেয ইবনে হাযার (রহ.)-ও বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনের বরাত দিয়ে এ বিষয়ে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। (ফাতহুল বারী : ৯/৩৬

সূচিপত্র

তাহলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এ আপত্তির কারণটা কি ছিল?

এপ্রশ্নের জবাব হচ্ছে ঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দু'টি অভিযোগ ছিল। প্রথমটি হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করার মহান কাজে তাঁকে কেন দায়িত্ব দেওয়া হলো না? দ্বিতীয়টি হলো, অন্যান্য মাসহাফগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হলো কেন?

সুনানে তিরমিযীর এক বর্ণনায় ইমাম যুহ্‌রী (রহ.) প্রথম অভিযোগের আলোচনা করেছেন। যার সারাংশ হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এ অভিযোগ ছিল যে,. কুরআন লিপিবদ্ধ করার মহান কাজ তাঁর দায়িত্বে কেন অর্পণ করা হলো না? যখন তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর তুলনায় অধিক সময় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্যে থেকে ধন্য হয়েছেন।

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) এ অভিযোগটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর জবাব ছিল যে, তিনি এ মহান কাজটি পবিত্র মদীনায় আরম্ভ করেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন কূফায় অবস্থান করছিলেন। আর হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর অপেক্ষায় থেকে এ মহান কাজটিকে আর বিলম্বিত করতে চাচ্ছিলেন না। উপরন্তু হযরত আবু বাক্‌রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উপরই এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাই হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও সমীচীন মনে করলেন যে, কুরআনের সংকলন এবং বিন্যাসের এ কাজটিও তাঁর হাতে সমাধা হোক।[২১৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল এই যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নতুন মাসহাফ প্রস্তুত করার পর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত সবগুলো মাসহাফ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তিনি তাঁর মাসহাফ পুড়িয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বুঝানোর জন্য তাঁর নিকট গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বললেন–

والله لاادفعه اليهم اقرانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاوسبعين سورة ثم ادفعه اليهم والله لاادفعه اليهم.

'অর্থ্যাৎ আল্লাহর শপথ! আমি এই মাসহাফ তাঁর নিকট সোপর্দ করবো না। আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্তরের চেয়ে অধিক সূরা শিক্ষা দিয়েছেন।

---

২১৪. ফাতহুল বারী : ৯/১৬

এরপরও আমি এই মাসহাফ তাঁকে দিয়ে দেব? মহান আল্লাহর শপথ! আমি এটা তাঁকে দেব না।'[২১৫]

যারা কূফায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অনুকরণে ব্যক্তিগতভাবে মাসহাফ প্রস্তুত করেছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁদেরকেও এ উৎসাহ দিলেন যে, তারা যেন তাদের মাসহাফ সোপর্দ না করে। হযরত খুমাইর ইবনে মালিক (রহ.) বলেন–

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَغُلَّ مُصْحَفَهُ فَلْيَغْلُلْهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً أَفَأَتْرُكُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟" ! . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي "مَسْنَدِهِ" عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ: إِنِّي غَالٌّ مُصْحَفِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

'অর্থ্যাৎ মাসহাফগুলোর মাঝে পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হলো। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (মানুষকে) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা নিজের মাসহাফকে লুকাতে সক্ষম হও, তারা লুকিয়ে রাখ।....অতঃপর তিনি বললেন, আমি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র যবান থেকে সত্তরটি সূরা শিখেছি। আমি কি ওই বিষয় ছেড়ে দেব, যা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জবান থেকে অর্জন করেছি।'[২১৬]

এখানে এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফটি উসমানী মাসহাফ থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল এবং তিনি সেটাকে সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে কোন বিষয়গুলো উসমানী মাসহাফ থেকে ভিন্নতর ছিল? সহীহ রেওয়ায়েত গুলোতে এর কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁর মাসহাফের মৌলিক পার্থক্য ছিল সূরার বিন্যাস। আর এ কথা আগেও বলা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেসব সহীফায় কুরআন সংকলন করেছিলেন, সেগুলোতে সূরাগুলো পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেগুলোতে কোনো বিন্যাস ছিল না। আর হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে কুরআন সংকলন করেছিলেন, তাতে সূরাগুলো একটি বিশেষ বিন্যাস অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ইমাম হাকেম (রহ.) লিখেন–

---

২১৫. মুসতাদরাক হাকেম : ২/২২৮, হাকেম (রহ.) বলেন, এটা সহীহ সনদবিশিষ্ট হাদীস। আল্লামা যাহাবী (রহ.) তা সত্যায়ন করেছেন।

২১৬. আল-ফাতহুর রব্বানী : ১৮/৩৫

সূচিপত্র

ان جمع القرأن لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله وسلم ثم جمع بعضه بحضرة ابى بكر الصديق والجمع الثالث هوفى ترتيب السورة كان فى خلافة امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهم اجمعين.

'কুরআন সংকলনের কাজ একবারেই সমাপ্ত হয়নি। বরং পবিত্র কুরআনুল কারীমের কিছু অংশ স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতিতেই সংকলন করা হয়েছিল। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে আরো কিছু সংকলন করা হয়েছিল। অতঃপর কুরআন সংকলনের তৃতীয় পর্যায়ে সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। যা ছিল আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাসনামলে।[২১৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফখানা হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফের সাথে বিন্যাসের দিক থেকে অনেকভাবে পার্থক্য ছিল। যেমন, এতে সূরা নিসা ছিল আগে আর সূরা আলে-ইমরান ছিল তার পরে।[২১৮] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্ভবত এই বিন্যাস অনুযায়ীই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে কুরআন শিখেছিলেন। তাই এই বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনকে রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইরাকের জনৈক অধিবাসী একদিন উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আসলো এবং বললো–

قال يا ام المؤمنين ارينى مصحفك قالت لم؟ قال لعلى اولف القران عليه يقرا غير مؤلف قالت ومايضرك أية قرأت قبل

'অর্থ্যাৎ সে বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে আপনার মাসহাফটি দেখান। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, কেন? লোকটি বলল, আমি (আমার) কুরআনের মাসহাফটি এর অনুকরণে বিন্যস্ত করবো। কেননা তা (আমাদের এলাকায়) অবিন্যস্ত অবস্থায়ই পড়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, কুরআনে যে অংশই আগে তুমি পড় না কেন, তা তোমার জন্য কোনো অসুবিধা হবে না।'[২১৯]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) লিখেন, এই ইরাকী ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ক্বেরাতের অনুসারী ছিলেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেহেতু নিজের মাসহাফে

---

২১৭. মুসতাদরাক হাকেম : ২/২২৯

২১৮. আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) ইবনে আশতা (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবন্মাসউদ (রা.)-এর মাসহাফের বিন্যাস নকল করেছেন। মাসহাফে উসমানীর সাথে যার প্রচুর গড়মিল রয়েছে। (আল-ইতকান : ১/৬৬)

২১৯. সহীহ বুখারী : কুরআন সংকলন অধ্যায়।

সূচিপত্র

পরিবর্তন করেননি এবং তা বিলুপ্তও করেননি, তাই এর বিন্যাস উসমানী মাসহাফের বিন্যাসের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, উসমানী মাসহাফের বিন্যাস অন্যান্য মাসহাফের বিন্যাসের তুলনায় অধিক সমীচীন ছিল। তাই এই ইরাকী লোকটি নিজের মাসহাফকে উসমানী মাসহাফের তুলনায় তারতিবের ভিন্নতা বলে আখ্যা দিয়েছেন।'[২২০]

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফে মৌলিক কিছু পার্থক্য ছিল, সূরাগুলোর বিন্যাস। এ ছাড়া রুসমেখতের পার্থক্যও থাকতে পারে এবং এতে এমন রুসমেখত অবলম্বন করা হয়েছে, যার মধ্যে উসমানী মাসহাফের ন্যায় সকল ক্বেরাতের জন্য অবকাশ থাকে না। অন্যথায় যদি হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী বলা হয় যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে শুধু এক হরফের উপর পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফ সেই পরিত্যক্ত হরফের কোনো একটির উপর লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তাহলে নিম্নোক্ত অভিযোগগুলো আরোপিত হয়।

১. সহীহ বুখারীর উল্লিখিত হাদীসে জনৈক ইরাকী ব্যক্তি শুধু সূরার বিন্যাসের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নতুবা যদি হরফের পার্থক্যও হতো, তাহলে তা ছিল অধিক গুরুত্বপর্ণ এবং অধিক গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হতো।

২. হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) ও অন্যান্যদের বক্তব্য অনুযায়ী সাত হরফ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সাত গোত্রের ভাষাকে বুঝানো হয়েছে। যদি এ কথা সঠিক হয়, তাহলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফের মাঝে কোনো পার্থক্য না থাকাই উচিত ছিল। কারণ এ বক্তব্য অনুযায়ী হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সবাইকে কুরাইশী হরফের উপর সমবেত করে সে অনুযায়ী মাসহাফ লিপিবদ্ধ করিয়ে ছিলেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ও কুরাইশী ছিলেন।

৩. হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) ও তাঁর অনুসারীগণ ছয় হরফ বিলুপ্ত করার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় দলীল হিসেবে (اجماع الصحابه) 'সাহাবায়ে কেরামের ইজমা'কে পেশ করেছেন। কিন্তু যদি হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অন্য কোনো হরফের উপর পাঠ করে থাকেন এবং এর লিখনকেও জায়েয মনে করে থাকেন, তাহলে এই ইজমা বা ঐক্যমত সংঘটিত হলো কি করে? যে ইজমার মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ন্যায় বিজ্ঞ ফকীহ সাহাবী শামিল নেই। এটাকে ইজমা বলার যুক্তি কোথায়? কেউ কেউ এই

---

২২০. ফাতহুল বারী : ৯/৩২

সূচিপত্র

দাবী করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর রায়কে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না।

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) লিখেন–

'ইবনে আবী দাউদ (রহ.) "ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পরবর্তীতে হযরত উসমানের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া" শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় লিখেছেন। তবে তিনি এই অধ্যায়ের অধীনে এমন কোনো সুস্পষ্ট রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে পারেননি, যা এই শিরোনামের খাপ খায়।'[২২১]

হাফেয ইবনে জারীর (রহ.)সহ অন্যান্যদের বক্তব্যের উপর আরোপিত এ অভিযোগগুলোর কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। কাজেই এটাই বিশুদ্ধ কথা যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাত হরফের সবগুলোই মাসহাফে উসমানীতে বাকি রেখেছেন। আর হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এ অভিযোগ ছিল না যে, ছয় হরফকে কেন বিলুপ্ত করা হয়েছে?[২২২] কারণ বাস্তবে এটা ঘটেই ছিল না। বরং তাঁর অভিযোগটা ছিল এই যে, যে মাসহাফগুলো আগে থেকেই লিপিবদ্ধ ছিল এবং যেগুলোর বিন্যাস ও রুসমেখত উসমানী মাসহাফ অনুযায়ী ছিল না, সেগুলো সঠিক হওয়া সত্ত্বেও নষ্ট করা হচ্ছে কেন?

গবেষণার ফলাফল ঃ تحقيق

"সাত হরফ"-এর বিতর্ক অনুমানের চেয়ে অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। বিধায় অবশেষে এ থেকে অর্জিত ফলাফলের সারাংশ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করছি। যেন মনে রাখতে সহজ হয়।

১. উম্মতের আসানী-সাধ্যের জন্য নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতকে যেন শুধু একটি পদ্ধতিকেই সীমাবদ্ধ রাখা না হয়। বরং বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেন তেলাওয়াতের অনুমতি প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতেই সাত হরফের উপর পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

২. সাত হরফে নাযিল হবার সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য হলো, এর ক্বেরাতের মধ্যে সাত প্রকারের বিভিন্নতা রাঁখা হয়েছে। যার আওতায় অনেকগুলো ক্বেরাত অস্তিত্বে এসে ছিল।

---

২২১. ফাতহুল বারী : ৯/৪০

২২২. মুসনাদে আহমদের মধ্যে কেবল একটি বর্ণনা এমন পাওয়া যায়, যা দ্বারা বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, হযরত উসমান (রা.) ছয় হরফকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর উপরই আপত্তি করেছিলেন। (ফাতহুর রাব্বানী : ১৮/৩৬) কিন্তু এটা এক মাজহুল তথা অপরিচিত ব্যক্তি থেকে বর্ণিত বলে নির্ভরযোগ্য নয়।

সূচিপত্র

৩. প্রথম দিকে মতানৈক্যের সাত প্রকারের মধ্যে শব্দমালা ও সমার্থবোধক শব্দের মতানৈক্যের প্রকারটি বেশ ব্যাপক ছিল। অর্থাৎ এমনটি অধিকতর হতো যে, এক ক্বেরাতে এক শব্দ আর অন্য ক্বেরাতে সে শব্দেরই সমার্থবোধক অন্য একটি শব্দ হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন আরববাসী কুরআনী ভাষার সাথে পরিচিত হতে লাগল, তখন মতানৈক্যের এই প্রকারটিও হ্রাস পেয়ে গেল। এমনকি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মৃত্যুর পূর্বে রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সর্বশেষ দাওর (عرضه اخيرة) করলেন, তখন এর মধ্যে এ ধরনের মতানৈক্য শূন্যের কোঠায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। বেশির চেয়ে বেশি শব্দরূপ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, বহুবচন, মারূফ (কর্তৃবাচ্য), মাজহুল (কর্মবাচ্য) এবং সুর-ভঙ্গিমার মতানৈক্য বাকি থাকল।

৪. আরযায়ে আখীরার সময় যে সব মতানৈক্য অবশিষ্ট ছিল, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেগুলোকে মাসহাফে এমনভাবে সংকলন করেছিলেন যে, সেগুলোকে নুকতা (বিন্দু) ও হরকত (কারক চিহ্ন) থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। এর ফলে এতে ক্বেরাতের অধিকাংশ মতানৈক্যের সংকুলান হয়ে গেছে। আর যেসব ক্বেরাতের এভাবে এক মাসহাফে সংকুলান হয়নি, সেগুলোকে অন্য মাসহাফে প্রকাশ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উসমানী মাসহাফে কোথাও কোথাও এক-এক, দুই-দুই শব্দের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

৫. হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এভাবে সাতটি মাসহাফ লিপিবদ্ধ করিয়েছেন এবং সেগুলোতে সূরাগুলোরও বিন্যাস দিয়েছেন। যখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সংকলিত মাসহাফগুলোতে সূরার কোনো বিন্যাস ছিল না। সাথে সাথে পবিত্র কুরআনুল কারীমের জন্য একটি রুসমেখতও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর যেসব মাসহাফ এই বিন্যাস ও রুসমেখতের বিপরীত ছিল সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছেন।

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাসহাফের তরতীব উসমানী মাসহাফের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তিনি যেহেতু তাঁর বিন্যাসকে বাকি রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর মাসহাফকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্য হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাতে সোপর্দ করেননি।

ساتھ حروف کے بارے میں اختلاف ارائی حقیقت ایک غلط فہمی کاازالہ

সাত হরফের ব্যাপারে একটি ভুল ধারণার অবসান ঃ

অবশেষে আরেকটি মৌলিক ভুল ধারণার অবসান ঘটানো জরুরী। আর সেটা হলো, "সাত হরফ"-এর উপরোক্ত আলোচনার পাঠক স্বাভাকিভাবে এ সন্দেহ ও সংশয়ে পড়তে পারে যে, মহান আল্লাহর সংরক্ষণে কুরআনুল কারীমের

ন্যায় মহাগ্রন্থ আজ পর্যন্ত কোনো ধরনের সামান্যতম পরিবর্তন ব্যতিরেকে সংরক্ষিত হয়ে চলে আসছে। তারপরও মুসলমানদের মাঝে সাত হরফ নিয়ে এত বড় মতানৈক্য সৃষ্টি হলো কি করে?

কিন্তু সাত হরফের আলোচনায় আমরা পেছনে যেসব মতামত ও বক্তব্য উল্লেখ করেছি, যদি গভীর দৃষ্টিতে সেগুলোকে অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে অতি সহজেই এসব সন্দেহ ও সংশয়ের অপনোদন হয়ে যায়। যে ব্যক্তিই এই মতানৈক্যের হাকীকত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, তার কাছে এ কথাটা একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ সকল মতানৈক্য শুধুমাত্র যুক্তি-তর্ক ও চিন্তা-প্রসূত। বাস্তব ক্ষেত্রে কুরআনের সত্যতা ও বাস্তবতা এবং কুরআন সংরক্ষিত থাকার উপর এই মতানৈক্যের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না। কারণ এ কথার উপর সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, বর্তমানে আমাদের নিকট যে আকৃতিতে পবিত্র কুরআনুল কারীম বিদ্যমান আছে, তা তাওয়াতুর বা বিশ্বস্ততার ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় আমাদের নিকট চলে আসছে।

এতে সামান্য কোনো পরিবর্তনও হয়নি। এ কথার উপরও সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের যতগুলো ক্বেরাত তাওয়াতুরের সাথে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সবগুলোই সহীহ। এগুলোর প্রত্যেকটি অনুযায়ীই পবিত্র কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করা যায়। আবার এ কথার উপরও উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মুতাওয়াতির ক্বেরাত ব্যতীত অপ্রচলিত ও বিরল যত ক্বেরাত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এ কথাও সর্বসম্মত যে, আরযায়ে আখীরা অথবা তারও পূর্বে যে সকল ক্বেরাতকে রহিত করা হয়েছে, স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সেগুলো পবিত্র কুরআনের অংশ হতে পারেনি।

এ কথাও সবার নিকট সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের সাত হরফের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল, তা ছিল শুধু শব্দগত। কিন্তু অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সবগুলো হরফ ছিল অভিন্ন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র কুরআনুল কারীমের এক ক্বেরাত বা এক হরফ অনুযায়ী কুরআন পাঠ করে, তাহলে কুরআনের বিষয়বস্তু তার অর্জিত হয়ে যাবে এবং কুরআনের দিক-নির্দেশনা অর্জন করার জন্য অন্য কোনো হরফ জানার প্রয়োজন পড়বে না। এর মাঝেও সামান্য কোনো মতানৈক্য নেই যে, হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে মাসহাফ প্রস্তুত করেছিলেন, তা পরিপূর্ণ সতর্কতা, হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ'র সত্যায়নের সাথে করেছিলেন। আর তাতে পবিত্র কুরআনুল কারীম ঠিক সেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে

সূচিপত্র

যেভাবে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এতে কোনো একজন মানুষেরও মতপার্থক্য হয়নি।[২২৩]

অতএব, যে মতানৈক্যের কথা পেছনের পৃষ্ঠা গুলোতে করা হয়েছে, তা শুধু এ ব্যাপারে যে, হাদীসে "সাত হরফ" দ্বারা উদ্দেশ্য কি ছিল? বর্তমানে যত মুতাওয়াতির ক্বেরাত বিদ্যমান রয়েছে, তা কি সাত হরফের উপর সন্নিবিষ্ট নাকি এক হরফের উপর? তা একটা যুক্তিগত ও দার্শনিক মতপার্থক্য মাত্র। যার দ্বারা জ্ঞানগত কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। তাই এর দ্বারা এ ধারণা করা একদম ভুল হবে যে, এসব মতানৈক্যের কারণে (নাঊযুবিল্লাহ) পবিত্র কুরআনুল কারীম বিতর্কিত হয়ে গেছে! এর উপমা কিছুটা এমন যে, একটি গ্রন্থের ব্যাপারে পুরো পৃথিবীর মানুষ ঐক্যমত পোষণ করে যে, এটা অমুক গ্রন্থকারের রচিত। ওই গ্রন্থকারের প্রতি এই গ্রন্থের সম্বন্ধ করা নির্ভরযোগ্য। এবং তিনি স্বয়ং ছাপিয়ে সেটার সত্যায়নও করলেন যে, এটা আমার রচিত গ্রন্থ এবং এ কপির আদলে এটা কেয়ামত পর্যন্ত ছাপানো যেতে পারে।

পরবর্তীতে মানুষের মাঝে এ মতানৈক্য সৃষ্টি হলো যে, ছাপানোর পূর্বে গ্রন্থকার তার পাণ্ডুলিপিতে শব্দগত কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছেন কিনা? নাকি প্রথমে যেমন ছিল তেমনি ভাবে সেটাকে প্রকাশ করেছেন? এটা স্পষ্ট যে, শুধু এতটুকু দার্শনিক মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে উহার হাকীকত বিতর্কিত হতে পারে না, যার উপর সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছে। অর্থাৎ এটা ওই গ্রন্থ যা গ্রন্থকার নিজেই ছাপিয়েছেন এবং নিজের দিকে এর সম্বন্ধ করেছেন।

আর কেয়ামত পর্যন্ত এটাকে প্রকাশ করার অনুমতিও প্রদান করেছেন। ঠিক তদ্রূপ গোটা উম্মত যখন এ কথার উপর একমত যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমকে মাসহাফে উসমানীতে হুবহু সেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এর সকল মুতাওয়াতির ক্বেরাত বিশুদ্ধ ও মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিলকৃত, তখন এই হাকীকত ওই সব দার্শনিক মতপার্থক্যের ভিত্তিতে বিতর্কিত হতে পারে না, যা সাত হরফের ব্যাখ্যায় উত্থাপিত হয়েছে।[আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

---

২২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যাঁরা মাসহাফকে বাকি রাখার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু মাসহাফে উসমানীর কোনো কথার উপর তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিমত পোষণ করেননি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাসিখ ও মানসূখ বা রহিত ও রহিতকারী : ناسخ ومنسوخ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ :

এতে "নাসিখ ও মানসুখ" শিরোনামে "নসখ" রহি তকরণের হাকীকত-সংজ্ঞা, ভ্রান্ত মতের খণ্ডনে প্রামাণিক ও যৌক্তিকভাবে নসখের স্বীকৃতি (গ্রহণযোগ্যতা), মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন আলেমদের মধ্যে নসখের পরিভাষাগত পার্থক্য, আল-কোরআনে ইখতিলাফসহ মানসূখ আয়াতের সংখ্যালোচনা ও উদাহরণ; ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তুলনামূলক নাতিদীর্ঘ আলোচনায় করেছেন।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো :

সূচিপত্র

নাসিখ ও মানসূখ বা রহিত ও রহিতকারী ঃ ناسخ ومنسوخ

নসখ বা রহিতকরণের হাকীকত ঃ نسخ کی حقیقت

প্রকাশ থাকে যে, উলূমুল কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, নাসিখ ও মানসূখ। এ আলোচনা বড়ই শক্তিশালী ও দীর্ঘ। তবে এখানে তার বিস্তারিত সকল বিষয় আলোচনার পরিবর্তে তৎসংশ্লিষ্ট শুধু মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে। (نسخ) নসখ-এর আভিধানিক অর্থ হলো, নিশ্চিহ্ন করা, বিলুপ্ত করা এবং দূরীভূত করা। আর এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো–

رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى

'কোনো শরঈ দলীল দ্বারা কোনো শরঈ হুকুমকে তুলে নেওয়া।'

'অর্থ্যাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো কোনো যুগের চাহিদা অনুপাতে একটি শরঈ হুকুম জারী করেন। অতঃপর অন্য এক যুগে এসে স্বীয় প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে ওই হুকুমকে বিলুপ্ত করে এর স্থলে নতুন আরেকটি হুকুম জারী করেন। হুকুম পরিবর্তনের এই বিষয়কে "নস্খ" বলা হয়। এভাবে পূর্বের যে হুকুমকে বিলুপ্ত করা হয় সেটাকে "মান্সুখ" এবং যে নতুন হুকুম প্রদান করা হয় সেটাকে "নাসিখ" বলা হয়।

প্রামাণিক ও যৌক্তিকভাবে নসখের স্বীকৃতি ঃ نسخ کا عقلی ونقلی ثبوت

ইহুদীদের ধারণা হচ্ছে, মহান আল্লাহ তা'আলার আহকাম ও বিধানের মধ্যে "নসখ" রহিত করন হতে পারে না। কারণ তাদের ধারণা মতে যদি 'নসখ'কে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এ কথা আবশ্যক হয়ে পড়বে যে, (নাঊযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহও নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলেন। তারা এ কথা বলে বুঝাতে চায় যে, যদি মহান আল্লাহ পাকের বিধি-বিধানে নাসিখ ও মানসূখকে মেনে নিতে হয় তাহলে এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ তা'আলা প্রথমে একটি বিধানকে সমীচীন মনে করেছিলেন; পরবর্তীতে (নাঊযুবিল্লাহ) নিজের ভুল প্রকাশ পাওয়ায় সেটাকে ফেরত নিয়েছেন! পরিভাষায় এটাকে "বুদা" অযোগ্য বলা হয়।

কিন্তু. ইহুদীদের এই অভিযোগ একেবারেই হালকা ও স্থূল দৃষ্টির .উপর ভিত্তিশীল। কেননা একটু চিন্তা করলেই এর বাতুলতা স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা "নসখ"-এর অর্থ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন নয়। বরং প্রত্যেক যুগে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিধি-বিধান প্রদান করতে হয়। আর মানসূখ (রহিতকৃত)-কে ভুল সাব্যস্ত করা নাসিখ (রহিতকারী)-এর কাজ নয়। বরং তার কাজ হলো, সে পূর্ববর্তী বিধান প্রয়োগের সময়-সীমা নির্ধারণ করে দেয় এবং এ কথা বলে দেয় যে, পূর্বের বিধানটি যতদিন পর্যন্ত চালু ছিল, ততদিনের জন্য সেটাই

সূচিপত্র

সমীচীন ছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তনের ভিত্তিতে নতুন একটি বিধানের প্রয়োজন। যে ব্যক্তিই সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারবে না যে, এ ধরনের পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে হেকমতে এলাহীর দাবী মাফিক এবং এটাকে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই দোষ বলা যাবে না। কেননা ওই ব্যক্তি যোগ্য হাকিম বা ডাক্তার নয়, যে রোগীকে সর্বাবস্থায় একই ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। বরং প্রকৃত ডাক্তার তো তিনিই, যিনি রোগী ও রোগের পরিবর্তনের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে তদানুযায়ী ব্যবস্থাপত্রে পরিবর্তন করেন।

আর এই বিষয়টা শুধু শরঈ বিধি-বিধানের সাথেই বিশেষিত নয়। বরং জগতের সকল কর্মশালা এই নিয়ম-নীতিতেই চলছে। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাবলে ঋতুগুলোর মধ্যে পরিবর্তন করতে থাকেন। কখনো শীত, কখনো গ্রীষ্ম, কখনো শরৎ, কখনো বসন্ত, কখনো বর্ষা আবার কখনো অনাবৃষ্টি আবার কখনো অতিবৃষ্টি। এ সকল পরিবর্তন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সুপরিপক্ক প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এগুলোকে "বুদা" বলে এর উপর এই অভিযোগ করতে শুরু করে যে, (নাঊযুবিল্লাহ) এতে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে পরিবর্তন এসে যায় যে, তিনি এক কালে শীতকে পছন্দ করেছিলেন, পরবর্তীতে ভুল ধরা পড়ায় তিনি গ্রীষ্মকে শীতের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন! তাহলে তাকে আহাম্মক বা নির্বোধ বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? শরঈ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নসখেরও অবস্থানটাও ঠিক তদ্রূপ যে, এটাকে "বুদা" সাব্যস্ত করে দোষ মনে করা চরম পর্যায়ের অদূরদর্শিতা এবং বাস্তবতা থেকে অন্ধ হয়ে যাওয়ার নামান্তর।

এখানে বলাবাহুল্য যে, আর এই নসখ শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীয়ারই বিশেষত্ব নয়। বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শরীয়তেও নাসিখ-মানসূখের এই ধারা প্রচলিত ছিল। যার বহু উদাহরণ বর্তমান বাইবেলে পাওয়া যায়। যেমন, বাইবেলে রয়েছে 'হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর শরীয়তে দুই বোনকে একই সাথে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ ছিল এবং স্বয়ং হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর দু'জন স্ত্রী লাইয়্যা এবং রাহিল পরস্পর সহোদরা বোন ছিলেন।[২২৪] কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে এসে এটাকে অবৈধ করে দেওয়া হয়েছে।[২২৫] হযরত নূহ (আ.)-এর শরীয়তে বিচরণকারী সকল প্রাণীই হালাল ছিল।[২২৬]

---

২২৪. বাইবেল : জন্ম শীর্ষক অধ্যায় : ২৯/৩০-৩২

২২৫. আহবার : ১৮/১৮

২২৬. বাইবেল : জন্ম শীর্ষক অধ্যায় : ৯/৩

কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে এসে অনেক প্রাণীই হারাম করে দেওয়া হয়েছে।[২২৭]

হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে তালাকের সাধারণ অনুমতি ছিল।[২২৮] পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.)-এর শরীয়তে ব্যভিচারের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অনুমতি ছিল না।[২২৯] মোটকথা, বাইবেলের নতুন ও পুরাতন অঙ্গীকারনামায় এ রকম বিশটি উদাহরণ পাওয়া যায়, যেগুলোতে নতুন হুকুম দ্বারা পুরাতন কোনো হুকুমকে মানসূখ (রহিত) করা হয়েছে।

نسخ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات کا فرق

নখসের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামাদের পরিভাষাগত পার্থক্য

"নসখ" শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে পরিভাষাগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যা জেনে নেওয়া জরুরী।

মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় "নসখ" ছিল বিস্তৃত অর্থ বহনকারী একটি শব্দ। এর মধ্যে এমন কতগুলো বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরবর্তী উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় যেগুলোকে নসখ বলা হয় না। যেমন, পূর্ববর্তীদের পরিভাষায় 'আম'-এর 'তাখসীস' তথা ব্যাপকত্বের বিশেষত্ব এবং 'مطلق'-এর 'تقييد' তথা সাধারণের নির্ধারণও নসখের অর্থের মধ্যে শামিল ছিল।

যদি এক আয়াতে ব্যাপকত্ব বাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে আর অন্য আয়াতে এটাকে বিশেষ কোনো প্রক্রিয়ায় বিশেষত্ব দান করা হয়, তাহলে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম প্রথমটাকে মানসূখ এবং দ্বিতীয়টাকে নাসিখ বলে আখ্যায়িত করতেন। যার উদ্দেশ্য হতো এটা যে, প্রথম হুকুমটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বরং উদ্দেশ্য হতো এটা যে, প্রথম আয়াতের ব্যাপকত্ব দ্বিতীয় আয়াত বিলুপ্ত করে দিয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

'অর্থ্যাৎ মুশরিক নারীকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না সে ঈমান আনে।'

এ আয়াতে "মুশরিক নারী" শব্দটি আম বা ব্যাপক। এ আয়াত দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে যে, যে কোনো মুশরিক নারীকেই বিবাহ করা হারাম।

---

২২৭. আহবার : ১১/৭ এবং ইসতেসনা : ১৪/৭

২২৮. ইসতেসনা : ২৪/-২

২২৯. ইনজিল মাত্তা : ১৯/১৫

সূচিপত্র

চাই সে মূর্তিপূজারী হোক কিংবা আহলে কিতাব হোক। কিন্তু অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

'অর্থ্যাৎ আর আহ্‌লে কিতাবের মধ্য হতে সতী-সাধ্বী নারীরা (তোমাদের জন্য হালাল)।'

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত "মুশরিক নারী" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, ওই সকল নারী যারা আহ্‌লে কিতাব নয়। কাজেই এই দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতের ব্যাপকত্বের মাঝে বিশেষত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ওই শব্দগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষ ধরনের মুশরিক নারীরা। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম এটাকেও নসখ বলতেন এবং প্রথম আয়াতকে মানসূখ এবং দ্বিতীয় আয়াতকে নাসিখ বলে আখ্যায়িত করতেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী উলামায়ে কেরামের নিকট নসখের অর্থ এত ব্যাপক নয়। তাঁরা শুধু ওই প্রকারকেই নসখ বলে থাকেন, যেখানে পূর্বের হুকুমকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

শুধু 'আম'-এর 'তাখসীস' এবং 'মুতলক'-এর 'তাকঈদ' কে তাঁরা নসখ বলেন না। তাই উপরোল্লিখিত উদাহরণে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম বলেন, এতে নসখ হয়নি। কেননা মূল হুকুম (মুশরিক নারীদের বিবাহের নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল রয়েছে। পার্থক্য শুধু এটুকু হয়েছে যে, দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রথম আয়াতের ভাব এত ব্যাপক ছিল না যে, এর মধ্যে আহ্‌লে কিতাব নারীরাও শামিল হয়ে যাবে। বরং তা আহ্‌লে কিতাব ব্যতীত অন্যান্য নারীদের সাথে বিশেষিত ছিল।

পারিভাষিক এই পার্থক্যের কারণে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের নিকট পবিত্র কুরআনুল কারীমে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। সাধারণ একটু পার্থক্যের কারণেই তাঁরা এক আয়াতকে মানসূখ এবং অন্য আয়াতকে নাসিখ আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা খুবই কম।[২৩০]

পবিত্র কুরআনুল কারীমে 'নস্‌খ'–এর আলোচনা قرآن کریم میں نسخ کی بحث

এ ব্যাপারে উম্মতের কোনো সদস্যের মতানৈক্য আছে বলে আমাদের জানা নেই যে, শরঈ বিধি-বিধানে নসখের ধারাবাহিকতা পূর্ববর্তী উম্মতদের যুগ থেকেই চলে আসছে এবং উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যার শরীয়তেও অনেক হুকুম মানসূখ হয়েছে। যেমন, প্রথম নির্দেশ ছিল যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ

---

২৩০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আল-ইতকান : ২/২২

সূচিপত্র

করে সালাত আদায় করতে হবে। পরবর্তীতে এই নির্দেশ মানসূখ করে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে মুসলমানদের মধ্যে কারো মতানৈক্য নেই।[২৩১]

তবে এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে নসখ হয়েছে কি-না? অন্য শব্দে এ মাসআলা এভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে কি এমন কোনো আয়াত বিদ্যমান আছে, যার হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে তবে তার তেলাওয়াত এখনও চালু আছে? জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের রায় হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ ধরনের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে, যার হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্য হতে আবু মুসলিম ইস্পাহানির বক্তব্য হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াত মানসূখ হয়নি। বরং সমস্ত আয়াতের উপর এখনো আমল করা ওয়াজিব। সেই আবু মুসলিম ইস্পাহানির অনুসরণ করে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও এই রায় ব্যক্ত করেছেন। আমাদের যুগের অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গও এই রায়ের প্রবক্তা। এ সকল ব্যক্তিবর্গ নসখের আয়াতসমূহের এমন ব্যাখ্যা করেন যে, যাতে নসখ স্বীকার করতে না হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, এ অবস্থানটা দলীল-প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল এবং তা মেনে নেওয়ার ফলে কুরআনের কিছু আয়াতের তাফসীরে এমন টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন পড়ে যা তাফসীরের মূলনীতির একেবারেই পরিপন্থী।

যে সকল ব্যক্তি পবিত্র কুরআনুল কারীমে নসখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না প্রকৃত পক্ষে তাদের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, নসখ একটি দোষের বিষয়, যা থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীম মুক্ত হওয়া উচিত। অথচ ইতোপূর্বে আপনি দেখেছেন যে, নসখকে দোষ হিসেবে ধারণা করা কত বড় দুর্বল চিন্তার পরিচায়ক। তারপর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, আবু মুসলিম ইস্পাহানি ও তাঁর অনুসারীরা সাধারণত ইহুদী-নাসারাদের মতো অস্বীকার করে না যে, আল্লাহ তা'আলার অনেক বিধানে নসখ হয়েছে। বরং তারা শুধু এ টুকু বলে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে নসখ নেই। নসখ যদি দোষের বিষয়ই হয়ে থাকে, তাহলে কুরআন বহির্ভূত আহকামের ক্ষেত্রে কিভাবে এ দোষের সৃষ্টি হলো? যখন সেগুলোও মহান আল্লাহ তা'আলারই আহকাম।

আর এটা যদি কোনো দোষের বিষয় না হয়ে থাকে, তাহলে যে বিষয় কুরআন বহির্ভূত আহকামে দোষের ছিল না সেটা কুরআনী আহকামের ক্ষেত্রে কি করে

---

২৩১. জামালুদ্দীন কাসেমী : "তাফসীরে কাসেমী" : ১/৩২

সূচিপত্র

দোষ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়? বলা হয়, এটা হেকমতে এলাহীর বিপরীত মনে হয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াত শুধু বরকতের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করার জন্য বাকি রাখা হবে এবং এর উপর আমলের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত করা হয়ে গেছে।[২৩২]

আর কেন এটাকে হেকমতে এলাহীর বিপরীত দাঁড় করানো হলো? অথচ পবিত্র কুরআনুল কারীমে 'হুকুম মানসূখ ও তেলাওয়াত বাকি' বিশিষ্ট আয়াতের মধ্যে অনেক কল্যাণও নিহিত থাকতে পারে। যেমন, এর দ্বারা শরঈ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকভাবে অবতীর্ণ হবার রহস্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মানুষকে স্বীয় আহকামের অনুসারী করার ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ হেকমত অবলম্বন করেছেন তা'ও জানা যায়। অনুরূপভাবে এর দ্বারা শরঈ আহকামের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় এবং এটাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানদের উপর কখন কি হুকুম জারী করা হয়েছিল। স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের কয়েক স্থানে পূর্ববর্তী উম্মতদের ওই সকল আহকামকে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যার শরীয়তে মানসূখ হয়ে গিয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ

'যারা ইয়াহূদী হয়েছে তাদের জন্য আমি যাবতীয় তীক্ষ্ণধার নখযুক্ত পশু হারাম করেছিলাম আর তাদের জন্য গরু-ছাগলের চর্বিও হারাম করেছিলাম, এগুলোর পিঠের কিংবা নাড়িভুড়ির বা হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি ছাড়া।'[২৩৩]

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা এখানে একটি মানসূখ হুকুমের উল্লেখ করেছেন। যদি পবিত্র কুরআনুল কারীমে কিছু রহিত হুকুমের আয়াতের তেলাওয়াত এ উদ্দেশ্যেই বাকি রাখা হয়, তাহলে এতে কোন বিষয়টা হেকমতে এলাহীর বিপরীত গিয়ে দাঁড়াল? উপরন্তু এ দাবী কে করতে পারে যে, সে মহান আল্লাহ পাকের সমস্ত হেকমত সম্পর্কে অবগত আছে?

---

[২৩২]. ম "কুরআনে মুহকাম" পৃ: ১২০, মজলিসে মাআরিফুল কুরন, দেওবন্দ : ১৩৮৬ হিজরী। মাওলানা আবদুস সামাদ রহমানি রচিত

[২৩৩]. সূরা আনআম : ১৪৬

সূচিপত্র

অথবা সে পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাপারে জানে যে, তা অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে কি কি হেকমত ছিল? যদি কোনো ব্যক্তির এ দাবী সঠিক না হয়– আর বাস্তবেই তা সঠিক হবার নয়, তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলার কোনো কাজের ব্যাপারে শুধু এ ভিত্তিতে কিভাবে অস্বীকার করা হয়ে যে, এর হেকমত আমরা জানতে পারিনি? যখন ওই কাজের বাস্তবায়ন শরঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

কাজেই বাস্তব কথা এটাই যে, যারা পবিত্র কুরআনুল কারীমে নসখের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, তাদের ভিত্তিটি একেবারে ভুল, যার উপর তারা নিজেদের চিন্তাধারার প্রাসাদ দাঁড় করিয়েছে। তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো কোনো আয়াতকে অনেক দূরবর্তী অর্থ দ্বারা এ জন্য সাজিয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে "নসখ" একটি দোষ। যা থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে মুক্ত দেখা এবং দেখানোই ছিল তাদের অভিপ্রায়। যদি তাদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নসখ কোনো দোষের বিষয় নয়; বরং ইহা হেকমতে এলাহীর বাস্তব দাবী, তাহলে তারা এ ধরনের আয়াতের তাফসীর তাই করবে, যা সাধারণভাবে করা হয়। কেননা প্রকাশ্য ও সচরাচর তাফসীর এটাই। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মতো আনয়ন করি। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'[২৩৪]

যে ব্যক্তিই কোনো পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত মুক্ত মস্তিষ্কে এ আয়াত পাঠ করবে, সে অবশ্যই এই আয়াত থেকে এ ফলাফল বের করতে সক্ষম হবে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে নসখের ধারাবাহিকতা স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্ণনা অনুযায়ীই চালু ছিল। পক্ষান্তরে আবু মুসলিম ইস্পাহানি ও তার অনুসারীরা বুঝে বা না বুঝে 'নসখ'কে একটা দোষ বলে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে তা থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করতে চায়। তারা উল্লিখিত আয়াতের দূরবর্তী জটিল ব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন তারা বলে যে, এই আয়াতে একটি কাল্পনিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কাল্পনিকভাবে আমি যদি কোনো আয়াতকে মানসূখ করি, তাহলে এর চেয়ে উত্তম বা সমমানের আয়াত নাযিল করি। এর দ্বারা বাস্তবেই কোনো আয়াতকে মানসূখ করা আবশ্যক হয় না। এর উপমা এমন যেমন এক পবিত্র আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

---

[২৩৪]. মাওলানা আবদুস সামাদ রহমানী রচিত "কুরআনে মুহকাম" পৃঃ ২১,মজলিসে মাআরিফুল কুরআন, দেওবন্দ : ১৩৮৬ হিজরী।

সূচিপত্র

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

'যদি রহমান (আল্লাহর)-এর সন্তান থাকতো, তবে আমি প্রথম তাঁর ইবাদতকারী হতাম।'[২৩৫]

নসখ অস্বীকারকারীরা বলে যে, এ আয়াতে যেমনিভাবে কাল্পনিক একটা অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা আবশ্যক নয় যে, বাস্তবেই মহান আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান আছে। অনুরূপভাবে উল্লিখিত আয়াতেও একটি কাল্পনিক দিক উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। যা বাস্তবায়িত হওয়ার আবশ্যকতা নেই।[২৩৬]

কিন্তু উল্লিখিত আয়াতের এই বিশ্লেষণ দূর-দূরান্তের মনগড়া জটিল ব্যাখ্যার চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে না। কারণ যদি পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতে কখনো নসখ না-ই হওয়ারই ছিল, তবে কাল্পনিকভাবেই এর উল্লেখ করা মহান আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন ছিল? পবিত্র কুরআনুল কারীমের শান কখনো এমন হতে পারে না যে, যা কখনো বাস্তবে উপস্থাপিত হবার নয়, বিনা কারণে কাল্পনিকভাবে উল্লেখ করে সেটার উপর হুকুম লাগানো হবে।

বাকি থাকল (ان كان للرحمن ولد الخ) "যদি রহমানের কোনো সন্তান থাকত..." আয়াতের কথা। এই আয়াতের মাঝে আর নসখের আয়াতের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মহান আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান জন্ম হওয়া এক অসম্ভব বিষয় (নাঊযুবিল্লাহ)। কাজেই এ আয়াতের পাঠক সাথে সাথেই বুঝে নেয় যে, এ কথাটি শুধুমাত্র কাল্পনিক বা কথার কথা হিসেবে বলা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো, যদি কথার কথা মহান আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান থাকতো, তাহলে আমি সবার আগে তার ইবাদত করতাম। কিন্তু যখন তাঁর কোনো সন্তান হতে পারে না, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কারো কোনো ইবাদত করার প্রশ্নই উঠে না। পক্ষান্তরে নসখের বাস্তবতা স্বয়ং আবু মুসলিম ইস্পাহানির নিকটও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে অসম্ভব নয়। কাজেই নসখকে কাল্পনিক বিষয় সাব্যস্ত করার কোনো অর্থ হতে পারে না।

আর এ কথাটি উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল দ্বারা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কতিপয় কাফের রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর এই অভিযোগ উত্থাপন করল যে, আপনি আপনার অনুসারীদেরকে প্রথমে একটি কাজের নির্দেশ দেন, তারপর আবার সেটা থেকে নতুন নির্দেশ

---

২৩৫. সূরা যুখরুফ : ৮১

২৩৬. মাওলানা আবদুস সামাদ রহমানী রচিত "কুরআনে মুহকাম" পৃ: ২১, মজলিসে মাআরিফুল কুরআন, দেওবন্দ : ১৩৮৬ হিজরী।

সূচিপত্র

নিয়ে আসেন কেন? এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[২৩৭] এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এই আয়াতে নসখকে স্বীকার করে নিয়ে তার হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে। নসখকে অস্বীকার করা হয়নি।

পবিত্রকুরআনে কারীমে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা : منسوخ آیات قرآنی کی تعداد

আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, মুতাকাদ্দেমীন পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় নসখের অর্থ বেশ ব্যাপক ছিল। তাই তাঁরা মানসূখ আয়াতের সংখ্যা অনেক বেশি সাব্যস্ত করেন। কিন্তু আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) মুতাআখখেরীন পরবর্তী উলামায়ে কেরামের পরিভাষা অনুযায়ী লিখেন যে, সমগ্র কুরআনে মাত্র উনিশটি আয়াত মানসূখ।[২৩৮]

অতঃপর শেষ জামানায় এসে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ওই উনিশটি আয়াতের মাঝে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে শুধুমাত্র পাঁচটির মধ্যে নসখকে স্বীকার করেছেন। আর বাকি আয়াতগুলোর মধ্যে ওঁই সকল তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যেগুলো অনুযায়ী আয়াতগুলোকে মানসূখ হিসেবে মেনে নিতে হয় না। সেগুলোর প্রত্যেকটি আয়াতের মধ্যেই হযরত শাহ সাহেবের ব্যাখ্যা অত্যান্ত যুক্তি ও বিবেকগ্রাহ্য। অবশ্য কোনো কোনো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্যও করা যেতে পারে। যাই হোক, তাঁর স্বীকৃত আয়াত পাঁচটি হচ্ছে–

১. সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

'তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, যখন তোমাদের কারও সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সেই ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তবে সে ব্যক্তি যেন সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে যায় পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য, মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা কর্তব্য।'[২৩৯]

মীরাস বা উত্তরাধিকার সম্পদ সংক্রান্ত বিধান নাযিল হবার পূর্বে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয করা হয়েছিল যে, সে মৃত্যুর পূর্বে নিজের পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করে যাবে, তার পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের কতটুকু করে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হবে? পরবর্তীতে মীরাসের আয়াত অর্থাৎ–يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ আয়াতটি অসীয়তের আয়াতকে মানসূখ করে দিয়েছে। আর স্বয়ং আল্লাহ পাক

---

২৩৭. আল্লামা আলুসী (রহ.) রচিত "রুহুল মাআনী" : ১/৩৫১

২৩৮. আল-ইতকান : ২/২২

২৩৯. সূরা বাকার : ১৮০

সূচিপত্র

রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজনের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের জন্য মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখন আর মৃত্যুর পূর্বে কোনো ব্যক্তির উপর অসীয়ত করা ফরয হয়নি।

২. সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে–

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ.

'তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে (ঐরূপ) একশ' জন থাকলে তারা একহাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কেননা তারা হচ্ছে এমন লোক যারা (ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে) কোন বোধ রাখে না।' [২৪০]

এ আয়াতটি যদিও বাহ্যিকভাবে একটি খবর। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে তা একটি নির্দেশ। আর তা হলো, মুসলমানদের জন্য দশগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করা থেকে পালায়ন করা জায়েয নেই। এ আয়াতকে পরবর্তী আয়াত দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে–

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

'(তবে) এখন আল্লাহ তোমাদের দায়িত্বভার কমিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তো জানেন যে তোমাদের ভিতর দুর্বলতা রয়ে গেছে, কাজেই তোমাদের মাঝে যদি একশ' জন ধৈর্যশীল হয় তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মাঝে এক হাজার (ঐ রকম) লোক পাওয়া যায় তাহলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার লোকের উপর জয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে (আছেন)।' [২৪১]

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুমকে সহজ-সাধ্য করে দিয়েছে এবং দশগুণ শত্রুর পরিবর্তে দ্বিগুণ শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এ সীমা অতিক্রম করে পালায়ন করা জায়েয নেই।

৩. হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কর্তৃক মানসূখ আয়াতের তৃতীয়টি হচ্ছে সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত–

لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

---

২৪০. সূরা আনফাল : ৬৫

২৪১. সূরা আনফাল : ৬৬

সূচিপত্র

'এরপর আপনার জন্য (এদের অতিরিক্ত) অন্য স্ত্রী গ্রহণ হালাল নয় এবং আপনার (বর্তমান) স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়, যদিও অন্যদের সৌন্দর্য আপনাকে বিমোহিত করে।' [২৪২]

এ আয়াতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অতিরিক্ত বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ করে দেওয়া হয়েছে। আর এ আয়াতের নাসিখ (মানসূখকারী) সেই আয়াত, যা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্তমান ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আয়াতটি হলো–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ.

'হে নবী (সা.)! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের মোহরানা তুমি প্রদান করেছ; ।'[২৪৩]

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এবং অন্যান্যদের বক্তব্য হলো, এ আয়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে যে, এ আয়াতে নসখ হওয়াটা নিশ্চিত নয়। বরং এ আয়াতের ওই তাফসীরও অত্যন্ত লৌকিকতা হীন ও সাদামাটা যা হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই দু'টি আয়াতও নিজেদের বর্তমান তারতীব বা ক্রমধারা অনুযায়ীই অবতীর্ণ হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু নারীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের সাথে আপনার বিবাহ হালাল। এরপর তার পরবর্তী আয়াত لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ এ বলা হয়েছে যে, এরা ব্যতীত অন্য নারীরা আপনার জন্য হালাল নয়।[২৪৪]

৪. হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কর্তৃক মানসূখ আয়াতের চতুর্থটি হচ্ছে সূরা মুজাদালাহ'র নিম্নোক্ত আয়াত–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (12)

"অর্থ্যাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন রসূলের সঙ্গে গোপনে কথা বল, তখন গোপনে কথা বলার আগে সদাক্বাহ দাও, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও অতি পবিত্র পন্থা। আর যদি সদাক্বাহ জোগাড় করতে না পার, তাহলে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'[২৪৫]

এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আয়াতটি হলো–

---

[২৪২]. সূরা আহযাব : ৫২
[২৪৩]. সূরা আহযাব : ৫০
[২৪৪]. তাফসীরে ইবনে জারীর।
[২৪৫]. সূরা মুজাদালাহ্ : ১২

সূচিপত্র

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

'অর্থ্যাৎ তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, তোমাদেরকে (নবীর সঙ্গে) গোপনে কথাবার্তা বলার আগে সদাক্বাহ দিতে হবে? তোমরা যদি তা না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, কাজেই তোমরা নামায কায়িম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর'[২৪৬]

এভাবে একান্তভাবে কানে কানে কথা বলার পূর্বে সদকা করার হুকুম রহিত করা হয়েছে।

৫. মানসূখ আয়াতের পঞ্চমটি হচ্ছে সূরা মুজ্জাম্মিলের নিম্নোক্ত আয়াত-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3)

'হে চাদর আবৃত! (রাসূল (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে) রাতে (তাহাজ্জুদ সালাতে) দাঁড়ান কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম।'[২৪৭]

এ আয়াতে রাতের কমপক্ষে অর্ধাংশ তাহাজ্জুদ সালাতে কাটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পরের আয়াত দ্বারা এতে সহজতা সৃষ্টি করে পূর্বের হুকুমকে রহিত করা হয়েছে। সেই আয়াতটি হলো–

عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

'তিনি [আল্লাহ তা'আলা] জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব, তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকুই পড়।'[২৪৮]

হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর তাহকীক অনুযায়ী তাহাজ্জুদের হুকুম প্রথমেও ওয়াজিব ছিল না। তবে এর উপর প্রথমে খুব গুরুত্ব ছিল এবং এর সময়ও ছিল বেশ প্রশস্ত। পরবর্তীতে এর গুরুত্বও হ্রাস পেয়েছে এবং সময়েরও তেমন পাবন্দি হয়নি।

এই সেই পাঁচ আয়াত, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী যা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, এই পাঁচটি উদাহরণ শুধু ওই ক্ষেত্রে, যার নাসিখ ও মানসূখ উভয়টা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান। এগুলো ব্যতীত সর্বসম্মত মত অনুযায়ী পবিত্র কুরআনুল কারীমে এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে, যেগুলোর নাসিখ পবিত্র কুরআনুল কারীমে রয়েছে, কিন্তু মানসূখ কুরআনে নেই। উদাহরণসরূপ, কেবলা পরিবর্তনের আয়াত।

---

২৪৬. সূরা মুজাদালাহ : ১৩

২৪৭. সূরা মুজ্জাম্মিল : ১-৩

২৪৮. সূরা মুজ্জাম্মিল : ২০

সূচিপত্র

আলোচনার ফলাফল ঃ نتيجة بحث

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা মূলত আমাদের উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতে নসখ পাওয়া যাওয়া [নাঊযুবিল্লাহ] কোনো দোষ নয়। যা থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে মুক্ত দেখানোর চেষ্টা করা হবে। বরং তা মহান আল্লাহ তা'আলার হেকমতের চাহিদা।

অতএব, কোনো আয়াতের কোনো তাফসীরকে শুধু এ ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় যে, এ তাফসীর অনুযায়ী কুরআনে নসখ আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। বরং তাফসীরের মূলনীতি অনুযায়ী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তাফসীরকে গ্রহণ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই। চাই তাতে আয়াতকে মানসূখ সাব্যস্ত করতে হোক না কেন?

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই ভালো জানেন।

সূচিপত্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ باب پنجم

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ

এ পরিচ্ছেদের শুরুতেই তার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করেছেন, যার বিবরণ হচ্ছে,

১। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ এবং তার পরবর্তী যুগে কীভাবে কুরআনুল কারীম সংরক্ষণ করা হয়েছে!

২। তা কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে!

৩। এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা কতটি ধাঁপ অতিক্রম করেছে!

৪। আলোচিত বিষয়ে নাস্তিক এবং অমুসলিমদের পক্ষ থেকে আগত সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টিকারী অপচেষ্টার জবাব প্রদান।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহর যুগ থেকে কোরআন সংরক্ষণ-পদ্ধতি নিয়ে পর্যায়-পর্যায়ভাবে আলোচনায় ব্রতী হন।

প্রথম পর্যায়ঃ রাসূলুল্লাহর যুগে কোরআন সংরক্ষণ-পদ্ধতি।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদ্ধতি ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর অন্তরে তা খোদাইকৃত রূপে বসে যাওয়া, যার ওয়াদা স্বয়ং রাব্বে কারীমই দিয়েছিলেন। পাশাপাশি আহলে আরব সাহাবায়ে কেরামও তা মুখস্থ করে নিত যত্নসহকারে। হাফেজে কোরআন সাহাবায়ে কেরামের ভাল রকমের একটি ফিরিস্তি উল্লেখ করেন এর সাথে। উল্লেখ্য, তৎকালীন যুগে এটিই ছিল বাণী সংরক্ষণের সর্বনিভ্রযোগ্য পদ্ধতি। হুজ্জিয়াতে হাদিস বইটির অধ্যায়নও উপকারী হবে ইন শা আল্লাহ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল লিপিবদ্ধকরণ। লিপিবদ্ধকারী সাহাবায়ে কেরামের নাম চল্লিশ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে এতে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ হযরত আবূ বকর (রাযি.)-এর যূগে সংরক্ষণ পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহর যুগে কোরআন যদিও লিপিবদ্ধ আকারেও সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু তা ছিল বিক্ষিপ্তাকারে। গাছের পাতায়, চামড়ার উপর, কারও কাছে পাঁচটি. আয়াত, কারও কাছে দশটি, আবার কোনো সাহাবীর কাছে আয়াতের সাথে তাফসীরও লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি স্বীয় যুগে বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্রিত আকারে রূপ দেন। এ অনুচ্ছেদে সংকলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট, হযরত আবূ বকর ও উমরের পরামর্শ, প্রথমদিকে হযরত উমরের বিরোধিতা, খলীফাতুল মুসলিমিনের আবেগঘণ বক্তব্য ও হযরত উমরের "শরহে ছদর", হযরত যায়েদের নিকট লিপিবদ্ধকরণের দায়িত্ব হস্তান্তর, তার মনোভাব,

সূচিপত্র

লিপিবদ্ধকরণ-পদ্ধতি ও সতর্কতা; ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত মাসহাফের মূলকপিগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে।

ততীয় পর্যায়ঃ হযরত উসমানের যুগ।

এ যুগে উম্মতের সহজতা এবং ঐক্যবদ্ধতার জন্যে কোরআনের উপর ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেয়া হয়। কেননা ইসলাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ায় কোরআনের কেরাতের সহজতার ব্যাপারে সকলেই অবগত না থাকায় একে অন্যের সাথে মতভেদ ও দোষারোপ করা শুরু হয়েছিল। এ আলোচনায় কোরআন সংকলনের কারণসহ পূর্ণ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সংকলনের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ্য,

১। হযরত আবূ বকর কর্তৃক সংকলিত মাসহাফ একত্রিত হলেও সূরার বিন্যাস ছিলং না। এতে সূরাগুলোর বিন্যাস দেয়া হয়।

২। এতে "রুসমে খত"লিখনপদ্ধতি সবগুলো স্থান পেয়েছে। যে কারণে তাতে নুকতা, বা হরকত কোনোটিই দেয়া হয়নি।

৩। হযরত আবূ বকরের সংকলন একটি কপিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা ৫, বা ৭টি সংকলনে উন্নিত হয় এবং তার একেকটি করে কপি বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়, ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্যায়ঃ তেলায়াত সহজীকরণের পদক্ষেপ।

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর "মাসহাফ" এর উপর সকল উম্মত ঐক্যমত পোষণ করেছে। এ লিখনপদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে কোরআন লিপিবদ্ধ করা এখন আর জায়েজ নয়। কিন্তু উসমানী মাসহাফ অনারবদের জন্য অতি কঠিন এবং পড়তে কষ্টকর ছিল। কেননা তাতে নুকতা এবং হরকত ছিল না। এ জটিলতা নিরসনকল্পে পরবর্তীতে কোরআনে নিম্নোক্ত খেদমত আঞ্জাম দেয়া হয়, যথাঃ

১। নুকতা সংযোজন। অবশ্য পূর্বে আহলে আরবের মধ্যে এটি প্রচলিত ছিল না। আর এর অনুপস্থিতিতে তাদের কোনো সমস্যাও হতো না। কিন্তু প্রয়োজনহেতু তা সংযোজন দরকার হয়ে পড়ে। এর প্রচলনকারী কে, সে ব্যাপারে আবুল আসাদ দুআইলী, "হযরত আলী নির্দেশক্রমে", কূফার গভণ্র . যিয়াদ বিন আবী সুফিয়ান, "আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এর নির্দেশে", "হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে" প্রমুখের নাম ইখতিলাফসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়াও পর্যায়ক্রমিকভাবে ২। হরকত, ৩। মনযীল, ৪। পারা, ৫। আখমাস ও আ'শার, ৬। রুকু, ৭। ওয়াকফ, বা যতিচিহ্ন। এসমস্ত বিষয়ের প্রকৃতি, ব্যবহার, উদ্ভাবক ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

পঞ্চম পর্যায়ঃ কোরআনুল কারীমের মুদ্রণ ।

এতে সর্বপ্রথম ছাপা কারখানায় কোরআন কারীম মুদ্রিত হওয়ার ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। পূর্বেকার প্রত্যেক যুগেই একটি দল ছিল, যারা কোরআন কারীম এর কপি তৈরি করাকেই নিজেদের মূখ্য কাজ বানিয়ে নিয়েছিল, আর এতে তারা শৈল্পিকভাবেও ঈর্ষণীয় অবদান রেখেছিল। এরপর ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ থেকে ১১১৩ হিজরীতে কোরআন ছাপা হয়। প্রথম-প্রথম ছাপা কোরআন মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। পরবর্তীতে আস্তে-আস্তে তা গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও এতে ইলমে কেরাতের উৎপত্তি, কেরাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত, ৭জন প্রসিদ্ধ, ৩জন এবং ১৪জন অন্যান্য কারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ, করত ভ্রান্তিগুলোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস ঃ تاریخ حفاظت قرآن

পবিত্র কুরআন নাযিলের ইতিহাস এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ করার পর এখন "কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস" বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। যার মধ্যে বর্ণনা করা হবে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ এবং তাঁর পরবর্তী যুগে কিভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীম সংরক্ষণ করা হয়েছে? তা কিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? এবং এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা কতটি ধাপ অতিক্রম করেছে? সাথে সাথে অমুসলিম ও নাস্তিকদের পক্ষ হতে যেসব সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করা হয়, এপরিচ্ছেদে সেগুলোর পরিপূর্ণ ও যুক্তি নির্ভর উত্তর প্রদান করা হবে।

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن

রাসূলে কারীম (সা.)–এর যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ঃ

পবিত্র কুরআনুল কারীম যেহেতু একসাথে পুরোটা অবতীর্ণ হয়নি; বরং প্রয়োজন ও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই নববী যুগে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মুকাবিলায় পবিত্র কুরআনুল কারীমকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, এ গ্রন্থকে কাগজ-কলমের চেয়ে কুরআনের হাফেযদের বক্ষের মাধ্যমে বেশি সংরক্ষণ করেছেন। যেমন, সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন–

(مُنْزِل عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ)

সূচিপত্র

'অর্থ্যাৎ আমি আপনার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করব, পানি যাকে ধুয়ে নিতে পারবে না।'

অর্থাৎ সাধারণত পৃথিবীর গ্রন্থসমূহের অবস্থা তো হলো যে, দুনিয়াবী বিপদ-মুসীবত ও দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তাইতো তাওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমকে এমনভাবে বক্ষে বক্ষে সংরক্ষণ করে দেওয়া হবে যে, তা বিনষ্ট হয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।[২৪৯] এ জন্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে সংরক্ষণ করার জন্য মুখস্ত করার প্রতি অধিক জোর দেওয়া হতো। প্রথম প্রথম যখন ওহী নাযিল হতো, তখনই তিনি এর শব্দগুলোকে বার বার উচ্চারণ করতেন, যেন তা ভালোভাবে মুখস্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে–

(لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)

'(এ সূরাহ অবতীর্ণ হওয়ার সময় আল্লাহর রসূল তা মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে আল্লাহ অভয় দিয়ে বললেন) তুমি অতিদ্রুত ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিভ নাড়াবে না। এর সংরক্ষণ ও পড়ানোর দায়িত্ব আমারই।'[২৫০]

এ আয়াতে সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমকে স্বরণ রাখার জন্য ওহী অবতীর্ণ হবার সময় রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্রুত বার বার শব্দ উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর মধ্যে এমন স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দিবেন যে, একবার ওহী অবতীর্ণ হবার পর তিনি আর সেটাকে ভুলতে পারবেন না। বাস্তবে হয়েছেও এমন যে, একদিকে তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো আর অপর দিকে তা তাঁর আত্মস্থ হয়ে যেত।

এভাবে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বক্ষ মোবারক পবিত্র কুরআনুল কারীমের এমন সুরক্ষিত ভান্ডারে পরিণত হয়েছিল, যার মধ্যে সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তি, সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সম্ভাবনাও ছিল না। উপরন্তু আরো অধিক সাবধানতার খাতিরে তিনি প্রতি বছর পবিত্র রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করে শোনাতেন। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দুইবার কুরআনুল কারীমের দাওর করেন (অর্থাৎ কুরআন শোনান এবং শুনেন)।[২০৫]

---

২৪৯. ইবনুল জাযারী কর্তৃক রচিত "আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর" : ১/৬

২৫০. সূরা কেয়ামাহ : ১৬-১৭

২০৫. সহীহ বুখারী ফাতহুল বারীসহ : ৯/৩৬

সূচিপত্র

অতঃপর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে শুধু পবিত্র কুরআনুল কারীমের অর্থই শিক্ষা দিতেন না। বরং তাঁদেরকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দও আত্মস্থ করাতেন। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামেরও কুরআন শেখা ও তা আত্মস্থ করার প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে, প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টায় থাকতেন। কোনো কোনো নারী সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-গণ নিজেদের শুধু এটাই মোহরানা হিসেবে দাবী করেছেন যে, স্বামীরা তাঁদেরকে কুরআনের শিক্ষা দিবেন। শত শত সাহাবায়ে কেরাম নিজেকে সব রকম ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে নিজের গোটা জীবন এ কাজের জন্যই ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।

তাঁরা শুধু পবিত্র কুরআনুল কারীমকে আত্মস্থই করেননি; বরং রাতের কেয়ামে সালাতে তা বার বার পাঠ করতেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসতেন, তখন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে আমাদের আনসারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কোনো একজনের দায়িত্বে দিয়ে দিতেন, যেন তিনি তাকে কুরআন শিক্ষা দেন। মসজিদে নববীতে কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারীদের আওয়াজ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ নির্দেশ প্রদান করতে হয় যে, প্রত্যেকে যেন আরো আস্তে আওয়াজ করে। যেন কোনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।[২০৬]

আরবরা তাদের বিস্ময়কর স্বরণশক্তির জন্য গোটা দুনিয়ায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল। শত শত বছর গোমরাহীর অন্ধকারে দিশেহারা থাকার পর পবিত্র কুরআনুল কারীমের সেই হেদায়েতের বাতিঘর তাঁরা লাভ করেছিলেন, যেটাকে তাঁরা নিজেদের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মূলধন মনে করতেন। তাই সেটাকে আত্মস্থ করার জন্য তাঁরা কত রকম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপই না গ্রহণ করেছেন! এর অনুমান কেবল তারাই করতে পারবে, যারা তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত আছেন।

যার ফলে অল্প কয়েক দিনে সামান্য কিছু দিনের ব্যবধানেই সাহাবায়ে কেরামের বিশাল একটি দল তৈরি হয়ে গেল, পবিত্র কুরআনুল কারীম যাদের টাটকা মুখস্থ ছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হাফেযে কুরআনের ওই দলে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত তালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত সা'দ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু),

---

২০৬. মানাহিলুল ইরফান : ১/২৩৪

সূচিপত্র

হযরত সালিম ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উম্মে ওয়ারাকাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু হালীমা মুআয (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মুজাম্মাহ ইবনে জারিআহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উকবা ইবনে আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত তামীমে দারী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু মূসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং হযরত আবু যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ন্যায় ব্যক্তিগণ শামিল ছিলেন।[২৫১]

এগুলো তো শুধু ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের সম্মানিত নাম, যাদের নাম "হাফেযে কুরআন" হিসেবে রেওয়ায়েতে সংরক্ষিত হয়েছে। নতুবা এ ধরনের অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম রয়েছেন, যারা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করেছিলেন। কিন্তু এভাবে তাঁদের নাম রেওয়ায়েতে সংরক্ষিত থাকেনি। এর প্রমাণ এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো একটি গোত্রের জন্য সত্তরজন করে কুরআনের প্রশিক্ষক সাহাবী কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। যেমন, গাযওয়ায়ে বি'রে মাঊনা'র সময় সত্তরজন ক্বারী সাহাবীর শহীদ হওয়ার কথা রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর ইয়ামামাহ্'র যুদ্ধেও প্রায় এই পরিমাণ সংখ্যক হাফেয সাহাবী (রা.)-গণ শাহাদাত বরণ করেন।[২৫২]

এছাড়া এগুলো তো শুধু ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম যাদের মুখস্ত ছিল। আর ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের তো হিসাব কষা-ই কঠিন, যারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন অংশ মুখস্ত করে রেখেছিলেন।[২৫৩]

মোটকথা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে সংরক্ষণের জন্য বুনিয়াদী পদ্ধতি এটাই অবলম্বন করা হয়েছিল যে, অধিক থেকে অধিক কুরআনুল কারীম মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হয়। ওই অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ ও ভরসাপোযোগী। কারণ ওই যুগে লেখা-পড়া জানে এমন

---

২৫১. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/৬, আল-ইতকান : ১/৩-৪ ও তারিখুল কুরআন : পৃ: ৬০
২৫২. উমদাতুল কারী : ২০/১৬-১৭
২৫৩. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : ১/২৪১-২৪৩

সূচিপত্র

লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। বই-পুস্তক প্রকাশ করার জন্য ছাপাখানা ও অন্যান্য উপকরণও বিদ্যমান ছিল না। তাই ওই সময়ে যদি লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তাহলে কুরআনুল কারীমকে ব্যাপকভাবে প্রচার করাও যেত না এবং নির্ভরযোগ্য পন্থায় তা সংরক্ষণও সম্ভব হতো না।

তাই মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আরববাসীদের স্মৃতিশক্তিতে এমন প্রখরতা দান করেছিলেন যে, এক এক জন ব্যক্তি হাজার হাজার কবিতার মুখস্থকারী ছিল। সাধারণ থেকে সাধারণ একজন বেদুঈনের শুধু নিজের এবং নিজের বংশেরই নয়; বরং নিজের ঘোড়ার নসবনামাও মুখস্ত থাকতো। তাই পবিত্র কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত ও সূরাগুলো আরবের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।

যার ফলে কত দ্রুত পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রচার ও প্রসার লাভ হয়েছে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। হযরত ওমর ইবনে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নববী যুগে খুবই অল্প বয়সী সাহাবী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল একটি ঝর্ণার পাশে। যেখানে পথিক মুসাফিররা আরাম-বিশ্রাম করতো। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন না। কিন্তু যাতায়াতকারী মুসাফিরদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও সূরা শুনে শুনে মুসলমান হবার পূর্বেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

নববী যুগে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধকরণ ঃ عہد رسالت میں کتابت قرآن

প্রথম ধাপঃ

পবিত্র কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের মূল ভিত্তি যদিও মুখস্থের উপর ছিল, তথাপি মুখস্ত করানোর সাথে সাথে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে কাতেব বর্গের প্রধান হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজের এক হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة، وعرق عرقاً شديداً... فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف، أو كسرة. فأكتب وهو يملي علي... فإذا فرغت. قال :اقرأ. فأقرؤه. فإن كان فيه سقط أقامه. ثم أخرج به إلى الناس

'অর্থ্যাৎ আমি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ওহী লিপিবদ্ধ করতাম। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, তখন তাঁর দেহ মোবারক প্রচুর ঘর্মাক্ত হয়ে

সূচিপত্র

যেত। পবিত্র দেহে ঘামের ফোঁটা মুক্তোর দানার ন্যায় টলে টলে পড়ত। যখন এ অবস্থা শেষ হয়ে যেত তখন আমি দুম্বার চওড়া হাড় কিংবা এর স্বাদৃশ্য লিখনিযোগ্য কোনো বস্তু নিয়ে হাজির হতাম। আমি লিখতে থাকতাম আর তিনি লিখাতে থাকতেন। এমনকি যখন আমি লেখা শেষ করতাম, তখন কুরআন নকল করার ওজনে আমার কাছে এমন অনুভব হতো যেন আমার পা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমি আর কখনো আমার পায়ের উপর চলতে পারব না। লেখা সমাপ্ত হলে তিনি বলতেন, "পড়"।

আমি তাঁকে পড়ে শুনাতাম। আমি কোনো ভুল-ত্রুটি করলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। তারপর সেটাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসতাম।[২৫৪]

প্রকাশ থাকে ওহী লিপিবদ্ধ করার এ কাজ শুধু একা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর উপরই সোপর্দ ছিল না; বরং তিনি আরো অনেক সাহাবীকে এ মহান কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যারা প্রয়োজন অনুযায়ী ওহী লিপিবদ্ধকারীদের সংখ্যা চল্লিশ পর্যন্ত শুমার করা হয়েছে।[২৫৫]

তবে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ হলেন, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত যুবাইর ইবনে আউয়াম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত হানযালা ইবনুর রুবী' (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মুআইকিব ইবনে আবী ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আয্ যাহ্‌রী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)[২৫৬], হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)।[২৫৭]

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই নিয়ম ছিল যে, যখনই পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো অংশ নাযিল হতো, তখন তিনি ওহী লেখকদের এ নির্দেশনা প্রদান করতেন যে, এটাকে অমুক সূরার অমুক

---

[২৫৪]. তবারাণী (রহ.) রচিত "মু'জামুল আওসাত"–নুরুদ্দীন হাইসামী কর্তৃক রচিত "মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/১৫২ দ্বারা উদ্ধৃত।

[২৫৫]. "উলূমুল কুরআন" পৃ: ১০১, সবহী সালেহ রচিত এবং গোলাম আহমদ হারীরি অনূদিত

[২৫৬]. এ পর্যন্ত নামগুলো ফাতহুল বারী ৯/১৮ থেকে সংগৃহীত।

[২৫৭]. এ সকল ব্যক্তির নাম জানার জন্য দেখুন, ইবনুল কায়্যিম (রহ.) রচিত "যাদুল মাআদ" ১/৩০।

সূচিপত্র

অমুক আয়াতের পরে লিখ।[২৫৮] সুতরাং এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী লিখা হতো। তখনকার যুগে যেহেতু আরব দেশে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাই কুরআনের আয়াত অধিকতর পাথরের গায়ে, চামড়ার কাগজে, খেজুরের ডালায়, বাঁশের চটিতে, গাছের পাতায় এবং পশুর হাড়ে লিখা হতো। অবশ্য কখনো কখনো কাগজের টুকরোও ব্যবহার করা হয়েছে।[২৫৯]

এভাবে নববী যুগে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআনুল কারীমের একটি কপি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। যদিও তখন গ্রন্থাকারে ছিল না; বরং পৃথক পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল। এর সাথে সাথে কোনো কোনো সাহাবী নিজের মুখস্ত রাখার জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো কোনো আয়াত নিজের কাছে লিখে রাখতেন। আর এই ধারাবাহিকতা ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে চালু ছিল। যার প্রমাণ নিম্নের ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো, হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে রাগান্বিত হয়ে যখন তাঁদের ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সেখানে কুরআনের একটি সহীফা বা পান্ডুলিপি পেলেন। যার মধ্যে সূরা 'ত্বহা'র আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ ছিল এবং হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তা পাঠ করছিলেন।[২৬০]

এছাড়াও একাধিক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, অনেক সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণ ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ কপি লিপিবদ্ধ করে নিজের সংরক্ষণে রেখে দিয়েছিলেন। যেমন সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارض العدو

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআনকে নিয়ে শত্রুর ভূমিতে সফর করতে নিষেধ করেছেন।'[২৬১]

অনুরূপভাবে মু'জামুল আওসাতেও একটি রেওয়ায়েত এসেছে।

---

[২৫৮]. মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান ও হাকেমের উদ্ধৃতিসহ "ফাতহুল বারী" : ৯/১৮ ইবনে হিব্বান ও হাকেম (রহ.) এটাকে সহীহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

[২৫৯]. ফাতহুল বারী : ৯/১১, উমদাতুল কারী : ২০/১৭

[২৬০]. সূনানে দারাকুতনী : ১/১২৩, আল্লামা হাইসামী রচিত "মাজমাউয যাওয়াইদ" : ৯/৬১, সীরাতে ইবনে হিশাম : যাদুল মাআদের টীকা'য় ১/১৮৬-১৮৭– হাফেয যায়লাঈ (রহ.) এ ঘটনাকে সনদের দিক থেকে উত্তম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। [নসবুর রাইয়াহ]

[২৬১]. সহীহ বুখারী : কিতাবুল জিহাদ : ১/৪১৯-৪২০

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

قرأة الرجل فى غير المصحف الف درجة وقرأته فى المصحف تضاعف فى ذلك الفى درجة.

'কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের কপি না দেখে তেলাওয়াত করে তাহলে তার সওয়াব এক হাজার। আর যে দেখে তেলাওয়াত করে তার সওয়াব দুই হাজার।'[২৬২]

উপরোক্ত দুটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, নববী যুগ থেকেই সাহাবায়ে কেরামের নিকট কুরআনের পান্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। আর যদি এমনটি না হতো তাহলে পবিত্র কুরআনুল কারীম দেখে পাঠ করার বা তা নিয়ে শত্রুর এলাকায় সফর করার প্রশ্নই উঠতনা।

حضرت ابو بکر رضی کے عہد میں جمع قرآن

হযরত আবু বকর (রা.)–এর যুগে পবিত্র কুরআন জমা করণেরঃ

দ্বিতীয় ধাপ ঃ

যেহেতু নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে পবিত্র কুরআনুল কারীমের যতগুলো কপি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেগুলোর অবস্থা ছিল এমন যে, হয়তো বিভিন্ন বস্তুর উপর লিপিবদ্ধ ছিল। কোনো আয়াত চামড়ার উপর, কোনো আয়াত গাছের পাতায় আবার কোনো আয়াত হাড়ের উপর। অধিকাংশই ছিল অসম্পূর্ণ কপি। কোনো সাহাবীর কাছে একটি সূরা লিপিবদ্ধ ছিল। কারো কাছে পাঁচ-দশটি সূরা। কারো কাছে শুধু কয়েকটি আয়াত। আবার কোনো কোনো সাহাবীর কাছে আয়াতের সাথে তার তাফসীর বাক্য ও লিপিবদ্ধ ছিল।

এপ্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নিজের খেলাফত কালে পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্রিত করে তা সংরক্ষণ করাটাকে অত্যন্ত জরুরী মনে করলেন। হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) যেসব অবস্থার প্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং যেভাবে তা সম্পন্ন করে ছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বর্ণনা করেন যে, ইমামামাহ্'র যুদ্ধের পর পরই একদিন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) আমাকে জরুরীভাবে তলব করলেন। (আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-উপস্থিত ছিলেন।)

হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) আমাকে বললেন,"হযরত ওমর এইমাত্র এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, ইয়ামামাহ্'র যুদ্ধে হাফেযে কুরআনদের বিরাট একটি দল শহীদ হয়ে গেছেন। আর এভাবে যদি হাফেযগণ শহীদ হতে থাকেন, তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, পবিত্র আল-কুরআনের বিরাট একটা

---

[২৬২]. মাজমাউয যাওয়াইদ : ৭/১৬৫–

অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই আমার মত হলো, আপনি আপনার নির্দেশ প্রদান করে কুরআনুল কারীমকে সংকলন করার কাজ আরম্ভ করে দিন।" আমি হযরত ওমরকে বললাম, যে কাজ রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে করেননি, তা আমরা কিভাবে করতে পারি? হযরত ওমর (রা.) উত্তর দিলেন, মহান আল্লাহর কসম! এ কাজ অনেক উত্তমই হবে।

এভাবে হযরত ওমর আমাকে বারবার তাগিদ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার অন্তরও এ দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবং আমিও হযরত ওমরের সাথে একমত হয়ে গেলাম, অতপর হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) আমাকে বললেন, "তুমি একজন নওজোয়ান এবং সমঝদার মানুষ। তোমার ব্যাপারে আমার কোনো বিরূপ ধারণা নেই। তুমি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ওহী লিপিবদ্ধ করতে। অতএব, তুমি কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহকে তালাশ করে সেগুলোকে একত্রে জমা কর।"

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, মহান আল্লাহর কসম! যদি তাঁরা আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন, তবু বোধ হয় তা আমার কাছে এত কঠিন মনে হতো না, যত কঠিন মনে হতে লাগল কুরআন সংকলনের কাজটি। আমি তাঁকে বললাম, আপনি ওই কাজ কি করে করতে চাচ্ছেন, যে কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেন নি? হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) উত্তরে আমাকে বললেন, মহান আল্লাহর শপথ! এ কাজ উত্তম-ই উত্তম হবে। বার বার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়কেও এ রায়ের প্রতি উন্মুক্ত করে দিলেন, যার প্রতি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর হৃদয়কে। এভাবে আমি কুরআনের আয়াত তালাশ করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাথরের গা এবং মানুষের বক্ষ থেকে কুরআন সংকলন করলাম।[২৬৩]

এখানে কুরআন জমা করার ক্ষেত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়ার দরকার। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, তিনি নিজেও একজন কুরআনের হাফেয ছিলেন। কাজেই তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ কুরআন লিখতে পারতেন। এ ছাড়া শত শত হাফেযও তখন বিদ্যমান ছিলেন। হাফেযদের একটি দলকে সমবেত করেও কুরআন লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমের যে কপিটি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ওই কপি থেকেও কুরআনুল কারীম

---

২৬৩. সহীহ বুখারী ফাতহুল বারী সহ : ৬/৮-১১

সূচিপত্র

নকল করে লিখতে পারতেন। কিন্তু তিনি অধিকতর সাবধানতার অবলম্বনের জন্য এ সবগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করেননি। বরং তিনি একই সময়ে এ সবগুলো পদ্ধতি দ্বারা কাজ করেছেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আয়াত প্রণীত সহীফায় স্থান দিতেন না, যতক্ষণ সেটার লিখিত ও মৌখিকভাবে মুতাওয়াতির হবার প্রমাণ তিনি না পেতেন। এতদ্ব্যতীত নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআনুল কারীমের যেসব আয়াত নিজের তত্ত্বাবধানে লিখিয়ে ছিলেন, সেগুলো বিভিন্ন সাহাবীর নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেগুলোকে একত্রিত করেছেন।

যেন নতুন কপিটি সেগুলো থেকেই নকল করা যায়। যেমন, ব্যাপকভাবে সর্ব সাধারণের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে, "যার কাছে কুরআনের কোনো আয়াত লিখিত থাকে, সে যেন তা হযরত যায়েদের কাছে নিয়ে আসে।"[২৬৪] আর যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে পবিত্র কুরআনুল কারীমের লিখিত কোনো আয়াত নিয়ে আসতেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সত্যায়ন করতেন।

১. সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে মিলিয়ে তা পরিমাপ করতেন।

২. এবং হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও হাফেয ছিলেন। আর রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকেও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর সাথে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো আয়াত নিয়ে উপস্থিত হতো, তখন তাঁরা উভয়ে যৌথভাবে সেটাকে সংগ্রহ করতেন।[২৬৫] কাজেই হযরত যায়েদ (রা.) ছাড়াও হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও নিজের স্মৃতির সাথে মিলিয়ে সেটার সত্যায়ন করতেন।

৩. এমনকি লিখিত কোনো আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হতো না, যতক্ষণ না দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দিত যে, এ আয়াত রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে লিখা হয়েছিল। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, এ সাক্ষ্য এর উপরও নেওয়া হতো যে, লিখিত এই আয়াতটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের বছর তাঁর নিকট পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি এই সত্যায়ন করে দিয়েছেন যে, এটি ওই সাত হরফ অনুযায়ী, যার উপর পবিত্র কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে।[২৬৬] বহু রেওয়ায়েত দ্বারা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

---

২৬৪. ফাতহুল বারী : ৯/১১ ইবনে আবী দাউদ কর্তৃক রচিত 'কিতাবুল মাসাহিফের উদ্ধৃতিসহ।

২৬৫. প্রাগুক্ত

২৬৬. আল-ইতকান : ১/৬০

সূচিপত্র

৪. অতপর এই লিখিত আয়াতগুলোকে বিভিন্ন সাহাবা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পান্ডুলিপির সাথে তুলনা করা হতো।[২৬৭]

হযরত ইমাম আবু শামাহ (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অধিক থেকে অধিকতর সতর্কতাই ছিল এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শুধু স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে সরাসরি ওই কপি থেকে আয়াতগুলো নকল করা হয়েছে, যা স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে লিখা হয়েছিল।[২৬৮]

হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর যুগে কুরআন সংকলনের এই পদ্ধতির কথা স্মৃতিতে থাকলে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এই কথাটির অর্থ সঠিকভাবে বুঝে আসতে পারে। তিনি বলেছিলেন,"সূরা তাওবার শেষ আয়াত-لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ الخ। থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটুকু আমি একমাত্র আবু খুযাইমা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট থেকে পেয়েছি। তিনি ছাড়া আর অন্য কারো কাছে আমি তা পাইনি।" এর অর্থ কক্ষনো এটা নয় যে, এ আয়াত কয়টি একমাত্র হযরত আবু খুযাইমা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ছাড়া আর কারো স্মৃতিতে ছিল না বা অন্য কারো নিকট লিখিত ছিল না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এটাকে কুরআনের আয়াত বলে জানতেন না।

বরং এ কথার অর্থ এই যে, যে সকল ব্যক্তি রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক লিখানো পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে আসতেন, তাদের মধ্য হতে হযরত আবু খুযাইমা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ব্যতীত অন্য কারো কাছে এই আয়াত পাওয়া যায়নি। অন্যথায় এ আয়াত যে কুরআনের অংশ তা তাওয়াতুরের সাথেই সবাই জানতেন।

১. শত শত হাফেযে কুরআন সাহাবীর স্মৃতিতে পুরো কুরআন ছিল। এই আয়াতও তাঁদের অবশ্যই আত্মস্থ ছিল।

২. কুরআনের আয়াতের যেসব পূর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি বিভিন্ন সাহাবী তৈরি করে রেখেছিলেন সেগুলোতেও এই আয়াত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যেহেতু হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) অধিক সতর্কতার জন্য উপরোক্ত মাধ্যমগুলোর উপর নির্ভর করার পরিবর্তে বিভিন্ন পদ্ধতিতে লিখিত আয়াতগুলোকে একত্রিত করার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, তাই তিনি এই আয়াতকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নতুন কপিতে লিপিবদ্ধ করেননি, যতক্ষণ না তৃতীয় পদ্ধতিতেও এই আয়াতটি তাঁর হস্তগত হয়েছে।

---

২৬৭. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : ১/২৩৮

২৬৮. আল-ইতকান : ১/৬০

সূচিপত্র

অন্যান্য আয়াতগুলোর ব্যাপার তো এমন ছিল যে, হাফেয সাহাবাগণের স্মৃতিতে তা বিদ্যমান থাকা এবং নববী যুগের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপিতে তা সংরক্ষিত থাকা ছাড়াও একাধিক সাহাবীর কাছে তা লিখিত ছিল। তাই দেখা যেত একটি আয়াত কয়েকজন সাহাবী নিয়ে উপস্থিত হতেন। পক্ষান্তরে 'সূরা বারাআ'র এই শেষ আয়াতটি শত শত সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিতে তো ছিল এবং যাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের পাণ্ডুলিপি ছিল– তাঁদের কাছেও লিখিত ছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্রভাবে লিখিত শুধু হযরত আবু খুযাইমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকটই পাওয়া যায়। অন্য কারো নিকট নয়।[২৬৯]

যা হোক, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই নযীরবিহীন সতর্কতার সাথে কুরআনের আয়াতগুলোকে একত্রিত করে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোকে কাগজের কপিতে লিপিবদ্ধ করে দেন।[২৭০] কিন্তু প্রত্যেকটি সূরা যেহেতু পৃথক পৃথক করে লিখা হয়েছিল, তাই তা একাধিক সহীফা সম্বলিত ছিল। তখনকার পরিভাষায় এই সহীফাগুলোকে "উম্ম" বা মূলকপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। আর এই কপিটির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) এই কপিতে কুরআনের আয়াতগুলো নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত তারতীব বা ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিন্যস্ত ছিল; কিন্তু সূরাগুলোর ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছিল না। প্রত্যেকটি সূরা পৃথক পৃথক করে লিখা হয়েছিল।[২৭১]

(২) এই কপিতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সাত হরফই বিদ্যমান ছিল।[২৭২]

(৩) এই কপিগুলো হায়রী লিপির অনুকরণে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।[২৭৩]

(৪) এই কপিতে শুধু ওই সকল আয়াতগুলো সংকলন করা হয়েছিল যেগুলোর তেলাওয়াত রহিত হয়েছিল না।

(৫) এই কপি লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল, যেন গোটা উম্মতের সামগ্রিক সত্যায়নের সাথে একটি কপি বিন্যস্ত হয়ে যায়। তাহলে প্রয়োজনের সময় সবাই এর শরণাপন্ন হতে পারবে।

হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক কুরআন সংকলনের এই ইতিবৃত্ত মাথায় থাকলে ওই রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্যও সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে, যার

---

২৬৯. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : ১/২৩৪-২৩৫

২৭০. সালেম থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) কাগজের টুকরায় কুরআন সংকলন করেছেন। (আল-ইতকান : ১/৬০), এক বর্ণনায় এসেছে যে, এ কপিটিও চামড়ার পার্চায় লিখা হয়েছিল। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রাগুক্ত

২৭১. আল-ইতকান : ১/৬০

২৭২. মানাহিলুল ইরফান : ১/২৪৬-২৪৭

২৭৩. তারীখুল কুরআন : পৃ: ৪৩

সূচিপত্র

মধ্যে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর পরই হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কুরআনুল কারীম সংকলন করে নিয়েছিলেন। কেননা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোর পাণ্ডুলিপি শুধু হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-ই নন; বরং আরো একাধিক সাহাবী তা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু এমন একটি মৌলিক ও মানসম্পন্ন কপি, যা গোটা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে সুবিন্যস্ত করা হয়, তা সর্ব প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-পদক্ষেপ গ্রহণ করে ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক সংকলিত এই কপিটি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিকটই সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তা সংরক্ষণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী সেগুলোকে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হয়।[২৭৪] অতঃপর মারওয়ান ইবনে হিশাম তার শাসনামলে হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কাছ থেকে এগুলো তলব করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ইন্তেকালের পর মারওয়ান তা চেয়ে নেয় এবং সেগুলোকে এ চিন্তা থেকেই আগুনে পুড়িয়ে দেন যে, তখন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক সূরার তারতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ সংকলিত কুরআনুল কারীমের সর্বসম্মত বিশুদ্ধতম কপি প্রস্তুত হযে চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার অনুসরণ করা সবার জন্য আবশ্যক ছিল এবং তখন আর এমন কোনো কপি অবশিষ্ট থাকা সমীচীন ছিল না, যা বর্তমান প্রচলিত কপিটির রুসমেখত ও তারতীবের বর খেলাফ হয়।[২৭৫]

حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন ঃ

তৃতীয় ধাপ ঃ

যখন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) খলীফা নির্বাচিত হলেন, ইসলাম তখন আরবের গন্ডি ছাড়িয়ে রোম ও ইরানের দূর-দূরান্তের এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক নতুন অঞ্চলের মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করতো, তখন তারা ইসলামের সেসব মুজাহিদ বা মুসলিম বণিকদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীম শিক্ষা করতো। যাদের মাধ্যমে তারা ইসলামের এই মহান নেয়ামত লাভ করেছিল। ইতোপূর্বে আপনারা অধ্যয়ন এসেছেন যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ সাত হরফে নাযিল হয়েছিল এবং বিভিন্ন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-

---

২৭৪. ফাতহুল বারী : ৯/১২-১৩

২৭৫. প্রাগুক্ত : পৃ: ১৬

সূচিপত্র

এর কাছ থেকে বিভিন্ন ক্বেরাত অনুযায়ী পবিত্র কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন।

তাই প্রত্যেক সাহাবীই নিজ নিজ শাগরিদদেরকে ওই ক্বেরাত অনুযায়ীই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, যেভাবে তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন কেরাত পদ্ধতিও দূর-দূরান্তের দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা এ তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিল যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ সাত হরফ পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন ক্বেরাতের এই বিভিন্নতা দূর-দূরান্তের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল, অপর দিকে কুরআনুল কারীমের সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়ার তথ্যটি তখনও তাদের মাঝে পুরোপুরি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি, তাই এ নিয়ে লোকদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হলো। কোনো কোনো লোক নিজেদের ক্বেরাতকে শুদ্ধ এবং অন্যদের ক্বেরাতকে ভুল আখ্যায়িত করতে শুরু করল।

এসব ঝগড়া-বিবাদের কারণে একদিকে তো এই আশঙ্কা ছিল যে, লোকেরা কুরআনুল কারীমের মুতাওয়াতির ক্বেরাতগুলোকে ভুল আখ্যায়িত করার মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হবে। অপরদিকে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক লিখিত এবং শুধু মদীনায়ই সংরক্ষিত একটি কপি ছাড়া গোটা ইসলামী দুনিয়ায় এমন কোনো মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল না, যা গোটা উম্মতের জন্য দলীল হতে পারে।

কেননা অন্যান্য যেসব পাণ্ডুলিপি ছিল, তা ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত এবং তাতে সাত হরফ বা সাত ক্বেরাতকে একত্রিত করার কোনো উদ্যোগ বা গুরুত্ব ছিল না। এসব কারণে চলমান বিবাদ ও সমস্যার একমাত্র গ্রহণযোগ্য সমাধান এটাই ছিল যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের এমন একটি কপি গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার মধ্যে সাত হরফ বা সাত ক্বেরাতের সবগুলোই স্থান পাবে এবং এই কপি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যে, কোন্ ক্বেরাতটি বিশুদ্ধ আর কোন্ ক্বেরাতটি অশুদ্ধ? হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নিজের খেলাফতকালে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করেছেন।

এই অতি জরুরী কাজ সম্পাদনের বিশদ বর্ণনা হাদীসের রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যায় যে, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান অঞ্চলে জিহাদের আমলে রত ছিলেন। তিনি সেখানে লক্ষ্য করলেন যে, লোকদের মাঝে পবিত্র কুরআন মাজীদের ক্বেরাত নিয়ে মতভেদ চলছে। তাই তিনি মদীনায় ফিরে এসে সোজা হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই উম্মত

সূচিপত্র

আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় মতভেদে লিপ্ত হবার আগেই আপনি এর সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করুন।

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন, আসল ব্যাপারটা কি? তখন হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) উত্তরে বললেন, আমি আর্মেনিয়া অঞ্চলে জিহাদে লিপ্ত ছিলাম। আমি সেখানে দেখলাম যে, সিরিয়ার লোকেরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ক্বেরাত অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করে। যে ক্বেরাত ইরাকবাসীদের শোনার সুযোগ হয়নি। অপরদিকে ইরাকের লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ক্বেরাত অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করছে, সিরিয়াবাসীদের যা শোনার সুযোগ হয়নি। যার ফলে তারা একে অপরকে কাফের আখ্যায়িত করছে।

অথচ হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)ও এই বিপদের আশঙ্কা আগেই করেছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, স্বয়ং পবিত্র মদীনায়ই এমন ঘটনা ঘটছে যে, একজন উস্তাদ তার ছাত্রদেরকে এক ক্বেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়াচ্ছেন আর অন্য উস্তাদ আরেক ক্বেরাত অনুযায়ী। এভাবে বিভিন্ন উস্তাদের ছাত্ররা যখন পরস্পর মিলিত হতো, তখন তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। কোনো কোনো সময় এই মতবিরোধ উস্তাদগণ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাতো এবং তাঁরাও একে অপরের ক্বেরাতকে ভুল বলে আখ্যায়িত করতেন।

যখন হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)ও এই বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তখন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণদেরকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু লোক পরস্পরের সাথে এ ধরনের কথা বলে যে, আমার ক্বেরাত তোমার ক্বেরাত থেকে উত্তম। অথচ এ ধরনের কথা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। অতএব, এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি?"

হযরত সাহাবায়ে কেরাম হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে আপনার চিন্তা কি? তখন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, "আমার মত হলো, আমরা গোটা উম্মতকে একটি মাসহাফ (কপির) উপর একত্রিত করে দেব। যেন মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার কোনো অবকাশ না থাকে।" সাহাবায়ে কেরাম এই মতকে পছন্দ করে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সমর্থন জানালেন।

অতঃপর হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) লোকদেরকে সমবেত করে একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "তোমরা পবিত্র মদীনায় আমার অতি নিকটে বসবাস করেও পবিত্র কুরআনুল কারীমের ক্বেরাতের ব্যাপারে পরস্পর

সূচিপত্র

মতভেদ করছ এবং একে অপরকে মিথ্যারোপ করছ। এর থেকে বুঝা যায় যে, যারা আমার কাছ থেকে দূরে বসবাস করছে, তারা এর চেয়েও বেশি মতভেদ ও মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কাজেই আমরা সবাই মিলে পবিত্র কুরআনুল কারীমের এমন একটি কপি তৈরি করে নেব, যা অনুসরণ করা সবার জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে।"

এই উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কাছে এ বলে পয়গাম পাঠালেন যে, আপনার নিকট। হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর যুগে সংকলিত] যে কপিগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিন। আমরা সেগুলোকে নতুন কপিতে নকল করে আপনার কাছে তা ফেরত পাঠিয়ে দেব। হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ওই কপিগুলো হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) চারজন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি দল গঠন করলেন, যা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে নিয়ে গঠিত ছিল।

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তাঁদেরকে এ দায়িত্ব দিলেন যে, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক সংকলিত কপিগুলো থেকে নকল করে এমন একটি কপি তৈরি করবেন, যার মধ্যে সূরাগুলোও ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে যাবে। আর সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ছিলেন আনসারী। আর বাকি তিনজন ছিলেন কুরাইশী। এ জন্য হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, যখন কুরআনের কোনো অংশে তোমাদের মাঝে এবং যায়েদের মাঝে কোনো মতানৈক্য দেখা দিবে (অর্থাৎ এই মতানৈক্য হবে যে, কোন্ শব্দটি কিভাবে লিখা হবে?), তখন সেটাকে কুরাইশদের ভাষা অনুযায়ী লিখবে। কেননা পবিত্র কুরআন মাজীদ তাদের ভাষায়ই নাযিল হয়েছে।"

তবে মৌলিকভাবে এ কাজের দায়িত্ব ওই চারজন সাহাবীর উপর অর্পণ করা হয়েছিল। এবং পরবর্তীতে আরো কয়েকজন সাহাবীকে তাঁদের সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এমনকি ইবনে আবী দাউদের বিবরণ অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা বারো জন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। যার মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত কাসীর ইবনে আফলাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মালেক ইবনে আবী আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং

সূচিপত্র

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও শামিল ছিলেন।[২৭৬] কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নোক্ত কাজগুলো আঞ্জাম দেন।

১. হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে যে কপি সংকলন করা হয়েছিল সেখানে সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। বরং প্রত্যেকটি সূরা পৃথক পৃথকভাবে লিখা হয়েছিল। তাঁরা ওই সবগুলো সূরা বিন্যাস দিয়ে একই কপিতে সন্নিবেশ করেছিলেন।[২৭৭]

২. পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলো এমনভাবে লিখা হয়েছিল যে, এগুলোর রুসমেখত বা লিখন পদ্ধতিতে সবগুলো মুতাওয়াতির কেরাতের স্থান পেয়েছে। এ কারণেই সেগুলোর উপর নুকতা বা হরকত কোনোটাই লাগানো হয়নি। যেন সকল মুতাওয়াতির ক্বেরাত অনুযায়ীই তা পাঠ করা যায়। যেমন, نُنْشِزُهَا লেখা হয়েছে। যেন এটাকে نَنْشُرُهَا এবং نُنْشِرُهَا উভয় রকমেই পাঠ করা যায়। কেননা এই দু'টি ক্বেরাতই সহীহ।[২৭৮]

৩. তখন পর্যন্ত পবিত্র কুরআনুল কারীমের নির্ভরযোগ্য এবং সর্বসম্মতভাবে সংকলিত একটি মাত্র কপিই ছিল। তাঁরা এর একাধিক কপি তৈরি করলেন। সাধারণভাবে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পাঁচটি কপি তৈরি করিয়ে ছিলেন। কিন্তু আবু হাতেম সাজিসতানী (রহ.)-এর বর্ণনা মতে মোট সাতটি কপি তৈরি করা হয়েছিল। যার মধ্য হতে একটি মক্কা মুকাররমায়, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কূফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর একটি কপি মদীনায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে[২৭৯]

৪. উল্লেখিত কাজটি করার জন্য তাঁরা মূলত সেই সহীহ কাগজগুলোকে সামনে রেখেছেন যেগুলো হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে সংকলন করা হয়েছিল। এর সাথে সাথে অধিক সতর্কতার খাতিরে ওই পদ্ধতিও অবলম্বন করেছেন, যা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে অবলম্বন করা হয়েছিল। সে ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বিভিন্ন সাহাবীর নিকট পৃথক পৃথকভাবে কুরআনের যেসব কপি সংরক্ষিত ছিল সেগুলোকে দ্বিতীয় বার আবার তলব করা হয় এবং সেগুলোর সাথে নতুনভাবে মিলিয়ে নতুন এই কপি তৈরি করা হয়। এই সময় সূরা আহযাবের এখান আয়াত–

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

---

২৭৬. ফাতহুল বারী : ৯/১৩-১৫

২৭৭. মুসতাদরাক হাকেম : ২/২২৯

২৭৮. মানাহিলুল ইরফান : ১/২৫৩-২৫৪

২৭৯. সহীহ বুখারী [ফাতহুল বারী] : ৯/১৭

সূচিপত্র

পৃথকভাবে লেখা একমাত্র হযরত আবু খুযাইমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট পাওয়া যায়। আর আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, এর অর্থ এটা নয় যে, এই আয়াত আর কারো স্বরণ ছিল না। কেননা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন–

فُقِدَتْ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا . فَالْتَمَسْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا إِلا مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ

'অর্থ্যাৎ কুরআনের কপি লিখতে গিয়ে সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি পাচ্ছিলাম না, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পাঠ করতে শুনতাম। আমরা সেটাকে তালাশ করে খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট পাই।'[২৮০]

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াত হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের খুব ভালোভাবে আত্মস্থ ছিল। অনুরূপভাবে এর অর্থ এটাও নয় যে, এ আয়াত আর কোথাও লিখা ছিল না। কেননা এটা স্পষ্ট যে, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে যেসব কপি তৈরি করা হয়েছিল সেগুলোতে এই আয়াত অবশ্যই ছিল। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের নিকট পৃথক পৃথকভাবে লিখিত কুরআনের যেসব পান্ডুলিপি ছিল, সেগুলোতে এই আয়াতও শামিল ছিল।

কিন্তু যেহেতু এ বারও হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগের মতো সাহাবায়ে কেরামের নিকট পৃথক পৃথকভাবে লিখিত সকল পান্ডুলিপিকে একত্রিত করা হয়েছিল, তাই হযরত যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাঁর সাথীরা ওই সময় পর্যন্ত নতুন কপিতে কোনো আয়াত লিখতেন না, যতক্ষণ না আগের সেই পান্ডুলিপিগুলোতেও তা না পেতেন। এভাবে অন্যান্য আয়াতগুলো তো একাধিক সাহাবীর নিকট পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সূরা আহযাবের উপরোক্ত আয়াতটি হযরত খুযাইমাহ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছাড়া আর কারো নিকট পাওয়া যায় নি।

৫. পবিত্র কুরআনুল কারীমের নির্ভরযোগ্য কয়েকটি কপি প্রস্তুত করার পর হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সকল বিক্ষিপ্ত কপিগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন, যা বিভিন্ন সাহাবীর সংগ্রহে ছিল। যাতে রুসমেখত, সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা এবং সর্বসম্মত ক্বেরাতের সমন্বয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সবগুলো কপি এক রকম হয়ে যায় এবং তাতে কোনো মতভেদের অবকাশ না থাকে।

---

২৮০. সহীহ বুখারী [ফাতহুল বারী] : ৯/১৭

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর গৃহিত পদক্ষেপকে গোটা উম্মত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন এবং সকল সাহাবা এ কাজে তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। একমাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এ ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্নতা ছিল। যে সম্পর্কে "সাত হরফ"-এর অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন–

«لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا»

'অর্থ্যাৎ তোমরা হযরত উসমানের সম্পর্কে ভালো কিছু ছাড়া বলো না। কেননা মহান আল্লাহর শপথ! তিনি মাসহাফ (কুরআনুল কারীমের কপি) তৈরির ক্ষেত্রে যা করেছেন, তা আমাদের সকলের উপস্থিতি ও পরামর্শ ক্রমে করেছেন।'[২৮১]

তেলাওয়াত সহজীকরণের পদক্ষেপ ঃ تسهيل تلاوت کے اقدامات

চতুর্থ ধাপঃ

হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক "মাসহাফ" তৈরির মহান কাজ সম্পন্ন করার পর সমস্ত উম্মত এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতীত পবিত্র কুরআন মাজীদ অন্য কোনো পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা জায়েয নেই। এ কারণেই তৎপরবর্তী সকল মাসহাফ ওই পদ্ধতিতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক সংকলিত মাসহাফ এর অনুলিপি তৈরি করে ব্যাপক আকারে কুরআনে কারীমের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

কিন্তু যখন উসমানী মাসহাফে নুকতা এবং যের, যবর ও পেশ ছিল না। তাই অনারবদের জন্য এ মাসহাফ তেলাওয়াত করা বেশ কষ্টকর হতো। পরবর্তীতে ইসলাম আনারব অঞ্চলেও দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ল, তখন এই মাসহাফে নুকতা এবং যের, যবর ও পেশ তথা হরকত সংযোজন করার তীব্র প্রয়োজন অনুভব হলো। যেন সকল অঞ্চলের মানুষ সহজভাবে তা তেলাওয়াত করতে সক্ষম হয়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

নুকতা ঃ نقط

তৎকালীন প্রাচীন আরবদের মাঝে হরফে নুকতা সংযোজনের রীতি প্রচলিত ছিল না। বরং লেখকরা নুকতাবিহীন খালি হরফ লিখার উপরই অভ্যস্ত ছিলেন। আর পাঠকরাও এ পদ্ধতির সাথে এতই অভ্যস্ত ছিলেন যে,

---

[২৮১]. ফাতহুল বারী [ইবনে আবী দাউদের বরাতে] : ৯/১৫

নুকতাবিহীন হরফ পড়তে তাদের সামান্যতম কষ্টও হতো না। বাক্যের আগের ও পরের অবস্থা দ্বারাই এক জাতীয় হরফগুলোর মাঝে সহজেই পার্থক্য হয়ে যেত। বরং অনেক সময় হরফে নুকতা লাগানোকে দোষ হিসেবে দেখা হতো। ঐতিহাসিক মাদায়িনী (রহ.) এক আরব সাহিত্যিকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন–

كثرة النقط فى الكتاب سوء ظن بالكتوب اليه

'অর্থ্যাৎ লিখনীতে অত্যাধিক নুকতার ব্যবহার, প্রেরিত পাঠকের প্রতি কু-ধারণার নামান্তর।'[২৮২]

সঙ্গত কারণে মাসহাফে উসমানীও নুকতাশূন্য ছিল এবং সাধারণ প্রচলন ছাড়াও এর বড় একটি উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, এ লিখন পদ্ধতিতে সকল মুতাওয়াতির ক্বেরাতগুলোর সংকুলান হয়ে যাওয়া। কিন্তু পরবর্তীতে অনারব ও কম পড়ুয়া মুসলমানদের সহজতার জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীমে নুকতার সংযোজন করা হয়। কুরআনুল কারীমে সর্বপ্রথম কে নুকতার প্রচলন করে ছিলেন? এ ব্যাপারে রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে এ কাজ সর্বপ্রথম আবুল আসাদ দুআইলী (রহ.) আঞ্জাম দেন।[২৮৩]

* কোনো বর্ণনা মতে তিনি এ কাজ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নির্দেশে করেছিলেন।[২৮৪]

* আর কেউ কেউ বলেন, কূফার গভর্ণর যিয়াদ ইবনে আবী সুফিয়ান তাঁকে দিয়ে করিয়ে ছিলেন।[২৮৫]

* আবার কোনো কোনো বর্ণনা মতে, যে তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে এ কাজ সম্পাদন করেছেন।[২৮৬]

* এবং এক বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি হাসান বসরী (রহ.), ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মার (রহ.) ও নসর ইবনে আসেম লাইসী (রহ.)-এর মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়েছেন।[২৮৭]

* আবার কেউ কেউ এ মত প্রকাশ করেছেন যে, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন মাজীদে নুকতা সংযোজন করেন, তিনিই নুকতার উদ্ভাবক। এর পূর্বে নুকতা সম্পর্কে কোনো কল্পনা ছিল না।

---

২৮২. আল্লামা কালকাশিন্দী রচিত "সুবহুল আ'শা" ৩/১৫৪
২৮৩. আল-বুরহানফী উলূমিল কুরআন : ১/২৫০, আল-ইতকান : ২/১৭১
২৮৪. "সুবহুল আ'শা" ৩/১৫৫
২৮৫. আল-বুরহান : পৃ. ২৫০-২৫১
২৮৬. আল-ইতকান : ২/১৭১
২৮৭. তাফসীরে কুরতবী : ১/৬৩, তারিখুল কুরআন : পৃঃ ১৮১

সূচিপত্র

কিন্তু আল্লামা কালকাশিন্দী (রহ.) [যিনি রুসমেখত এবং ইনশা শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম] এ মতকে প্রত্যাখান করেছেন এবং বলেছেন যে, অনেক পূর্বেই নুকতার উদ্ভাবন হয়েছিল। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরবী লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন, বুলান গোত্রের মুরামুর ইবনে মুররাহ, আসলাম ইবনে সিদরা এবং আমের ইবনে জাদারাহ। মুরামুর আরবী অক্ষরের আকৃতি উদ্ভাবন করেন। আসলাম সংযুক্ত ও পৃথক অক্ষর লিখার পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। আর আমের নুকতা তৈরি করেন।[২৮৮]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এ কথা পাওয়া যায় যে, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর দাদা আবু সুফিয়ান ইবনে উমাইয়াহ সর্বপ্রথম নুকতার ব্যবহার করেন। তিনি হায়রাহ্-এর বাসিন্দাদের কাছ থেকে তা শিখেছেন। আর হায়রাহ'র বাসিন্দারা শিখেছে আম্বারবাসীদের থেকে।[২৮৯] অতএব, বুঝা গেল যে, নুকতার উদ্ভাবন তো অনেক পূর্বেই হয়েছিল। কিন্তু একাধিক বিশেষ কল্যাণার্থে পবিত্র কুরআন মাজীদকে নুকতামুক্ত রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে যারাই পবিত্র কুরআনুল কারীমে নুকতা সংযোজন করেছেন, তিনি নুকতার উদ্ভাবক নন। বরং তিনি শুধু সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন মাজীদে নুকতার ব্যবহার করেছেন।[২৯০]

হরকত ঃ ৫৮

অনুরূপভাবে নুকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় পবিত্র কুরআন মাজীদে হরকত তথা যের, যবর ও পেশও ছিল না। সবার আগে কে হরকত লাগিয়েছেন? এ ক্ষেত্রেও রয়েছে যথেষ্ট মতপার্থক্য।

* কারো কারো মতে আবুল আসওয়াদ দুআইলী (রহ.) এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। আর কারো কারো মত হলো, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এ কাজ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার (রহ.) এবং নসর ইবনে আসেম লাইলী (রহ.)-কে দিয়ে করিয়েছে।[২৯১]

উল্লেখিত সবগুলো রেওয়ায়েত সামনে রাখলে এমনটি বুঝে আসে যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের জন্য সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ দুআইলী (রহ.)-ই হরকত আবিষ্কার করেন। তবে তাঁর আবিস্কৃত হরকতগুলো আজকের প্রচলিত হরকতের ন্যায় ছিল না। বরং যবর দিতে হলে হরফের উপর একটি নুকতা

---

২৮৮. "সুবহুল আ'শা" ৩/১২
২৮৯. "সুবহুল আ'শা" ৩/১৩
২৯০. "সুবহুল আ'শা" ৩/১৫৫
২৯১. তাফসীরে কুরতুবী : ১/৬৩

সূচিপত্র

(.....) এবং যের দিতে হলে হরফের নিচে একটি নুকতা (.....) আর পেশ উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটি নুকতা (.....) ও তানভীরের জন্য দু'টি নুকতা (.....) অথবা (.....) অথবা (.....) নির্ধারণ করা হয়েছিল।[২৯২] পরবর্তীতে খলীল ইবনে আহমদ (রহ.) হামযা ও তাশদীদের চিহ্ন তৈরি করেন।[২৯৩]

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মার (রহ.), নসর ইবনে আসেম (রহ.) এবং হাসান বসরী (রহ.)-কে একই সময়ে পবিত্র কুরআন মাজীদে নুকতা ও হরকত সংযোজন করার আদেশ করেন। এ পর্যায়ে হরকতগুলোকে আরো স্পষ্ট ও সহজসাধ্য করার নিমিত্ত পূর্ব উদ্ভাবিত নুকতার পরিবর্তে বর্তমান প্রচলিত যের, যবর ও পেশ ... নির্ধারণ করা হয়। যেন হরফের মূল নুকতার সাথে হরকতের নুকতার সংমিশ্রণ না হয়ে যায়। (মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

মনযীল ঃ احزاب یا منزیل

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাবেঈগণের (রহ.) অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা প্রতি সপ্তাহে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এ উদ্দেশ্য তাঁরা দৈনন্দিন তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। যেটাকে "হিযব" বা "মনযীল" বলা হয়। এভাবে সমগ্র কুরআন মাজীদকে মোট সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। হযরত আউস ইবনে হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতটি মনযীলে কুরআন খতম করেন? তিনি উত্তরে বললেন, প্রথম মনযীলে তিনটি সূরা, দ্বিতীয় মনযীলে পাঁচটি সূরা, তৃতীয় মনযীলে সাতটি সূরা, চতুর্থ মনযীলে নয়টি সূরা, পঞ্চম মনযীলে এগারটি সূরা, ষষ্ঠ মনযীলে তেরটি সূরা এবং শেষ মনযীলে সূরা ক্বাফ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবগুলো সূরা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[২৯৪]

পারা ঃ پارہ

বর্তমানে পবিত্র কুরআন মাজীদ ত্রিশটি পারায় বিভক্ত। এই পারার বিভক্তি। অর্থ ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং শিশুদের পড়ানোর সুবিধার্থে ত্রিশটি খন্ডে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাই তো দেখা যায় কখনো কখনো আলোচনা শেষ হবার আগেই পারা শেষ হয়ে যায়। কে কুরআনুল কারীমকে ত্রিশটি খন্ডে বিভক্ত করেছেন? নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা

---

২৯২. "সুবহুল আ'শা" ৩/১৬০, তারীখুল কুরআন : পৃ: ১৮০
২৯৩. আল-ইতকান : ২/১৭১
২৯৪. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : ১/২৫০

সূচিপত্র

মুশকিল। কারো কারো মতে হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মাসহাফ লিপিবদ্ধ করানোর সময় ত্রিশটি খন্ডে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করি ছিলেন।

তাই তাঁর যুগ থেকেই ত্রিশ পারার এই প্রচলন হয়ে আসছে।[২৯৫]

কিন্তু মুতাকাদ্দীমীন পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের বিশাল গ্রন্থ ভান্ডারের এর কোনো দলীল-প্রমাণ (লিখক)-এর দৃষ্টিগোচর হয়নি। অবশ্য আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.) লিখেছেন যে, কুরআনের ত্রিশ পারা বহু আগ থেকে প্রসিদ্ধির সাথে চলে আসছে এবং মাদরাসাসমূহের কুরআনের কপিতে এর রেওয়াজ রয়েছে। এমনটাই মনে হয় যে, ত্রিশ পারার এ বিভক্তি সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে। (মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই এই ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো অবগত।)

আখমাস ও আ'শার ঃ اخماس اور اعشار

প্রথম যুগের পবিত্র কুরআনুল কারীমের কপিগুলোতে আরো কিছু চিহ্নের প্রচলন ছিল। আর তা হলো, প্রতি পাঁচ আয়াতেহর পর(টিকাতে) خمس বা সংক্ষেপে خ এবং প্রতি দশ আয়াতের পর عشر. অথবা সংক্ষেপে ع লিখে দেওয়া হতো। প্রথম প্রকারের চিহ্নগুলোকে اخماس (আখমাস) এবং দ্বিতীয় প্রকার চিহ্নগুলোকে اعشار (আ'শার) বলা হতো।[২৯৬] কিন্তু এ দু'টি বর্ণনার কোনোটিকেই সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের যুগেই "আশর"-এর চিহ্ন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে–

عن مسروق. عن عبد الله: انه كره التعشير في المصحف

'মাসরূক (রহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মাসহাফের মধ্যে "আ'শার" চিহ্নের ব্যবহারকে মাকরূহ মনে করতেন।'[২৯৭]

এ থেকে বুঝা যায় যে "আ'শার" চিহ্নের ব্যবহার সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

রুকুর চিহ্ন ঃ ع

পরবর্তীতে আরো একটি চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তা চালু আছে। আর সেটা হলো, রুকু'র চিহ্ন। আলোচিত বিষয়বস্তুর অনুসরণে এ চিহ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে একটা প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে সেখানে পৃষ্ঠার পাশে রুকু'র চিহ্নের জন্য ع অক্ষর লিখে দেওয়া হয়েছে। এই

---

২৯৫. তারীখুল কুরআন : পৃ: ৮১

২৯৬. মানাহিলুল ইরফান : ১/৪০৩

২৯৭. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ২/৪৯৭

সূচিপত্র

চিহ্নটি কে চালু করেছেন এবং কার আমল থেকে চালু হয়েছে? অধমের অনুসন্ধান সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারিনি।

কারো কারো মত হলো, এই রুকু'র চিহ্নের নির্ধারণও হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগ থেকেই হয়েছিল।[২৯৮] কিন্তু অধম কোনো রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এর প্রমাণ পাইনি। কিন্তু এ কথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই চিহ্নের উদ্দেশ্য আয়াতের এমন একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা, যা এক (নামাযের) রাকাতে পড়া হয়। আর এটাকে এ জন্যই "রুকু" বলা হয় যে, নামাযে এখানে এসে রুকু করা হয়। যেমন, ফাতোয়ায়ে আলমগীরিতে এসেছে–

أن المشَايِخَ رحمهم الله تعالى جَعَلُوا القُرأن على خمسمائة وأربعين رُكُوعا وأعلموا ذلك فى المصاحف حتى يحصل الختم فى ليلة السابع والعشرين

'অর্থ্যাৎ মাশায়েখগণ পবিত্র কুরআনুল কারীমকে ৫৪০টি রুকু'তে বিভক্ত করেছেন এবং কুরআনের কপিতে তাঁরা এর জন্য আলামত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেন (তারাবীর সালাত) সাতাশতম রাতে কুরআন খতম হয়ে যায়।[২৯৯]

ওয়াক্ফ বা যতিচিহ্ন সমূহ ঃ

তেলাওয়াত ও তাজভীদের সহজতার জন্য আরো একটি উপকারী কাজ করা হয়েছে যে, কুরআনের বিভিন্ন বাক্যের উপর এমন কিছু যতিচিহ্ন লিখে দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে ওয়াক্ফ করা (শ্বাস নেওয়া) কেমন? এই চিহ্নগুলোকে "রুমূযে আওক্বাফ"বলা হয়। যেগুলোর উদ্দেশ্য হলো, যখন একজন অনারবী ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে, সেও যেন সঠিক স্থানে ওয়াক্ফ করতে পারে এবং ভুল জায়গায় ওয়াক্ফ করার কারণে অর্থের মধ্যে কোনো বিকৃতি না ঘটে। এই চিহ্নগুলোর অধিকাংশই সর্বপ্রথম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (রহ.) সংযোজন করেন।[৩০০]

ওই চিহ্নগুলোর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

৳ = এই চিহ্নটি "ওয়াক্ফে মুত্লাক"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর উদ্দেশ্য হলো, এখানে এসে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই এখানে থামাটা উত্তম।

ে = "ওয়াকফে জায়েয"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর উদ্দেশ্য হলো, এখানে থামা জায়েয।

---

২৯৮. তারীখুল কুরআন : ৮১
২৯৯. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি : ১/৯৪
৩০০. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/২৫৫

ج = টা "ওয়াক্‌ফে মুজাওওয়ায"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এখানে থামা জায়েয; তবে না থামাটাই উত্তম।

ص = টা "ওয়াকফে মুরাখ্‌খাস"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এখানে কথা তো পুরো হয়নি; তবে বাক্য যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই শ্বাস নেওয়ার জন্য অন্য স্থানে থামার পরিবর্তে এখানেই থামা উচিত।[৩০১]

م = টা "ওয়াকফে লাযেম"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর উদ্দেশ্য হলো, এখানে যদি থামা না হয়, তাহলে আয়াতের অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এখানে থামাটাই অধিক উত্তম। কোনো কোনো ব্যক্তি এটাকে "ওয়াকফে ওয়াজিব'ও বলে থাকেন। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফেকহী ওয়াজিব নয় যে, এখানে না থামলে গোনাহ হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল ওয়াকফের মধ্যে এখানে থামাটাই সর্বোত্তম।[৩০২]

لا = টা لاتقف (লা তাকিফ)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর উদ্দেশ্য হলো, এখানে থামবে না। তবে থামা একেবারেই নাজায়েয এমনটা নয়। বরং এ চিহ্নবিশিষ্ট এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে থামতে কোনো অসুবিধা নেই এবং এর পরবর্তী আয়াত থেকে তেলাওয়াত করা যেতে পারে। তবে এখানে থামলে, (পরের শব্দ থেকে শুরু না করে বরং) পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়াটাই উত্তম।[৩০৩]

উপরোক্ত যতিচিহ্নগুলোর ব্যাপারে তো নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আল্লামা সাজাওয়ান্দী (রহ.) এগুলোর প্রবর্তক। কিন্তু এগুলো ছাড়াও পবিত্র কুরআনুল কারীমে আরো কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ–

ع =এটা "মু'আনাকা" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই চিহ্নটি ওই স্থানে লেখা হয় যেখানে একই আয়াতের দুই ধরনের তাফসীর হতে পারে। এক তাফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ হওয়াকে বুঝায়। কাজেই দুই স্থানের যে কোনো এক স্থানেই থামা যেতে পারে। তবে এক স্থানে থামার পর দ্বিতীয় স্থানে থামা ঠিক নয়। যেমন–

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

এই আয়াতটিতে যদি التَّوْرَاةِ এর মধ্যে থামা হয়, তাহলে আর الإِنْجِيلِ -এর মধ্যে থামা ঠিক হবে না। আর যদি الإِنْجِيلِ -এর মধ্যে থামতে চায় তবে -এর মধ্যে থামা ঠিক হবে না। তবে উভয় স্থানের কোনোটিতেই যদি থামা না হয়

---

৩০১. এই চারটি চিহ্নের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন : "আল-মানহুল ফিকরিয়্যাহ [মোল্লা আলী কারী] পৃ: ৬৩

৩০২. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/২৩১

৩০৩. প্রাগুক্ত : পৃ: ২৩৩

সূচিপত্র

তাহলে দোষের কিছু নেই। এই চিহ্নটির আরো একটি নাম হলো, "মুকাবিলা"। এই চিহ্নের সর্বপ্রথম প্রচলন করেন ইমাম আবুল ফযল রাযী (রহ.)।[৩০৪]

سكته = এটা "সেক্তা"-এর চিহ্ন। এর উদ্দেশ্য হলো, এখানে থামতে হবে। তবে শ্বাস ছাড়তে পারবে না; বরং চালু রাখতে হবে। এটা সাধারণত এমন স্থানে ব্যবহার করা হয় যেখানে না থেমে, বরং পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে গেলে অর্থের ক্ষেত্রে ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে।

وقفه = এ চিহ্নযুক্ত স্থানে সেক্তার চাইতে একটু বেশি সময় ধরে থামতে হবে। কিন্তু শ্বাস এখানেও জারী রাখতে হবে।

ق = قيل عليه الواقف সংক্ষিপ্ত রূপ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কারো মতে এখানে থামা যাবে আর কারো মতে থামা যাবে না।

قف = এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, থেমে যাও। এটি এমন স্থানে ব্যবহার করা হয় যেখানে তেলাওয়াতকারীর এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, এখানে থামা যাবে না।

صلى الوصل اولى-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ হচ্ছে, পূর্বাপর মিলিয়ে পড়া উত্তম।

صل = এটা قديوصل এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ এখানে কেউ কেউ থামার কথা বলেন আর কেউ কেউ মিলিয়ে পড়াকে পছন্দ করেন।

এই যতিচিহ্নগুলো খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা এখনও জানা যায়নি যে, কে এগুলোর বর্ণনাকারী?

পবিত্র কুরআনুল কারীমের মুদ্রণ ঃ قرآن كريم كى طباعت

পঞ্চম পর্যায় ঃ

যতদিন পর্যন্ত প্রেস বা ছাপাখানা আবিষ্কার হয়নি ততদিন পর্যন্ত পবিত্র কুরআন মাজীদের সকল কপি হাতে লেখা হতো। প্রত্যেক যুগে লেখকদের এমন একটি দল বিদ্যমান ছিলেন, কুরআন লেখা ছাড়া যাদের আর কোনো ধ্যান-জ্ঞান ছিল না। পবিত্র কুরআনুল কারীমের অক্ষরগুলোকে সুন্দর ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে লেখার জন্য মুসলমানরা যে সাধনার সাক্ষর রেখেছেন এবং এ মহা গ্রন্থের সাথে অন্তরঙ্গ ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন এর বিস্তারিত ও চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। যার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নেই।

---

৩০৪. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/২৩৭

সূচিপত্র

অতপর যখন ছাপাখানা আবিষ্কার হলো, তখন সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে ১১১৩ হিজরীতে পবিত্র কুরআনুল কারীম ছাপানো হয়। যাঁর একটি কপি এখনো মিসরের 'দারুল কুতুব'-এ সংরক্ষিত রয়েছে। এরপর বহু প্রাচ্যবিধ পন্ডিতগণ কুরআনুল কারীমের কপি মুদ্রণ করেন। কিন্তু তাদের মুদ্রিত কুরআনুল কারীমের এই কপিগুলো মুসলিম বিশ্বে মোটেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উসমান রাশিয়ার 'সেন্ট পিটার্সবার্গ' শহরে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কুরআনুল কারীমের একটি কপি মুদ্রণ করে। অনুরূপভাবে 'কাযান' শহরেও একটি কপি ছাপানো হয়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের 'তেহরানে' কুরআনুল কারীমকে পাথরের উপর ছাপানো হয়। অতঃপর এ মুদ্রিত কপি গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[৩০৫]

ক্বেরাতগুলো ও সেগুলোর সংকলন ঃ قرآت اور ان کی تدوین

"প্রকাশ থাতে যে, পূর্বে সাত হরফ"-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তেলাওয়াতের সহজ-সাধ্যের জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদকে একাধিক ক্বেরাতের উপর অবতীর্ণ করেছেন। ক্বেরাতের এই বিভিন্নতার কারণে আয়াতের সামগ্রিক অর্থের মধ্যে তো কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু তেলাওয়াত ও উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যার কারণে বহু মানুষের জন্য তেলাওয়াত করা সহজ হয়ে গেছে।

মুসলিম উম্মাহ প্রত্যেক যুগেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই ক্বেরাতগুলোকে সংরক্ষণ করে আসছেন এবং এ লক্ষ্যে তারা নযীরবিহীন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এখানে সেই মহান খেদমতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তবে কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া আবশ্যক মনে করছি।

আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রচার ও প্রসারের মূল মাধ্যম লিখনীর পরিবর্তে স্মৃতিশক্তি, নকল ও রেওয়ায়েতের উপরই ছিল। ওদিকে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাসহাফে উসমানীকে নুকতা ও হরকৃত থেকে মুক্ত রাখা হয়েছিল। যেন এতে সর্বজনস্বীকৃত সবগুলো ক্বেরাতের সংকুলান হয়ে যায়। তাই তো হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) যখন এই মাসহাফ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছেন, তখন তিনি এগুলোর সাথে এমন ক্বারী সাহেবগণকে প্রেরণ করেছেন, যারা এগুলোর তেলাওয়াত শিক্ষা দিতে পারবেন। ক্বারী সাহেবগণ যখন বিভিন্ন অঞ্চলে

---

৩০৫. . কুরআন মুদ্রণের ইতিহাস জানার জন্য দেখুন : কুরদী (রহ.) রচিত "তারীখুল কুরআন" পৃ: ১৮৬, সবহী সালেহ রচিত এবং গোলাম আহমদ হারীরি কর্তৃক অনূদিত "উলূমুল কুরআন" পৃ: ১৪২

সূচিপত্র

পৌছেছেন, তখন তাঁরা নিজ নিজ ক্বেরাত অনুযায়ী মানুষদেরকে পবিত্র কুরআনুল কারীম শিক্ষা দিয়েছেন।

আর এভাবেই বিভিন্ন ক্বেরাতগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো মনীষী পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বিভিন্ন প্রকারগুলো নিজে শিখতে এবং অন্যদেরকে শিখানোর পেছনে নিজের গোটা জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে ছিলেন এবং দিচ্ছে। আর এভাবেই"ইলমে ক্বেরাত"-এর গোড়া পত্তন হয়ে যায় এবং প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ এই ইলমে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য ক্বেরাতের ইমাম বা ক্বেরাত বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে শুরু করেছেন।

আবার কেউ শুধু একটি ক্বেরাত, কেউ দুটি, কেউ তিনটি, কেউ সাতটি, আবার কেউ তার চেয়ে অধিক ক্বেরাত নিজের স্মৃতিভান্ডারে সংরক্ষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত একটি নীতিমালা ছিল এবং সব জায়গায় সে অনুযায়ীই কার্যক্রম চলতো। আর সেটা হলো, শুধুমাত্র ওই ক্বেরাতটিই পবিত্র কুরআনুল কারীমের ক্বেরাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে।

১. উসমানী মাসহাফের লিখন পদ্ধতিতে এর অবকাশ থাকা।

২. আরবী সরফ (শব্দ-প্রকরণ) ও নাহ্‌ব (বাক্য-প্রকরণ) অনুযায়ী হওয়া।

৩. সহীহ সনদসূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়া এবং ক্বেরাতের ইমামগণের নিকট প্রসিদ্ধ হওয়া।

যে ক্বেরাতে এই তিনটি শর্তের মধ্য হতে কোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকত সেটাকে কুরআনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হতো না। এভাবে মুতাওয়াতির ক্বেরাতসমূহের বিরাট একটি সংখ্যা বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়ে আসতে থাকে। সহজ-সাধ্যের জন্য এমনও হয়েছে যে, একই ইমাম একটি অথবা কয়েকটি ক্বেরাত গ্রহণ করে সেগুলোর শিক্ষা দান করতে শুরু করেন। ফলে সেই ক্বেরাতটি ওই ইমামের নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারপর উলামায়ে কেরাম সেই ক্বেরাতগুলো সংকলন করার নিমিত্তে গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন। যেমন, সর্বপ্রথম ইমাম আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (রহ.), ইমাম আবু হাতিম সাজিস্তানী (রহ.), কাযী ইসমাঈল (রহ.) এবং ইমাম আবু যা'ফর তাবারী (রহ.) এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

যেখানে তারা বিশটিরও বেশি ক্বেরাত সন্নিবেশিত করে ছিলেন। অতঃপর আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনে মূসা ইবনে আব্বাস ইবনে মুজাহিদ (রহ.) (মৃত্যু : ৩২৪ হিজরী) একটি কিতাব রচনা করেন। যার মধ্যে শুধু সাতজন ক্বারীর ক্বেরাত স্থান পেয়েছিল। তাঁর এই গ্রন্থ এমনভাবে ক্বেরাতগুলো অনেক

সূচিপত্র

প্রসিদ্ধি লাভ করে। বরং কেউ কেউ এ ধারণাও করতে লাগল যে, বিশুদ্ধ ও মুতাওয়াতির ক্বেরাত এগুলোই। অন্যান্য ক্বারীদের ক্বেরাতগুলো বিশুদ্ধ ও মুতাওয়াতির নয়। অথচ বাস্তবতা হলো এই যে, আল্লামা ইবনে মুজাহিদ (রহ.) শুধু ঘটনাচক্রে এ ক্বেরাতগুলোকে সংকলন করেছিলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য কক্ষনো এটা ছিল না যে, এগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্বেরাতগুলো ভুল ও অগ্রহণযোগ্য। আল্লামা ইবনে মুজাহিদ (রহ.)-এর এ রচনাকর্ম দ্বারা আরো একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, কেউ কেউ "সাত হরফ" দ্বারা ইবনে মুজাহিদ সংকলিত সাত ক্বেরাতকে বুঝানো হয়েছে বলে ধারণা করতে শুরু করে। অথচ "সাত হরফ"-এর বিশুদ্ধ ও সঠিক ব্যাখ্যা সেটাই, যা পেছনে স্বতন্ত্র একটি শিরোনামের অধীনে আলোচিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে মুজাহিদ (রহ.)-এর এ রচনাকর্ম দ্বারা যে সাতজন ক্বারী সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন–

(১) আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর আদ-দারী (রহ.)। (মৃত্যু : ১২০ হিজরী)। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং আবু আইয়ূব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁর কেরাত মক্কা মুকাররমায় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর ক্বেরাতের বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাযযী এবং কুম্বাল বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(২) নাফে' ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু নাঈম (রহ.) (মৃত্যু : ১৬৯ হিজরী)। তিনি এমন সত্তর জন তাবেঈ থেকে উপকৃত হয়েছেন, যাঁরা সরাসরি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর ক্বেরাত পবিত্র মদীনায় অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর ক্বেরাত বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু মূসা কালূন (রহ.) (মৃত্যু : ২২০ হিজরী) এবং আবু সাঈদ ওয়ার্‌শ (রহ.) : ১৯৭ হিজরী) অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(৩) আবদুল্লাহ আল-ইয়াহ্‌সাবী (রহ.) (মৃত্যু : ১১৮ হিজরী)। তিনি ইবনে আমের নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে যরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তিনি ক্বেরাত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন হযরত মুগীরা ইবনে শিহাব মাখযূমী (রহ.)-এর কাছ থেকে। যিনি ছিলেন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ছাত্র। তাঁর ক্বেরাত সিরিয়ায় অধিক প্রচলিত ছিল। তাঁর ক্বেরাতের রাবীদের মধ্যে হিশাম এবং যাকওয়ান ছিলেন বেশি প্রসিদ্ধ।

সূচিপত্র

৪. আবু আমর যাব্বান ইবনে আ'লা ইবনে আম্মার (রহ.) (মৃত্যু : ১৫৪ হিজরী)। তিনি হযরত মুজাহিদ (রহ.) ও হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর ক্বেরাত বসরায় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর ক্বেরাত বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু ওমর আদ-দাওরী (মৃত্যু : ২৪৬ হিজরী) এবং আবু শুআইব সূসী (রহ.) (মৃত্যু : ২৬১ হিজরী) অধিক প্রসিদ্ধ ছিরেন।

৫. হামযা ইবনে হাবীব আয্ যাইয়্যাত (রহ.)। তিনি ইকরিমা ইবনে রবী' আত্ তাইমী (রহ.) (মৃত্যু : ১৮৮ হিজরী)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াস্সাব (রহ.)-এর কাছ থেকে, তিনি যর ইবনে হুবাইশ (রহ.)-এর কাছ থেকে আর তিনি হযরত উসমান, হযরত আলী এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কাছ থেকে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ক্বেরাতের বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে খালাফ ইবনে হিশাম (রহ.) (মৃত্যু : ১৮৮ হিজরী) এবং খাল্লাদ ইবনে খালেদ (রহ.) (মৃত্যু : ২২০ হিজরী) অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৬. আসেম ইবনে আবীন-নাজ্ওয়াদ আল-আসাদী (রহ.) (মৃত্যু : ১২৭ হিজরী)। তিনি হযরত যর ইবনে হুবাইশ (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ছাত্র। তাঁর ক্বেরাত বর্ণনাকারীদের মধ্যে শু'বা ইবনে আইয়্যাশ (রহ.) (মৃত্যু : ১৯৩ হিজরী) এবং হাফস ইবনে সুলাইমান (রহ.) (মৃত্যু : ১৮০ হিজরী) অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে সাধারণত হাফস (রহ.)-এর কেরাত অনুযায়ী তেলাওয়াত করা হয়।

৭. আবুল হাসান আলী ইবনে হাম্যাহ আল-কুসাঈ আন-নাহ্বী (রহ.) (মৃত্যু : ১৮৯ হিজরী)। তাঁর কেরাতের রাবীদের মধ্যে আবুল হারেস মারওয়াযী (রহ.) [মৃত্যু : ২৪০ হিজরী) এবং আবু ওমর আদ-দাওরী (রহ.) (যিনি আবু আমরেরও রাবী) বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। শেষোক্ত তিনজন কারীর ক্বেরাত অধিকতর কূফায় প্রচলিত হয়েছে।

তবে প্রসঙ্গে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সাত ক্বেরাত ছাড়াও আরো কয়েকটি ক্বেরাত মুতাওয়াতির ও বিশ্বস্ত বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে যখন এ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে যে, শুদ্ধতম ক্বেরাত উপরোক্ত সাত প্রকার ক্বেরাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তখন সমকালীন বহু আলেম (যেমন, আল্লামা শাযাঈ (রহ.) এবং আবু বকর ইবনে মেহরান (রহ.)) সাতের পরিবর্তে দশ ক্বেরাত পদ্ধতি সংকলন করে একটি কিতাব রচনা করেন। এর ফলেই "ক্বেরাতে আশারা"-এর পরিভাষা প্রসিদ্ধ হয়ে

সূচিপত্র

গেছে।[৩০৬] এই দশ ক্বেরাতের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত সাতজন ছাড়া আরো যে তিনজন ক্বারীর ক্বেরাত সন্নিবেশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন–

১. ইয়াকুব ইবনে ইসহাক খাযরামী (রহ.) (মৃত্যু : ২২৫ হিজরী)। তিনি সালাম ইবনে সুলাইমান আত্-তভীল থেকে, আর তিনি আসেম (রহ.) ও আবু আমর (রহ.) থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ক্বেরাত অধিকতর বসরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

২. খালাফ ইবনে হিশাম (রহ.)। (মৃত্যু : ২০৫)। তিনি সুলাইম ইবনে ঈশা ইবনে হামযাহ ইবনে হাবীব যাইয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হামযাহ'র ক্বেরাতেরও রাবী ছিলেন। তাঁর ক্বেরাত অধিকতর কূফায় প্রচলিত ছিল।

৩. আবু যা'ফর ইয়াযিদ ইবনে কা'কা' (রহ.) (মৃত্যু : ১৩০ হিজরী)। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কাছে থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর ক্বেরাত পবিত্র মদীনায় প্রচলিত ছিল।

উল্লেখিত ১০ জন ক্বারীসহ আরো ৪জন ক্বারী শামিল করে ১৪জন ক্বারী কে সাবস্ত করে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১. হাসান বসরী (রহ.) (মৃত্যুঃ ১১০ হিজরী)। তিনি ছিলেন প্রথম সারীর তাবেঈদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ক্বেরাত চর্চার কেন্দ্র ছিল বসরা।

২. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাইসিন (রহ.) (মৃত্যু : ১২৩ হিজরী)। তিনি হযরত মুজাহিদ (রহ.)-এর ছাত্র এবং আবু আমের (রহ.)-এর উস্তাদ ছিলেন। তাঁর ক্বেরাতের কেন্দ্র ছিল মক্কা মুকাররমাহ।

৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুবারক ইয়াযীদী (রহ.) (মৃত্যু : ২০২ হিজরী)। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। আবু আমের (রহ.) ও হামযাহ (রহ.)-এর কাছ থেকে তিনি ক্বেরাত শিক্ষা লাভ করেন।

৪. আবুল ফর্য মুহাম্মদ ইবনে শানাবূযী (রহ.) (মৃত্যু : ৩৮৮ হিজরী)। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। নিজের উসতায ইবনে শানাবূযী (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে শানাবূযী বলা হয়।

আবার কেউ কেউ উপরোক্ত চৌদ্দজন ক্বারীর মধ্যে শানাবূযী (রহ.)-এর স্থলে হযরত সুলাইমান আ'মাশ (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

এ চৌদ্দজন ক্বারীর প্রথম দশজনের ক্বেরাত বিশুদ্ধ সনদ অনুযায়ী মুতাওয়াতির। এ ছাড়া বাকিগুলো শায বা বিরল।[৩০৭]

---

৩০৬. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/৩৪

সূচিপত্র

আমাদের যুগের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ পন্ডিত মোনটেগম্রী (Motgomery Watt) নিজের শিক্ষক বেল (Bell)-এর অনুকরণ করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে মুজাহিদ (রহ.)-এর বক্তব্যের যে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, সে দিকে একটু ইঙ্গিত করা সমীচীন মনে করছি। তিনি লিখেছেন–

"ইবনে মুজাহিদ (রহ.) সাত ক্বেরাতকে সংকলন করে ১. এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, হাদীসে পবিত্র কুরআনুল কারীমের যে সাত হরফের আলোচনা করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই সাত ক্বেরাতই। ২. তাঁর দাবী ছিল যে, এই সাত ক্বেরাত ব্যতীত অন্য কোনো ক্বেরাত নির্ভরযোগ্য নয়। এমনকি অন্যান্য আলেমগণও তাঁর এ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই তাঁরা ইবনুল মুকসিম (রহ.) এবং ইবনে শিনবূয (রহ.)-কে নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেছিলেন। কারণ তিনি অন্যান্য ক্বেরাতগুলোকেও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন।"[৩০৮]

বাস্তবতা হলো, উপরে বর্ণিত ওয়াট (Watt)-এর একটি কথাও সঠিক নয়। আমরা আগেই বলে এসেছি যে, ওই যুগে বিভিন্ন আলেম ও ক্বারীগণ নিজ নিজ সুবিধার জন্য কয়েকটি করে ক্বেরাত একই গ্রন্থে সংকলন করে রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারোই এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, এগুলো ব্যতীত অন্যান্য ক্বেরাতগুলো অগ্রাহ্য ও অনির্ভরযোগ্য। এপ্রসঙ্গে স্বয়ং ইবনে মুজাহিদ (রহ.)ও এ সাত ক্বেরাতকে সংকলন করার সময় এ কথা কোথাও লিখেননি যে, এই ক্বেরাতগুলো "সাত হরফ"-এর ব্যাখ্যা। আর না তিনি এই দাবী করেছেন যে, বিশুদ্ধ ক্বেরাত এই সাতটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য আলেমগণও তাঁর কর্মরচনা থেকে কখনো এ কথা বুঝেননি যে, তিনি অন্যান্য ক্বেরাতকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে চান। বরং এর স্থলে মুহাক্কিক আলেমগণ এ ধারণাকে সর্বদা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। ইলমে ক্বেরাতের নির্ভরযোগ্য সর্বজনস্বীকৃত এবং 'মুহাক্কিক' উপাধিতে ভূষিত আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থসমূহে এ ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এক স্থানে তিনি লিখেন–

ہم نے اس بحث کو اس لیے طول دیا ہے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض بے علم لوگ صرف انہی سات قراءت توں کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد صرف یہی سات قراتیں ہیں۔۔۔۔ اسی بناپر بہت سے ائمہ متقدمین نے ابن مجاہد پر یہ تنقید کی ہے کہ انہیں سات قراتیں

---

৩০৭. ইবনুল জাযারী রচিত "মুনজিদুল মুকরিঈন"-এর উদ্ধৃতিসহ মানাহিলুল ইরফান : ১/৪৬০

308. W.M. Watt, Bell's Introduction to the Quran (Inslamic Surveys, Series 8) Edinburgh 1970 P P 48, 49.

সূচিপত্র

جمع کرنے کے بجائے سات سے کم یا سات سے زائد قراتی ذکر کرنی چاہیے، تہی یا اپنی مراد واضح کردینی چاہیے تہی تاکہ بے علم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے

"আমি এই আলোচনাকে এত দীর্ঘায়িত করার কারণ হলো, আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু কান্ডজ্ঞানহীন মূর্খ লোক শুধু এই সাতটি ক্বেরাতকে বিশুদ্ধ মনে করে এবং তার বলে যে, হাদীসে বর্ণিত সাত হরফ দ্বারা এই সাত ক্বেরাতকেই বুঝানো হয়েছে! ... এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কেরাম ইবনে মুজাহিদ (রহ.)-এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, তাঁর জন্য উচিত ছিল সাতের চেয়ে কম অথবা সাতের চেয়ে বেশি ক্বেরাত সংকলন করা কিংবা নিজের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে দেওয়া। তাহলে জ্ঞানহীন লোকেরা এই ভুল ধারণার শিকার হতো না।"[৩০৯]

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) এবং আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) ক্বেরাতের বহু ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যার মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইবনে মুজাহিদ (রহ.) শুধু সাত মাসহাফের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সাতটি ক্বেরাত সংকলন করেছেন। অন্যথায় অন্যান্য ক্বেরাতগুলো ভুল অথবা অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।[৩১০]

এখানে বাকি রইল ইবনে মুকসিম (রহ.) ও ইবনে শিনবূয (রহ.)-এর কথা। মূলত উলামায়ে কেরাম তাঁদের যে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তার কারণ এই ছিল না যে, তাঁরা এই সাত ক্বেরাত ব্যতীত অন্যান্য ক্বেরাতকে বিশুদ্ধ মনে করেন না কেন? বরং তার কারণ ছিল এই যে, সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, কারো ক্বেরাত বিশুদ্ধরূপে গণ্য করার জন্য তাতে তিনটি বিষয় পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

১. মাসহাফে উসমানীর রুসমেখত বা লিখন পদ্ধতির এর সংকুলান হওয়া।

২. আরবী সরফ (শব্দ-প্রকরণ) এবং নাহব (বাক্য-প্রকরণ)-এর নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া।

৩. বিশুদ্ধ সনদসূত্রে বর্ণিত হওয়া এবং ক্বেরাতের ইমামগণের মাঝে প্রসিদ্ধ হওয়া।

এই তিনটি শর্ত যে ক্বেরাতের মধ্যে পাওয়া যাবে, তা-ই গ্রহণযোগ্য ক্বেরাত হিসেবে বিবেচিত হবে। চাই তা সাত ক্বেরাতের অন্তর্ভুক্ত থাকুক বা না থাকুন। আর যে ক্বেরাতে এই তিনটি শর্তের মধ্য হতে যে কোনো একটি শর্ত

---

৩০৯. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/৩৫-৩৬

৩১০. ফাতহুল বারী : ৯/২৫-২৭, আল-ইতকান : ১/৮২-৮৩

সূচিপত্র

বিলুপ্ত হয়, তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তাই তা সাত ক্বেরাতের অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন। কিন্তু ইবনে মুকসিম (রহ.)[৩১১] এবং ইবনে শিনবূয (রহ.) সর্বসম্মত এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

ইবনে মুকসিম (রহ.)-এর বক্তব্য ছিল, ক্বেরাতকে বিশুদ্ধরূপে গণ্য করার জন্য শুধু প্রথম দু'টি শর্তই যথেষ্ট। কাজেই কোনো ক্বেরাত যদি মাসহাফে উসমানীর লিখন পদ্ধতি অনুযায়ী হয় এবং আরবী ভাষা হিসেবেও সেটা বিশুদ্ধ হয়, তাহলে সেটাকে গ্রহণ করা যাবে।

চাই সেটার কোনো সনদ বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। আর ইবনে শিনবূয তাঁর বিপরীত বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোনো ক্বেরাত বিশুদ্ধ সনদসূত্রে বর্ণিত হয়, তাহলে সেটা মাসহাফে উসমানীর লিখন পদ্ধতি অনুযায়ী না হলেও গ্রহণ করা যাবে। এর ভিত্তিতেই উম্মাহ'র সকল আলেম তাঁদের দু'জনকে প্রতিহত করেছেন। এ উদ্দেশ্যে মুবাহাসা ও বিতর্কের মজলিসও বসেছিল। অবশেষে তাঁরা উভয়ই জামহুর উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

---

৩১১. ইবনে মুকসিম (রহ.)-এর পুরো নাম হলো, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে ইয়াকুব এবং ইবনে শিনবূয (রহ.)-এর পুরো নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আইউব।

باب ششم

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোরআন সংরক্ষণ সম্পর্কিত সংশয় ও তার জবাব ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ -

এ পরিচ্ছেদটি প্রাচ্যবিদবের বিভিন্ন কোরআন সংরক্ষণ সম্পর্কিত ভুল বিশ্লেষিত বিষয়, অবান্তর এবং বানোয়াটসব প্রশ্নের জবাবেদান নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এতে প্রাচ্যবিদদের গোয়ার্তুমি, হঠকারিতা ইত্যাদির বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এতে মোট ১১টি প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা তারা কোরআন অসংরক্ষিত ছিল বলে দাবি করে থাকে, যথাঃ

১। প্রসিদ্ধ প্রাচ্য বিশারদ এফ. বুহল (Buhl) নিম্নোক্ত দু'টো আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। একঃ আল-আ'লাঃ ৬-৭। দুইঃ বাকারাঃ ১০৬।

২। পণ্ডিত ডি. এস. মারগোলিয়থ বুখারী ও মুলিমের বর্ণিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে তার দাবি প্রমাণ করতে চান। বুখারীঃ ২/৭৫৩। মুসলিমঃ ১/২৬৭।

জবাবঃ ভুলে যাওয়া আর খেয়াল না থাকা এক বিষয় নয়।

৩। তিনি সূরা নিসা ও আনআমে একই ভাবার্থের আয়াত দুই শব্দ দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় একই দাবি ছড়িয়ে দিয়েছেন। নিসাঃ ১৪০। আল-আনআমঃ ৬৮।

জবাবঃ একই বাক্য দু'ধরণের শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা দোষের কিছুই নয়।

৪। তিনি এপ্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর আয়াতের কৃত ব্যাখ্যাকে কোরআনের আয়াত দাবি করে নিজের মুর্খতা প্রকাশ করেদেন। বুখারীঃ ২/৭১৩।

জবাবঃ পূর্ণ মিথ্যা, অথবা বুঝার ভুল।

৫। উক্ত প্রাচ্যবিদ হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হস্তগত কিছু আয়াত তার পোষা প্রাণী নষ্ট করে ফেলেছিল। এটির মাধ্যমেও কোরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে।

সূচিপত্র

জবাবঃ এসমস্ত আয়াতগুলো সর্বসম্মতভাবে রহিত।

৬। কেউ-কেউ একটি হাদীসের মাধ্যমে হাফেজে কোরআন সাহাবায়ে কেরামদের অপ্রতুলতার ধারণা করে সন্দেহে পতিত হয়েছে। সূত্রঃ বুখারী, বিস্তারিতঃ ফতহুল বারীঃ ৯/৪১-৪২।

জবাবঃ এটি ছিল মূলত কোরআন সংকলক সাহাবাদের নাম, হাফেজে কোরআনের সংখ্যা নয়।

৭। তারা কিছু কিছু রেওয়াতের বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূরা ফালাক ও নাসকে কোরআনের অংশ মানতেন না। তা নিয়ে পানি ঘোলাটে করতে চেয়েছে।

জবাবঃ এসমস্ত বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। এতে উলূমুল হাদীসে আগ্রহী তালেবে ইলম ভাইদের জন্য "উসূলী" সুন্দর আলোচনা রয়েছে।

৮ ও ৯। হযরত সিদ্দীকের যুগে কোরআন সংকলনের কোনো চেষ্টা হয়নি এবং হযরত উসমান হযরত হাফসার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত কপি দিয়ে উপকৃত হয়েছেন। এ নিয়ে তারা পানি ঘোলা করার চেষ্টা করেছে।

জবাবঃ ওরা এক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদান হাফেজে কোরআন সাহাবাদের একটি ভাল রকমের ফিরিস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ ৮-৯ এ দু'টি আলোচনাখুবই কাছাকাছি ধরণের, যা পাশাপাশি রাখা চাই।

১০। কেরাতের বিভিন্নতাকে তাদের বিশাল একটি দল কোরআনের অসংরক্ষণতা বলে উল্লেখ করে থাকেন। তাদের দাবি, নুকতা ও হরকতের অনুপস্থিতিই এর মূল কারণ।

জবাবঃ আগের অধ্যায়ে এর পূর্ণ আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। এর উদ্যেশ্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত সকল কেরাতের সুবিধা রাখা, সংশয়-সন্দেহ এ কারণের অন্তর্ভুক্তই নয়!

১১। শায কেরাতগুলোর মাধ্যমেও তাদের উদ্যেশ্য হাসিলে তারা বদ্ধপরিকর।

জবাবঃ শায কেরাত মানেই গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই তা দ্বারা প্রমাণ দেয়া বোকামি।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

حفاظت قرآن سے متعلق شبہات اوران کا جواب

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ বিষয়ক সংশয় ও তার জবাব ঃ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).

'নিশ্চয় আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।'[৩১২]

এই আয়াতের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত তার আসল অবস্থায় সংরক্ষিত থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি এটাকে নিশ্চিহ্ন করার বা তাতে কোনো বিকৃতি সাধন কিংবা কোনো প্রকার সংশোধন-সম্পাদনা করতে সক্ষম হবে না। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ ভবিষ্যদ্বাণীকে কিভাবে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এবং যুগে যুগে কিভাবে এর সংরক্ষণ করা হয়েছে? তাইতো আজ নির্ভয়ে দ্বিধাহীনভাবে জোর গলায় আমরা এ দাবী করতে পারি যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ আমাদের কাছে তার আসল সেই রূপ নিয়েই বর্তমান রয়েছে, যেভাবে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত এতে কোনো একটি নুকতা বা বিন্দু পরিমাণও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

এ বিষয়টি শুধু মুসলমানদেরই আকীদা-বিশ্বাস নয়; বরং নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন অমুসলিমরাও এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে এবং অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখায়নি। কিন্তু চোখে যখন পক্ষপাতিত্ব কিংবা শত্রুতার পর্দা পড়ে যায়, তখন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পানিকেও ঝাপসা ও ঘোলাটে দেখায়। তাইতো কিছু কিছু অমুসলিম লেখক এ ব্যাপারে কিছু কিছু সংশয় ও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আমরা এখানে সেসব সংশয় ও অভিযোগের হাকীকতকে সংক্ষেপে প্রকৃতিরহস্য ধরতে প্রয়াস চালাব।

ابتدائی زمانہ کی کچھ آیات محفوظ نہیں رہیں

প্রাথমিক যুগের কিছু আয়াত সংরক্ষিত নেই ঃ

প্রথম অভিযোগ ঃ پہلا اعتراض

প্রসিদ্ধ প্রাচ্য বিশারদ পন্ডিত এফ. বুহ্‌ল (Buhl) এই দাবী করেছেন যে, নবী কারীম (সা)-এর রেসালাত যুগের শুরুদিকে পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করা হতো না। বরং তা সংরক্ষণের পুরো ভিত্তি ছিল রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

[৩১২] . সূরায়ে হিজর, আয়াত নং-৯

সূচিপত্র

ও তাঁর সাহাবাদের স্মৃতিশক্তির উপর। তাই এটা অবশ্যই সম্ভব যে প্রাথমিক যুগের কুরআনের আয়াতগুলো সংরক্ষিত রয়নি। এই দাবীর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতকে পেশ করেছেন।[৩১৩]

(سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ).

'আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি ভুলবেন না। তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত।'[৩১৪]

২. 'مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا' অর্থ্যাৎ যখনই আমি কোনো আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তখন এর চেয়েও উত্তম বা এর সমমানের আয়াত নিয়ে আসি।'[৩১৫]

কিন্তু যে ব্যক্তিই পবিত্র কুরআনুল কারীম ও এর তাফসীরের ব্যাপারে সামান্যতম জ্ঞান রাখেন, তিনি এই অভিযোগের অসারতা অনুভব করতে সক্ষম হবেন। কেননা এ দু'টি আয়াতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের মানসূখ [রহিত] আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতের শানে নুযূল হলো, যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) পবিত্র কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত নিয়ে উপস্থিত হতেন, তখন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেগুলো ভুলে যাবার আশঙ্কায় বার বার পুনঃচর্চা করতেন। এতে তাঁর কঠোর পরিশ্রম হতো। এ আয়াতে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অভয়বাণী দেওয়া হয়েছে যে, তা আত্মস্থ করার জন্য আপনার এত কষ্ট সাধনের প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই পবিত্র কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।[৩১৬] কাজেই রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই আয়াতগুলো ভুলতে পারেন না। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত তো পরবর্তীতে মানসূখ হয়ে যাওয়ার কারণে স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যই إلا ماشاء الله (তবে আল্লাহ যা চান)-শব্দ কয়টি বর্ধিত করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, যখন মহান আল্লাহ তা'আলা কোনো আয়াতকে মানসূখ করবেন, তখনই কেবল ওই আয়াতটি তাঁর স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হতে পারবে, অন্যথায় নয়।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আয়াতেও বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিছু আয়াত মানসূখ হয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও

---

৩১৩. ঋ. ইষয : "উহপুপষড়ঢ়ধবফরধ ড়ভ ওংষধস চ. ১০৬৭. ঠ. ৩ কঙজঅঘ".
৩১৪. সূরা আ'রা : ৬-৭
৩১৫. সূরা বাকারা : ১০৬
৩১৬. তাফসীরে কুরতুবী : ২০/১৮

সূচিপত্র

সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতি থেকে শুধু রহিত সেই আয়াতটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, অন্যান্য আয়াত নয়।

সুতরাং, উপরোক্ত আয়াত দু'টি থেকে বেশির চেয়ে বেশি যা সাব্যস্ত হয় তা হলো, কতক আয়াতকে যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানসূখ (রহিত) করে দিলেন, তখন সেগুলোর লিখিত অক্ষরগুলোকে তো বিলুপ্ত করার নির্দেশ দেওয়াই হয়েছে, সাথে সাথে ওই আয়াতগুলোকে মানুষের স্মৃতি থেকেও বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় অরহিত আয়াতগুলোর ব্যাপারে তো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো সেগুলোকে ভুলতে পারবেন না। এ থেকে অবশেষে এই ফল কিভাবে বেরিয়ে আসল যে, যে আয়াতগুলো রহিত হয়নি সেগুলো ভুলে যাবারও কোনো সম্ভাবনা রয়েছে? উল্লেখিত উপরোক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা এ কথার দলীল দেওয়া যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করা হতো না। এটি একটি অকাট্য ভিত্তিহীন ও অসার দলীল। আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সাহাবায়ে কেরামের নিকট পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ থাকার কথা মুসতানাদ বা গ্রহণযোগ্য সনদসূত্রে প্রমাণিত আছে। সুতরাং প্রথম আয়াতে শুধু نسيان... (বিস্মৃত) হওয়ার কথা উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়নি যে, ওই সময় পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিল না।

বরং আসল কথা হচ্ছে এখানে শুধু نسيان (বিস্মৃত হওয়ার)-এর আলোচনাই চলে আসছিল। তাই এখানে লিখিত আয়াতগুলোকে نسخ করার কথা উল্লেখ করা হলে তা হবে অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক। আর এ কারণেই দ্বিতীয় আয়াতটিতেও যেহেতু নসখই হচ্ছে আলোচনার বিষয়, তাই এতে "নসখ" (লিখিত আয়াতকে বিলুপ্ত করা) এবং نسيان.. . (বিস্মৃত করা) উভয়টার উল্লেখ করা হয়েছে। "নসখ"-এর আভিধানিক অর্থ হলো, দূরীভূত করা এবং বিলুপ্ত করা।

অতএব, এই শব্দটিই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং এর কতক আয়াতকে মানসূখ হওয়ার ভিত্তিতে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, এই আয়াত যা পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ থাকার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে, সেটাকেই ওই এক বুহ্‌ল (Buhl) কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ না থাকার উপর দলীল হিসেবে উপস্থাপন করছেন!

সূচিপত্র

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک آیت یاد نہیں رہی تھی،

একদা একটি আয়াত রাসূল (সা.)-এর স্মরণ ছিল না ঃ

দ্বিতীয় অভিযোগ ঃ دوسرا اعتراض

প্রাচ্য পন্ডিত ডি. এস. মারগোলিয়থ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণকে সংশয়পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন।[৩১৭] বুখারী ও মুসলিম শরীফে উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক রাতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে এক সাহাবীকে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতে শুনে বললেন–

رحمه الله, لقد أذكرني كذا وكذا آية اسيتها

'অর্থ্যাৎ আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে এমন একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'[৩১৮]

এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে মারগোলিয়থ বুঝাতে চান যে, যদি কোনো এক সময়ে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি আয়াত বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে (নাঊযুবিল্লাহ) অন্য আয়াতও বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এ বর্ণনা দ্বারা সম্ভবত এটাও সাব্যস্ত করতে চান যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ ছিল না। যদি লিপিবদ্ধ থাকতো, তাহলে তিনি এ আয়াতটি ভুলতেন না।

কিন্তু এই অভিযোগটি এতই অসার ও ভিত্তিহীন যে, সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন একজন ব্যক্তিও এটাকে মেনে নিবে না। কেননা উপরোক্ত ঘটনার বাস্তবতা কেবল এতটুকুই যে, অধিকাংশ সময় কোনো একটি বিষয় মানুষের স্মরণে তো থাকে, কিন্তু দীর্ঘ সময় নিয়ে এর আলোচনা না হওয়ার কারণে এর প্রতি খেয়াল যায় না। তাই তা স্মৃতিতে উপস্থিত থাকে না। যখনই কোনো ব্যক্তি এর আলোচনা করে সঙ্গে সঙ্গেই তা স্মৃতিভান্ডারে সতেজ হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে এটাকে ভুল বলা হয় না। বরং সাময়িকভাবে তা খেয়াল থেকে বের হয়ে যায়। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলায় তা-ই ঘটেছিল।

তাই এ ধরনের ঘটনার উপর ভিত্তি করে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি نسیان (বিস্মৃত) হওয়ার সম্বন্ধ করা চরম পর্যায়ের বে-ইনসাফী। যার উদ্দেশ্য গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়। বরং মিষ্টার মারগোলিয়ত যদি গভীর ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখতেন, তাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন যে, এই ঘটনা থেকে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল

---

৩১৭. Margoliouth, উ. ঝ. ঊহপুপষড়ঢ়বধফরধ ড়ভ জবষরমরড়হ ধহফ ঊঃযরপং চ. ৫৪৩.
৩১৮. সহীহ বুখারী : ২/৭৫৩, সহীহ মুসলিম : ১/২৬৭

সূচিপত্র

আলামীন পবিত্র কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের এমন এক অসাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যার কোনো অংশ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাই নেই।

কেননা এ ঘটনা থেকে যদি কোনো হাকীকত সাব্যস্ত হয় তাহলে তা হলো এই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের এক একটি আয়াত এত অসংখ্য মানুষের আত্মস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, যদি ঘটনাক্রমে কখনো কোনো আয়াত সাময়িকভাবে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্মৃতিভান্ডারে উপস্থিত না থাকে, তাহলেও তা অরক্ষিত বা নষ্ট হয়ে যাবার দূরবর্তী কোনো আশঙ্কাও নাই।

এখানে কথা উঠতে পারে যে, এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, 'কুরআনুল কারীম লিখিত আকারে বিদ্যমান ছিলনা।' এ কথাটি প্রথম কথার চেয়ে অধিক ভিত্তিহীন ও হাস্যকর। আমরা আরয করেছি যে, এ ঘটনার মূল বিষয় হচ্ছে, একটি আয়াত ঘটনাক্রমে সাময়িকভাবে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্মৃতিভান্ডারে উপস্থিত ছিল না।

যা একজন সাহাবীর তেলাওয়াতের সাথে সাথেই তাঁর স্মৃতিতে সতেজ হয়ে উঠে। এর দ্বারা কিভাবে এটা সাব্যস্ত হয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিল না? এই প্রাচ্য পন্ডিতজী কি মনে করেন যে, যা একবার লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়, তা আর এক মুহূর্তের জন্যও স্মৃতিভান্ডার থেকে অনুপস্থিত হতে পারে না? আর জগদ্বাসীর তো এ কথা জানাই আছে যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন উম্মী। অর্থাৎ, তিঁনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। তাই পবিত্র কুরআন মাজীদকে স্মরণ রাখার জন্য লিপিবদ্ধকরণের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। অতএব, উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ না থাকার উপর ওই ব্যক্তিই দলীল-প্রমাণ পেশ করতে পারে, যে নিজের উপর ইনসাফ ও নিরপেক্ষতার সকল দরজা রুদ্ধ করে দিয়েছে।

সূরায় নিসা'য় সূরা আনআমের উদ্ধৃতি : سورہ نسا میں سورہ انعام کا حوالہ

তৃতীয় অভিযোগ : تیسرا اعتراض

প্রফেসর মারগোলিয়থ পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ না থাকার উপর আর কটি আযব ও আশ্চর্যকর দলীল পেশ করেছেন। তা হলো, সূরা নিসার আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

'এবং নিশ্চয়ই তিনি গ্রন্থের মাধ্যমে তোমাদের আদেশ করছেন যে, তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি উপহাস করা

সূচিপত্র

হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; ।'[৩১৯]

এই আয়াতটি মাদানী। আর এতে সূরা আনআমের নিম্নোক্ত মাক্কী আয়াতটির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে–

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

'আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়।'[৩২০]

প্রথম আয়াতে দ্বিতীয় আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উভয় আয়াতের শব্দমালা ভিন্ন ভিন্ন। মারগোলিয়থ এটা থেকে এ ফলাফল বের করেছেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ ছিল না। যদি লিপিবদ্ধই থাকতো, তাহলে প্রথম আয়াতে অবিকল ওই শব্দগুলোই থাকতো যা দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ আছে। শব্দের এই ভিন্নতার কারণে বুঝা যায় যে, প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় দ্বিতীয় আয়াতের শব্দাবলী (নাঊযুবিলাহ) সংরক্ষিত ছিল না।[৩২১]

কিন্তু মারগোলিয়থের উপস্থাপিত এ দলীলটি এতই স্পষ্ট ভ্রান্ত যে, এর জবাব দিতেও লজ্জা লাগে। প্রশ্ন হলো, যদি সূরা নিসা অবতীর্ণ হবার সময় সূরা আনআমের উল্লিখিত আয়াতের শব্দমালা (নাঊযুবিলাহ) সংরক্ষিত না-ই থেকে থাকে তাহলে পরবর্তীতে তা কিভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমে লিপিবদ্ধ করা হলো? যদি সূরা আনআমের মূল শব্দমালা সংরক্ষিত না থাকত তাহলে নিয়ম-নীতির দাবী তো ছিল এটাই যে পরবর্তীতে লিখিত সূরা আনআমেও অবিকল ওই শব্দমালা লিপিবদ্ধ করা, যা সূরা নিসা'য় উল্লেখ রয়েছে।

এ উভয় আয়াতের শব্দগত পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে এ কথাই প্রমাণ করে যে, উভয় আয়াতের শব্দমালা সর্বদাই পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত ও অবিকৃত ছিল এবং তাতে কারো কেয়াস এবং ধারণার কোনো অবকাশ বাকি ছিল না। কারণ পবিত্র কুরআনুল কারীমের লিপিবদ্ধকরণ যদি কেয়াস ও ধারণা দ্বারাই হতো, তাহলে উভয় আয়াতের শব্দমালার মাঝে কোনো পার্থক্য না হওয়াটাই সমীচীন ছিল।

আসল কথা হলো, প্রত্যেক ভাষার বাক-পদ্ধতিতে যখন কোনো প্রাক্তন আলোচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, তখন তা দু'ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। কখনো

---

৩১৯. সূরা নিসা : ১৪০
৩২০. সূরা আনআম : ৬৮
৩২১. ইনসাইক্লোপিডিয়া : ১০/৫৪২

সূচিপত্র

প্রাক্তন আলোচনাকে অবিকল শব্দমালা দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয়। (ইংরেজিতে যেটাকে Direct Narration বলা হয়।) আবার কখনো অবিকল শব্দমালার পুনরাবৃত্তি না করে শুধুমাত্র মূল আলোচনার ভাবার্থকে অন্যান্য শব্দমালা দ্বারা বর্ণনা করে দেওয়া হয়। (ইংরেজিতে যেটাকে Indirect Narration বলা হয়। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটির ব্যবহার খুবই কম। অর্থাৎ এমন খুব কমই হয়ে থাকে যে, প্রাক্তন আলোচনার উদ্ধৃতিতে এর পুরোপুরি শব্দমালার পুনরাবৃত্তি করা হয়।

এর পরিবর্তে সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রকারটিই অধিক সমাদৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মূল আলোচনার ভাবার্থকে অন্য শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সূরা নিসা'তেও এই দ্বিতীয় প্রকারটিই অবলম্বন করা হয়েছে। এর আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, কুরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি সূরার নিজ নিজ বাক্য-গঠনে পৃথক পৃথক শৈলীর অবলম্বন পরিলক্ষিত হয়। কাজেই যদি কোনো একটি সূরার বাক্যগুলোর মাঝে অন্য সূরার কোনো বাক্যকে অবিকল জুড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আয়াতের ধারাবাহিকতা (Sequence)-এর মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং বাক্যের প্রবাহ (Flow) স্থির থাকে না, যার প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। তাই যে ব্যক্তির সামান্যতমও সাহিত্য প্রীতি রয়েছে, সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, যদি সূরা নিসা'র উল্লিখিত আয়াতে সূরা আনআমের শব্দমালা হুবহু নকল করে দেওয়া হয়, তাহলে ইবারতের গাঁথুনী এবং ছন্দ বিনষ্ট হবে।

এতদ্ব্যতীত সূরা আনআম– যার উলিখিত আয়াতের ব্যাপারে মারগোলিয়থের দাবী হলো যে, তা লিপিবদ্ধ ছিল না, সম্পূর্ণতা একসাথেই অবতীর্ণ হয়েছে[৩২২]

وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

'আর এই (কুরআন) এমন একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বরকতময়, যা তার পূর্বে (অবতীণ) গ্রন্থসমূহ (তাওরাত, ইনজীল ইত্যাদি)-এর সত্যায়নকারী।'[৩২৩]

এ আয়াতে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে বুঝানোর জন্য "কিতাব" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিসূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ না থাকতো, তাহলে সেটাকে "কিতাব" বলার অর্থ কি?

মোটকথা, যে দৃষ্টিকোন থেকেই তাকাবেন, মারগোলিয়থের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং শুধুই একগুঁয়েমী ও শত্রুতা ভাবাপন্ন বলে মনে হয়।

---

৩২২. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/১২২

৩২৩. সূরা আনআম : ৯২

সূচিপত্র

امام بخاری پر مار گولیو تھ کا ایک بیان

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উপর মারগোলিয়থের একটি অপবাদ ঃ

চতুর্থ অভিযোগ ঃ چوتھا اعتراض

পবিত্র কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রাচ্যবিদ মারগোলিয়থের চতুর্থ অভিযোগ উপস্থাপ করে বলেন–"

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন, إِلاَّ أَن تَصِلُوا مَابَيْنِي مِنَ القَرَابَةِ এ বাক্যটি ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন, এ বাক্যটি পবিত্র কুরআনুল কারীমে পাওয়া যায় না। তাই তিনি এটাকে ৪২নং সূরা (শুরা)-এর ২২নং আয়াত–إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ-এর ব্যাখ্যা হিসেবে সাব্যস্ত করেন।"[৩২৪]

কিন্তু আমরা পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে আবেদন করছি যে, এ কথাগুলোর মাধ্যমে মারগোলিয়থের মতো জগদ্বিখ্যাত একজন প্রাচ্যবিদ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রতি এমন লজ্জাকর অপবাদ আরোপ করেছেন, উগ্রবাদী কপটতা বা আক্ষেপময় মূর্খতা ছাড়া যার কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। ওই উক্তির মাধ্যমে মারগোলিয়থ এই প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালিয়েছেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এমন একটি আয়াতকে কুরআনের অংশ সাব্যস্ত করেছেন, যা কুরআনে বিদ্যমান নেই। অথচ যে কেউ বুখারী শরীফ খুলতেই দেখতে পাবে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) আয়াতের অবিকল ওই শব্দগুলোই উদ্ধৃত করেছেন, যা কুরআন মাজীদে রয়েছে।

আর إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي القُربَ বাক্যটি ওই আয়াতের তাফসীর করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পুরো ইবারত হলো নিম্নরূপ–

بَابُ قَولِهِ: (إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَى) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشاَّرٍ..... عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما: أَنَّهُ سُئِلَ عَن قَولِهِ: (إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَى) فَقَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ: قُربَى أَلِ مُحَمَّدٍ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلم فقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: عَجِلتَ إِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَكُن بَكن مِن قُرَيشٍ. إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِم قَرَابَةُ. فَقَالَ: إِلاَّ أَن تَصِلُوا مَابَينِي وَبَينَكُم مِنَ القَرَابَةِ..

লক্ষ্য করুন যে, এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) এ অধ্যায়ের শিরোনামে আয়াতের ওই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন, কুরআন মাজীদে যা বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (ঃ)-কে (إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَى)এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি এই বাক্যটি বলেন–

إِلاَّ أَن تَصِلُوا مَابَينِي وَبَينَكُم مِنَ القَرَابَةِ

---

৩২৪. ইনসাইক্লোপিডিয়া : ১০/৫৪৩

সূচিপত্র

কিন্তু মিষ্টার মারগোলিয়থ বেপরোয়া গোঁয়ার্তুমির সাথে বলেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এ বাক্যটিকে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ বলে মানেন।

এর দ্বারা আপনারা আঁচ করতে পারেন যে, গবেষণা ও ইনসাফের এই দাবীদার পবিত্র কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামীর কেমন স্থায়ী ব্যাধিতে লিপ্ত রয়েছেন? ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতা কত নিকৃষ্টভাবে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে! (তার মতো ব্যক্তিদের ব্যাপারেই পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে)–

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

.....

حضرت عائشہ سے کچھ آیتیں گم ہو گئی تھیں

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছ থেকে কিছু আয়াত হারিয়ে গিয়েছিল

পঞ্চম অভিযোগ ঃ پانچواں اعتراض

মারগোলিয়থের পঞ্চম অভিযোগ হচ্ছে, মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর কাছ থেকে কিছু আয়াত হারিয়ে গিয়েছিল।[৩২৫] এখানে মারগোলিয়থ যে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হলো নিম্নরূপ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا

'অর্থ্যাৎ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রজম অর্থাৎ ব্যভিচারী ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দশবার দুধ পান করা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াতগুলো আমার ঘরের খাটের নিচে একটি কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল। যখন রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (মৃত্যু পূর্ববর্তী) অসুস্থতায় পড়ে গেলেন, তখন আমরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত হয়ে গেলাম। আমাদের একটি পোষাপ্রাণী ছিল। সেটা এসে ওই কাগজটিকে খেয়ে ফেলল।'[৩২৬]

আসল বাস্তবতা হলো যে, উপরোক্ত বর্ণনায় উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) যেসব আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন, উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে এই আয়াতগুলোর তেলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা.)ও

---

৩২৫. ইনসাইক্লোপিডিয়া : ১০/৫৪৩

৩২৬. মুসনাদে আহমদ : ৬/২৬৯

সূচিপত্র

এই আয়াতগুলোর তেলাওয়াত রহিত হওয়ার প্রবক্তা। সুতরাং তিনি যদি আয়াতগুলোকে কোনো কাগজে লিপিবদ্ধ করেই থাকেন, তা একটি স্মারকের সংরক্ষণ বৈ কিছুই ছিল না।

অন্যথায় যদি এই আয়াতগুলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট কুরআন মাজীদের অংশই হতো, তাহলে কমপক্ষে তা তাঁর তো মুখস্ত থাকতো এবং তিনি তা পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুলিপি গুলোতে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। কিন্তু তিনি গোটা জীবনে কখনো এ ধরনের চেষ্টা করেননি। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এ আয়াতগুলো শুধুমাত্র এক ইলমী স্মারকের মর্যাদা রাখতো। পবিত্র কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াতের ন্যায় মাসহাফে লিপিবদ্ধ করার জন্য এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো গুরুত্ব ছিল না। অতএব, এ ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআন মাজীদের সংরক্ষণের উপর কোনো ধরনের অভিযোগ-আপত্তি তথা ওজর পেশ করা যায় না।

নববী যুগে হাফেযদের সংখ্যা : عہد رسالت میں حفاظ کی تعداد

ষষ্ঠ অভিযোগ : چھٹا اعتراض

হযরত কাতাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর একটি বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের ব্যাপারে সংশয়ে পড়ে যান। সহীহ বুখারীতে বর্ণনাটি নিম্নোক্ত শব্দমালা দ্বারা বর্ণিত হয়েছে–

قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ؟؟ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (70)

"আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কারা আল কুরআন সংকলন করেছেন? তিনি বললেন, চারজন। তাঁরা সবাই ছিলেন আনসারী। ১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। ২. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। ৩. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। ৪. হযরত আবু যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)।"

এই বর্ণনা দ্বারা কোনো কোনো ব্যক্তি এ ধারণা করেন যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে পবিত্র কুরআনুল কারীমের হাফেয এই চারজনই ছিলেন। অথচ এ ধারণা সঠিক নয়। আমরা পূর্বে ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের সম্মানিত নাম উল্লেখ করে এসেছি, যাঁরা রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেই কুরআন মাজীদের হিফয করে নিয়েছিলেন।

কাজেই হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এই চারজন ব্যতীত আর কোনো হাফেযে কুরআন ছিলেন না। বরং উপরোক্ত বর্ণনায় "কুরআনুল

সূচিপত্র

কারীমের সংকলন" করার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই শব্দের সঠিক (ভাবার্থ) হচ্ছে কুরআনুল কারীমকে লিপিবদ্ধ করা। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উদ্দেশ্য হলো, এই চারজন সেই মহান ব্যক্তি যাঁদের নিকট রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেই পবিত্র কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ ছিল।

এতদ্ব্যতীত হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) তাবারী শরীফের একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ওই উক্তির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন যে, একবার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে পরস্পর গর্ব ও অহঙ্কারের আলোচনা চলছিল। আউস গোত্রের লোকেরা নিজ গোত্রের এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম গণনা করলেন, ইসলামে যাদের বিশেষ মর্যাদা লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এর প্রতি উত্তরে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা (যাদের মধ্যে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও শামিল ছিলেন), বললেন, আমাদের মধ্যে এমন চারজন ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা সমগ্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অতএব, উপরোক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, আউস ও খাযরাজের গোত্রের মাঝে কুরআনুল কারীমকে সংকলনকারী ব্যক্তি ছিলেন, এই চারজন।[৩২৭]

حضرت عبداللہ بن مسعود اور معوذتین

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং মু'আওয়াযাতাইন ঃ

সপ্তম অভিযোগ ঃ ساتواں اعتراض

কোনো কোনো লোক মুসনাদে আহমাদের ওই বর্ণনাটিকে অভিযোগের দলীল হিসেবে অনেক বেশী পেশ করে থাকেন, যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মু'আওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক এবং সূরা নাস)-কে কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে মানতেন না।[৩২৮]

অথচ এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। প্রকৃত ঘটনা হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও গোটা উম্মতের ন্যায় সূরায়ে ফালাক এবং সূরা নাস'কে কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করতেন। যেসব বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে মানতেন না, সেগুলো সঠিক নয়। এর প্রমাণ হলো এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে যেসব মুতাওয়াতির কেরাত বর্ণিত আছে, সেগুলোতে সূরা ফালাক ও সূরা নাসও সন্নিবেশিত আছে। "القراءة العشرة" তথা দশ ক্বেরাতের মধ্য হতে হযরত আসেম (রহ.)-এর ক্বেরাত হযরত আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহ.), হযরত যর ইবনে হুবাইশ (রহ.) এবং হযরত

---

৩২৭. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : ফাতহুল বারী : ৯/৪১-৪২

328. Watt : W. Montgomery; Bell's Introduction to the Quran P. P.46

সূচিপত্র

আবু আমর আশ-শাইবানী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে। আর এঁরা তিনজনই নিজেদের ক্বেরাত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করতেন।[৩২৯]

অনুরূপভাবে হযরত হাম্‌যাহ (রহ.)-এর কেরাত আলকামাহ (রহ.), আসওয়াদ (রহ.), ইবনে ওয়াহাব (রহ.), মাসরূক (রহ.), আসেম ইবনে যামরাহ (রহ.) ও হারেস (রহ.) থেকে বর্ণিত। আর তাঁরা সকলেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন।[৩৩০]

এছাড়াও দশ ক্বেরাতের মধ্যে ইমাম কুসাঈ (রহ.) এবং ইমাম খালাফ (রহ.)-এর ক্বেরাতও শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট গিয়ে সমাপ্ত হয়। কেননা ইমাম কুসাঈ (রহ.) হামযাহ্ (রহ.)-এর শাগরিদ ছিলেন। আর খালাফ (রহ.) ছিলেন তাঁর শাগরিদের শাগরিদ। আর এ কথার উপর সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে যে, দশ ক্বেরাতের সবগুলোর সনদ পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং বিশুদ্ধ এবং বংশ পরম্পরায় তাওয়াতুরের সাথে বর্ণিত হয়ে আসছে।[৩৩১]

আর বিধিবদ্ধ নিয়ম হলো যদি কোনো "খবরে ওয়াহিদ" মুতাওয়াতির ক্বেরাতের বিপরীত হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে তা বর্জনীয় এবং তা কবুল করা যাবে না।

এর উপর ভিত্তি করেই অধিকাংশ মুহাক্কিক আলেম ও মুহাদ্দিসগণ এসব বর্ণনাকে দুর্বল, মাউযু অথবা কমপক্ষে অগ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দিকে এই ভ্রান্ত মাযহাবের সম্বন্ধ করে। ওই সকল মুহাক্কিক আলেম ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শায়খুল ইসলাম আল্লামা নববী (রহ.), আল্লামা ইবনে হায্‌ম (রহ.), ইমাম রাযী (রহ.), কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহ.), আল্লামা বাহরুল উলূম (রহ.) এবং শেষ যুগের প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক আলেম আল্লামা জাহেদ কাউসারী (রহ.)ও শামিল রয়েছেন।[৩৩২]

একথার উপর সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) এবং আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী (রহ.) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর সকল রাবী সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য।[৩৩৩]

---

৩২৯. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/১৫৬
৩৩০. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/১৬৬
৩৩১. ফয়যুল বারী : ১/২৬২
৩৩২. দেখুন : "আল-ইতকান" : ১/৮১, আল-মুহালা : ১/১৩, ফাওয়াতিহুর রহমূত শরহে মুআলামুস সুবূত : ২/১২, মাকালাতুল কাউসারী : পৃ. : ১৬। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : অধমের রচিত "হযরত আবদুলাহ ইবনে মাসউদ ও মু'আওয়াযাতাইন" মাসিক আল-বালাগ, শাবান, ১৩৯৩ হিঃ
৩৩৩. ফাতহুল বারী : ৮/৩-৬, মাজমাউয যাওয়াইদ [হাইসামী] : ৭/১৪৯

সূচিপত্র

কাজেই কিভাবে বলা যেতে পারে যে, এ বর্ণনাগুলো সহীহ্ নয়? কিন্তু যারা হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান রাখেন, তাঁদের কাছে এ কথাটি অস্পষ্ট নয় যে, শুধু বর্ণনাকারীর সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) হওয়াই কোনো বর্ণনা সহীহ হবার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে অস্পষ্ট কোনো কারণ না পাওয়া যাওয়াও আবশ্যক। মুহাদ্দিসগণ "সহীহ হাদীস"-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, ওই বর্ণনাটি যে কোনো প্রকারের অস্পষ্ট কারণমুক্ত হওয়া আবশ্যক। যদি কোনো বর্ণনায় কোনো অস্পষ্ট কারণ পাওয়া যায়, তখন ওই বর্ণনার বর্ণনাকারীগণ সিকাহ হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে সহীহ হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায় না। হাফেয ইবনুস সালাহ্ তাঁর 'মুকাদ্দিমা'য় লিখেন

"হাদীসে মুআলাল এমন হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে এমন কোনো "علة" (অস্পষ্ট কারণ) পাওয়া যায়, যা ওই হাদীসের বিশুদ্ধতাকে অভিযুক্ত করে দেয়। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ নির্ভেজাল বলে মনে হয়। আর এই "علة" ওই সনদের মধ্যেও পাওয়া যায় যার বর্ণনাকারী সিকাহ্ এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশুদ্ধতার সকল শর্ত তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী পন্ডিতগণ বিভিন্নভাবে এই ইল্লত বা অস্পষ্ট কারণ অনুধাবন করতে পারেন।

কখনো বর্ণনাকারীর একাকীত্ব দেখে অনুধাবন করেন। আবার কখনো একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা অপর একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত পরিলক্ষিত হলে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন। আবার কখনো এগুলোর সাথে আরো অন্যান্য লক্ষণও পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।[৩৩৪]

অনুরূপভাবে "شاذ" ও হাদীসের একটি প্রকার। এর রাবীও নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এটা তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত হয়ে থাকে তাই তার হাদীস গ্রহণ করা হয় না। অতএব, যেসব বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রতি এ বক্তব্যের সম্বন্ধ করা হয়েছে যে, তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে মানতেন না, আলামা নববী (রহ.) ও আলামা ইবনে হাযম (রহ.) প্রমুখ ওই বর্ণনাগুলোর রাবী সিকাহ হওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত তিনটি কারণে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি।

১. এই বর্ণনাগুলো মা'লূল (معلول)। এতে সবচেয়ে বড় ইল্লত হলো এই যে, তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ওই সকল ক্বেরাতের বিপরীত, যা মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত আছে।

---

৩৩৪. মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল মুলহিম : ১/৫৪

সূচিপত্র

২. মুসনাদে আহ্‌মদের সেই বর্ণনা যার মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এ স্পষ্ট বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে যে انهما ليستا من كتاب الله এ সূরা দু'টি (ফালাক ও নাস) কুরআনুল কারীমের অংশ নয়। এ বাক্যটি শুধু আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত। অন্য কেউ তাঁর এই বাক্য বর্ণনা করেননি।[৩৩৫] কাজেই মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়ায় নিশ্চয়তা "শায।" আর মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুযায়ী (মুতাওয়াতিরের বিপরীত) "হাদীসে শায" গ্রহণযোগ্য হয় না।

৩. যদি কথার কথা ওই বর্ণনাগুলোকে সহীহ হিসেবে মেনেও নেওয়া হয়, তবু তো সেগুলো "خبر واحد" মাত্র। আর এ কথার উপর উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে যে, যে খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতির ও قطعي অথাৎ অকাট্যভাবে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হয় তা গ্রহণযোগ্য হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে যেসব ক্বেরাত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর বিশুদ্ধতা অকাট্য ও নিশ্চিত। কাজেই সেগুলোর বিপরীত এই খবরে ওয়াহিদগুলো অবশ্য পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।

এখন শুধু একটি প্রশ্নই থেকে যায় যে, যদি এ বর্ণনাগুলো বিশুদ্ধই না হয় তাহলে এই নির্ভরযোগ্য রাবীগণ এমন ভিত্তিহীন কথাগুলো কেন বর্ণনা করলেন? এর জবাব হলো, ওই বর্ণনাগুলোর হাকীকত এ হতে পারে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে মানতেন। কিন্তু কোনো কারণবশতঃ সূরা দু'টিকে তিনি নিজের মাসহাফে লিপিবদ্ধ করেননি।

এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো রাবী এ ধারণা করে বসেছেন যে, তিনি সূরা দু'টিকে কুরআনের অংশ হিসেবে মানেন না এবং নিজ ধারণা অনুযায়ী এভাবেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। অথচ বাস্তব ঘটনা ছিল শুধু এতটুকু যে, তিনি সূরা দু'টিকে কুরআনুল কারীমের অংশ মানা সত্ত্বেও স্বীয় মাসহাফে তা লিপিবদ্ধ করেননি। আর লিপিবদ্ধ না করার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন, আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) বলেছেন যে, তিনি সূরা দু'টিকে এ জন্য লিপিবদ্ধ করেননি যে, এগুলো ভুলে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না। কারণ প্রত্যেক মুসলমানেরই সাধারণত এগুলো মুখস্ত থাকে।[৩৩৬]

উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থন এ কথা দ্বারা হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নিজের মাসহাফে "সূরা ফাতেহা"ও লিপিবদ্ধ করেননি। ইমাম আবু বকর আল-আম্বারী (রহ.) নিজ সনদে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে এ

---

৩৩৫. মাযমাউয যাওয়াইদ : ৭/১৪৯, আল-ফাতহুর রাব্বানী : ১/১/৩৫১-৩৫২

৩৩৬. মাকালাতে কাউসারী : পৃ: ১৬

সূচিপত্র

ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, "আমি যদি সূরা ফাতেহা লিপিবদ্ধ করতাম তাহলে প্রত্যেক সূরার সাথে লিপিবদ্ধ করতাম।" ইমাম আবু বকর (রহ.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাযে প্রত্যেক সূরার পূর্বেই সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয়। তাই আমি সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে তা লিপিবদ্ধ করিনি এবং মুসলমানদের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেছি।[৩৩৭]

সারকথা, যদি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নিজের মাসহাফে সূরা ফাতেহা এবং সূরা ফালাক ও নাস লিপিবদ্ধ না করে থাকেন, তাহলে এর যুক্তিযুক্ত বহু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা বুঝা কোনোভাবেই সঠিক নয় যে, তিনি সূরা দু'টিকে কুরআন মাজীদের অংশই মানতেন না। যখন তাওয়াতুর সূত্রে তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ কুরআন বর্ণিত আছে এবং তাতে সূরা ফালাক ও সূরা নাস সন্নিবেশিত রয়েছে।

خلافت صدیقی میں جمع قرآن کی روایت پر مستشرقین کا

সিদ্দীকি খেলাফত আমলে কুরআন সংকলন ঃ

অষ্টম অভিযোগ ঃ آٹھواں اعتراض

আমরা ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি যে, সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর খেলাফত আমলে পবিত্র কুরআনুল কারীম সংকলনের যে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল, কোনো কোনো প্রাচ্য বিশারদ পন্ডিত এ ঘটনাকে বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর খেলাফত কালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পবিত্র কুরআন সংকলন ও বিন্যাসের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। বরং সরকারী ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রথম এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। তারা দাবী করেছেন যে, হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট সংরক্ষিত কুরআনের যে কপিটি দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, তা ছিল হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত একটি কপি। সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতকৃত কোনো কপি ছিল না। নিজেদের এ বক্তব্য প্রমাণ করতে গিয়ে তারা হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী শরীফের ওই হাদীসটির উপর একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। যার মধ্যে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর যুগে কুরআন সংকলনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে (হাদীসটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রফেসর মন্টেগোমেরী ওয়াট এসব অভিযোগের সারকথা তুলে ধরেছেন।[৩৩৮]

---

৩৩৭. তাফসীরে কুরতুবী : ১/১১৪-১১৫

৩৩৮. Watt, Bell's Introduction to the Quran 40, 42 Edinburgh 1970

সূচিপত্র

এখানে তাদের সবগুলো অভিযোগ উত্থাপন করে সেগুলোর জবাব দেওয়া এ জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করি যে, এগুলোর মাঝে এমন কিছু অর্বাচীন অভিযোগ আছে যার জবাব একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিজেই বুঝতে পারে। অবশ্য এগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের জবাব এখানে উপস্থাপন করছি।

তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হলো, সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর যুগে কুরআন সংকলনের উদ্দীপক এই ছিল যে, ইয়ামামার যুদ্ধে হাফেয ও ক্বারীদের বিরাট একটি দল শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ উদ্দীপনা সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের নামের তালিকায় এমন লোকদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল, যারা কুরআনের হাফেয ছিলেন। কারণ শহীদদের অধিকাংশই ছিলেন নও মুসলিম।

কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, তাদের এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন ও অনর্থক। সর্বপ্রথম ফ্রেডরিক শালে (Fredrich Schwally) এ অভিযোগটি উত্থাপন করেছিল। তারপর প্রাচ্য পন্ডিতরাও চোখ বন্ধ করে তার অন্ধ অনুকরণ করেছে।[৩৩৯] আর কেউ এ দায়িত্ব কাঁধে নেয়নি যে, ইয়ামামার শহীদগণের নামের তালিকা দেখে এ কথাটি যাচাই করে দেখবে যে, এ অভিযোগ কতটুকু সঠিক ও সত্য? প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, ইয়ামামার যুদ্ধে মদীনার অধিবাসী মুহাজির ও আনসারদের সংখ্যা ছিল ৩৬০ জন।[৩৪০] এটা তো স্পষ্ট যে, এই ৬৬০ সদস্যের প্রত্যেকের নাম ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত নেই।

তবে তাঁদের মধ্য হতে ৫৮ জন মুহাজির ও আনসারের নাম হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) উল্লেখ করেছেন।[৩৪১]

ওই ৫৮ জনের মধ্য হতে একজন ছিলেন হযরত সালেম মাওলা আবী হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। যিনি হাফেয ও ক্বারী হিসেবে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষ যে চারজন ব্যক্তির কাছে থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীম শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরতের পূর্বে তিনিই ছিলেন মসজিদে কোবা'র ইমাম। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)ও তাঁর পেছনে সালাত আদায় করতেন। সফরেও অধিকাংশ সময় তিনিই সাহাবায়ে

---

৩৩৯. ডধঃঃ, ইবষষ'ং ওহঃৎড়ফঁপষঃরড়হ ঃড় ঃযব ছঁৎধহ ৪০, ৪২ উফরহনঁৎমষ ১৯৭০.

৩৪০. তারিখে তাবারী : ২/৫১৬

৩৪১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ : ৬/৩৪০

সূচিপত্র

কেরামের ইমামতী করতেন। কারণ তাঁকেই اقرأ (কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে বড় আলেম) মনে করা হতো।[৩৪২]

তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। যিনি ছিলেন হযরত সালেম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর মনিব। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ৪৪ তম মুসলমান।[৩৪৩] নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে দীর্ঘ সাহচর্য ছাড়াও হযরত সালেম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনুল কারীম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায়।

তৃতীয় সাহাবী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বড় ভাই। ইসলামের সূচনা লগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলতেন, যখনই কোনো বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন তা আমায় যায়েদ ইবনে খাত্তাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৪৪]

চতুর্থ সাহাবী ছিলেন হযরত সাহেব ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। যাঁর ব্যাপারে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তিনি কাতেবীনে ওহী বা ওহী লেখকদের মধ্য হতে একজন ছিলেন।[৩৪৫]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারটি দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত।

আরোএকজন বুযুর্গ ছিলেন হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ইরশাদ করেছেন, আনসার সাহাবাদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তিত্ব এমন ছিলেন, যাঁরা ইলম ও ফযীলতের দিক থেকে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এই তিন ব্যক্তিত্বের মধ্য হতে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌রও একজন ছিলেন।[৩৪৬]

অনুরূপভাবে হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)ও ইমামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। যিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী। কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ক্বারীর শাগরিদ।[৩৪৭]

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ভাই হযরত ইয়াযীদ ইবনে সাবেত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত বারা ইবনে আযেব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর চাচা হযরত কায়েস ইবনুল

---

৩৪২. ইবনে আবদুল বার (রহ.) রচিত "আল-ইসতেআব" ২/৬৮-৬৯
৩৪৩. হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) রচিত "আল-ইসাবাহ" : ৪/৪৩
৩৪৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ : ৬/৩৩৬
৩৪৫. ইবনুল কায়্যিম (রহ.) রচিত "যাদুল মাআদ" : ১/৩০
৩৪৬. "আল-ইসাবাহ" : ২/২৫৫, "আল-ইসতেআব" ২/৪৪৪-৪৪৬
৩৪৭. "আল-ইসাবাহ" : ২/২১৭

সূচিপত্র

হারেস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ভাই হযরত আয়েয ইবনে মায়েয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ভাই সায়েব ইবনে আউয়াম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত উসমান ইবনে মাযঊন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পুত্র হযরত সায়েব ইবনে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম শহীদদের এই তালিকায় শামিল রয়েছেন।

উপরোল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত ১৮ জন মুহাজির এবং আনুমানিক ২০ জন আনসার সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁরা বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবার পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। এ ছাড়াও তাঁদের মধ্যে দশজন সাহাবী এমন ছিলেন যারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩৪৮] এ তালিকা শুধু সে সকল শহীদানের, যাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়েছে। বাকি হাজার হাজার অজ্ঞাত শহীদানের মাঝে আরো কতজন হাফেয-ক্বারী থাকতে পারেন তার কোনো অনুমান করা যায় না।

কিন্তু ফ্রেডরিক শালে (schwally), জর্জ বেল এবং মন্টেগোমরী ওয়াটের দৃষ্টিতে শহীদানের এই তালিকায় কোনো হাফেয-ক্বারী তো নেই-ই; বরং তারা সবাইকে "নও মুসলিম" (Recently Converts) আখ্যা দিয়ে নিজেদের গবেষণার প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছেন। ভেবে দেখুন, যে যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারের এত বড় একটি দল শহীদ হয়েছেন, সে ক্ষেত্রে এ কথা বলা যে, "এতে সব নও মুসলিমরা শহীদ হয়েছেন। তাই কুরআন সংকলনের ঘটনা সম্বলিত সহীহ বুখারীর হাদীসটি ভুল।" ইলম ও গবেষণার উপর কত বড় জুলুম! সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে কত বড় ধরণের প্রতারণা?

আর আমাদের কথা এটা নয় যে, ইয়ামামার যুদ্ধে সকল হাফেয সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। বরং কথা হচ্ছে, ইয়ামামার যুদ্ধ তো ছিল একটি লড়াই মাত্র। আর সময়টা ছিল এমন, যখন এ ধরনের যুদ্ধের দীর্ঘ একটি ধারাবাহিকতার সূচনা হচ্ছিল। আর আলেম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কতক এমন জানবাজ সাহাবী ছিলেন, যাঁরা ইয়ামামার চেয়েও অধিকতর খুনরাঙ্গা রণাঙ্গনে স্বীয় জান উৎসর্গ করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এমন পরিবেশে যদি হযর ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অন্তরে কুরআন সংকলনের বাসনা জাগ্রত হয়, তাহলে এতে এমন কোন্ অযৌক্তিক কথা রয়েছে যার ভিত্তিতে সহীহ বুখারীর এমন শক্তিশালী বর্ণনাকে ভুল হিসেবে আখ্যা দিয়ে দেওয়া হবে?

---

৩৪৮. এ তালিকা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন : "আল-কামেল" [ইবনে আসীর (রহ.)] : ২/১৪০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ : ৬/৩৪০

সূচিপত্র

বুখারী শরীফের উক্ত বর্ণনার উপর মন্টেগাম্রী ওয়াটের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, "হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) যদি সরকারী ব্যবস্থাপনায় কুরআনের কোনো কপি প্রস্তুত করেই থাকতেন, তাহলে তা একটি "দলীল" হবার মর্যাদা পেত। অথচ ওই যুগের বর্ণনাগুলোতে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

কিন্তু মিঃ ওয়াটের ওই অভিযোগের অসারতা বর্ণনারও অপেক্ষা রাখে না। কেননা ওই কপিটি "দলীল" হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, যখন হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুলিপি তৈরি করে প্রেরণের ইচ্ছা করেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর কাছ থেকে ওই কপিটিই চেয়েছিলেন, যা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) প্রস্তুত করেছিলেন।

মিঃ ওয়াট আরেকটি অভিযোগ এই করেছেন যে, যদি এটা কোনো সরকারী অনুলিপিই হতো, তাহলে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর পর এই কপিটি পরবর্তী খলীফার হাতে না থেকে হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট ছিল কেন? এর জবাবও একেবারে সুস্পষ্ট যে, হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর শাহাদাতের সময় কোনো খলীফা নির্ধারিত ছিলেন না। তাই অন্যান্য আসবাব-পত্রের সাথে এই কপিটি হযরত হাফসা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট স্থানান্তরিত হয়। এমন বিবেকবান মানুষ কে হতে পারে, যে শুধু এতটুকু কথার কারণে এমন শক্তিশালী বর্ণনাকেই নিচিহ্ন করার সাহস রাখে?

خلافت صدیقی تک پورا قرآن لکھا نہیں گیا تھا،

সিদ্দীকী খেলাফত যুগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়নি ঃ

নবম অভিযোগ ঃ نواں اعتراض

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, যখনই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর কোনো আয়াত নাযিল হতো, তখনই তিনি ওহী লেখকদের ডেকে তা লিখিয়ে রাখতেন। এভাবে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে তা পুস্তক আকারে বিন্যস্ত ছিল না। বরং বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন বস্তুর উপর লিপিবদ্ধ ছিল। হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ওই বিভিন্ন বস্তু থেকে কুরআনের আয়াতগুলোকে সংকলন করে তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন।

পক্ষান্তরে প্রাচ্য পন্ডিতদের মধ্য হতে নলডিকে ও অর্থার জিফেরী প্রমুখ এ দাবী করেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে যুগে সমগ্র কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বরং এর মাত্র কিছু অংশ লিখা হয়েছিল। নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে তারা সহীহ বুখারীর ওই হাদীসকে পেশ করে, যার মধ্যে বর্ণনা

সূচিপত্র

করা হয়েছে যে, "ইয়ামামার যুদ্ধের পর হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন সংকলনের পরামর্শ দিলেন এবং এর কারণ হিসেবে বললেন যে, যদি হাফেয সাহাবায়ে কেরামগণ এভাবে শহীদ হতে থাকেন, তাহলে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিরাট একটি অংশ হারিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।"

অর্থার জিফেরী লিখেন–"এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আশঙ্কার কারণ ছিল ওই হাফেযদের শহীদ হয়ে যাওয়া, যারা পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্ত করে রেখেছিলেন। যদি নববী যুগেই সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো, তাহলে এই আশঙ্কার কোনো অর্থই ছিল না।"[৩৪৯]

কিন্তু প্রথমতঃ এ কথাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও দুঃখজনক যে, অন্যান্য প্রাচ্য বুদ্ধিজীবীদের ন্যায় অর্থার জিফেরীও সহীহ বুখারীর এ হাদীসকে মানতে অস্বীকার করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সরকারী ব্যবস্থাপনায় কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন।[৩৫০]

এখন এ দু'মুখী কার্যবিধিকে সততা ও নিরপেক্ষতার কোন্ ছকে ফিট করা হবে যে, একদিকে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসের ওই সবগুলো কথা তো মিঃ জিফেরীর দৃষ্টিতে মিথ্যা হিসেবে পরিগণিত, যেগুলো থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে সরকারী ব্যবস্থাপনায় কুরআন সংকলনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর দিকে এই হাদীসেরই ওই অংশ তার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সঠিক, যে অংশে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ওই বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যদি এভাবে সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হতে থাকেন তাহলে আশঙ্কা রয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিরাট একটি অংশ হারিয়ে যাবে।" একদিকে তো তিনি এই হাদীসকে উদ্ধৃত করে এটাকে মনগড়া (fictitions) হিসেবে আখ্যা দেন।

আর অপরদিকে এই হাদীস দ্বারাই পবিত্র কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ না থাকার উপর দলীল দিয়ে থাকেন! এতদ্বসত্ত্বেও তাদের দাবী হলো যে,"প্রাচ্য বিশারদদের সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা সুস্পষ্ট। তাদের রচনা থেকে জানা যায় যে, তারা সত্য সন্ধান ও সত্যের পর্দা উন্মোচন ছাড়া আর কিছু চান না"!? উল্লেখ্য, হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফত কালে পবিত্র কুরআনুল কারীম সংকলনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল এবং যার আলোচনা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে করে এসেছি, সেটাকে মাথায় রাখলে

---

৩৪৯. ইবনে আবী দাউদ রচিত আরবী ভূমিকা সম্বলিত "কিতাবুল মাসাহিফ" অর্থার জিফেরী, পৃঃ ৫ মাতবায়ায়ে রহমানিয়া, মিসর : ১৩৫৫ হিঃ

৩৫০. Arthur Jeffery; Materials for the History of the text of the quran, Leiden ১৯৩৭ ঢ়.৬

সূচিপত্র

হযরত ওমর (রা.)-এর উক্ত বাক্য দ্বারা মিঃ জিফেরী যে দলীল পেশ করেছে, তা নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যায়।

আমরা এ কথাও বলে এসেছি যে, হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে কুরআন সংকলনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল, তাতে যুগপৎভাবে স্মৃতিতে রক্ষিত এবং লিখিতভাবে রক্ষিত-এ উভয় মাধ্যমকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। তাই ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আয়াত লিপিবদ্ধ করা হতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত সকল মাধ্যম দ্বারা তা কুরআনের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত না হতো। এই সতর্কতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা তখনই সম্ভব হয়েছে, যখন কুরআনের আয়াতগুলো লিখিত আকারে সংরক্ষিত হওয়া ছাড়াও হাফেযদের বিরাট একটি দল বিদ্যমান ছিল। পক্ষান্তরে যদি হাফেয সাহাবায়ে কেরামের এত বড় একটি দল তখন বিদ্যমান না থাকতেন, তাহলে কুরআন সংকলনের এ মহা ব্যবস্থাপনা এমন পূর্ণাঙ্গ সতর্কতার সাথে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হতো না।

এতদ্ব্যতীত কোনো আয়াতকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য তাওয়াতুর বা ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনাকৃত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। মাত্র দু'-চারটি অনুলিপি এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই কুরআন সংকলনের সময় হাফেযে কুরআনের বড় একটি দলের অবশ্য প্রয়োজন ছিল। সুতরাং হযরত ওমর (রা.)-এর আশঙ্কার কারণ এটাই ছিল যে, যদি কুরআনের হাফেযগণ এভাবে শহীদ হতে থাকেন এবং কুরআন সংকলনের কাজে বিলম্ব হতে থাকে, তাহলে আবার এমন যেন না হয় যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের তাওয়াতুর বন্ধ হয়ে যায় এবং লিখিত পান্ডুলিপির সত্যায়ন মুতাওয়াতির হাফেয সাহাবায়ে কেরামগণ দ্বারা করা না যায়। অতএব, হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আশঙ্কাবোধ দ্বারা এ দলীল দেওয়া একেবারেই অবান্তর যে, ওই সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন কোথাও লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না।

مختلف قراتیں کس طرح وجود میں آئیں،

বিভিন্ন ধরনের ক্বেরাত অস্তিত্ব লাভ করল কিভাবে? ঃ

দশম সংশয় ঃ دسواں شبہ

পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন ক্বেরাতের হাকীকত সম্পর্কে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রাচ্য বিশারদ পন্ডিতগণের বিরাট একটি দল এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর আরেকটি চিন্তাধারা পেশ করে থাকেন।

সূচিপত্র

যেমন নড়লিকে, গোল্ডযিহার এবং অর্থার জিফেরী প্রমুখ লিখেন যে, ক্বেরাতের বিভিন্নতা মূলত গতানুগতিক ছিল না। বরং এর কারণ ছিল হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক রচিত কুরআনের নুকতা ও হরকত না থাকা। তাই সেটাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়া যেত। এ সুযোগে যে ব্যক্তি যেভাবে চেয়েছে, নিজের ইজতেহাদের মাধ্যমে সেভাবেই পড়ে নিয়েছে। আর সেটাই তাঁর ক্বেরাত হিসেবে গণ্য হয়েছে।[৩৫১]

প্রাচ্য পন্ডিতদের এ দাবীর সারকথা হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন ধরনের ক্বেরাত হিসেবে যেগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেগুলো রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই। বরং উসমানী মাসহাফ পাঠ করতে গিয়ে ক্বারীদের যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকেই ক্বেরাতের এই বিভিন্নতার জন্ম হয়েছে। অথচ তাদের এই দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মাসহাফে উসমানীর নুকতা ও হরকতমুক্ত হওয়াটা ক্বেরাতের বিভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ নয়। বরং মাসাহিফে উসমানীকে জেনে বুঝে এ জন্য নুকতা ও হরকতমুক্ত রাখা হয়েছিল যেন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যতগুলো ক্বেরাত প্রমাণিত আছে, এ লিখন পদ্ধতিতে সে সবগুলোর সংকুলান হয়ে যায়।

এসম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, প্রত্যেক যুগেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো ক্বেরাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত বাধ্যতামূলক মনে করা হয়েছে–

১. মাসহাফে উসমানীর রুসমেখত বা লিখন পদ্ধতিতে এর সংকুলান হওয়া।

২. আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী হওয়া।

৩. রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সনদসূত্রে সাব্যস্ত হওয়া।

অতএব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ক্বেরাতকে সঠিক ও বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়নি, যতক্ষণ না বিশুদ্ধ সনদসূত্রে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এর সাব্যস্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধরনের ক্বেরাতের অস্তিত্ব লাভের কারণ যদি শুধু "উসমানী লিখন পদ্ধতি"ই হতো, তাহলে ওই লিখন পদ্ধতিতে সংকুলান হয়, এমন সকল ক্বেরাতকেই সঠিক বলে মেনে নেওয়া হতো.।

আর তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্তটি আরোপ করা হতো না। তাই তো যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনুল কারীমের ক্বেরাতের বিভিন্নতার উপর গভীর গবেষণা করবে, সেই নিজের খোলা দৃষ্টিতে দেখতে পাবে যে, উসমানী লিখন পদ্ধতিতে একই শব্দকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ করার অবকাশ বিদ্যমান ছিল।

---

৩৫১. দেখুন : গোল্ডবিহার রচিত "মাযাহিবুত তাফসীরিল ইসলামী" আরবী অনুবাদ : ড. আবদুল হালীম নাজ্জার : পৃ: ৮, অর্থার জিফেরী রচিত "কিতাবুল মাসাহিফ" এর ভূমিকা : পৃ: ৭।

সূচিপত্র

কিন্তু যেহেতু ওই পদ্ধতিটি রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত ছিল না, তাই ওই পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হয়নি। দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

১. উদাহরণ ঃ সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

এ আয়াতে এক ক্বেরাত অনুযায়ী وَلَا يُقْبَلُ আবার অন্য ক্বেরাত অনুযায়ী وَلَا تُقْبَلُ পড়া যায়। কিন্তু এ ধরনেরই একটি আয়াত সূরা বাকারা'র অন্য এক স্থানে এ শব্দে এসেছে– وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ এ আয়াতে لَا تَنفَعُهَا (শুধু ت দ্বারাই) পড়া যায়। لَا يَنفَعُهَا-য়া দ্বারা পড়া যায় না। অথচ উসমানী লিখন পদ্ধতিতে এখানে لا ينفعها দ্বারা) পড়ারও অবকাশ রয়েছে। কারণ উসমানী মাসহাফে এ শব্দটি এভাবে লেখা ছিল لا ينفعها (নুকতা ও হরকত বিহীন)। আর আরবী ভাষার রীতিতেও ي এবং ت উভয়টির অবকাশ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ ধরনের ক্বেরাত প্রমাণিত নেই, তাই কেউ সেটাকে গ্রহণও করেননি।

অনুরূপভাবে সূরা ইয়াসীন-এ বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

এ আয়াতে এক ক্বেরাত অনুযায়ী فَيَكُونُ (নূনের উপর পেশ দিয়ে) আর অন্য ক্বেরাত অনুযায়ী فَيَكُونَ (নূনের উপর যবর দিয়ে) পড়া যায়। কিন্তু এ ধরনেরই একটি আয়াত সূরা আলে-ইমরানে রয়েছে–

إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

এতে শুধুমাত্র একটি ক্বেরাত (অর্থাৎ নূনের উপর পেশ দিয়ে) জায়েয। রুসমেখতের হিসেবে দ্বিতীয় ক্বেরাতটির অবকাশ থাকা সত্ত্বেও কেউ তা গ্রহণ করেননি।[৩৫২] (কেননা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তা প্রমাণিত নয়। এমনিভাবে ক্বেরাতের ক্ষেত্রে এ ধরনের আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ক্বেরাতের বিভিন্নতা রুসমেখত বা লিখন পদ্ধতির কারণে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বরং রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত থাকার কারণেই সেগুলোর অস্তিত্ব। আর হযরত উসমান গণি (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সেগুলোকে সংরক্ষিত রাখার জন্যই স্বীয় মাসহাফকে নুকতা ও হরকত থেকে মুক্ত রেখেছিলেন।

---

৩৫২. এ দুটি উদাহরণ আলামা তাহের কুরদী (রহ.) রচিত "তারীখুল কুরআন" পৃঃ ১২৮-১২৯ হতে সংগৃহীত।

সূচিপত্র

এ কারণেই গোটা উম্মতের মাঝে শুধু এক ব্যক্তিই (অর্থাৎ আবু বকর ইবনে মুকসিম[৩৫৩]) এমন অতিবাহিত হয়েছেন যিনি এ পথ অবলম্বন করেছিলেন যে, "উসমানী মাসহাফ থেকে নিজের ইজতেহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্বেরাত উদ্ভাবন করা যায় এবং তা সনদের সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।" কিন্তু যখন তিনি তাঁর এই বিভ্রান্তিকর মতবাদ পেশ করেন, তখন সমগ্র ইসলামী বিশ্ব তার তীব্র প্রতিবাদ করে। তৎকালীন খলীফা তাঁকে ক্বারী ও ফকীহগণের মজলিসে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে তাওবা করতে বলেন। এভাবে তিনি তাওবা করেন এবং নিজের মত প্রত্যাবর্তনের স্বীকারোক্তিমূলক লিফল্যাট প্রচার করেন।[৩৫৪]

এ ঘটনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, উসমানী মাসহাফ থেকে স্বীয় ইজতেহাদ অনুযায়ী বিভিন্ন কেরাত আবিষ্কার করাতে উম্মতে মুসলিমা'র মাঝে সর্বদা একটি পথভ্রষ্টতা বলে মনে করা হয়েছে এবং এ বিষয়টির উপর প্রত্যেক যুগেই মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শুধু ওই ক্বেরাতকেই গ্রহণ করা হবে, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে বিশুদ্ধ সনদসূত্রে রেওয়ায়েত হয়ে আসছে।

উসমানী রুসমেখতে পড়তে গিয়ে ইজতেহাদী মতপার্থক্যের কারণেই যদি ক্বেরাতের বিভিন্নতা অস্তিত্ব লাভ করে থাকতো, তাহলে ইবনে মুকসিমের উপর এত কঠোর সমালোচনা কেন করা হলো? অতএব, প্রাচ্য পন্ডিতগণের এই দাবী একেবারে ভিত্তিহীন ও মনগড়া যে, উসমানী মাসহাফকে নুকতা ও হরকত থেকে মুক্ত রাখার কারণেই ক্বেরাতের বিভিন্নতার সূত্রপাত হয়েছে। বরং বাস্তব সত্য হলো এই যে, ক্বেরাতের এই প্রকারগুলো রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় সাব্যস্ত আছে। আর সেগুলোকে সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্যেই হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) স্বীয় মাসহাফকে নুকতা ও হরকত মুক্ত রেখেছিলেন। যেন তার লিখন পদ্ধতিতে এই সবগুলো ক্বেরাতের অন্তর্ভূক্ত করা য়ায়।

---

৩৫৩. তাঁর পুরো নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে ইয়াকুব ইবনে মুকসিম। জন্ম : ২৬৫ হিজরী এবং মৃত্যু : ৩৫৪ হিজরী।

৩৫৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : খতীবে বাগদাদী (রহ.) রচিত "তারীখে বাগদাদ" ২/২০৬-২০৮। খতীবে বাগদাদী (রহ.) তাঁর একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর আবু আহমদ আল-ফরাযী (রহ.) তাঁকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে নামায পড়ছেন। ফরাযী (রহ.) বলেন, আমি এর ব্যাখ্যা নিয়েছি যে, তিনি কুরআনের কেরাতের ক্ষেত্রে ইমামগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

সূচিপত্র

قرآن کریم کی شاذ قراتیں اور انکی حقیقت.

পবিত্র কুরআনুল কারীমের শায ক্বেরাত ও তার হাকীকত ঃ

একাদশ অভিযোগ ঃ گیارہواں شبہ

কোনো কোনো প্রাচ্য পন্ডিতবর্গ পবিত্র কুরআনুল কারীমের শায বা বিরল ক্বেরাতসমূহকে কাজে লাগিয়ে ভ্রান্ত ধারণার এক পাহাড় বানিয়েছে এবং সরিষার পাহাড় ও সুচের বর্শা তৈরির চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে গোল্ডযিহার এবং অর্থার জিফেরী ওই ক্বেরাতসমূহের অনেক উদাহরণ পেশ করত সেগুলো থেকে মনগড়া সিদ্ধান্ত রচনা করেছে।[৩৫৫] এখানে ওই সবগুলো উদাহরণ পেশ করে সেগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করা তো মুশকিল। কারণ এর জন্য স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের প্রয়োজন হবে।[৩৫৬] এ ছাড়া আমার মতে এর প্রয়োজনও নেই। তবে আমরা এখানে শায বা বিরল ক্বেরাতসমূহের ব্যাপারে কয়েকটি মূলনীতি উপস্থাপন করতে চাই।

আশা করি এই মূলনীতিগুলো চোখের সামনে রাখলে প্রাচ্য পন্ডিতগণের ওই সব ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলো প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সহজেই বুঝে আসবে, যা তারা শায ক্বেরাতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যেমনটি আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শুধু ওই ক্বেরাতগুলোই গ্রহণযোগ্য হবে, যেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি বিষয় পাওয়া যাবে।

১. কখনো কখনো ওই ক্বেরাতগুলো একেবারেই মওজু (বানোয়াট) হয়ে থাকে। যেমন, আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে যা'ফর খুযাঈ'র ক্বেরাতসমূহ। তিনি ক্বেরাতগুলোকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী (রহ.) এবং সমস্ত উলামায়ে কেরাম তাহকীক করে বলেছেন যে, এ সবগুলো ক্বেরাতই মওজু বা ভিত্তিহীন।[৩৫৭]

২. কখনো কখনো ক্বেরাতগুলোর সনদে দুর্বলতা থাকে। যেমন, ইবনুস সামীফা' এবং আবুস সাম্মানের ক্বেরাতসমূহ।[৩৫৮] অথবা এ ধরনের অনেক

---

৩৫৫. দেখুন : গোল্ডযিহার রচিত "মাযাহিবুত তাফসীরিল উসলামী", আরবী অনুবাদ ঃ ড. আবদুল হালীম নাজ্জার। আরো দেখুন : অৎঃযঁৎ ঔবভভবৎু; গধঃবৎরধষং ভড়ৎ ঃযব ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ঃযব ঃবীঃ ড়ভ ঃযব য়ঁৎধহ, খবরফবহ ১৯৩৭ ঢ়. ৬

৩৫৬. গোল্ডযিহারের চিন্তাধারার উপর ড. আবদুল হালীম নাজ্জারও "মাযাহিবুত তাফসীরিল ইসলামী"-এর টীকায় চমৎকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

৩৫৭. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/১৬, আল-ইতকান : ১/৭৮-৭৯

৩৫৮. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/১৬

সূচিপত্র

ক্বেরাত যা ইবনে আবী দাউদ (রহ.) কিতাবুল মাসাহিফে বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেঈদের দিকে সম্বন্ধ করেছেন।

৩. কোনো কোনো সময় ক্বেরাতগুলোর সনদ বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পবিত্র কুরআনুল কারীমের অন্তর্ভুক্তই নয়। বরং কোনো সাহাবী অথবা তাবেঈ সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন মাজীদের কোনো শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর সাথে দু'একটি শব্দ সংযোজন করে দিয়ে ছিলেন বা পাঠ করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনুল কারীম যেহেতু সম্পূর্ণটাই তাওয়াতুর বা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত ছিল এবং প্রত্যেক যুগেই এর হাজারো হাফেয বিদ্যমান ছিল, তাই ব্যাখ্যা করার সময় দু'একটি শব্দের সংযোজনের ফলে তা পবিত্র কুরআনুল কারীমের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত হবার কোনো আশঙ্কা ছিল না। তাই এ ধরনের ব্যাখ্যা করাকে কোনো অসুবিধা বলে মনে করা হয়নি।[৩৫৯] যেমন, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ পড়েছেন। এখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি مِنْ أُمٍّ শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি আয়াতকে এভাবে পড়েছেন যে–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

এ আয়াতে وَيَسْتَعِينُونَ اللهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ বাক্যটুকু নিঃসন্দেহে ব্যাখ্যা হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। কেননা এ বাক্যটি যদি হযরত উসমান (রা.)-এর ক্বেরাতের মধ্যে পবিত্র কুরআন মাজীদের অংশই হতো, তাহলে তাঁর সংকলিত মাসহাফে অবশ্যই তা বিদ্যমান থাকতো। অথচ তাঁর সংকলিত সাতটি মাসহাফের কোনোটিতেই এ বাক্যটি নেই। অপ্রসিদ্ধ ক্বেরাতের মধ্যে এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

৪. কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো কোনো ক্বেরাত পরবর্তীতে রহিত করা হয়েছে। কিন্তু কোনো সাহাবী তা রহিত হবার বিষয়টি জানতে পারেননি। তাই তিনি পূর্বের ক্বেরাত অনুযায়ী পড়তে থাকেন।[৩৬০] কিন্তু অন্যান্য সকল সাহাবী যেহেতু বিষয়টি জানতেন যে, এ ক্বেরাতটি বাতিল হয়ে গেছে, তাই তাঁরা এটা পড়তেন না এবং পবিত্র কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধ ক্বেরাত হিসেবে গণ্যও করতেন না।

---

৩৫৯. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/৩১-৩২, আল-ইতকান : ১/৭৯

৩৬০. মুশকিলুল আসার [তহাভী] : ১৯৬-২০২

সূচিপত্র

৫. আবার কোনো কোনো শায ক্বেরাত দেখে এমনও মনে হয় যে, কখনো কখনো তাবেঈ বা এ জাতীয় কোনো ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন মাজীদের তেলাওয়াতে কোনো ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে গেছে। যেমন অধিকাংশ হাফেযদের কাছ থেকে হয়ে যায়। তখন কোনো শ্রবণকারী তা শুনে বর্ণনা করে দিয়েছেন।[৩৬১]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের সম্পর্কে যত শায ক্বেরাত বর্ণিত আছে, এর অধিকাংশই এই পাঁচটি প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আর এটা তো স্পষ্ট যে, এ প্রকারগুলোর কোনো ক্বেরাতকেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাই সমগ্র উম্মাহ কোনো যুগেই সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য ক্বেরাত হিসেবে গণ্য করেনি। আর এ জন্যই এ ক্বেরাতসমূহ মুতাওয়াতির তো দূরে থাক; প্রসিদ্ধিও লাভ করতে পারেনি। অতএব, এই বিরল ক্বেরাতগুলোর উপর কেন্দ্র করে প্রাচ্য পন্ডিতগণ যে ফলাফল বের করার চেষ্টা করেছেন, সেগুলো এমনই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট যে, গভীর জ্ঞান ও গবেষণা অনুযায়ী তা চিন্তা-ভাবনার উপযোগী নয়। الله اعلم (মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত)

[৩৬১]. আন-নশরু ফী কিরআতিল আশর : ১/১৬

باب هفتم

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুরআনের সত্যতা ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃএ পরিচ্ছেদটি কুরআন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নানান ধরণের প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে হৃদয়ে প্রশান্তি মিলে যে, এটিই সে ঐশীগ্রন্থ, যার অপেক্ষায় মানব-দানব মৌন অপেক্ষায় ছিল। এতে আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থ বাইবেলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুভাগমন বার্তা, কুরআনের অলৌকিকত্ব ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ; শব্দগত, ব্যাক্যগত, রচনাগত, ছন্দগত, ভবিষ্যতবাণীসমূহ; রোমান ও মক্কা-বিজয়, ইহুদীদের পক্ষ থেকে রাসূলের মৃত্যু কামনা, কুরআন সংরক্ষিত হওয়ার দিক থেকে তার অলৌকিকতা, তাতে অজানা তথ্য উন্মোচন, কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে পশ্চিমা অমুসলিম লেখদবৃন্দের স্বীকারোক্তি, এবং এগুলোর উপর উত্থাপিত আরও কতক অভিযোগের জবাদ প্রদান; ইত্যাদি বিষয়।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

কুরআনের সত্যতা ঃ حقانیت قرآن

পবিত্র কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কতৃক প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মহান আল্লাহ সুবআনাহু তা'আলা এতে এমন এক বিস্ময়কর প্রভাব রেখে দিয়েছেন যে, বৈরিতা ও শত্রুতামূলক মনোভাব ছাড়া যে কেহ নিরপেক্ষতা এবং মুক্তমন ও নিষ্ঠার সাথে যে কেউই তা পাঠ করবে, সে সতস্ফুতভাবে বলতে বাধ্য হবেন যে, নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কালাম। পবিত্র কুরআনুল কারীম একই সময়ে মানুষের আকল ও মেধায় প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। এর সত্যায়ন ও প্রত্যায়নের ঢেউ হৃদয়ে উথলে উঠতে থাকে।

বিধায় পবিত্র কুরআন মাজীদের সত্যতার উপর দলীল উপস্থাপন করার উপমা অনেকটা এমন, প্রদীপ্ত সূর্যের আলোকিত হবার উপর দলীল উপস্থাপন করা। তথাপিও নিম্নে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে এমন কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করছি, যেগুলোর উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করার দ্বারা একজন অমুসলিমের জন্যও পবিত্র কুরআনুল কারীমের সত্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সহজ হয়ে যায়।

আঁহযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী রিসালত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাত ঃ

সর্বপ্রথম ওহীর প্রয়োজনীয়তা শিরোনামে যেসকল বিষয়াবলী উপস্থাপন করা হয়েছিল সেগুলোকে স্মৃতির ধারন করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে প্রকৃতগতভাবে অহী মানব জীবনের এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। যা ব্যতীত মানুষের জন্য সুন্দর ও গোছালো জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বে যারা বিশ্বাসী নয়, তাদের কাছে ওহী ও রিসালাত বিষয়ে আলোচনা করা একেবারেই অনর্থক। তাদের কাছে সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক।

কিন্তু যারা মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা এ বাস্তবতাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না যে, "ওহী" আল্লাহ তা'আলার রহমত ও কুদরতের এমন এক অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক চাহিদা, যার প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। যে মহান ও অসীম ক্ষমতাধর সত্ত্বা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছেন, সেই সুমহান সত্ত্বার জন্য এটা সম্ভবই নয় যে, তিনি অনিষ্ট ও ফেতনা-ফ্যাসাদের চাহিদায় ভরপুর এই পৃথিবীতে মানুষকে

সূচিপত্র

অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিবেন এবং তার দিক-নির্দেশনার জন্য কোনো "হেদায়াত নামা" বা দিক-নির্দেশিকা প্রেরণ করবেন না।

হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনার ও ধারাবাহিকতার নামই হলো "ওহী" ও "রিসালত"।

আর এ ধারাবাহিকতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরম্ভ হয়নি; বরং তাঁর উপর তার সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পূর্বে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়ায়ে কেরাম মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার একত্ববাদের পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। আর তাঁদের মধ্য হতে প্রায় প্রত্যেকেই এই সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, শেষ যুগে এমন একজন পয়গম্বর আগমন করবেন, যার মাধ্যমে নবুওয়াতের এই পবিত্র ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। কোনো কোনো আম্বিয়া (আ.) তো পূর্বেই তাঁর বহু আলামত ও লক্ষণও বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। আবার কোনো কোনো নবী-রাসূলগণ সুস্পষ্টভাবে তাঁর নামই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী নবীগণের সহীফাগুলোতে যদিও অনেক বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কিন্তু আজও সেগুলোতে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনের বহু সুসংবাদ ও আলামত সংরক্ষিত আছে:।

کتب مقدسہ میں آپ کی بشارتیں

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে তাঁর (সা.) আগমনের সুসংবাদ ঃ

এপ্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের "ইসতেস্না" অধ্যায়ে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সম্বোধনঃ

"আর মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন যে, তিনি যা বলেন সঠিক বলেন। আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য হতেই তোমার ন্যায় একজন নবী প্রেরণ করব এবং আমার বাণী তাঁর মুখে ঢেলে দেব। আমি তাঁকে যে বিধান প্রদান করব, তিনি তা-ই তার সম্প্রদায়কে বলবেন। আর আমার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যে কথা তাঁর সম্প্রদায়কে বলবেন, তা যে না শুনবে, আমি তার কাছ থেকে এর হিসাব নেব।

কিন্তু যে ভন্ড নবী সেজে আমার উদ্ধৃতি দিয়ে এমন কথা বলবে, যা আমি বলার নির্দেশ দেইনি অথবা অন্য কোনো উপাস্যের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু বলবে, তাহলে ওই ভন্ড নবীকে হত্যা করা হবে। তুমি যদি মনে মনে বলে থাক যে, যে কথা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেননি তা (যদি কেউ নবী সেজে আমাদেরকে বলে) আমরা তা চিনতে পারব কি করে? তাহলে শোন! তার পরিচয়ের লক্ষণ হলো যে, যখন ওই নবী আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার উদ্ধৃতি

সূচিপত্র

দিয়ে কিছু বলবে এবং তার কথা অনুযায়ী যদি বাস্তবে কিছু সংঘটিত না হয়, তাহলে তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত নয়। বরং সে ভন্ড নবী সেজে তা বলেছে। কাজেই তাকে ভয় করবে না।"[৩৬২]

এই বাক্যগুলোতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে নবীর আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি তাদের বংশ থেকে নন; বরং তাদের ভ্রাতৃবর্গ তথা ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে প্রেরিত হবেন। হযরত শা'ইয়াকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলার এ ইরশাদ বর্তমান বাইবেলে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,-

"দেখো! আমার খাদেম যাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি। সে আমার নির্বাচিত। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি .স্বীয় আত্মা তার উপর নিক্ষেপণ করি। সে সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায়-নীতি চালু করবে। সে কোনো রকম হৈ-হুল্লোড় ও শোরগোল করবে না। বাজারে তার আওয়াজ শোনা যাবে না। তিনি নিভু নিভু বাতিগুলো নিভিয়ে দিবেন না। সততার সাথে সে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। সে ঝিমিয়ে পড়বে না এবং হিম্মত ও মনোবল হারাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীপ-উপদ্বীপের অধিবাসীরা তার শরীয়তের অপেক্ষায় থাকবে.. ।

আমিই তোমার হাত ধরবো। তোমার নিরাপত্তা প্রদান করবো। মানবজাতির প্রতিশ্রুতি এবং সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শনের জন্য আমি তোমাকে প্রেরণ করবো। তুমি অন্ধদের দৃষ্টি খুলে দিবে এবং কয়েদীদেরকে মুক্ত করবে। অন্ধকারের ভবঘুরে যারা রয়েছে, তাদেরকে মুক্ত করবে। আমিই ইয়াহুদাহ্। এটাই আমার নাম। আমি আমার মর্যাদা অন্য কারো জন্য এবং স্বীয় প্রশংসা খোদাই করা মূর্তির জন্য চালু রাখবো না।

হে সমুদ্র অতিক্রমকারীগণ! এবং সমুদ্র তীরে বসবাসকারীগণ! হে উপদ্বীপবাসীগণ! নব উদ্যমে মহান আল্লাহর গুণ কীর্তন কর। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রশংসায় মেতে উঠ। (তিনি যখন আসবেন) মরু-বিয়াবান ও তার বস্তিগুলো, কাইদারের আবাসিক এলাকার লোকেরা মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসায় নিজেদের কণ্ঠ উচ্চকিত করবে। (মদীনার প্রসিদ্ধ পাহাড়) সালা'র অধিবাসীরা অভ্যর্থনা সংগীত পরিবেশন করবে। পাহাড়ের চূঁড়াদেশ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হবে।"[৩৬৩] [বাইবেল, Isaiah/যিশাইয় ৪২ : ১-১১]

---

[৩৬২]. ইসতেস্না : ১৮/১৭-২২ [Deuteronomy / দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৭-২২]

[৩৬৩]. এ সুসংবাদের প্রত্যেকটি শব্দ একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর প্রযোজ্য হয়। অধম এর বিস্তারিত আলোচনা "বাইবেল থেকে কুরআন পর্যন্ত" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৮১ নং পৃষ্ঠায়

সূচিপত্র

আর তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মহিমা ব্যক্ত করবেন এব
উপদ্বীপ অঞ্চলে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করবেন। বীর-শার্দূলের ন্যায় তিনি
বিকাশিত হবেন। তিনি বীর যোদ্ধার ন্যায় স্বীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ
করবেন। যারা খোদাই করা মূর্তির উপর ভরসা করতো এবং পতিত বললেন
না।"[বাইবেল, isaiah /যিশাইয় ৪২ : ১২-১৭]

আর ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য এই— যখন ইহুদীরা কয়েক জন ইমাম ও লেবীয়কে দিয়ে জেরুশালেম থেকে তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালো, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; তিনি স্বীকার করে বললেন, আমি সেই মসীহ্ নই। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বললেন, আমি নই। **আপনি কি সেই নবী? জবাবে তিনি বললেন, না।** ৩৬৪

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে হযরত ইয়াহইয়া(আ.) এর যুগেও মানুষ হযরত মসীহ (আ.) ব্যতীত আরো একজন নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। আর ওই নবী তাদের মাঝে এত বেশি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিলেন যে, তাঁর নাম উচ্চারণেরই প্রয়োজন হতো না। বরং "সেই নবী" বলেই সবাই তাঁকে চিনে ফেলতো।

এরপর যখন হযরত ঈসা (আ.) আগমন করলেন, তখন তিনিও রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট নাম বলে দিয়ে তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ইনজীল ইউহান্নার মাঝে মসীহ (আ.)-এর বক্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি যে, এ ধরা থেকে আমার প্রস্থান তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। কেননা আমি যদি না যাই তাহলে তিনি[৩৬৫] তোমাদের নিকট আগমন করবেন না। তবে আমি যদি প্রস্থান করি তাহলে তাঁকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করব। তিনি এসে পৃথিবীকে পাপ-পঙ্কিলতা ও ন্যায়-নীতির ব্যাপারে ত্রুটিকারক হিসেবে সাব্যস্ত করবেন।"[৩৬৬]

উল্লেখিত সুসংবাদগুলোকে স্মৃতিতে রেখে ওই যুগের কথা কল্পনা করুন, যে যুগে তিনি আগমন করেছেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন হাজার হাজার বছর

করেছে। এখানে সংক্ষেপে শুধএতটুকু বুঝে নিন যে, স্বয়ং বাইবেলের ভাষ্য মতেই 'কায়দার' ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পুত্র। (তাওয়ারিখ : ১/৩) আর তাঁর বংশধরদের বসতী ছিল আরবের মরু-বিয়াবানে। যেমনটি বাইবেলের কিতাবের "ইয়াসাইয়াহ'র (২১/১৩-১৭) থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। অতএব, এ রচনায় কাইদারের নাম নিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যে নবীর সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে তিনি ইসমাঈল (আ.)-এর বংশ থেকে হবেন এবং আরবে প্রেরিত হবেন। এ ছাড়াও এ রচনায় 'সীলা' পাহাড়ের অধিবাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা তাঁর আগমনে স্বাগত সংগীত পরিবেশন করবে। 'সীলা' মদীনা শরীফের একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। এরই একাংশে "সানিয়াতুল বিদা" অবস্থিত। এর উপর দাঁড়িয়েই মদীনার শিশুরা ... [তলাআল বাদরু আলাইনা] গেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

৩৬৪. দেখুন, ইনজীল ইউহান্না : ১/১৯-২৬ [বাইবেল, John/যোহন ১ : ১৯-২৬]

৩৬৫. ইনজীলের ইউনানী কপিগুলোতে এই শব্দটি "পিরাক্লোতোস" ছিল। যা "মুহাম্মদ" শব্দের ইউনানী অনুবাদ। এখানে আমরা শুধু নমুনা হিসেবে কয়েকটি সুসংবাদ উলেখ করলাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, "বাইবেল থেকে কুরআন পর্যন্ত" তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়। মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী।

৩৬৬. ইউহান্না : ১৬/৭ [বাইবেল, John/যোহন ১৬ : ৭]

সূচিপত্র

ধরে এই দুনিয়া কোনো নবীর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ছিল। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বিকৃত ও পরিবর্তনকারী চক্র পূর্ববর্তী শরীয়তকে ব্যাপকভাব বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। শিরকের মহামারী সমগ্র বিশ্বে ছেয়ে গিয়েছিল। জুলুম ও বর্বরতার জয়জয়কার ছিল। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণ শেষ যুগের নবীর জন্য অধীর অপেক্ষা করছিলেন।

মানবতার এই ক্লান্তি লগ্নে পবিত্র মক্কায় জন্ম গ্রহণ করলেন সর্বযুগ ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি এই ছোট্ট বস্তিটিতে এমনভাবে থাকলেন যে, এখানকার ছোট্ট শিশুরাও তাঁর সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি ও সচ্চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। মক্কা মোকাররমা আজকের ন্যায় এতবড় শহর ছিল না। বরং এত ছোট্ট একটি বস্তি ছিল, যেখানে একজনের জীবন-যাত্রা অপরজনের সামনে খোলা বইয়ের ন্যায় হতো। এই বস্তিতেই তিনি জীবনের চল্লিশটি বসন্ত অতিবাহিত করেছেন। মক্কার অধিবাসীগণ নিখুঁতভাবে তাঁর শৈশব কৈশোর ও যৌবনকালকে প্রত্যক্ষ করেছে।

এই ধীর্ঘ সময়টিতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো কাজের প্রতি কারো অঙ্গুলি নির্দেশের সুযোগ হয়নি। এমন কোনো সমালোচক পাওয়া যায় না, যে কখনো রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমগ্র জীবনে সামান্যতম দোষ-ত্রুটি বর্ণনার কোনো উপমা পেশ করতে পারবে। বরং এর স্থলে পুরো বস্তির সবার কাছে তিনি "আল-আমীন" অর্থাৎ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত উপাধিতে সমাদৃত ছিলেন। এমনটিও নয় যে, চল্লিশ বছরের এ জীবনে তিনি জন-জীবন থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

বরং তিনি তাদের জীবন-যাত্রার প্রতিটি পরতে পরতে সম্প্রদায়ের একজন সচেতন ও চিন্তাবিদ ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি তাদের সাথে ব্যবসা করতেন। বিনিময়ের ভিত্তিতে কাজ-কর্ম করতেন। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দিতেন। তাদের সাথে সফর করতেন। পারিবারিক জীবন-যাপন করতেন। মোদ্দাকথা ওই যুগে জীবনের যতগুলো স্তরের কল্পনা করা যায়, সবকটি স্তরই তিনি পাড়ি দিয়েছেন এবং সমগ্র কওম প্রত্যেকটি স্তরেই তাঁর সাহসিকতার স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

অথচ চল্লিশ বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান অর্জন করেননি। আহলে কিতাব আলেমগণের সাথেও উঠা-বসা করতেন না। কারো কাছ থেকে লেখা-পড়া শিখতেন না। সাধারণত আরববাসীদের ন্যায় তিনি কোনো কাব্য চর্চা করতেন না এবং কবি-সাহিত্যিকদের সাথে কখনো কোনো

সূচিপত্র

সখ্যতাও তাঁর ছিল না। কখনো কোনো গণক, যাদুকর ও জ্যোতিষীর সান্নিধ্যে তিনি বসতেন না।

অত:পর হঠাৎ করে তাঁর পবিত্র যবানে এমন সব কালাম চালু হয়ে গেল, যার সামনে আরবের বড় বড় কবি-সাহিত্যিকরা নতজানু হতে বাধ্য হলো। এমন এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাত তত্ত্ব বর্ণনা করলেন, যার সম্মুখে সমগ্র বিশ্বের দার্শনিকদের মস্তক অবনত হয়ে গেল। এমন এমন ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতে থাকলেন, যা কখনো কোনো গণক বা জ্যোতিষীর কল্পনাও আসেনি।

এবং অক্ষরে অক্ষরে তাঁর এ সংবাদগুলো বাস্তবে পরিণত হলো। তাঁর পবিত্র হাত থেকে এমন সব মু'জিযা প্রকাশিত হলো, যার সামনে বড় বড় যাদুকররা অক্ষম হয়ে গেল। এবং তার তেইশ বছরের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে গোটা আরব উপদ্বীপে এমন বিস্ময়কর বিপ্লবের ঝড় তুললেন যে, আরবের যে মরুভূমি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাহ্যীব-তমদ্দুন থেকে একেবারেই অন্ধ ছিল, সেই আরবই গোটা পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাহযীব-তমদ্দুন ও পরিশীলিত সংস্কৃতির মশাল জ্বালিয়ে দিল। যে লোকগুলো গতকাল পর্যন্ত একে অপরের রক্ত দিয়ে নিজেদের পিপাসা নিবারণ করত, তারাই আজ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেল।

যেখানে চারদিকে হত্যাযজ্ঞ ও জুলুম-নির্যাতনের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলত, সেখানে আজ শান্তি ও নিরাপত্তার গোলাপ ফুল ফুটছিল। যেখানে জুলুম ও বর্বরতার জয়জয়কার ছিল, সেখানে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল। অবশেষে আরবের এই বেদুঈনরাই– যারা নিজেদের অজ্ঞতার জন্য পুরো দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ছিল– ইরান ও রোমের বিশাল সালতানাতের উত্তরাধিকারী হয়ে গেল এবং গোটা বিশ্ব তাদের ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি, মহানুভবতা এবং ভদ্রযাচিতার গুণ-কীর্তন করতে বাধ্য হয়ে গেল।

এ সকল বিস্ময়কর ঘটনাবলীর উপর যে ব্যক্তি ঠান্ডা মাথায়, মুক্তমনে নিষ্ঠার সাথে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে এ সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হবে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সত্য রাসূল ছিলেন। তিনিই "সেই নবী" শতাব্দী কাল পূর্ব থেকে যার আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছিল। মানবতা যার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছিল। এবং, তাঁর উপর প্রেরিত এই বাণী "পবিত্র কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহর কালাম" তা নির্দ্বিধা ও নিঃসঙ্কোচে শতভাগ সত্য।

পবিত্র কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব : إعجاز قرآن

প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের সত্যতার আরেকটি উজ্জ্বল দলীল হচ্ছে, এর অলৌকিক বিষয়বস্তু। অর্থাৎ এমন এক কালাম যা মানবীয় ক্ষমতার বাইরে। এ কারণেই এটাকে দু'জাহানের সর্দার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

সূচিপত্র

সবচেয়ে বড় মু'জিযা বা অলৌকিক বিষয় বলে অভিহিত করা হয়। আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পবিত্র কুরআন মাজীদের ওই সব মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করার প্রয়াস চালাব, যেগুলোর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম অবশ্যই অবশ্যই মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের কালাম। মানবীয় দখলদারিত্বের লেশমাত্র এতে নেই।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে মৌলিকভাবে দু'টি কথা সম্মানিত পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা আবশ্যক বলে মনে করছি।

প্রথমতঃ ফাসাহাত-বালাগাত বা ভাষা অলংকার এবং ভাষার যাদুকরী উপস্থাপনা এমন একটি গুণ, যার সম্পর্ক হলো উপলব্ধি ও অনুভূতির সাথে পুরো হাকীকত ও তত্ত্ব শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আপনি তালাশ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে ফাসাহাত ও বালাগাতের মূলনীতি নির্ধারণ করতে পারবেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই নিয়ম ও নীতির অবস্থান সিদ্ধান্তকারী হয় না। কেননা কোনো কালামের সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রুচি ও মেধার উপরই নির্ভরশীল। যেমন, একটি মনকাড়া রঙের ফুলের কমনীয়তাকে ভাষায় পুরোপরি প্রকাশ করা যায় না। যেভাবে সুরভিত মিশকের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। যেভাবে একটি সুস্বাদু ফলের স্বাদ ও মিষ্টতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঠিক তেমনিভাবে কোনো কালামের ফাসাহাত ও বালাগাতকেও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন কোনো রুচিশীল ব্যক্তি তা শ্রবণ করবে, তখন এর সৌন্দর্য ও গুণাবলী সম্পর্কে সে নিজে নিজেই অবগত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ ফাসাহাত-বালাগাতের ব্যাপারে রুচিটাও শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ভাষাধারীদের ক্ষেত্রেই ধর্তব্য হবে। কোনো ব্যক্তি নিজের ভাষা ছাড়া অন্যের ভাষায় চাই যতই পাণ্ডিত্য লাভ করুক, কিন্তু সুরুচিবোধের ব্যাপারে সে কখনো ওই ভাষাধারীদের ধারে কাছেও পৌছতে পারবে না।

তখন একটু জাহেলী যুগের আরববাসীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে কল্পনা করুন। বক্তৃতা ও কাব্য চর্চা ছিল তাদের সমাজের চালিকাশক্তি। আরবী কবিতা ও সাহিত্য চর্চার স্বভাব-রুচি তাদের ছোট ছোট শিশুদের মধ্যেও প্রোথিত ছিল। ফাসাহাত ও বালাগাত জীবন সঞ্চালক রক্ত কণিকা হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করতো। তাদের মঞ্চের উজ্জ্বলতা, মেলার বর্ণাঢ্যতা, তাদের গর্ব ও অহঙ্কারের মূলধন এবং প্রচার ও প্রসারের সবকিছুই ছিল কবিতা ও সাহিত্য। আর এর উপর তাদের এতই অহংবোধ ছিল যে, তারা নিজেদের

সূচিপত্র

ব্যতীত অন্য সকল জাতিকে "আজম" তথা "গুঙ্গ বলে" হিসেবে অভিহিত করতো।

এমন পরিবেশে একজন উম্মী নবী (হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) এমন এক কালাম পেশ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, এটা আল্লাহর কালাম। কেননা–

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

'বল, 'এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জ্বীন একত্রিত হয় তবুও তারা তার মত আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।' [৩৬৭]

এই ঘোষণাটি কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মহান প্রভুর এই বাণী সেই মহান ব্যক্তির জবান হতে উদ্ধৃত হয়েছিল, যিনি সমসাময়িক নামকরা কোনো সাহিত্যিক ও কবির কাছ থেকে কোনো জ্ঞান লাভ করেননি। কখনো কোনো কবিতার আসরে একটি কবিতাও আবৃত্তি করেননি। কখনো কোনো গণকের সাহচর্য গ্রহণ করেনি। স্বরচিত কবিতা তো দূরের কথা, অন্য কারো কবিতাও তাঁর স্মৃতিতে ছিলনা। অবশেষে তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যাকে ফাসাহাত তথা ভাষালংকারের এই ধারক-বাহকরা এক নতুন দ্বীনের প্রতিষ্ঠাতা বলতো। যদি (উপরোক্ত) ঘোষণা সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে তাদের পিতৃ পুরুষদের লালিত ধর্মের সমস্ত প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং তাদের শতাব্দী কাল পুরানো তথা ও রেওয়াজের সমস্ত ভান্ডার ধুলোয় মিশে একাকার হয়ে যাবে।

কেননা প্রকৃতপক্ষে এ ঘোষণা ছিল তাদের সাহিত্য কীর্তির প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এটা ছিল তাদের ধর্ম ও মতবাদের উপর এক কুঠারাঘাত। এটা ছিল তাদের সাম্প্রদায়িক প্রীতির নামসর্বস্ব বিলীন করার এক আগামবার্তা। তাদের আত্মমর্যাদার প্রতি বিরাট হুমকি। যার জবাব দেওয়া ব্যতীত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আরব গোষ্ঠীর জন্য স্বস্তিতে বসে থাকা সম্ভব ছিল না।কিন্তু হলো কি? এ ঘোষণার পর সেই অগ্নিঝরা বক্তা আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী কবিদের আড্ডাখানায় হতাশার কালো মেঘ নেমে এল। কেউ এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসল না। কিছুদিন পর পবিত্র কুরআনুল কারীম আবারো ঘোষণা করল

---

[৩৬৭]. বনী ইসরাঈল : ৮৮

সূচিপত্র

فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24)

'আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।'[৩৬৮]

ইহ্যর উপর যথারীতি নীরবতা বিরাজ করল। কোনো ব্যক্তি এই কালামের মুকাবিলায় কয়েকটি বাক্যও রচনা করে পেশ করতে সক্ষম হয়নি। চিন্তার বিষয় হলো, আল্লামা যুরজানী (রহ.)[৩৬৯] -এর উক্তি মতে সে সম্প্রদায়ের অবস্থা এমন ছিল যে, যদি তারা জানতে পারত যে, পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তেও কোনো ব্যক্তি নিজের ফাসাহাত ও বালাগাতের মধ্যে অস্বাভাবিক দক্ষতা রাখে, তাহলে তারা তার সমালোচনা করতে এবং নিজেদের কবিতার মধ্যে তার প্রতি খোঁচা মারাও টিপ্পনীকাটা থেকে বিরত থাকতে পারতো না।

এমন লোকদের ব্যাপারে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বারংবারের ঘোষণার পরেও চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে? এবং তাদের শ্বাস নিক্ষেপের দুঃসাহসও থাকবে না? এই কথার এ ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না যে, ফাসাহাত ও বালাগাতের এই যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা পবিত্র কুরআন মাজীদের মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। ফলশ্রুতিতে তারা ব্যর্থ হয়ে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য জুলুম ও নির্যাতনের কোনো পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে অবশিষ্ট রাখেনি। তাঁর উপর নির্যাতন করেছে, পাগল বলেছে, যাদুকর বলেছে, কবি ও গণক বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে এতটুকু হয়নি যে, পবিত্র কালামে পাকের মুকাবিলায় তারা মাত্র কয়েকটি বাক্য রচনা করে উপস্থাপন করবে।

তাছাড়া শুধু এখানেই শেষ নয় যে, সেই অগ্নিঝরা বক্তা আর অগ্নিস্ফুলিংগ সৃষ্টিকারী কবিরা এই পবিত্র কুরআন মাজীদের মুকাবিলা করতে পারেনি। বরং তাদের অনেকেই এই কালামের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার

---

৩৬৮. সূরা বাকারা : ২৩-২৪

৩৬৯. আবদুল কাহের যুরজানীকৃত : "আর-রিসালাতুশ শাফিয়্যাহ" পৃ: ১০৯

সূচিপত্র

করেছে। ইমাম হাকেম ও বায়হাকী (রহ.) পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে ওলীদ ইবনে মুগীরার নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বর্ণনা করেছেন–

وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِى يَقُولُ حَلاَوَةً. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَاوَةً. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى

'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) যা বলেন, তার মধ্যে রয়েছে এক তৃপ্তিময় স্বাদ ও মনোহারী চমক। আর এই কালাম বিজয়ীই হয়ে থাকে, পরাজয় হয় না কখনো।'[৩৭০]

যে, ওলীদ ইবনে মুগীরা ছিল আবু জাহেলের ভাতিজা। আবু জাহেল যখন অনুভব করতে পারল যে, তার ভাতিজা কালামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ছে, তখন সে তাকে সতর্ক করার জন্য তার কাছে ছুটে আসল। ওলীদ তার চাচার কথার জবাবে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ কবিতার ভালো-মন্দের ব্যাপারে আমার চেয়ে জ্ঞানী নেই। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) যা বলছে, কবিতার সাথে এর সামান্যতম সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য নেই।[৩৭১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই ওলীদ ইবনে মুগীরার ঘটনা বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী হিসেবে প্রেরিত হবার পর যখন হজ্বের মৌসুম আসলো, তখন সে কুরাইশদের একত্রিত করে বলল, হজ্বের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এখানে আসবে, তাই মুহাম্মাদের ব্যাপারে আমাদেরকে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে করে পারস্পরিক কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি না হয়। কুরাইশের লোকেরা বলল, আমরা আগন্তুকদেরকে বলবো, মুহাম্মাদ একজন 'গণক'। ওলীদ বলল, আল্লাহর শপথ! তাঁর কালাম গণকদের কালামের মতো নয়। কুরাইশরা বলল, তাহলে আমরা তাকে 'পাগল' বলবো। ওলীদ বলল, তার মাঝে পাগলামীর লেশমাত্র নেই। কুরাইশরা বলল, তাহলে আমরা তাকে বলবো 'কবি'। ওলীদ বলল, কবিতার আগাগোড়া সব আমার জানা। তার এ কালাম কক্ষনো কবিতা হতে পারে না। কুরাইশরা বলল, তাহলে আমরা তাকে 'যাদুকর' বলবো। ওলীদ প্রথমে এটাকেও অস্বীকার করেছিল। কিন্তু অবশেষে অক্ষমতাবশতঃ এর উপরই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁকে যাদুকর বলা হবে। কেননা এটা এমন এক যাদু যা পিতা-পুত্র এবং ভাই-ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদের দেয়াল সৃষ্টি করে দেয়।[৩৭২]

---

৩৭০. আলামা সুয়ূতী রচিত "আল-খাসায়েসুল কুবরা" ১/১১৩, আল-ইতকান : ২/১১৭

৩৭১. হাকেম ও বায়হাকী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এটাকে সংকলন করেছেন। (আল-খাসোয়েসুল কুবরা : ১/১৩

৩৭২. ইমাম বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক (রহ.) তা সংকলন করেছেন। (খাসায়েসুল কুবরা : ১/১১৩)

সূচিপত্র

অনুরূপভাবে উতবা ইবনে রবী'আ ছিল কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্যতম। সে একবার সমঝোতার আলোচনা করার জন্য রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসল। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সামনে সূরা হা-মীম সাজদা'র শুরুর আয়াতগুলো পাঠ করলেন। সে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনছিল। এমনকি তিনি সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদায় লুটিয়ে পড়লে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সোজা উঠে চলে গেল।

লোকেরা তার কাছে আলোচনার ফলাফল জানার জন্য ছুটে আসল। তখন সে বলল, "আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ আমাকে এমন কালাম শুনিয়েছে যা আমার এই কর্ণযুগল গোটা জীবনে শোনেনি। এখন আমার বুঝে আসছে না আমি কি জবাব দেব?"[৩৭৩]

এ ধরনের আরো অনেক ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। যা দ্বারা উপলব্দি করা যায় যে, আরবের বড় বড় ভাষাবিদ সাহিত্যিক ও কবিরা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মুকাবিলা করতে শুধু অক্ষমই হননি; বরং পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রভাবশীলতাকে মৌখিক বা কার্যতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কোনো কোনো অমুসলিম লেখক এ ধারণা প্রকাশ করে যে, হতে পারে কেউ পবিত্র কুরআন মাজীদের মুকাবিলায় কোনো কালাম পেশ করেছে। কিন্তু আমাদের পর্যন্ত সে কালাম এসে পৌছায়নি! আল্লামা আবু সুলাইমান খত্তাবী (রহ.) (মৃত্যু : ৩৮৮ হিঃ) এ ব্যাপারে সুন্দর একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যিনি একজন উঁচু মানের মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি ভাষা ও সাহিত্যেরও ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন–

"এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ পৃথিবীর শুরু থেকেই সাধারণ এবং বিশেষ বিশেষ লোকদের এ অভ্যাস প্রচলিত হয়ে আসছে যে, তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে অবশ্যই লিখিত আকারে সংরক্ষণ করে রাখতেন। বিশেষ করে সেসব ঘটনাবলী যেগুলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আর এটি (কুরআনুল কারীমের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি) তো তৎকালীন বিশ্বে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও আকর্ষণীয় বিষয় ছিল অবশ্যই। কেউ যদি ওই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করত তাহলে আমাদের পর্যন্ত সে সংবাদ না পৌছাটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর যদি এটা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে এটাও তো সম্ভব হতে পারে যে, ওই যুগে অন্য কোনো নবী বা অগণিত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে।

---

৩৭৩. ইমাম বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক (রহ.) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রহ.) থেকে তা সংকলন করেছেন। খাসায়েসুল কুবরা : ১/১১৫, আবু ইয়ালা (রহ.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। (জমউল ফাওয়াইদ : ২/২৬

সূচিপত্র

সেগুলোতে মুহাম্মাদী শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোনো শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সংবাদগুলো আমাদের পর্যন্ত পৌছায়নি! যদি এ ব্যাপারটি অকল্পনীয় হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনুল কারীমের মুকাবিলার বিষয়টিও স্বাভাবিকভাবেই অকল্পনীয়।"[৩৭৪]

অবশ্য কতক মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তি পবিত্র কুরআন মাজীদের চ্যালেঞ্জের জবাবে কিছু হাস্যকর বাক্য পেশ করেছিল। তাই ইতিহাসের পাতায় আজও সংরক্ষিত আছে। আরবরা সর্বদা এগুলো বলে বলে হাসির খোরাক জোগায়। যেমন, কেউ সূরা "কারিআহ" এবং সূরা "ফীল"-এর ছন্দ অনুসরণ করে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো রচনা করেছে–

الفيل ماالفيل وما ادراك ماالفيل له مشفرٍ طويل وذنب اثيل وما ذالك من خلق ربنا بقليل

আবার কেউ কেউ এভাবে রচনা করেছেন–

الم ترالى ربك كيف فعل بالحبلى واخرج منها نسمة تسعى بين شراسيف وحشى

মুসাইলামাতুল কাযযাব কুরআনের মুকাবিলায় তার উপর অবতীর্ণ ওহী বলে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পেশ করেছে–

يافدع نقى كم تنقين لاالماء تكدرين ولاالوارد تنفرين[375]

অতঃপর পবিত্র কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের বহুদিন পর তৎকালীন আরবীর বিখ্যাত পন্ডিত ও সাহিত্যিক আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা (মৃত্যু : ১৪২) পবিত্র কুরআনুল কারীমের জবাব লেখার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু ওই সময় সে কোনো এক শিশুকে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনে–

"يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي" তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ কালামের মুকাবিলা করা অসম্ভব। আর এটা কখনো মানুষের কালাম হতে পারেনা।[৩৭৬]

قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات

পবিত্র কুরআন মাজীদের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ঃ

আমরা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে ওই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা করতে চাই, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআন মাজীদের কালামকে মু'জিযা

---

৩৭৪. ছালাছু রাসায়িল ফী ই'জাযিল কুরআন : পৃ: ৫০

৩৭৫. আলামা খাত্তাবী (রহ.) রচিত "বয়ানু ই'জাযিল কুরআন" ছালাছু রাসায়িল ফী উলুমিল কুরআন : পৃ: ৫০-৫১– এ প্রকাশিত।

৩৭৬. আলামা বাকিলানী (রহ.) রচিত "ই'জাযুল কুরআন" : ১/৫০

সূচিপত্র

(অক্ষমকারী) হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। এটা তো স্পষ্ট যে, ওই সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে পরিবেষ্টন করা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। তা সত্ত্বেও মানুষের সীমিত উপলব্ধি অনুযায়ী ওই বৈশিষ্ট্যগুলোকে চারটি শিরোনামে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা–

১. শব্দগত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য।
২. বাক্য গঠন সম্পর্কিত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য।
৩. রচনাশৈলীর সম্পর্কিত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য।
৪. ছন্দবদ্ধ গদ্যের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র কুরআন মাজীদের শব্দগত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ঃ إعجاز اللفظ

যে কোনো ভাষার কোনো কবি বা সাহিত্যিক নিজ ভাষায় পাণ্ডিত্যের যত উচ্চ শিখরেই আরোহণ করুক না কেন, এ দাবী সে কখনো করতে পারে না যে, তার কালাম বা রচনায় কোথাও কোনো ফাসাহাত বা অলংকারহীন শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। কেননা অনেক সময় মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে ফাসাহাতহীন বা অলংকার বিহীন শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়ে যায়। কিন্তু সমগ্র কুরআনুল কারীমে "আল-হামদু" থেকে শুরু করে "আন্নাস" পর্যন্ত কোথাও একটি শব্দও ফাসাহাতহীন ব্যবহৃত হয়নি শুধু তাই নয়; বরং প্রতিটি শব্দ যে স্থানে যেভাবে এসেছে, ফাসাহাত ও বালাগাতের বিচারে এমন স্থির ও সমীচীন বিবেচিত হয়েছে যে, ওই শব্দটিকে পরিবর্তন করে ওই ফাসাহাত ও বালাগাতের সাথেই অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আরবী ভাষা সীমাহীন সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক ভাষা। যা নিজের বিপুল শব্দ ভান্ডারের বিচারে পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধশালী ভাষাগুলোর মধ্য হতে অন্যতম একটি। যেমন, এতে একই ভাব প্রকাশের জন্য সাধারণ ও সামান্য পার্থক্যের সাথে বহু শব্দ পাওয়া যায়। এই বিশাল শব্দ ভান্ডারের মধ্য হতে পবিত্র কুরআনুল কারীম স্বীয় উদ্দেশ্য আদায়ে ওই শব্দটিকেই চয়ন করে, যা বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক, ভাব প্রকাশ ও রচনাশৈলীর প্রবাহের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সমীচীন ও সুবিন্যস্ত। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি সকল পাঠকবৃন্দের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

উদাহরণ–১ ঃ

জাহেলী যুগে "মৃত্যু" শব্দটির ভাব আদায়ের জন্য বহু আরবী শব্দ ব্যবহৃত হতো। যেমন[৩৭৭]–১. موت মউত। ২. هلاك হালাক। ৩. فناء ফানা। ৪.

---

৩৭৭. ইবনে সাইয়্যেদাহ্ উন্দুলুসী (রহ.) এসবগুলো নাম একত্রিত করে আরবদের কবিতা থেকে উদাহরণ পেশ করেছেন। ইবনে সাইয়্যেদাহ্ রচিত "আল-মুখাস্সাস" ৬/১১৫।

সূচিপত্র

حتف হাত্‌ফ। ৫. شعوب শাঊব। ৬. حمام হিমাম। ৭. مئون মানূন। ৮. سام সাম। ৯. قاضيه কাযীয়াহ্। ১০. هيئ হামীগ। ১১. نيط নীত। ১২. فود ফূদ। ১৩. مقدار মিকদার। ১৪. جباز জাব্বায। ১৫. قيتم কীতাম। ১৬. حلاق হাল-াক। ১৭. طلاطل ত্বালাত্বাল। ১৮. الله ত্বালাত্বালাহ্। ১৯. عول উল। ২০. ذام যাম। ২১। كفت কিফ্‌ত। ২২. جداع জিদা'। ২৩. حزره হুজরাহ্। ২৪. خلج খালিজ।

কিন্তু এগুলোর মধ্য থেকে অধিকাংশ শব্দের নেপথ্যে আরবদের এই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হতো যে, মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিরকালের জন্য নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার তার জন্য জীবিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

তারা যেহেতু পুনরুত্থান, পরকাল, এবং হিসাব-নিকাশকে বিশ্বাস করত না, তাই তারা "মৃত্যু"কে বুঝানোর জন্য যতগুলো শব্দ নির্বাচন করেছে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই ওই দৃষ্টিভক্তি (চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া)-এর ঝলক বিদ্যমান রয়েছে।

এখন যদি পবিত্র কুরআন মাজীদ আরবদের ওই পুরানো ব্যাখ্যাকেই যথেষ্ট মনে করতো, তাহলে মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কোনো স্তরে এসে সাদৃশ্যের সন্দেহ হতো।

তাই তো যেখানেই মৃত্যুর হাকীকত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে পবিত্র কুরআনুল কারীম "মৃত্যু"র ভাব বুঝানোর জন্য উলিখিত চব্বিশটি শব্দকে পরিহার করে অভিনব একটি শব্দ ব্যবহার করেছে এবং আরবী ভাষাকে এমন এক সৌন্দর্যপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, সমৃদ্ধ ও বিশুদ্ধ-অলংকারপূর্ণ শব্দ প্রদান করেছে যার দ্বারা মৃত্যুর হাকীকতও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আর সেই শব্দটি হচ্ছে, تَوَفّى (তাওয়াফ্‌ফা)। যার আভিধানিক অর্থ হলো,"কোনো বস্তুকে পুরোপুরিভাবে আদায় করে নেওয়া।" এই শব্দটি এ কথাও স্পষ্ট করে দিল যে, موت"মৃত্যু" চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নাম নয়।

বরং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে রূহ নিয়ন্ত্রণ করার নাম হলো, "মৃত্যু"। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, ওই বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে তাতে পুনরায় রূহ দিতে পারেন। "মৃত্যু"কে বুঝানোর জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীমের পূর্বে এই শব্দটি কেউ ব্যবহার করেনি। যেমন, আল্লামা ইবনুস সাইয়্যেদাহ (রহ.) মৃত্যুর প্রতিশব্দ উল্লেখ করতে গিয়ে স্বীয় গ্রন্থ "আল-মাখাস্‌সাস"-এ আরবদের কবিতা থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত

সূচিপত্র

করেছেন। কিন্তু تَوْفٰى (তাওয়াফ্ফা) শব্দ বুঝানোর জন্য পবিত্র কুরআন মাজীদ ছাড়া ভিন্ন কোনো দলীল উপস্থাপন করেননি।[৩৭৮]

উদাহরণ–২ঃ

প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কিছু বিষয় পরিলক্ষিত হয়, যা শ্রুতিমধুরতার দৃষ্টিকোণ থেকে ফাসীহ ও পছন্দনীয় বলে মনে করা হয় না। কিন্তু যেহেতু সেগুলোর ভাব প্রকাশের জন্য অন্য কোনো পরিবর্তিত বা সমার্থবোধক শব্দ নেই, তাই ওই ভাষার লোকেরা সে শব্দগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়ে যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীম এ ক্ষেত্রগুলোতে এত সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করে যে, সুরুচিবোধ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। যেমন, প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত পাকা ইট বুঝানোর জন্য আরবী ভাষাতে যতগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার সবকটি উচ্চারণে কঠিন এবং নিম্নশ্রেণীর ও অপছন্দনীয় মনে করা হয়।

যেমন, اجر(আজুর্রুন), قرمد (কারমাদুন) ও طوب (তূবুন)। এখন পবিত্র কুরআন মাজীদে এ কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, ফেরাউন স্বীয় মন্ত্রী হামানকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, "আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করতে ইট পোড়াও।" এ ঘটনাকে বর্ণনা করার জন্য "ইট" শব্দটি ব্যবহার করা ছিল অত্যাবশ্যক। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীম এ ভাবকে এমন এক অলৌকিক পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছে যে, ভাবটাও অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় হয়েছে আবার কঠিন শব্দ ব্যবহারের দোষও সৃষ্টি হয়নি। যেমন, পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا

'অর্থ্যাৎ ফির'আউন বললঃ হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর।'[৩৭৯]

উদাহরণ–৩

আরবীতে কোনো কোনো শব্দ এমন আছে, যা একবচন অবস্থায় উচ্চারণে সহজ ও ফাসীহ হয়। কিন্তু বহুবচন অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। যেমন, জমিনকে বুঝানোর ارض (আরদুন) উচ্চারণে সহজ একটি শব্দ। আরবীতে এর দু'টি বহুবচন ব্যবহৃত হয়– اراضى এবং ارضون । দু'টি শব্দকেই উচ্চারণে

---

৩৭৮. শায়েখ বিন্নুরী রচিত "ইয়তিমাতুল বয়ান লি মুশকিলাতুল কুরআন : পৃ: ৫৬, মজলিসে ইলমী, ডাবেল : ১৩৫৭ হিঃ।

৩৭৯. প্রাগুক্ত : ইবনুল আসীর (রহ.) রচিত "আল-মাসালুস সায়ে'র"-এর উদ্ধৃতিসহ পৃ: ৭১।

সূচিপত্র

কঠিন বলে মনে করা হয় এবং এগুলোর দরুণ কালামের প্রাঞ্জলতায় ফাটল সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেখানে বহুবচন শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক, সেখানে সাহিত্যিকগণ এগুলোকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়ে যান। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন মাজীদ অধিকাংশ স্থানে سموٰت (সামাওয়াত)-কে বহুবচন এবং এরই সাথে ارض (আরদুন)-কে একবচন ব্যবহার করেছে। কোথাও ارض (আরদুন)-কে বহুবচন শব্দে ব্যবহার করেনি। অবশ্য পবিত্র কুরআনুল কারীমের একটি স্থানে সাত জমিনের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল। যার জন্য বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু পবিত্র কুরআন মাজীদ এখানেও বহুবচন শব্দটিকে এড়িয়ে এমন এক চমৎকার অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, যার দ্বারা ভাবও যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং সাথে সাথে শুধু এটা নয় যে, কালামে কোনো কাঠিন্য সৃষ্টি হয়নি; বরং কালামের সৌন্দর্য আরো বহু বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

'আল্লাহ ওই মহান সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং সমপরিমাণ জমিন।'[৩৮০]

লক্ষ্য করুন, এখানে سماء (সামাউন)-এর বহুবচন سَمَاوَاتٍ (সামাওয়াত) তো ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীম أَرْضٍ (আরদুন)-এর কোনো বহুবচন ব্যবহার না করে তার স্থলে ভাব আদায়ের জন্য وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ -বাক্যটি ব্যবহার করেছে। এর নিগূঢ় রহস্য সূক্ষ্ম কারুকার্যের উপর যতই গভীর চিন্তা-ভাবনা করা হবে, ততই অলৌকিক বালাগাতের সমুদ্র চোখের সামনে ঢেউ খেলতে থাকবে।

উদাহরণ–৪ ঃ

পবিত্র কুরআন মাজীদের কোনো কোনো শব্দের উপর কতক নাস্তিক কঠিন হবার আপত্তি উত্থাপন করেছে। যেমন, ضیزی (দ্বীযা) শব্দটি। কিন্তু ওই নাস্তিকরা এ কথা বে-মালুম ভুলে যায় যে, কোনো কোনো শব্দ সৃষ্টিগতভাবেই কঠিন হয়। কিন্তু সাহিত্যিকগণ সেগুলোকে এমন শৈলীতে ব্যবহার করেন যে, এর চেয়ে উত্তম আর কোনো শব্দ সেখানে ব্যবহার করা যায় না। উর্দূ ভাষায় এর উদাহরণ হলো এই যে, دھول دھپا (ধোল-ধাপ্পা) একটি নিম্নমানের শব্দ বলে বিবেচিত। যেটাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপূর্ণ ফাসীহ-বালীগ ভাষায় সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু কবি মির্জা গালিব-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি লক্ষ্য করুন–

---

৩৮০. সূরা তালাক : ১২

সূচিপত্র

ڈھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوہ نہیں
ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن

অর্থাৎ, হাতাহাতি-মারামারি সবটুকুই আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে গণ্য নয়। হে গালিব, আমি নিজেও একদিন মারামারি করেছিলাম।

এখানে এই শব্দটি এমন শৈলীতে ব্যবহৃত হয়েছে যে, যদি এর স্থলে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সুন্দর উপস্থাপনার বিষয়টি বিদঘুটে হয়ে যাবে। আরবীতে এর উদাহরণ এই যে, ঘাড়ের একটি রগের নাম ...(আখদা)। আরবের দুইজন কবি নিজেদের কালামে শব্দটিকে দু'ভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে উভয়টির মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কবি আবু তাম্মাম বলেন–

يادهر قوم عن اخذ عيك فقد
اصبحت هذا الانام عن قك

এখানে শব্দটিকে অত্যন্ত কঠিন ও ভারী মনে হচ্ছে। কিন্তু এরপর হামাসার এক কবি আবদুল্লাহ ইবনুস সাম্মাহ'র কবিতাটি পাঠ করুন–

تلفت نحو الحى حتى وجدتنى
وجعت من الاصغاء ليتا واخدعا

এখানে ওই কঠিন শব্দটিই এতই সাবলীল ও সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, সুরুচিবোধের উপর এটা কোনো রকম ভারী বা কঠিন বলে মনে হয় না। বরং সামগ্রিকভাবে কবিতার মধ্যে যে সাবলীলতা পাওয়া যায়, সেখানেও এই কঠিন শব্দটি পুরোপুরিভাবে স্থাপিত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন মাজীদে ضيزى শব্দটিও এমন সৌন্দর্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে যে, এর স্থলে এর চেয়ে সুন্দর থেকে সুন্দরতম কোনো শব্দও তার জুড়ি হতে পারে না।

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (22)

বাহ্যিকভাবে তাকালে ضِيزَىٰ এর মুকাবিলায় قِسْمَةٌ جائرة অথবা قِسْمَةٌ ظالم উত্তম বলে মনে হয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের যে বিষয়বস্তুর যোগসূত্রে ضِيزَىٰ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে যদি جائرة অথবা ظالمة ব্যবহার করা হয় তাহলে বাক্যের সকল সৌন্দর্য ও প্রবাহ বিনষ্ট হয়ে যাবে।[৩৮১]

---

৩৮১. এ চারটি উদাহরণ বুনিয়াদীভাবে মাওলানা ইউসুফ বিননূরী (রহ.) রচিত গ্রন্থ "ইয়াতিমাতুল বয়ান" থেকে সংকলিত। যা হযরত আলামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) রচিত "মুশকিলাতুল কুরআন" গ্রন্থের

সূচিপত্র

পবিত্র কুরআনে বাক্যগঠন সম্পর্কিত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ঃ تركيب কাঠামো

সাধারনত শব্দের পর আসে শব্দরাজি দ্বারা গঠিত বাক্যের গঠন, তারকীব ও বিন্যাসের বিষয়টি। এ ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনুল কারীমের অলৌকিকতা চরম শিখরে আসীন। পবিত্র কুরআন মাজীদের বাক্যগঠন রীতিতে এমন শক্তিমত্তা, প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা ও মাধুর্যতা রয়েছে, যার কোনো উদাহরণ পেশ করা বাস্তবিক অর্থে অসম্ভব। আমি এখানে শুধুমাত্র একটি উপমা পেশ করেই ক্ষান্ত হব।

হত্যাকারী থেকে কেসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করা আরবদের নিকট অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার ছিল। আর এর উপকারীতা প্রচার-প্রসারের জন্য আরবীতে কয়েকটি প্রবাদবাক্য প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন– اَلْقَتْلُ اِحْيَاءٌ لِلْجَمِيْعِ (হত্যা সবার জন্য জীবন।) اَلقتل انفى للقتل (হত্যাই হত্যার গতিরোধক)। اكثروا القتل ليقل القتل (হত্যা প্রবণতা রোধ করার জন্য হত্যা বৃদ্ধি কর।) ইত্যাদি। এই প্রবাদগুলোর এতই গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে, লোকমুখে প্রায় এগুলো উচ্চারিত হতো এবং এগুলোকে ফাসীহ বা উঁচু মানের প্রবাদসাহিত্য বলে মনে করা হতো। পবিত্র কুরআনুল কারীমও এ ভাবটি প্রকাশ করেছে, তবে তা কেমন মানের? ইরশাদ হয়েছে–

'তোমাদের জন্য কেসাসে রয়েছে জীবন।' ولكم فى القصاص حياة

এই বাক্যের সংক্ষেপণ, সমৃদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা-সাবলীলতা, শক্তিমত্তা ও ভাব প্রকাশকে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাকানো হবে, পবিত্র কুরআন মাজীদের বালাগাত ও ভাষালংকারের অলৌকিক কীর্তি নজরে পড়বে। পূর্বের সবগুলো প্রবাদ বাক্যকে এর সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

কালামে পাকের বর্ণনাশৈলীর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ঃ اسلوب কাঠামো

পবিত্র কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় তার বর্ণনাশৈলীর মাঝে। আর এটা এমন একটা বিষয়, যা যোগ্য ও অযোগ্য সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্ণনাশৈলীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু-অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নে পেশ করা হলো-

(১) পবিত্র কুরআন মাজীদের শব্দমালা এমন গদ্য সম্বলিত, যার মধ্যে পদ্যের নিয়ম-নীতি না থাকা সত্ত্বেও এমন এক স্বাদ ও মাধুর্যতাপূর্ণ সুরেলা ধ্বনি পাওয়া যায়, যা পদ্যের চেয়েও অধিক মাধুর্যতাপূর্ণ, শ্রুতিমধুর ও সৌন্দর্যবহ এবং ব্যাপক অর্থবহ।

ভূমিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উদাহরণগুলো আলামা শাহ সাহেব (রহ.) ও আলামা ইবনে আছীর (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে পেশ করেছেন।

সূচিপত্র

এই সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, মানুষের স্বভাবগত রুচিবোধ ছন্দময় কবিতার মাঝে এমন এক স্বাদ ও মাধুর্যতা অনুভব করে, যা গদ্যের মাঝে অনুভূত হয় না। আপনি যদি এই স্বাদ ও মাধুর্যতার প্রকৃত রহস্যের উপর চিন্তা-গবেষণা করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, এর মূল রহস্য শব্দমালার সেই গাঁথুনীর মাঝে সুপ্ত আছে, যা বিশেষ একটি সুরেলা ধ্বনির সৃষ্টি করে। আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষার প্রাচীন কাব্য প্রতিভায় কবিতার বিশেষ একটি ছন্দবদ্ধতার কারণে এ সুরেলা ধ্বনির মাঝে মাধুর্যতার সৃষ্টি হয়। যখন একই ছন্দময় শব্দ বার বার কানে আঘাত করে, তখন এতে সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে একটি বিশেষ মাধুর্যতা অর্জিত হয়। আবার যখন ছন্দের সাথে মিত্রাক্ষরও পাওয়া যায়, তখন স্বাদ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আর যখন এর সাথে সহগামী পঙক্তি একই রকম হয়, তখন নতুন আরেক শ্রবণ স্বাদ ও তৃপ্তি সংযোজিত হয়। আর যদি পঙক্তিরাজির শেষ শব্দের ছন্দের সাথে সাথে মধ্যখানের ছন্দ ও মিত্রাক্ষরও এক রকম হয়, তাহলে শ্রুতি-মাধুর্যতা আরো বহুগুণে বেড়ে যায়।

কিন্তু ছন্দ ও মিত্রক্ষরের নিয়ম-নীতি সকল অঞ্চলে এবং সকল ভাষায় এক রকম হয় না। প্রত্যেক ভাষার লোকই স্বীয় রুচি ও স্বভাব অনুযায়ী এর জন্য বিভিন্ন নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে থাকে। যেমন, আরবগণ তাদের কাব্যচর্চাকে ছন্দ ও মিত্রাক্ষরের ওই ছাঁচ পর্যন্ত সীমিত রেখেছে, যা খলীল ইবনে আহমদ প্রমুখ রচনা করেছেন। ফার্সীর কাব্য চর্চায় ছন্দের পরিধিকে আরো একটু ব্যাপক করা হয়েছে এবং নতুন নতুন পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মিত্রাক্ষর ও সহছন্দের অনুসরণের ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন, আরবী কাব্যে قبور (কবূর) এবং كبير (কাবীর) শব্দ দু'টিকে পরস্পরের মিত্র শব্দ বলা হয়। যদি কবিতার এক পঙক্তির শেষে قبور (কবূর) আর দ্বিতীয় পঙক্তির শেষে كبير (কাবীর) শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটাকে দূষণীয় মনে করা হয় না। অথচ ফারসী ভাষায় এটা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আরবীতে যদি একই শব্দের এক অংশ এক পঙক্তিতে আর অপর অংশ অন্য দ্বিতীয় পঙক্তিতে থাকলেও এটাকে দূষণীয় মনে করা হয় না। কিন্তু ফার্সীতে এমন রীতি জঘন্য দোষ হিসেবে বিবেচিত।

বরং এমন কবিতাকে কবিতাই মনে করা হয় না। অনুরূপভাবে আরবী কাব্যে শব্দ বিকৃতি এত বেশি ঘটে যে, মূল শব্দই পরিবর্তন হয়ে যায়। অথচ ফার্সীতে এমনটি হয় না। এমনিভাবে আরবী কাব্যে সহছন্দ [প্রথম চরণের শেষ শব্দের প্রায় সমোচ্চারিত পরবর্তী চরণের শেষ শব্দের মিল]-এর কোনো কল্পনা করা যায় না। অথচ ফার্সীতে সহছন্দ ব্যতীত কাব্যকে অত্যন্ত হালকা মনে করা

সূচিপত্র

হয়। অতিরিক্ত তথ্য হলো যে, আরবী কাব্যে ফার্সীর মতো দ্বিচরণ কবিতা, চৌচরণ বিশিষ্ট কবিতা, পঞ্চচরণ বিশিষ্ট কবিতা এবং ষড়চরণ বিশিষ্ট কবিতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অথচ ফার্সী কাব্য এসব প্রকার দ্বারা ভরপুর। অতঃপর এর প্রভাব তৎকালীন মুসলিম অধ্যুষিত স্পেন ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত শহরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

আরবী ও ফার্সীর এই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ছন্দগত ক্ষেত্রে বিরাট একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন হিন্দী কাব্যে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ শব্দগত ছন্দের পরিবর্তে শুধু অক্ষর সংখ্যার হিসাব করা হয়েছে। যদি উভয় শব্দের অক্ষর সংখ্যা সমান হয় তাহলে পরস্পরের সহছন্দ বলা হয়, যদিও এর হরকত ও সাকিনের মাঝে বিরাট পার্থক্য থাকে। বরং কখনো কখনো হিন্দী শব্দ দু'টি হবার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছন্দযুক্ত অক্ষর, মিত্রাক্ষর ও সহছন্দের মাঝে, এমনকি অক্ষর সংখ্যার মাঝেও বিরাট ব্যবধান থাকে। এতদসত্ত্বেও অতি স্বাদ ও যত্ন নিয়ে তা পাঠ করা এবং গাওয়া হয় এবং তা অনস্বীকার্য প্রভাবও বিস্তার করে।

এ ক্ষেত্রে ইংরেজি কাব্যের প্রকৃতি সম্ভবত সবচেয়ে অধিক মুক্ত। কেননা এর ছন্দ কখনো দীর্ঘতা হ্রস্বতার মাঝে হয়ে থাকে। আর এতেও অনেক সময় আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ মিত্রাক্ষরের প্রতি বিশেষ কোনো মনোযোগ দেওয়া হয় না। বরং উচ্চারণের খটখটানী (Syllables) থেকে বিশেষ একটি সুর (rhythm) সৃষ্টি হয়। আর সেই সুরটিই ইংরেজদের জন্য একটি বিশেষ স্বাদ ও মাধুর্যতার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপরোল্লেখিত বিশদ আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কবিতার স্বাদ ও মাধুর্যতার ক্ষেত্রে ছন্দ ও মিত্রাক্ষরের ধরা-বাঁধা নিয়ম-নীতি বিশেষ কোনো মর্যাদা রাখে না। এ কারণেই ভাষা ও অঞ্চলের পরিবর্তনের কারণে এই নিয়ম-নীতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু একটি বিষয় আছে, যা সকল ভাষায়, সকল দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের মাঝে সমভাবে প্রযোজ্য। আর তা হলো, "ছন্দবদ্ধ সুরেলা ধ্বনি।" অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে শব্দরাজিকে এমনভাবে গাঁথা যে, সেগুলো উচ্চারণ করলে বা শোনলে সুরুচিবোধ আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে। কিন্তু মানুষ যেহেতু সমভাবে প্রযোজ্য বিষয়টিকে ছন্দ ও মিত্রাক্ষরের ছাঁচ থেকে পৃথক করতে সক্ষম নয়, তাই তারা যখন কাব্যে প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যতা সৃষ্টি করতে চায়, তখন তাকে বাধ্য হয়েই নিজের পরিবেশ ও প্রকৃতির তৈরি নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয়।

কিন্তু একমাত্র পবিত্র কুরআনুল কারীমেরই এই অলৌকিক বৈশিষ্ট্য যে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নির্ধারিত কাব্যিক রীতি-নীতির কোনো অনুসরণ

সূচিপত্র

করেনি। বরং শুধু "ছন্দবদ্ধ সুরেলা ধ্বনি"র এতটুকু গ্রহণ করেছে, যা সমস্ত নিয়ম-নীতির মূল উদ্দেশ্য। এ কারণেই পবিত্র কুরআন মাজীদ গদ্য হওয়া সত্ত্বেও পদ্যের চেয়েও অধিক প্রাঞ্জলতা ও তৃপ্তিবহ। শুধু আরববাসীই নয়; বরং পৃথিবীই যে কোনো ভাষার লোক সেটাকে শ্রবণ করে অসাধারণ তৃপ্তি ও প্রভাব অনুভব করে।

বিষয়টা এর দ্বারা আঁচ করা যায় যে, আরবের কতক কাফের কিসের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআন মাজীদকে কবিতা আখ্যা দিয়েছিল? এটা স্পষ্ট যে, কবিতার প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা কোনোভাবেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপর প্রযোজ্য হয় না। আরবের কাফেররা নিজেদের গোমরাহী সত্ত্বেও গদ্য ও পদ্যের পার্থক্যজনিত জ্ঞান অবশ্যই রাখতো। কবিতার জন্য যে ছন্দ ও মিত্রাক্ষর আবশ্যক, তা তাদের ভালো করেই জানা ছিল। যা পবিত্র কুরআনুল কারীমে অনুপস্থিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পবিত্র কুরআন মাজীদকে এ কারণেই কবিতা বলে আখ্যা দিয়েছে যে, এর বর্ণনাভঙ্গি ও সুরেলা ধ্বনির মাঝে তারা কবিতার চেয়ে অধিক স্বাদ ও প্রভাব অনুভব করেছিল। তারা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, ছন্দ ও মিত্রাক্ষরের অনুসরণ ছাড়াই এই কালামের মাঝে কাব্যিক রুচি ও মেধার জন্য সেই স্বভাবগত তৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, যা ছন্দ ও মিত্রাক্ষরের ছকবাঁধা রীতি-নীতি দ্বারাও অর্জিত হয় না।

পবিত্র কুরআনুল কারীম "ধারাবাহিক সুরেলা ধ্বনি"র এই প্রভাব সৃষ্টির জন্য কোন্ অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? এটা বর্ণনা করা মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়। কারণ প্রচলিত শব্দরাজি ও পরিভাষা ওই ধরনকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম নয়, যা কুরআনী বর্ণনাভঙ্গিতে অহরহ দৃষ্টিগোচর হয়। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সাহিত্যরুচি ও শিল্পানুভূতির কিছু অংশ লাভ করেছেন, তিনি আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনার সত্যতা পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার সময় নিজে নিজেই অনুভব করতে সক্ষম হবেন।[৩৮২]

(২) বালাগাত বা ভাষালংকার বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনাভঙ্গির তিনটি প্রকার নির্ধারণ করেছেন। (১.) সম্বোধনসূচক রীতি। (২.) সাহিত্যরীতি। (৩.) ইলম ও তথ্যভিত্তিক রীতি।

প্রত্যেক প্রকারের পরিধি পৃথক পৃথক এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ও প্রায়োগিক স্থানও ভিন্ন ভিন্ন। একই রচনার মাঝে তিন প্রকারের প্রত্যেকটির সম্মেলন ঘটানো সম্ভব নয়। আপনি যখন বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন আপনি

---

৩৮২. এই পুরো বিষয়টি হযরত শাহ ওয়ালী উলাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) রচিত "আল-ফাউযুল কাবীর" থেকে সংকলিত। বিস্তারিত জানার জন্য উক্ত গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করুন।

সূচিপত্র

এক ধরনের ভাষারীতি অনুসরণ করেন। আর যখন সাহিত্যপূর্ণ কোনো পদ্য রচনা করেন, তখন সেটার ভাষারীতি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আবার যখন আপনি ইলমী বা গবেষণামূলক কোনো প্রবন্ধ লিখেন, তখন তার বর্ণনাভঙ্গি অন্য আরেকটি গ্রহণ করে থাকেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পবিত্র কুরআন মাজীদের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য এই যে, সে উপরোক্ত তিনটি রীতিকে একই সঙ্গে বহন করে চলে। এতে বক্তৃতার প্রভাব, সাহিত্যের প্রস্ফূটন এবং ইলম ও তথ্যের দৃঢ়তা একই সাথে উপস্থিত থাকে। কোনোটার মধ্যে কোনো কমতি তথা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না।

(৩) নিরক্ষর গ্রাম্য বেদুঈন লোকও পবিত্র কুরআনুল কারীমের সম্বোধিত ব্যক্তি। শিক্ষিত লোকও এর সম্বোধিত ব্যক্তি। উচ্চ পর্যায়ের আলেম-উলামা ও বিজ্ঞ দার্শনিকও এর সম্বোধিত ব্যক্তি। কিন্তু পবিত্র কুরআন মাজীদের একই বর্ণনাভঙ্গি যুগপৎভাবে উল্লিখিত প্রত্যেক স্তরের সম্বোধিত লোকদেরকে প্রভাবিত করে। একদিকে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ব্যক্তি তাতে সহজ-সরল তথ্য খুঁজে পায় এবং সে মনে করে, এই পবিত্র কুরআনুল কারীম আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু অপর দিকে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও গবেষকগণ যখন গভীর চিন্তার সাথে তা অধ্যয়ন করেন, তখন পবিত্র কুরআন মাজীদের তথ্যভিত্তিক অনেক সূক্ষ্ম বিষয় তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং এমন মনে হয় যে, এই গ্রন্থ ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সূক্ষ্ম বিষয় সম্বলিত, সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যা বুঝতেই সক্ষম হবে না।একজন সাধারণ মানুষের মেধার সামনে পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রমাণ পেশ করার পদ্ধতি অত্যন্ত সাদামাটা এবং বহুলাংশে চাক্ষুষ প্রমাণাদির উপর ভিত্তিশীল।

প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত, জীবন-স্রষ্টা এবং মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে পবিত্র কুরআনুল কারীম একেবারে চোখের সামনে ভাসমান দলীলসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত করেছে। প্রকৃতির দৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ওই হাকীকত ও মূলতত্ত্ব বর্ণনা করেছে, যা অতি সহজেই একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বুঝে এসে যায়। কিন্তু ওই সাদামাটা দলীলগুলোকেই যখন নিগূঢ় তথ্যের ময়দানে অবতীর্ণ করে দেখা হবে, তখন তাতে নিখুঁত যুক্তি ও তার্কিক দলীলও পাওয়া যাবে। যা দর্শনজনিত মার-প্যাঁচে আক্রান্ত রোগীদেরও শিফা দান করে। শব্দে শব্দে পবিত্র কুরআন মাজীদ দর্শন ও বিজ্ঞানের ওই সকল সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে, যেগুলোর গবেষণার জন্য বড় বড় দার্শনিকরাও শেষ পর্যন্ত হাবুডুবু খেতে থাকে।

সূচিপত্র

(৪) একটি কথাকেই যদি বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়, তাহলে এর বক্তা সাহিত্য রচনায় চাই যত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, এক পর্যায়ে এসে শ্রোতা ও পাঠবৃন্দ তার উপর বিরক্ত হয়ে যায়। আলোচনার ধার কমে যায় এবং তার প্রভাব হ্রাস পেয়ে যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন মাজীদের অবস্থা হলো এই যে, এতে একটি কথাকে কখনো কখনো বিশ বার পর্যন্ত বলা হয়েছে। একই ঘটনা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বারেই নতুন নতুন ভঙ্গিমা, নতুন নতুন স্বাদ-তৃপ্তি ও প্রভাব অনুভব হয়।

(৫) কালামের প্রভাব ও মাধুর্যতা দু'টি বিপরীতমুখী গুণ। উভয়টার জন্য পৃথক পৃথক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করতে হয়। এই গুণ দু'টিকে একই রচনার মাঝে উপস্থিত করানো মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু এটা কেবল কুরআনী শৈলীর বৈশিষ্ট্য যে, এতে গুণ দু'টিকে পরিপূর্ণভাবে একই স্থানে পাওয়া যায়।

(৬) পবিত্র কুরআনুল কারীম এমন কিছু বিষয়ে উচ্চাঙ্গ বালাগাত বা ভাষালংকারের প্রদর্শনী ঘটিয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও মানবিক মেধা যেগুলোতে হাজার চেষ্টা করেও কোনো সাহিত্যরস সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলীর কথাই বলা যাক। এটা এমন এক শুষ্ক ও রসহীন-কঠোর বিষয় পৃথিবীর সকল কবি-সাহিত্যিক একত্রিত হয়েও এতে কোনো সাহিত্যিকতা ও রচনার সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু এরপর সূরা নিসা'র يوصيكم الله আয়াত বিশিষ্ট রুকুটি পাঠ করুন। আপনি অবলীলায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠবেন, এটা তো এক অসাধারণ কালাম। এই পুরো রুকুটিতে উত্তরাধিকার সম্পদের বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এতই সুন্দর ও চমৎকার ভঙ্গিমায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, যার প্রতিটি বাক্যের উপর সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি তৃপ্তিবোধ করে থাকেন।

(৭) প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যিকের ফাসাহাত ও বালাগাতের বিশেষ একটি প্লাটফর্ম রয়েছে, যা অতিক্রম করলে মূল আলোচনাই বিস্বাদ হয়ে যায়। আরবী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েস নারীর রূপ-লাবণ্য বর্ণনায়, নাবিগাহ্ ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক বর্ণনায়, আশা আবেদনের সৌন্দর্য ও গুণাবলী বর্ণনায় এবং যুহাইর আগ্রহ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্ণনায় অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। প্রত্যেক ভাষাতেই এ অবস্থা রয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন মাজীদে এত পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যার পরিবেষ্টন অসম্ভব ব্যাপার। যেখানে উৎসাহ হোক আর ভীতি প্রদর্শন হোক, প্রতিশ্রুতি হোক আর ধমকি হোক, উপদেশ হোক আর ঘটনা-উপমা হোক, কিংবা আকাইদ হোক আর আহকামেরই বর্ণনা হোক–প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বর্ণনাভঙ্গি বালাগাতের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছেছে।

সূচিপত্র

(৮) আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণ পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্ণনাভঙ্গির অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি গুণ। এই গুণের মধ্যে পবিত্র কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব একেবারেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীম যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের দিক-নির্দেশনার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাই সে সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলোতে ওই সুপ্রশস্ত বিষয়গুলোকে সন্নিবেশ করে দিয়েছে। যেন প্রত্যেক যুগেই তার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা লাভ করা যায়। চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও তার বিষয়বস্তুগুলো পুরাতন হয়ে যায়নি। অথচ এই সময়ের মাঝে মানব জীবন কত উত্থান-পতনের শিকার হয়েছে। কত বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কত দেশ ও সম্রাজ্যের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কত বড় বড় প্রতাপশালী শাসকগণ এবং তাদের সালতানাত সমূহ কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। কত বিখ্যাত সৃষ্টিকর্ম ও সাহিত্যকর্ম পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গিয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীম সদা-সর্বদাই প্রাণবন্ত ও সুরভিত ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটা ইতিহাস গ্রন্থ নয়; কিন্তু ইতিহাসের বিশুদ্ধতম উৎস। এটা রাজনীতি ও আইনের বই নয়; কিন্তু সে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে রাজনীতি ও বিশ্ব পরিচালনার এমন সব নীতিমালা বর্ণনা করে দিয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে দিক-নির্দেশনা দিবে এবং পৃথিবীর সকল দেশের সংবিধানের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা দর্শন ও বিজ্ঞানের বই নয়; তবে সে দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। এটা অর্থনৈতিক ও সামাজিকজ্ঞান গ্রন্থ নয়; কিন্তু এ দু'টি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তাকারে সে এমন সমৃদ্ধ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে যে, পৃথিবীর সকল জ্ঞানভান্ডার শত-সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের পর অবশেষে আজ তার নিকটবর্তী এসেছে।

আল-কুরআনের শব্দ-বিন্যাসগত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ঃ نظم القرآن

পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও সম্পর্ক এবং শব্দমালার গাঁথুনী ও বিন্যাসের মাঝে এক সূক্ষ্ম অলৌকিকত্ব নিহিত রয়েছে। আপনি যখন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করবেন, তখন আপনার কাছে মনে হবে, এর প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুর বাহক এবং এগুলোর মাঝে পরস্পর কোনো যোগসূত্র নেই। এ কারণেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দমালার বিন্যাসের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল মুফাসসিরের মতামত হলো, পবিত্র কুরআন

সূচিপত্র

মাজীদ যেহেতু দীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে, তাই এতে কোনো যোগসূত্র ও বিন্যাস অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই।

এর প্রতিটি আয়াতই একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের বাহক। পক্ষান্তরে অপর দলের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি আয়াত পরস্পরের মাঝে সম্পর্কযুক্ত এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এটাকে অধ্যয়ন করা উচিত। এই দ্বিতীয় দলের মতের সপক্ষে দলীল হচ্ছে, কোনো গ্রন্থের আলোচনা পরস্পর সম্পর্কহীন হওয়া ওই গ্রন্থের অসম্পূর্ণতার পরিচয় বহন করে। আর মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কালাম অবশ্যই অবশ্যই এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। কিন্তু প্রথম দলের মুফাসসিরগণ এর প্রতিউত্তরে বলেন যে, যেমনিভাবে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের কুদরতী দৃশ্যাবলীতে কোনো যোগসূত্র ও বিন্যস্ততা নেই, বরং অবিন্যস্ততার মাঝেই এর সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে।

কোথাও উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র, কোথাও অসমতল পাহাড়-পর্বত। আবার কোথাও উঁচু-নিচু টিলা। ঠিক তদ্রূপ পবিত্র কুরআন মাজীদের সৌন্দর্যও তার ওই স্বতন্ত্র অবস্থানের মাঝেই নিহিত আছে। গযলের প্রত্যেকটি ছন্দের আলোচ্য বিষয় পৃথক পৃথক হয়ে থাকে এবং এটাকে কেউ দোষ বলে মনে করে না। ব্যস, তদ্রূপ (নিঃসন্দেহে) পবিত্র কুরআনুল কারীমের অবিন্যস্ততাও দোষের কিছু নয়।

কিন্তু বাস্তব কথা হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোর মাঝে পরস্পর খুবই সূক্ষ্ম যোগসূত্র পাওয়া যায়। যা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অন্যথায় যদি বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য না-ই রাখা হতো, তাহলে অবতীর্ণ হওয়ার বিন্যাস এবং লিপিবদ্ধ করার বিন্যাসের মাঝে পার্থক্য রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

যে তারতীব বা ধারাবাহিকতায় পবিত্র কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হতো, সে অনুযায়ীই লিখে নেওয়া হতো। লিপিবদ্ধ করার সময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে একটি বিন্যাস দিয়েছেন, পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর মাঝে যোগসূত্র থাকার এটাই সবচেয়ে বড় দলীল। তবে এ ধরনের যোগসূত্র বেশ সূক্ষ্ম হয়ে থাকে এবং সে পর্যন্ত পৌছার জন্য গভীর চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়।

এই যোগসূত্রগুলো এতই জটিল ও সূক্ষ্ম রাখার রহস্য বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, (বাস্তবতা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই জানেন) প্রত্যেক আয়াতের স্বাতন্ত্র্য যেন বজায় থাকে এবং শব্দরাজির ব্যাপকতা যেন নিঃশেষ না হয়ে যায়। তাহলে اَلعِبرَةُ بِعُمُومِ اللفظِ -এর উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

সূচিপত্র

এতদ্ব্যতীত ওই যুগে আরববাসীদের ভাষণ ও কাব্যরীতি সাধারণত এমনই ছিল যে, এর বিষয়বস্তুগুলো সুবিন্যস্ত ও সম্পর্কযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে স্বতন্ত্র একটি অবস্থান রাখতো। কাজেই এই পদ্ধতি তৎকালীন সাহিত্য রুচিবোধের সম্পূর্ণ অনুকূলে ছিল। তাই যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকানো হয়, তাহলে প্রত্যেকটি আয়াতকে পৃথক পৃথক বলে মনে হবে। কিন্তু আপনি যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকান তাহলে বুঝতে পারবেন যে, সমস্ত আলোচনাই ধারাবাহিক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

এভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীম তার শব্দমালার মাঝে যে বিন্যাসশৈলী প্রয়োগ করেছে, তা এর সূক্ষ্মতার অলৌকিক বৈশিষ্ট্য। আর এর অনুসরণ মানবিক শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দমালার বিন্যাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক আলেম স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। কোনো কোনো মুফাসসির স্বীয় তাফসীরের আওতায় এটাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন।

এ ক্ষেত্রে ইমাম রাযী (রহ.) রচিত "তাফসীরে কাবীর"ই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবীদার। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের নযম বা শব্দবিন্যাসের ব্যাখ্যার বিশেষ যোগ্যতা ও তাওফীক দান করেছেন। তারপর কাযী আবুস সাউদ (রহ.)-ও পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দমালার বিন্যাসের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীতে বহু মুফাসসিরীনে কেরাম এ ক্ষেত্রে ওই দুই মহান ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করেছেন। নিম্নোক্ত উদাহরণে পবিত্র কুরআন মাজীদের শব্দমালার বিন্যাসের সামান্য একটু আঁচ করা যেতে পারে। সূরা হিজরের এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে–

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50)

'আপনি আমার বান্দাদের এই সংবাদ দিয়ে দিন যে, আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর (এ সংবাদও দিয়ে দিন যে,) আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'[৩৮৩] তার পর পরই ইরশাদ হয়েছে–

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

'আর তাদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর অতিথিদের ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করুন।'

এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট ফেরেশতাদের আগমনের প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় কথার মাঝে কোনো মিল আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে,

---

৩৮৩. সূরা হিজর : ৪৯-৫০

সূচিপত্র

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনাটি প্রথম বাক্যেরই সমর্থনকারী। কেননা যে ফেরেশতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট এসে ছিলেন, তিনি দু'টি কর্ম সম্পাদন করেছেন। একটি হচ্ছে, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত ইসহাক (আ.)-এর ন্যায় নেক সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওই ফেরেশতাই হযরত লূত (আ.)-এর বস্তিতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন। ফেরেশতার প্রথম কাজটি ছিল, اَنَّهُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -এর বাস্তব প্রদর্শনী। আর দ্বিতীয়টি ছিল عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -এর বাস্তব প্রদর্শনী। এভাবে এ দু'টি বাক্য পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে তাকালে সেগুলোর স্বতন্ত্র অবস্থানও পরিলক্ষিত হয়।[৩৮৪]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভবিষ্যদ্বাণী : قرآن کریم کی پیشگی خبری

প্রকাশ থাকে যে মহান আল্লাহ পাকের চিরাচরিত নিয়ম যে, তিনি যখন কাউকে নিজের মনোনীত পয়গাম্বর বানিয়ে প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করেন, তখন মানুষের নিকট তা আল্লাহ তা'আলার কালাম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এতে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু ঘটনার অগ্রিম সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও জ্যোতিষীদের পক্ষ হতেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। কিন্তু প্রথমতঃ তা বিশ্বাসযোগ্যই নয়।

তাই তো বড় থেকে বড় কোনো জ্যোতির্বিদ কখনো এ দাবী করতে পারেনি যে, তার প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে এবং কখনো কোনো ভুল হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এটাও মহান আল্লাহ তা'আলার নিয়ম যে, যদি কোনো ব্যক্তি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীর সাথে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, তখন তা বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হয় না। পবিত্র কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার সাথে বিশটি অগ্রিম সংবাদ প্রদান করেছে। যার প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণভাবে সঠিক বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ইসলামের বড় থেকে বড় কোনো শত্রুও যেগুলোকে অস্বীকার করতে পারেনি। এখানে ওই সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী তো বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে উদাহরণস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে–

রোমানদের বিজয় : رومیوں کی فتح

নবীজী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নবুওয়াত লাভের পর মক্কা মোকাররমায় তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং মক্কার মুশরিকরা তাঁকে নানাভাবে

---

৩৮৪. এখানে আমরা কুরআনুল কারীমের অলৌকিকত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত করলাম। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, হযরত মাওলানা রহমাতুলাহ কেরানভী (রহ.) রচিত [অধম লেখক কর্তৃক সম্পাদিত] "বাইবেল ছে কুরআন তক" ২/৩৫৭, আরো দেখুন, আলামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) রচিত "ই'জাযুল কুরআন"।

সূচিপত্র

কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক ওই সময়ে পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। ওই যুদ্ধে পারস্য বা ইরানী সৈন্যরা একের পর এক রোমানদের উপর বিজয় লাভ করতে থাকে। রোমানদের পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছিল। আর ইরানী সৈন্যরা সিরিয়ার বড় বড় শহরগুলোতে লুটতরাজ করতে করতে স্রোতের গতিতে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল।

রোমানরা পাল্টা আক্রমণ করা তো দূরের কথা; বরং তাদের শাসনব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ভেঙ্গে পড়া, একের পর এক পরাজয় এবং জান-মালের অপূরণীয় ক্ষতির কারণে তারা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, কোথাও পা জমানোই তাদের জন্য মুশকিল হয়ে পড়েছিল। রোমানদের এই শোচনীয় অবস্থা আরবের কাফেরদের জন্য ছিল আনন্দের কারণ। কেননা তারা ইরানীদেরকে অগ্নিপূজক হবার কারণে নিজেদের সাদৃশ্য আর রোমানদেরকে আহলে কিতাব হবার কারণে মুসলমানদের সাদৃশ্য মনে করতো এবং ইরানীদের বিজয় তাদের কাছে নিজেদের বিজয় এবং মুসলমানদের পরাজয়ের ন্যায় ছিল। এমতাবস্থায় সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো–

الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'নিকটস্থ ভূমিতে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে কয়েক (তিন থেকে নয়) বছরের মধ্যেই; (কোন্ কাজ হবে) আগে ও (কোন্ কাজ হবে) পরে সে ফয়সালা আল্লাহরই। সেদিন মু'মিনরা আনন্দ করবে। (সে বিজয় অর্জিত হবে) আল্লাহর সাহায্যে। যাকে ইচ্ছে তিনি সাহায্য করেন, তিনি মহাপরাক্রমশালী, বড়ই দয়ালু।এটা আল্লাহর ও'য়াদা, আল্লাহ তাঁর ও'য়াদার ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।'[৩৮৫]

যারা রোম ও পারস্যের যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিল, তাদের জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী অকাট্যভাবে অবিশ্বাসযোগ্য ছিল। তাইতো কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বাজি ধরে বসল যে, 'যদি আগামী তিন বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয় তাহলে আমি তোমাকে দশটি উষ্ট্রী প্রদান করব। আর যদি বিজয় লাভ করতে না পারে তাহলে তুমি আমাকে দশটি উষ্ট্রী প্রদান করবে।'

---

৩৮৫. (সূরা রোম : ১-৬)

সূচিপত্র

ওই সময় এ ধরনের বাজি বা চুক্তি বৈধ ছিল। এ জন্য হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই চুক্তি মঞ্জুর করে নিলেন এবং এ ব্যাপারে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অবগত করলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কুরআন তো بضع سنين (কয়েক বছর) বলেছে। আর আরবীতে بضع বা "কয়েক বছর" বলতে তিন বছর থেকে নয় বছর পর্যন্ত সময়কালকে বুঝায়। তাই তুমি উবাই ইবনে খালফের সাথে উষ্ট্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে শর্তের সীমা নয় বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করে নাও। তখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উবাই ইবনে খালফের সাথে চুক্তির মেয়াদ নয় বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করে একশত উষ্ট্রীর শর্ত আরোপ করে নিলেন।

যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় তা বাস্তবায়িত হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। বরং এ চুক্তির পরেও ইরানী বাহিনী বিজয় নিশানা উড়িয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। এমনকি তারা রোমানদের রাষ্ট্রীয় প্রধান কার্যালয় কন্‌স্টানটিনোপল (ইস্তাম্বুল)-এর দুয়ারে গিয়ে পৌছল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইডর গিবন এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেন- যে, সে সময়ে যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কোনো ভবিষ্যৎ খবর ধারণার এত বহির্ভূত হতে পারত না, কেন না হিরাক্লিয়াসে প্রথম বারো বছর রোম বাদশাহীর অবসানের ঘোষণা করা হচ্ছিল।

কিন্তু তার প্রথম পরাজয়ে ঠিক সাত বছর পর রোমের বাদশাহ বায়সার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কন্সটান্টিনোপোল থেকে বের হলেন এবং তার সেনাবাহিনী ইরানিদের ওপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করে তাদেরকে বহুস্থানে পরাজিত করেন এবং তারপর রোমক বাহিনী প্রত্যেকটি স্থানে বিজয় লাভ করতে ছিল।

এ দিকে সে সময়ে মুসলমানদের একটি বৃহৎ দল হিজরত করে মদীনা তৈয়েবায় পৌছে ছিলেন এবং মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং যখন 'বদর' প্রান্তরে মাত্র তিন শ তেরজন প্রায় নিরস্ত্র মুসলমান এক হাজার বর্ম পরিহিত সশস্ত্র সেনাবাহিনী পিছু হটাতে ঠিক সেই সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, রোমক বাহিনী ইরানিদের পরাজিত করে পর্যুদস্ত করেছে। তখন প্রকাশ পেল যে, কুরআন কারীম রোমকদের বিজয়ের সংবাদ দেওয়ার সাথে যে বলেছিল-

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ

মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ : فتح مکہ کی خبر

যে সময়ে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কার কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা মোকাররমা থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং 'সওর' পর্বতের গুহায় তিন দিন অবস্থান করার পর পবিত্র মদীনার পথ ধরে 'যুহ্‌ফা'

সূচিপত্র

নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন, তখন সেখান থেকে মক্কার দিকে যাওয়ার পথটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। স্বভাবগতভাবেই মাতৃভূমির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। আর জন্মভূমিকে ত্যাগ করার চিন্তায় খুব আফসোস করলেন। ওই মুহূর্তে পবিত্র কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হলো–[৩৮৬]

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

'যে মহান সত্ত্বা আপনার প্রতি কুরআন (-এর বিধি-বিধান) ফরয করেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে পুনরায় এখানে প্রত্যাবর্তন করাবেন।'

ওই সময়ে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে অসহায় ও পাথেয় বিহীন অবস্থায় মক্কা মোকাররমা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যিকভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর পরেই তিনি বিজয়ী বেশে ওই মক্কা শহরে প্রবেশ করেন। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হলো।

ইহুদীদের মৃত্যু কামনা : یہودیوں کی تمنائے موت

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ইহুদীরা বলে বেড়াতো, "পরকালের সফলতা শান্তি শুধু ইহুদীদের জন্য নির্ধারিত। আর আমরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবো।" তাদের এ কথার প্রতিউত্তর পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (94) لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95)

'বল, 'যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্যলোক ছাড়া কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক' ।কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কক্ষনো তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুবই অবহিত।'[৩৮৭]

এই চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র মদীনার সেই পরিবেশে ঘোষণা করা হচ্ছিল যেখানে এলাকার পর এলাকা ইহুদীদের আবাস ছিল। দিন-রাত মুসলমানদের সাথে তাদের তর্ক-বিতর্ক ও বচসা লেগেই থাকতো। যদি এই চ্যালেঞ্জ ওহীর মাধ্যমে করা না হতো, তাহলে যে ইহুদীরা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিল না, তারা অতি সহজেই প্রকাশ্যভাবে মৃত্যু কামনা করে দেখাতে পারতো।

---

৩৮৬. সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে "জামউল ফাওয়াইদ" : ৩/১০৭
৩৮৭. সূরা বাকারা : ৯৪-৯৫

সূচিপত্র

আর এভাবে দিন-রাত যে বাক-বিতন্ডা ও বচসা লেগে থাকতো, মুহূর্তের মধ্যেই তার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর ইহুদীদের কলিজা শুকিয়ে গেল এবং একজন ব্যক্তিও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য সামনে অগ্রসর হলো না।

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত ও রিসালতের ব্যাপারে অমুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমনই হোক, কিন্তু তাঁর কোনো শত্রুও এ ব্যাপারটি অস্বীকার করেনি যে, তিনি বিবেক, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি শক্তি ও দূরদর্শিতার দিক থেকে একজন উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এখন এ কথা একজন সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ থেকেও এই আশা করা যায় না যে, সে দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা ছাড়া এমন কোনো চ্যালেঞ্জ বা ভবিষ্যদ্বাণী করে যাবে, যা তার প্রতিপক্ষের লোকেরা এক মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হবে। তাহলে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় বিবেক, প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের পক্ষ হতে এই চ্যালেঞ্জ ওহীর দিক-নির্দেশনা ব্যতীত সম্ভবই ছিল না।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণ ঃ قرآن کریم کی حفاظت

পবিত্র কুরআনুল কারীমের পূর্বে যে সকল আসমানী কিতাব বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের উপর নাযিল করা হয়েছে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ হতে সেগুলোর সংরক্ষণের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না। আর তাই তো সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকেনি।

মুসলমানদের তো এই শুভ বিশ্বাস যে, বর্তমানে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুরের নামে যেসব কিতাবে প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে, তা কখনো অবিকল ওই কিতাব নয়, যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। বরং এগুলোতে বহু হের-ফের ও বিকৃতি সাধিত হয়েছে।[৩৮৮] বরং স্বয়ং আহলে কিতাব সম্প্রদায়ও এই হাকীকতকে স্বীকার করতে বাধ্য। কট্টর থেকে কট্টরপন্থী কোনো ইহুদী বা খ্রিস্টানও এই দাবী করতে পারে না যে, তাদের (বর্তমান) কিতাবের প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এবং সেগুলোর কোথাও কোনো ভুল বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনুল কারীম নিজের ব্যাপারে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'নিশ্চয়ই আমিই এই কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।'

---

৩৮৮. এর বিস্তারিত ও অনস্বীকার্য দলীলের জন্য দেখুন : মাওলানা রহমাতুল্লাহ কেরানভী (রহ.) রচিত এবং অধম [গ্রন্থকার] কর্তৃক সম্পাদিত "কুরআন ছে বাইবেল তক"।

সূচিপত্র

এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। চৌদ্দশত বছরের এই দীর্ঘ সময়ে পবিত্র কুরআনুল মাজীদের কোনো নুকতা বা বিন্দুও বিনষ্ট হয়নি। আর না এতে বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনো অপচেষ্টা সফল হয়েছে। ইসলাম সর্বদাই বিরোধীতা ও শত্রুতার বেষ্টনীতে ছিল এবং শত্রুরা এটাকে পরাস্ত করার অপচেষ্টায় কোনো ধরনের কার্পণ্য করেনি।

কিন্তু ওই যুগেও কোনো শত্রু পবিত্র কুরআনুল কারীমকে নিশ্চিহ্ন, বিনষ্ট বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অপচেষ্টায় সফল হতে পারেনি। যখন পবিত্র কুরআনের কপি সংখ্যা ছিল একেবারেই সীমিত এবং প্রচার ও প্রকাশনার উপকরণও ছিল অনুপস্থিত। আর তাওরাতের অবস্থা দেখুন, বাবেলের বাদশা বুখতে নসর কীভাবে নিপীড়ন চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করেছিল?[৩৮৯]

বনী ইসরাঈলের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উযাইর (আ.) ব্যতীত কারো তাওরাত মুখস্ত ছিল না। তাই সমস্ত কপি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা নিজেদের স্মৃতিতে রক্ষিত তাওরাত পুনরায় লিপিবদ্ধ করিয়ে নেয়। অতঃপর রোম সম্রাট আনিতুকাস্ নিজের শক্তিমত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। স্বয়ং বনী ইসরাঈলের বর্ণনা অনুযায়ী সে তাওরাতের এক একটি করে সবকটি কপি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। এমনকি একটি কপিও অবশিষ্ট ছিল না।[৩৯০]

অনুরূপভাবে ইঞ্জিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কিভাবে রোমান বাদশাহ তীতূস, শাহ নীরূন, ডুমিশীন ও ডিউক্ল্যাশনের আক্রমণে এর আসল কপিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের অবস্থা হলো এই যে, শত-সহস্র আক্রমণকারীর সম্মুখীন হয়, বহু স্থানে মুসলমানদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তাদের গ্রন্থাগারগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং পুরাতন গ্রন্থাদীর বিশাল সংগ্রহ ভান্ডার সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কারামেতা বা শিয়া সম্প্রদায়ের মহা প্লাবন সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে তছনছ করে দেয় এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টায় তারা কোনো কার্পণ্য করেনি। কিন্তু মহা গ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনো ধরনের বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই শুধু সংরক্ষিত নয়; বরং পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত তথা সারা বিশ্বে এর প্রচার ও প্রসারের গতি বেড়েই চলেছে। (আল্লাহ না করুন) যদি কথার কথা আজও পবিত্র কুরআন মাজীদের লিখিত সমস্ত কপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে লক্ষ লক্ষ তাওহীদী

---

৩৮৯. দেখুন, ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা : ৩/৫০১, প্রবন্ধ বাইবেল।

৩৯০. দেখুন : বাইবেল, নাকিছ ওয়ারযন মীকমেলন, লন্ডন, ১৯৬৩ ঈ. মুকাবিউ কী পহ্লী কিতাব : ১/৫৯

সূচিপত্র

মানব সন্তানের স্মৃতিশক্তি এর পরিপূর্ণ আমানতদার। কেউ যদি পবিত্র কুরআনুল কারীমের একটি শব্দও পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে মুসলমানদের ছোট্ট শিশুরাও তাকে ধরে ফেলতে পারে।

অতঃপর পবিত্র কুরআন মাজীদের শুধু শব্দরাজিই নয়; বরং অর্থ ও তাফসীর সংরক্ষণের যে ব্যবস্থাপনা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে করা হয়েছে, তা স্বয়ং স্বতন্ত্র একটি ইতিহাস। যেমন সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রত্যেক ভাষায় অর্থের আলোকে শব্দমালার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ ইবরানী, সুরইয়ানী ও কালদানী ইত্যাদি ভাষা ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথবা সেগুলোতে এমন আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে, তা আজ নতুন এক ভাষায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভাষাকে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এমন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছেন যে, হাজারো বিপ্লব, উত্থান-পতন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়া সত্ত্বেও তা পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি জানতে চায় যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের অমুক শব্দটি সেই যুগে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হতো? তাহলে অতি সহজেই সে তা জানতে সক্ষম।

আরবী ভাষাকে কি অসাধারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে? নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তার কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। ইয়ামেনের প্রসিদ্ধ শহর 'যারায়েব'-এর কোল ঘেঁষে 'উকাজ' নামক দু'টি পাহাড় ছিল। পাহাড় দু'টিতে বসবাসকারীরা এই সংকল্প করে নিয়েছিল যে, নিজেদের বসতি এলাকার বাইরে কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না এবং এলাকা ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবে না। এমনকি বাইরের কোনো ব্যক্তিও তাদের এখানে তিন দিনের চেয়ে বেশি অবস্থান করতে পারতো না। এ সবের কারণ ছিল একটাই যে, তারা মনে করতো যদি বাইরের লোকজনের সাথে আমাদের মেলামেশা বেড়ে যায়, তাহলে আমাদের বিশুদ্ধ আরবী ভাষা বিকৃত হয়ে যাবে। তারা নিজেদের এই নিয়ম-নীতিকে কঠোরভাবে পালন করতো। ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, এটিই একমাত্র গ্রুপ, যাদের আরবী ভাষা একেবারে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়্যাত যুগের ভাষা এবং তাতে এক চুল পরিমাণও পার্থক্য সাধিক হয়নি।[৩৯১]

আসল কথা হলো, পবিত্র কুরআন মাজীদ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই কিতাব সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে এবং স্বয়ং

---

৩৯১. ইয়াকুব হামাভী (রহ.) রচিত : "মু'জামুল বুলদান" : ৪/১৪৩, বৈরত ১৩৭৬ হিজরী।

সূচিপত্র

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সংরক্ষণ করবেন, এর সত্যতা দিন দিন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

এখানে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী সমবেত করা নয়; বরং শুধু কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর এই কয়েকটি উদাহরণ থেকেই এ কথাটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ যে ভবিষ্যদ্বাণী বা অগ্রিম সংবাদ প্রদান করেছিল, সেগুলো এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মধ্যে মানবিক শক্তির বিন্দুমাত্র কোনো দখল নেই।

পবিত্র কুরআন মাজীদের তথ্য উন্মোচন ঃ قرآن کریم کے انکشافات

প্রকাশ থাকে যে, ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও পবিত্র কুরআনুল কারীম ইলমী ও ঐতিহাসিক এমন বহু তথ্য উন্মোচন করেছে, যা ওই যুগে শুধু 'অজ্ঞাত' ছিল, এমনটি নয়; বরং ওই সময় সেগুলোর কল্পনাও করা যেত না। যদি পবিত্র কুরআন মাজীদের এ ধরনের আয়াতগুলো একত্রিত করে সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিণত হতে পারে। এখানে সেসব আয়াতের সবগুলোর আলোচনা তো সম্ভব নয়। তবে এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

১. পবিত্র কুরআনুল কারীম বর্ণনা করেছে যে, যখন ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছিল তখন সে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92)

"এখন (ঈমান আনছ), আগে তো অমান্য করেছ আর ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত থেকেছ। আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।' অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে নিশ্চিতই উদাসীন।"[৩৯২]

যে সময় এই আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন এবং তারপর থেকে শতাব্দী কাল পর্যন্ত কারো জানা ছিল না যে, ফেরাউনের মৃতদেহ এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এখন থেকে মাত্র কয়েক যুগ পূর্বে এই

---

[৩৯২] . সূরা ইউনুস : ৯১-৯২

সূচিপত্র

মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং আজও তা মিসরের রাজধানী কায়রো জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

২. পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'আর আমি প্রত্যেক বস্তু থেকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।' [৩৯৩]

এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখন কল্পনা ছিল যে, নারী ও পুরুষের জোড়া তো শুধু মানুষ অথবা প্রাণী জগতের মধ্যেই হয়ে থাকে। অথবা কিছু উদ্ভিদ জগতেও হয়ে থাকে। কিন্তু সাইন্স বা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এই কুরআনী তত্ত্ব ও সুস্পষ্ট হতে লাগল যে, নারী ও পুরুষ সব জিনিসের মাঝেই বিদ্যমান। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, কোথাও সে জোড়ার নামকরণ করা হয়, নারী-পুরুষ। আবার কোথাও নামকরণ করা হয়, পজেটিভ (Positive) ও নেগেটিভ (Negative)। আবার কোথাও ইলেকট্রন ও প্রোটন। আবার কোথাও নিউট্রন ও পজিট্রন ইত্যাদি। বরং এক আয়াতে পবিত্র কুরআন মাজীদ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছে যে, অনেক জিনিসের মাঝে জোড়া খুঁজে পাওয়া এখনো মানুষের অজানা রয়ে গেছে।

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36)

'পূত পবিত্র সেই সত্তা যিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটির যা উৎপন্ন করে যমীন, আর তাদের নিজেদের ভিতরেও আর সে সবেও যা তারা জানে না।' [৩৯৪]

حقانیت قرآن اور مغرب کے غیر مسلم مصنفین

কুরআনের সত্যতা ও পশ্চিমা অমুসলিম লেখকবৃন্দের স্বীকারুক্তিঃ

একটা যুগ ছিল যখন পশ্চিমা লেখকরা খ্রিস্টানদের কঠোর পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে প্রকাশ্য-খোলামেলাভাবে বলতো যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম [নাঊযুবিল্লাহ] রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মস্তিষ্ক-প্রসূত রচনা। কিন্তু বর্তমানে স্বয়ং পশ্চাত্যের অমুসলিম-লেখকদের বক্তব্য হলো যে, পূর্বের পশ্চাত্য লেখকদের (কুরআনের ব্যাপারে) এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিছক এক শত্রুরা-প্রসূত দাবী, যার স্বপক্ষে কোনো দলীল ছিল না এবং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুরো জীবন ব্যবস্থা তাদের এই দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রফেসর মন্টেগুমরী ওয়াট লিখেন–

---

৩৯৩. যারিআত : ৪৯

৩৯৪. সূরা ইয়াসীন : ৩৬

সূচিপত্র

"মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই ধারণাকে ব্যাপক করা হয়েছিল যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন (নাঊযুবিল্লাহ) মিথ্যা নবী ছিলেন। যিনি ভুলবশতঃ এই দাবী করতেন যে, তাঁর নিকট আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ হতে ওহী নাযিল হয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় এই ধারণা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধজনিত প্রোপাগান্ডা ছিল। যা আজ ধীরে ধীরে ইউরোপ ও খ্রিস্টজগতের মাথা থেকে বেরিয়ে আসছে।"[৩৯৫]

প্রফেসর ওয়াট সত্যিই বলেছেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এই মিথ্যারোপ কোনো তথ্যভিত্তিক দলীলের উপর ভিত্তি করে ছিল না। বরং তা ছিল প্রোপাগান্ডারই একটি অংশ।

মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্য যেটা আবশ্যক মনে করা হচ্ছিল। তারা (বর্তমান লেখকরা) বিশদ বর্ণনার সাথে সেসব ইউরোপীয়দের প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি (নাঊযুবিল্লাহ) মিথ্যা দাবী অথবা উন্মাদনা বা কোনো অসুস্থতার অপবাদ আরোপ করতো। তারা বলেছে যে, বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য লেখকদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল থাকার কারণে তারা সেসব অপবাদকে মেনে নিচ্ছে না। পরিশেষে তিনি লিখেন–

"অতএব, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে মধ্যযুগীয় এই ধ্যান-ধারণাকে তো এখন আলোচনার অযোগ্য মনে করা উচিত এবং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন এক ব্যক্তি মনে করা উচিত, যিনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও সৎ উদ্দেশ্যে মানুষকে ওই সব পয়গাম (ওহী) শোনতেন। যার ব্যাপারে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এগুলো মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর নিকট ওহী হিসেবে এসেছে।"[৩৯৬]

এই স্বীকারোক্তির পর ইনসাফের দাবী তো এটাই ছিল যে, পরিষ্কার ভাষায় দু'জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত ও রেসালতের স্বীকৃতি প্রদান করবে। কিন্তু শতাব্দীকাল থেকে মস্তিষ্কে ঝেঁকে বসা ভ্রান্ত ধারণাগুলো তো এত সহজেই মিটবার নয়। তাইতো মন্টেগুমরী ওয়াট এবং তার মতো অন্যান্য লেখকরাও এক দিকে তো এই স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের নবুওয়াতের দাবীতে নিষ্ঠাবান ছিলেন। অপর দিকে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে নিজেদের মাযহাব ও মতাদর্শকে ত্যাগ করে ইসলামের ছায়া তলে আসাও তাদের জন্য মুশকিল ব্যাপার। তাই তারা মধ্যবর্তী একটি পথ বেছে নেওয়ার জন্য নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের দাবীর এক আশ্চর্য ও অভিনব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে।

তাদের বক্তব্য হলো, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী মূলত বাহ্যিক ও বাস্তবিক কোনো বিষয় ছিল না। বরং (নাঊযুবিল্লাহ) এটা ছিল

---

৩৯৫. Watt : Bell's Interoduction to the Quran Ch. 2 P. 17.

৩৯৬. Watt : Bell's Interoduction to the Quran Ch. 2 P. 18

সূচিপত্র

ভেতরগত ও আধ্যাত্মিক একটি অবস্থা। যা তাঁর দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা ও সাধনার ফলে সৃষ্টি হতো। আর তিনি অত্যন্ত সততার সাথে এটাকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বা কোনো ফেরেশতার আওয়াজ মনে করতেন।

তিনি তাঁর শৈশবকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের মাযহাব ও মতাদর্শ থেকে বিমুখ ছিলেন। তাই তিনি তাদের নিয়ম অনুযায়ী ইবাদত করার পরিবর্তে নির্জনে একাকী গভীর চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যানমগ্নে লিপ্ত থাকতেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতার কারণে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হতো এবং তিনি তাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার পথ খুঁজতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি হেরা গুহার নির্জনে এক নাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত কাটাতে শুরু করলেন। ওই দীর্ঘ চিন্তা-ফিকির ও সাধনার ফলে তাওহীদী আকীদার উপর তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়। সাথে সাথে এই আগ্রহও জাগ্রত হয় যে, এই সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজার গোমরাহী থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা উচিত। হেরা পর্বতের ওই নির্জন-নিস্তব্ধতায়– যেখানে কথা বলার মতো কেউ ছিল না– এই ধারণাগুলো তাঁর মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, অন্তরের এই উপলব্ধিকে তাঁর কাছে বাহ্যিক ও বাস্তব আওয়াজ মনে হতে লাগল। আর সেটাকেই তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বা কোনো ফেরেশতার আওয়াজ মনে করে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে নবুওয়াতের দাবী করে বসলেন!

এই হলো দু'জাহানের সর্দার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এ নবুওয়াতের দাবীর সেই ব্যাখ্যা, যা বর্তমানে "পশ্চিমা বিজ্ঞজনদের মাঝে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পশ্চাত্যের পন্ডিতদের মধ্যে এক-দু জন নয়; বরং বিশজন গবেষক এর প্রবক্তা। এমনকি মুসলমান নামধারী অনেক ব্যক্তিকেও এতে প্রভাবান্বিত হতে দেখা যায়।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এই ব্যাখ্যার পেছনে এ ছাড়া আর কি মানসিকতা কাজ করছে যে, ওই পন্ডিতরা আগ থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চাই তার স্বপক্ষে যত উজ্জ্বল দলীলই থাকুক না কেন। আর চাই ওই নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যতই দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য ও অবিশ্বাসযোগ্য জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হোক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, প্রফেসর ওয়াট ও বর্তমান যুগের অন্যান্য পশ্চাত্য পন্ডিতগণ রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাযিলকৃত ওহীর যে ব্যাখ্যা করেছেন এর তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর কোনো জবাব দিতেও লজ্জাবোধ হয়। তথাপি নিম্নোক্ত বাস্তব তথ্যগুলোর উপর চিন্তা করুন।

সূচিপত্র

১. দু'জাহানের সর্দার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে তাদেরই স্বীকারোক্তি হলো যে, তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মেধা ও বাস্তব কর্মপন্থার যোগ্যতায় টইটুম্বুর ব্যক্তিত্ব। তাহলে তাঁর ব্যাপারে এই উদ্ভট কথা কিভাবে বিবেক মেনে নিতে পারে যে, তিনি দীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে নিজের ভেতরের আধ্যাত্মিক একটি অবস্থাকে কোনো ফেরেশতার আওয়াজ মনে করতেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জানতেই পারেননি যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থার হাকীকত কি? তাঁর প্রতি এক-দুইবার ওহী অবতীর্ণ হয়নি। বরং দীর্ঘ তেইশ বছরে শত-সহস্র বার ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে কি তিনি এই পুরোটা সময় (মা'আযালাহ) এ ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন?

২. অতঃপর যদি তাঁর উপর তথাকথিত এই "আধ্যাত্মিক অবস্থা" স্বীয় সম্প্রদায়কে দেখে প্রকাশ পেত, তাহলে সূত্রানুযায়ী দাবী এটাই ছিল যে, এই আধ্যাত্মিক অবস্থার সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতায় তাদের ভ্রষ্টতার প্রত্যাখ্যান ও তাওহীদী আকীদার বর্ণনা করা। কিন্তু আমরা তো দেখতে পাই যে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া প্রথম ওহীতে কুফর-শিরিকের প্রত্যাখ্যানমূলক কোনো কথা নেই। নেই তাওহীদী আকীদার আলোচনাও। আর না আছে তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য হতে কোনো শিক্ষার আলোচনা। বরং এর পরিবর্তে নিম্নোক্ত আয়াতমালা দিয়ে ওহীর সূচনা হয়–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে ।পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে,শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।' [৩৯৭]

৩. অতঃপর এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, এই "আধ্যাত্মিক হালাত" বা ভেতরগত অবস্থা একবার সৃষ্টি হবার পর সঙ্গে সঙ্গে নিস্প্রভ হয়ে গেল এবং তিন বছর যাবৎ তিনি আর কোনো আওয়াজ শুনতে পেলেন না! এ দীর্ঘ সময় ওহী বন্ধ থাকার কারণে তিনি পেরেশানও থাকতেন। কিন্তু এই তিন বছর পুরোপুরি নিশ্চুপ থাকার পর যখন আবার ওহী অবতীর্ণ হতে শুরু করল, তখনও তাতে সুস্পষ্টভাবে শিরিকের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করা হলো না। আরবদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের ভ্রষ্টতার কোনো আলোচনাও করা হলো না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তাঁর এই আধ্যাত্মিক হালাত স্বীয় সম্প্রদায়কে গোমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তাওহীদের সাধনার প্রবলতার কারণেই হয়ে

---

৩৯৭ · সূরা আলাক : ১-৫

সূচিপত্র

থাকতো, তাহলে ওহীর সর্ব প্রথম ঘটনাবলীতে এ ধারণাগুলো কোথায় গেল? এবং তিন বৎসর যাবৎ ওই ধারণাগুলোর প্রবলতা কেন কোনো আওয়াজ শুনালো না?

৪. যদি এটা কোনো আধ্যাত্মিক হালাত বা ভেতরগত অবস্থা হতো তাহলে তা তো সম্পূর্ণরূপে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধ্যান-ধারণার সাথে মিলে যাওয়া উচিত ছিল। অথচ কুরআনুল কারীমের অনেক স্থানে তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার বিপরীত দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বরং কোনো কোনো স্থানে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতঃ এর উপর এক অম্ল-মধুর তিরস্কারও করা হয়েছে। যেমন–

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

"আমার প্রকৃত বান্দাহ্দের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না, তোমাকে যারা অনুসরণ করে সেই বিভ্রান্তরা ছাড়া।[৩৯৮]

(খ) সূরা আনফালের ৬৭ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে।

(গ) সূরা তাওবা'র ৪২নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ(43)

'আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। কারা সত্য বলেছে তা স্পষ্ট না হতেই আর মিথ্যাবাদীদেরকে তুমি না চিনেই কেন তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দিলে? এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে।'

৫. যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, কোনো চিন্তা-কল্পনার চরম প্রবলতা মানুষের কাছে "বাস্তব ধ্বনি"র ন্যায় অনুভূত হতে থাকে। তাহলে এর কি কারণ যে, এই "বাস্তব ধ্বনি" যে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, তা সর্বদা সত্যে পরিণত হয়? যে নির্দেশনা প্রদান করে তা অবশেষে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। যে শব্দমালা বলে দেয় তা এমন পাথরে খোদাই করা চিহ্নে পরিণত হয়ে যায় যে, সারা দুনিয়ার সাহিত্যিক ও বাগ্মি ভক্তরা এর মুকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে যায়! এমনকি এই কালামকে নিয়ে গোটা আরব উপদ্বীপে এমন আলোড়ন ও হৈ-চৈ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো নজির নেই।

---

৩৯৮. (সূরা হাজার, আয়াত-৪২)

সূচিপত্র

৬. যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, ধ্যান-ধারণার প্রবলতার কারণে অনুভূত ধ্বনির কোনো হাকীকত বা বাস্তবতা আছে। তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, তা ওই ব্যক্তিরই জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার একটি ছায়া-প্রতিচ্ছায়া হয়ে থাকে, যে তা শুনতে পায়। আর যে কথা পূর্ব থেকেই তার জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণায় থাকে না, তা ওই আওয়াজ দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু আপনি পবিত্র কুরআন মাজীদ পাঠ করে দেখুন যে, তাতে এমন বহু কথা রয়েছে, যা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জানা ছিল না। ওহীর বাণীই সর্ব প্রথম তাঁকে এর জ্ঞান দান করেছে। যেমন–

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

'তুমি জানতে না কিতাব কী, ঈমান কী, কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ ওয়াহী যোগে প্রেরিত কুরআনকে) করেছি আলো, যার সাহায্যে আমার বান্দাহদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে আমি সঠিক পথে পরিচালিত করি।' [৩৯৯]

৭. বিশেষ করে পূর্ববর্তী উম্মতদের অধিকাংশ ঘটনাবলী, যেগুলোর ব্যাপারে স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। আর ঐতিহাসিকভাবেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। পবিত্র কুরআনুল কারীমই সর্বপ্রথম তাঁকে এই জ্ঞান দান করেছে। যেমন, সূরা হুদে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا

'এ সব হল অদৃশ্যের খবর যা তোমাকে ওয়াহী দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছি, যা এর পূর্বে না তুমি জানতে, না তোমার জাতির লোকেরা জানত।' [৪০০]

অনুরূপভাবে সূরা ইউসুফের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে–

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102)

'অদৃশ্য জগতের খবর থেকে এটা তোমাকে ওয়াহী করে জানালাম। ষড়যন্ত্র করার সময় যখন তারা তাদের কাজে জোটবদ্ধ হয়েছিল তখন তুমি তো তাদের কাছে ছিলে না।' [৪০১]

এদিকে মন্টেগুমরী ওয়াট ও তার সহচররা এ কথা স্বীকার করেন যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। যেমন, স্বীয় রচনায় তিনি বলেন,

---

৩৯৯. ত্বরা : ৫২
৪০০. সূরা হুদ : ৪৯
৪০১. সূরা ইউসুফ : ১০২

"মুহাম্মদ (সা.)-এর আমানতদারী ও সচ্চরিত্রের উপর অভিযোগ করার কোনো অবকাশ নেই।"[৪০২]

সুতরাং তাদের মত অনুযায়ীও পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াতের ব্যাপারে ভুল বর্ণনা করা অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হলো, যদি এই "ওহী" বহিরাগত ও বাস্তবিক কোনো জ্ঞান লাভের মাধ্যম না হতো, তাহলে সেই ওহীর মাধ্যমে তিনি কি করে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সেসব ঘটনা জানতে পারলেন, যা পূর্বে তাঁর জানা ছিল না?

৮. উপরে আমরা শুধু ওই বিষয়গুলোই উল্লেখ করেছি, যা একজন সাধারণ মানুষও সামান্য চিন্তা-ফিকির করে বুঝতে পারে এবং যা এক নজরে পবিত্র কুরআন মাজীদের তেলাওয়াতের দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর যদি হাদীসের ওইসব রেওয়ায়েতকেও সামনে রাখা হয়, যেগুলোতে ওহী অবতরণের অবস্থা ও এর প্রাথমিক ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলে মন্টেগুমরী ওয়াট প্রমুখের ধারণা ও অনুমানভিত্তিক জটিল ব্যাখ্যাগুলো এমনিতেই বাতাসে উড়ে যায়। পূর্বে উল্লেখিত"কুরআন নাযিলের ইতিহাস" অধ্যায়ে এ ধরনের কিছু রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে।

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کتاب

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আহলে কিতাব ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো কোনো পাশ্চাত্য লেখক রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীকে মূলত তাঁর "আধ্যাত্মিক অবস্থা" হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের মতে ধ্যান ও চিন্তার প্রবলতার কারণে তা সৃষ্টি হতো। তারা এ কথাও সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে যে, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকেই রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ওই ঘটনাবলীই এই "বিশেষ অবস্থা"র সময় তাঁর যবান দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী (নাঊযুবিল্লাহ) আরবের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে বুহাইরা ও নাসতূরা নামক দু'জন পাদ্রীর নাম উল্লেখযোগ্য।[৪০৩] সিরিয়া সফরের সময় যাদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হওয়ার ঘটনা সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

---

৪০২. ডধঃঃ : ইবষষ'ং ওহঃবৎড়ফঁপঃরড়হ ঃড় ঃযব ছঁৎধহ ঈয. ২ চ. ২৫

403. wR. Gg iWI‡qj (J.m Rodwell) কর্তৃক অনূদিত ইংরেজি কুরআনের ভূমিকা, পৃ: ৭। লন্ডন : ১৯৫৩

সূচিপত্র

কোনো কোনো পাশ্চত্য লেখক এ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, এই পাদ্রী ছিলেন আরয়ূসী গ্রুপের মধ্য হতে। যারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। ওই পাদ্রীর কাছে থেকেই তিনি (নাঊযুবিল্লাহ) তাওহীদের ধারণা লাভ করেন! তার কাছ থেকেই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের জ্ঞান অর্জন করেন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত হন।

যদি ইনসাফ ও আমানতদারী পৃথিবী থেকে একেবারে ওঠে গিয়ে না থাকে, তাহলে একজন সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও এ কথা মেনে নিতে পারে না যে, সিরিয়া সফরকালে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের সাক্ষাতে ওই পাদ্রীরা নিজেদের বক্ষে সংরক্ষিত সম্পূর্ণ জ্ঞানভান্ডার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে উপুড় করে ঢেলে দিলেন। আর তিনি মুহূর্তের মধ্যে রাতারাতি সেগুলো চোষণ করে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক দ্বীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন! প্রথমতঃ এ কথা একেবারেই দলীল-প্রমাণহীন; বরং ভিত্তিহীন যে বুহাইরা ও নাসতূরা আরয়ূসী গ্রুপের মধ্য হতে ছিলেন।

কোনো দুর্বল থেকে দুর্বল বর্ণনায়ও এর কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আর কীভাবেই বা পাওয়া যাবে? যখন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই আরয়ূসী গ্রুপকে বিদ'আতী ও নাস্তিক (Heretic) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাদের নাম মুখে নেওয়াটাও ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এথানাসিউস (Athanasius) ও তার সহচররা এই গ্রুপটিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় কোনো অবহেলা করেনি। এই অসহায় বিলুপ্তপ্রায় গ্রুপটিতে এত শক্তি কোথায় ছিল যে, তারা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসে শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? যদি তাদের কোনো সন্তান-সন্ততিও বেঁচে থাকতো, তারও এই সাহস কীভাবে হতো যে, সে বসরার মতো শহরে একটি আস্তানার শুরু করে বসতো?

দ্বিতীয়তঃ যেসব বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ আছে যে, সিরিয়া সফরের প্রাক্কালে পাদ্রীদের সাথে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাত হয়েছে, সেখানে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রত্যাশিতভাবে এ সাক্ষাত ঘটেছিল। যার মধ্যে শেখা-শেখানোর কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। আশ্চর্য হই ওইসব লোকের বিবেকের উপর, যারা এ ধরনের হাস্যকর কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে পারে! অথচ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়া তাদের জন্য মুশকিল।

এখানে আমরা বুহাইরা পাদ্রীর সাথে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাত সংক্রান্ত সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি। যা দ্বারা মূল বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

সূচিপত্র

সুনানে তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু তালেব কুরাইশদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে মিলে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হলেন। সিরিয়া গিয়ে তিনি যেখানে অবতরণ করলেন সেখানে একজন রাহেব বা পাদ্রী থাকতেন। ইতিপূর্বেও তিনি এ পাদ্রীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু কখনো তিনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। এবার যখন এই ব্যবসায়ী কাফেলা সেখানে গিয়ে অবতরণ করল, তখন অস্বাভাবিকভাবে পাদ্রী নিজের খানকা থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এক এক করে সবাইকে দেখতে থাকলেন। এভাবে এক পর্যায়ে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাত ধরে ফেললেন। তারপর বললেন–

هَذَا سَيِّدُ الْعَلَمِيْنَ. هَذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. يُبْعَثُهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

'তিনি সমস্ত জাহানের সর্দার। ইনি হলেন, সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। যাকে সমগ্র জাহানের জন্য রহমত করে পাঠানো হয়েছে।'

কুরাইশের নেতারা পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিভাবে তা জানতে পারলেন? জবাবে পাদ্রী বললেন, 'আপনারা সবাই যখন উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তখন কোনো বৃক্ষলতা ও পাথর এমন ছিল না, যা তাঁকে সিজদা করেনি। আর বৃক্ষলতা ও পাথর একমাত্র নবীর জন্যই সিজদা করতে পারে। এতদ্ব্যতীত মোহরে নবুওয়াত দ্বারাও আমি তাঁকে চিনতে পারছি। যা আপেলের ন্যায় তাঁর স্কন্ধের নীচে রয়েছে।'

এ কথাগুলো বলে পাদ্রী নিজের খানকায় ফিরে গেলেন এবং পুরো কাফেলার জন্য সৌজন্য ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। সবাই যখন খাওয়ার জন্য উপস্থিত হলো, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন উপস্থিত ছিলেন না। পাদ্রী জিজ্ঞাসা করল, তিনি (মুহাম্মদ) কোথায়? জানা গেল, তিনি উট চরাতে গিয়েছেন। লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডাকা হলো। তিনি যখন উপস্থিত হলেন, তখন এক খণ্ড মেঘমালা তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছিল। তিনি যখন নিজের সম্প্রদায়ের নিকটে পৌঁছলেন তখন দেখলেন যে, লোকেরা তাঁর পূর্বেই বৃক্ষের নিচে স্থান দখল করে নিয়েছে। এখন আর ছায়াদার কোনো স্থান বাকি নেই। তিনি এক পাশে বসে পড়লেন। বসতেই বৃক্ষের ছায়া তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ল।

তখন পাদ্রী বললেন, দেখ! বৃক্ষের ছায়া কীভাবে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে? তারপর দাঁড়িয়ে কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা তাঁকে রোমের দিকে নিয়ে যাবেন না।

সূচিপত্র

রোমানরা যদি তাঁকে দেখে, তাহলে তাঁর গুণাগুণ ও লক্ষণাদি দ্বারা নববী পরিচয় পেয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কথা বলতে বলতেই পাদ্রীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সাতজন রোমানের উপর। যারা কারো খোজে এদিকে আসছিল। পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেন বেরিয়ে এসেছ? রোমানরা বলল, আমরা সেই নবীর সন্ধানে বের হয়েছি, (তাওরাত ও ইঞ্জিলে যার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে) যিনি এ মাসে সফরে বের হওয়ার কথা রয়েছে। আমরা সবদিকে আমাদের লোক পাঠিয়েছি।

পাদ্রী বলল, আচ্ছা বল তো দেখি, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যা করার ইচ্ছা করেছেন, তা কি কেউ পরিবর্তন করতে পারে? তারা বলল, না। এরপর রোমানরা পাদ্রীর সাথে ওয়াদা করল যে, তারা এখন থেকে আর ওই নবীর পিছু করবে না এবং তারা সেখানেই পাদ্রীর কাছে থেকে গেল। এরপর পাদ্রী কুরাইশদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্য হতে তাঁর (মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম))-এর অভিভাবক কে? লোকেরা বলল, আবু তালেব। তারপর পাদ্রী একের পর এক কসম দিয়ে আবু তালেবকে বলল, তুমি অবশ্যই তাঁকে ফেরত পাঠাও। এমনকি আবু তালেব তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[৪০৪]

এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হবার ব্যাপারে কোনো কোনো আলেমের আপত্তি রয়েছে।[৪০৫] কিন্তু যদি বর্ণনাটি বিশুদ্ধও হয়ে থাকে তবুও তার মধ্যে দূরবীন লাগিয়ে দেখলেও এমন কোনো কথার সম্ভাবনাও নজরে আসবে না যে, তিনি বুহাইরা পাদ্রীর কাছ থেকে কিছু ঘটনাবলী শিখে নিয়েছেন।

এটা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সাক্ষাৎ। যা কয়েক ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। উপরন্তু এই সাক্ষাতটিও ওই সময়ে হয়েছে যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বার কিংবা তের বৎসর।[৪০৬] কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ কি এ কথা মেনে নিতে পারে যে, এত অল্প বয়সে মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত তাঁকে পূর্ববর্তী উম্মতদের এমন গভীর জ্ঞান দান করেছে যে, তিনি আহলে কিতাবদের চ্যালেঞ্জ করে তাদের কিতাবের বিকৃতির বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেছেন!

---

৪০৪. "নবী স.-এর নবুওয়াত লাভ" শীর্ষক অধ্যায় : ২/২২৫: জামে' তিরমিযী

৪০৫. যেমন হাফেয যাহাবী (রহ.) এ বর্ণনাকে অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করে লিখেন– ... (তালখীসুল মুসতাদরাক, কিতাবুত তারীখ, দালাইলুন নবুওয়্যাত : ২/৬১৫)। কিন্তু ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) প্রমুখ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন– ...। (শরহুল মাওয়াহিব : ১/১৯৬)

৪০৬. এ সফরের ব্যাপারে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটিতে তাঁর বয়স সর্বসাকুল্যে নয় বছর বর্ণনা করা হয়েছে। আলামা হালবী (রহ.) এ বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (আস-সীরাতুল হালবীয়্যাহ, মুস্তফা আল-হালবী : ১৩৪৯ হিজরী। আর হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.) : 'তের বছর' বিষয়ক বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আলামা যুরকানী (রহ.) বলেন যে, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের এই মতের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন যে, তাঁর বয়স ছিল বার বৎসর। (শরহে মাওয়াহিব : ১/১৯৩)

সূচিপত্র

আর নাসতূরা পাদ্রীর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা তো বুহাইরা পাদ্রীর ঘটনার চেয়েও বেশি সংক্ষিপ্ত। যদি কোনো ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতগুলোর উপর ভিত্তি করে এ কথা বলে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহলে কিতাবদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাহলে এটাকে চরম পক্ষপাতিত্ব ও ইসলামের সাথে শত্রুতা ব্যতীত এর আর কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ভাবার বিষয় হচ্ছে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি আহলে কিতাবদের কাছ থেকে এই ঘটনাগুলো শুনেই থাকতেন, তাহলে মক্কার কাফের সম্প্রদায়, যারা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সরিষাকে পাহাড় বানানোর জন্য প্রস্তুত থাকতো– তারা ওই সময় কেন নিশ্চুপ থাকল? তারা এই দাবী কেন করল না যে, আপনাকে তো অমুক অমুক আহলে কিতাব এই কথাগুলো শিখিয়েছে। অবশেষে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি কখনো কখনো মক্কা মোকাররমার কোনো কামারের নিকট দাঁড়িয়ে যেতেন, তাহলে শুধু এটুকু বিষয়ের কারণেই মক্কার কাফেররা এ কথা প্রচার করতো যে, এই কামার হচ্ছে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষক। যার প্রত্যাখ্যান পবিত্র কুরআনুল কারীমে এভাবে করেছে–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

'আমি জানি, তারা বলে, 'এক মানুষ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.)-কে) শিখিয়ে দেয়।' অথচ দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তারা যে লোকটির কথা বলছে তার ভাষা তো অনারব, অপরপক্ষে কুরআনের ভাষা হল স্পষ্ট আরবী।'[৪০৭]

কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেউ কখনো এই অভিযোগ উত্থাপন করেনি যে, তিনি এই ইলম বুহাইরা কিংবা নাসতূরা ও ওরাকা ইবনে নাওফল থেকে অর্জন করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা এমন এক ভিত্তিহীন অভিযোগ যা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমকালীন ঘোর শত্রুরাও নিজেদের মুখ থেকে বের করতে পছন্দ করেনি।

قرآن کریم پر چند اعتراضات

পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপর কয়েকটি সংশয় উত্থাপন ঃ

কোনো কোনো পাশ্চাত্য বিশারদ পন্ডিত পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত কিছু কিছু ঘটনার উপর অভিযোগ উত্থাপন করে এর দ্বারা তারা এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, (নাঊযুবিল্লাহ) নবী কারীম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সব ঘটনাবলী আহলে কিতাবের কোনো আলেমের কাছ থেকে মৌখিকভাবে শুনেছিলেন। অতঃপর তা বর্ণনা করার সময় কিছু ভুল হয়ে গেছে। যেমন–

---

৪০৭. সূরা নাহল : ১০৩

সূচিপত্র

হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম ঃ حضرت مریم کے والد کا نام

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর বোনের নামও ছিল মারইয়াম এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মায়ের নামও ছিল মারইয়াম। প্রথমোক্ত মারইয়াম ছিলেন ইমরানের কন্যা। কিন্তু পবিত্র কুরআন মাজীদে (নাউযুবিল্লাহ) ভুলবশতঃ শেষোক্ত মারইয়ামকেও "ইমরানের কন্যা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০৮]

পরিতাপের বিষয় হলো, ব্রিটেনিকা'র ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বিশ্বকোষেও এ ধরনের পা-মাথাকাটা স্থূল অভিযোগটি লিপিবদ্ধ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করা হয়নি। যদি 'ব্রিটেনিকা'র প্রবন্ধ সম্পাদক নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণ করে দিতে পারতো যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম "ইমরান" ছিল না। তাহলে তা কোনো এক পর্যায়ে অভিযোগ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারতো।

কিন্তু অবস্থা হলো এমন যে, যদি তাকেই পাল্টা প্রশ্ন করা হয় যে, 'হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম 'ইমরান' ছাড়া অন্য কোনো নাম ছিল?' তখন এর জবাবে তার কাছে 'নিশ্চুপতা' ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। এমনকি বাইবেলের মধ্যেও তাঁর পিতার কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। আর স্বয়ং ব্রিটেনিকার "মারইয়াম" প্রবন্ধের মধ্যেও এ কথা স্বীকার করা হয়েছে–

"হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতা-মাতার ব্যাপারে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে কোনো রেকর্ড বিদ্যমান নেই।"[৪০৯]

এক দিকে এই অজ্ঞতা আর অপর দিকে পবিত্র কুরআনুল কারীমে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম (নাউযুবিল্লাহ) ভুলবশতঃ লিপিবদ্ধ হওয়ার দাবী! 'ব্রিটেনিকা' বিশ্বকোষের প্রবন্ধ সম্পাদক কি এটা মনে করেন যে, যদি একবার কোনো ব্যক্তির নাম "ইমরান" রেখে ফেলা হয়, তাহলে পৃথিবীতে আর অন্য কোনো ব্যক্তির এই নাম রাখা যাবে না?

প্রকৃত কথা হলো, এটা তো পবিত্র কুরআনুল কারীমের সত্যতার সুস্পষ্ট দলীল যে, সে ওইসব ঐতিহাসিক মূলতত্ত্বের প্রকাশ্যে পর্দা উন্মোচন করেছে, যা সাতশত বছর পর্যন্ত অজানা ছিল। আর এতই আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীকতার সাথে করেছে যে, চৌদ্দশত বছরের নিকৃষ্টতম শত্রুও এটাকে ভুল বলে আখ্যা দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি।

---

৪০৮. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা : ১৩/৪৮৩, প্রবন্ধ : কুরআন।

৪০৯. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা : ১৪/৯৯৯, প্রবন্ধ : মারইয়াম।

সূচিপত্র

অতঃপর এক্ষেত্রে ব্যাপারটি শুধু হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর জন্ম, তাঁর লালন-পালন, শিশুকাল ও কৈশোর জীবনের সকল অবস্থার ব্যাপারে "প্রমাণপুষ্ট" খ্রিস্টীয় সকল উৎস একেবারেই নিশ্চুপ ছিল। এমনকি ইঞ্জিলের নির্ভরযোগ্য সুসমাচার [অর্থাৎ মার্ক, লুক, মথি ও ইউহান্নাহ]-এর মাঝেও তাঁর অবস্থা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই!

একমাত্র পবিত্র কুরআন মাজীদই প্রথমবার এ সমস্ত ঘটনাবলীকে জনসম্মুখে তুলে ধরেছে। প্রথম প্রথম খ্রিস্টীয় জগতে এসব "হাকীকত উন্মোচন"-এর উপরও বহু অভিযোগ-আপত্তি চলতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে স্বয়ং খ্রিস্টীয়দের এমন পুরাতন গ্রন্থের সন্ধান মিলছে, যেগুলোর মধ্যে আনুমানিক পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীই বর্ণনা করা হয়েছে।[৪১০] আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের এসব স্পষ্ট অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখার পরও সেই বিজ্ঞজনদের (!) পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপর এই অভিযোগ যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম ঈসায়ী কোনো উৎসের মাঝে পাওয়া যায় না।

ফেরাউনের উজির হামান ঃ فرعون کا وزیر ہامان

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার প্রবন্ধ "কুরআন"-এর মধ্যে এ অভিযোগও করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম ফেরাউনের এক উজির বা মন্ত্রীর নাম 'হামান' বলে উল্লেখ করেছে। অথচ বাইবেলের পুরাতন আহাদনামা'য় এ নামে ফেরাউনের কোনো মন্ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। প্রবন্ধ সম্পাদক এই মত প্রকাশ করেছে যে, বস্তুতঃ হামান শাহ আসভীরাসের মন্ত্রী ছিল। আর আলোচনা বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেহেতু এঘটনাগুলো মৌখিকভাবে শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি (নাউযুবিল্লাহ) ভুলবশতঃ এই নামটিকে ফেরাউনের মন্ত্রীর দিকে সম্বন্ধ করেছেন।[৪১১]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও অত্যন্ত স্থূল ও অসম্পূর্ণ একটা কথা এবং ওই শিশুসুলভ দাবীর উপর-ভিত্তিহীন দাবী যে, পৃথিবীতে এক নামের দুই ব্যক্তি পাওয়া যেতে পারে না। এরপর আসল কথা হচ্ছে, ব্রিটেনিকার সম্পাদক আসভীরাসের যে তথাকথিত মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছে, এ কাহিনী শুধু বাইবেলের একটি সন্দেহপূর্ণ গ্রন্থ (Apocryphal book) 'আসতার'-এর

---

৪১০. দেখুন : ডিকশনারী অব দ্যা বাইবেল : ৩/২৮৮

৪১১. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা : ১৩/৪৮৩, প্রবন্ধ : কুরআন।

সূচিপত্র

মাঝে উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টানদের প্রোটেস্টেন্ট গ্রুপ এই গ্রন্থকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে মানে না।

তাইতো প্রচলিত প্রোটেস্টেন্ট ইঞ্জিল গ্রন্থগুলোতে এ গ্রন্থটি বিদ্যমান নেই। অবশ্য ক্যাথলিক (Catholic) গ্রুপ এটাকে প্রমাণপুষ্ট বলে মনে করে। এই সন্দেহপূর্ণ গ্রন্থটিকে যে হামান[৪১২] (অথবা আমান)-এর আলোচনা করা হয়েছে সে শাহ আসভীরাসের মন্ত্রী ছিল না; বরং মন্ত্রীসভার সভাপতি ছিল।[৪১৩] আর এর যে কাহিনী এই কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, এর সঙ্গে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হামানের ঘটনার সাথে দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও নেই।

পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরাউন হামানকে তার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। যাতে এর উপর আরোহণ করে সে মূসা (আ.)-এর প্রভুকে দেখে নিতে পারে। পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকেই এ কথাও জানা যায় যে, হামান শেষ সময় পর্যন্ত ফেরাউনের নামকরা মন্ত্রী ছিল এবং অবশেষে ফেরাউনের সাথেই দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আসতার গ্রন্থে হামান (অথবা আমান) সম্পর্কে এ জাতীয় কোনো ঘটনাই বর্ণনা করা হয়নি।

আসতার গ্রন্থে উল্লিখিত হামানের ঘটনা বুখতে নাস্‌সারের পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। আর তার ঘটনা শুধু এতটুকুই যে, কোনো কারণবশতঃ হঠাৎ সামান্য সময়ের জন্য সে বাদশা আসভীরাসের নৈকট্য অর্জন করে। কিন্তু এই সামান্য সময়ের ক্ষমতার দাপটে সে ইহুদীদেরকে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ দেয়। যার ফলে বাদশার ইহুদী রাণী 'আসতার' তার শত্রু হয়ে যায়। অবশেষে বাদশা তাকে শূলে চড়িয়ে এক ইহুদী যুবককে তার স্থলে নিযুক্ত করে দেয়।[৪১৪]

যে ব্যক্তি হালকা দৃষ্টিতেও আসতার গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছে, সেও এ কথা আঁচ করতে পারবে যে, আসতারের এই ঘটনার সাথে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হামানের ঘটনার সাথে দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও নেই। ঘটনাক্রমে যদি হামানের আলোচনার সাথে আসতারে উল্লিখিত হামানের সাথে সাদৃশ্য থাকতো, তা হলে উভয় ঘটনার কোথাও না কোথাও মিল থাকা উচিত ছিল।

---

৪১২. আসতার গ্রন্থের কোনো কপিতে তার নাম হামান এবং কোনো কপিতে আমান [অসধহ] বা আইমান উলেখ রয়েছে।

৪১৩. দেখুন : আসতার : ১/৩

৪১৪. প্রাগুক্ত : ৩/১-৮, ৭/৬-১০, ৮/২ (নাফিস ওরজন : মীকমলন, লন্ডন, ১৯৬৩ ঈ.

সূচিপত্র

কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, উভয় ঘটনার মাঝে সামঞ্জস্যের সামান্যতম কোনো ঝলকও পরিলক্ষিত হয় না। হামানের যে ঘটনা পবিত্র কুরআনুল কারীম বর্ণনা করেছে, তা আসতার বা বাইবেলের কোনো গ্রন্থে উল্লেখ নেই। আর আসতারে যে কাহিনী বর্ণিত আছে, তা পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোথাও তো নেই-ই; বরং লাখো লাখো হাদীসের ভান্ডারের কোথাও উল্লেখ নেই।

অতঃপর খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, একই নামের দু'জন ব্যক্তিকে দেখে সাদৃশ্য ও সংশয় সৃষ্টি হবার এই দর্শন বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রিস্টীয় পাশ্চাত্য পন্ডিতদের সব সময় শুধু কুরআন ও ইসলামের ক্ষেত্রেই চোখে বিঁধে। বাইবেলে যে একই নামের শত শত ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে, তাদের ব্যাপারে এ ধরনের কোনো দর্শন-চিন্তা তাদের যন্ত্রণা দেয় না!?

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ باب هشتم

কুরআনের বিষয়বস্তু ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ

এতে কোরআনের বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে, সে দিকে ঈঙ্গিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানমনস্তকরা কুরআনে বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিকে তার ত্রুটি ভেবে (থাকে), কিন্তু তা ভুল। কারণ কুরআন বিজ্ঞান বর্ণনা করতে নয়, বরং নৈতিক পথ দেখাতে এসেছে। আর সেসমস্ত বিষয় নিয়েই এ অধ্যায়টি আলোচিত। উল্লেখ্য, ২য় খণ্ডের একটি অধ্যায়ে এই ভ্রান্তিটির বিস্তারিত আলোচনাই করা হয়েছে।

এতে প্রাথমিকভাবে কুরআনের মূল চার প্রকার বিষয়, তথাঃ আকাঈদ, আহকাম, ঘটনাবলী ও উপমা-উদাহরণ এবং সেসমস্ত বিষয়ের আনুষঙ্গিক, শাখা-প্রশাখা, প্রমাণাদি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর এসমস্ত বিষয়ের অধীনে এ অধ্যায়টিতে মুশরিক ও তাদের গোমরাহির প্রকারভেদ, ইহুদী, মুনাফিকদের বিভিন্ন গলত আকায়েদের আলোচনাসহ আহকাম ও তার প্রকারভেদ, তথাঃ ইবাদত, মুআমালাত ইত্যাদি, ঘটনাবলীর প্রকারভেদ, তাতে উল্লেখিত নবীগণের নামসমূহ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম, একই ঘটনা পুনরাবৃত্তির রহস্য, উপমা ও প্রবাদ-সাহিত্য; ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঃ مضامين قرآن [৪১৫]

আমরা যখন পবিত্র কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তুর উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, এ সবগুলো বিষয় সমূদয় চারটি শিরোনামে বিভক্ত। পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি আয়াত অবশ্যই সেগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। শিরোনাম চারটি হচ্ছে–

ধর্ম বিশ্বাস ঃ عقائد

১. আকাইদ ঃ عقائد

২. আহকাম ঃ احكام

৩. ঘটনাবলী ঃ واقعات

৪. উপমা-উদাহরণ ঃ امثال

বিস্তারিত আলোচনা

প্রথম বিষয়বস্তু আকাইদ (ইতিবাচক দিক) ঃ

মৌলিকভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমে তিন প্রকার আকীদা-বিশ্বাসের কথা ঘোষিত হয়েছে। যেমন–

১. তাওহীদ (মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস)।

২. রিসালাত (আল্লাহ কর্তৃক নবী-রাসূল প্রেরণের প্রতি বিশ্বাস)।

৩. আখিরাত (পরকালের প্রতি বিশ্বাস)।

'তাওহীদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ এই বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে একক সত্ত্বার সৃষ্টি হিসেবে বিশ্বাস করবে। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর কাছেই প্রার্থনা ও যাচনা করবে। একমাত্র তাঁকেই ভয় করবে। তাঁর কাছেই চাইবে। আর অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, এই অগণিত সৃষ্টির প্রতিটি অনুপরমানু তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং অন্য কেউ তাঁর তাওফীক দেওয়া ব্যতীত সেটাকে এদিক-সেদিক করতেও সক্ষম নয়।

আর' রিসালাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর পূর্বে অতিবাহিত সকল পয়গাম্বরকে মহান আল্লাহর সত্য রাসূল হিসেবে বিশ্বাস

---

৪১৫. এই গ্রন্থ সংকলনের ১১ বছর পূর্বে অধম [গ্রন্থকার] এ বিষয়গুলো লিখেছিল এবং তৎকালীন মাসিক "আল-বাইয়্যিনাত" ইত্যাদিতে তা ছাপাও হয়েছিল। এখন তাতে কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন করে এই গ্রন্থের অংশ হিসেবে প্রস্তুত করছি। মুহাম্মাদ তাকী

সূচিপত্র

করা। তিনি যে কথাকে হক বলেন, সেটাকে সত্য বলে মেনে নিবে এবং তিনি যে বিষয়কে বাতিল বলেন, সেটাকে বাতিল হিসেবে মেনে নিবে।

আর' আখিরাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ মৃত্যুর পর এমন এক নতুন জীবনের উপর বিশ্বাস রাখবে, যা হবে চিরন্তন এবং সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পার্থিব জীবনের কর্মকান্ডের বিনিময় প্রদান করা হবে। যদি সে ভালো কাজ করে থাকে, তাহলে জান্নাতের চিরন্তন নেয়ামতরাজির অধিকারী হবে। আর যদি মন্দ কাজ করে স্বীয় পার্থিব জীবনকে বিনষ্ট করে থাকে, তাহলে জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তির যোগ্য হবে।

এই তিনটি মৌলিক আকীদাকে সাব্যস্ত করার জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীম বিভিন্ন ধরনের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেছে। আক্‌লী বা যুক্তিগত দলীলগুলো চার প্রকার। কোনো বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য মানুষ হয়তো এমন একটি উদ্ধৃতি দেয়, যা প্রতিপক্ষও মানতে বাধ্য। এগুলো দলীলে নাকলী বা উদ্ধৃতিসূচক দলীল হয়ে থাকে। অথবা মানুষ তর্কশাস্ত্রের ধাঁচে নিজের দাবীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করে থাকে।

তাহলে এগুলোকে বলা হয় যুক্তিভিত্তিক দলীল। অথবা সে নিজের প্রতিপক্ষকে এমন জিনিস প্রদর্শন করে, যা দ্বারা প্রত্যেক মানুষই দাবীদারের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এগুলোকে বলা মুশাহাদাতী বা চাক্ষুষ দলীল। কিংবা মানুষ নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য অতীত বিশ্বের কিছু ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে যে, দেখ অতীতে আমার দৃষ্টিভঙ্গির অনুযায়ী আমল করা হয়েছে বলে দুনিয়া সফলতা পেয়েছিল। আর অমুক সম্প্রদায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি বিরুদ্ধাচরণ করেছে বলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের দলীলকে বলা হয় 'তায্‌রেবাতী বা অভিজ্ঞতালব্ধ দলীল।

পবিত্র কুরআন মাজীদে উপরোক্ত প্রত্যেক প্রকারের দলীল বিদ্যমান রয়েছে, । সেগুলোর উদাহরণসমূহ নিম্নে লক্ষ্য করুন–

(১) নাক্‌লী বা উদ্ধৃতিমূলক দলীল ঃ نقلی دلائل

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালতকে সাব্যস্ত করার জন্য মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন–

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)

সূচিপত্র

'নিঃসন্দেহে তাঁর (রাসূলের) সংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও রয়েছে।[৪১৬] এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করছ, অথচ যেসব কিতাব তোমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীলে (বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও) আজও তাঁর রিসালাতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

এই আয়াতে ওইসব ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল। যেমন, তাওরাতের 'ইস্‌তেসনা' (Deuteronomy) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে–

"অর্থ্যাৎ খোদাওয়ান্দ 'সীনা'র দিক থেকে আসলেন এবং 'শাঈর'[৪১৭]-এর চূড়া ঘেঁষে উদিত হলেন। ফারান পর্বতের চূড়ায় তাঁর দ্যুতি বিচ্ছুরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার কুদ্‌সী। আর তাঁর ডান হাতে ছিল তাঁর জন্য একটি আগ্নেয় শরীয়ত (গ্রন্থ)।" (ইস্‌তেস্‌না : ৩৩তম অধ্যায়, পাঠ : ২)

একথা সত্য যে, 'ফারান' ও 'শাঈর' পর্বতদ্বয়ে (হযরত মূসা (আ.)-এর পরে আগত নবীদের মধ্য হতে) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য কোনো নবী দ্যুতি বিচ্ছুরণ করেননি। দশ হাজার কুদসী[৪১৮] দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

অনুরূপভাবে ইনজীলে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

"যখন তিনি অর্থাৎ সত্যরূহ আগমন করবেন, তখন তিনি তোমাদের সত্যের পথ দেখাবেন। কেননা তিনি নিজের পক্ষ হতে কিছু বলবেন না। বরং যা কিছু শুনবেন, তাই বলবেন এবং তোমাদেরকে ভবিষ্যতের সুসংবাদ প্রদান করবেন।"[৪১৯]

(২) মানতিকী দলীল বা যুক্তিনির্ভর ঃ منطقی دلائل

মানতিকী দলীলসমূহেরও অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রকারটিকে পরিভাষায় "قیاس اقترانی' বলা হয়।

---

৪১৬. [সূরা শুআরা : ১৯৬

৪১৭. 'শাঈর' পবিত্র মদীনার নিকটস্থ একটি পাহাড়ের নাম। আর 'ফারান, মক্কা মোআযযমার প্রসিদ্ধ একটি পাহাড়। আর এক প্রান্তে অবস্থিত "গারে হেরা"। যা বর্তমানে "যাবালে নূর" নামে প্রসিদ্ধ।

৪১৮. ১৯৫৮ ঈ. সনের সংস্করণে বাইবেলের সংস্কারকগণ 'দশ হাজার' শব্দটিকে 'দশ লক্ষ' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

৪১৯. ইউহান্না–১৫ : ১২ [বাইবেল, John/যোহন ১৫ : ১২]

সূচিপত্র

এই "কেয়াসে ইকতেরানী"র মধ্যে সাধারণত একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয় এবং নিজের দাবীকে ওই নীতিমালার সাথে মিলানো হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। সূরা ত্বহা'র মধ্যে রয়েছে– যখন হযরত মূসা (আ.) যাদুকরদের মুকাবিলায় উপনীত হলেন এবং তাদের রশি ও লাঠিগুলো সাপে পরিণত হয়ে চলতে লাগল, তখন হযরত মূসা (আ.) কিছুটা ভয় অনুভব করলেন। ওই সময় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁকে অভয় ও সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনার মাথাই উঁচু থাকবে। আপনিই বিজয়ী হবেন। এরা সফলতা লাভ করতে পারবে না। কেননা–

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (69)

'তারা যা করেছে, তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। আর যাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না'। [৪২০]

এটা হচ্ছে 'কেয়াসে ইকতেরানী'র উদাহরণ। যার মধ্যে সুগরা[৪২১] এবং কুবরা উভয়টি রয়েছে। আর এ ধরনের উদাহরণ তো পবিত্র কুরআনুল কারীমে অনেক রয়েছে, যার মধ্যে কোনো মুকাদ্দিমা বা পটভূমি উহ্য থাকে। যেমন, কাফের সম্প্রদায় বলে বেড়াত যে, যখন মানুষের অস্থিমজ্জা মাটিতে পরিণত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন এটা কিভাবে সম্ভব যে, কেয়ামতের দিন সেগুলোকে নতুন করে আবার জীবিত করা হবে? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, এটা অবশ্যই সম্ভব। কেননা–

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ (4)

'হ্যাঁ, আমি তার আংগুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।'[৪২২]

এটা হলো, সুগরা। এখানে কুবরা উহ্য আছে। অর্থাৎ যিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগকে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই অস্থিমজ্জাকেও দ্বিতীয় বার জীবিত করতে সক্ষম। (কেননা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পুনর্বিন্যস্ত করা অস্থিমজ্জাকে জীবিত করার চেয়ে বেশি কঠিন।) কারণ অঙ্গুলির অগ্রভাগে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যে রেখা-চিহ্ন অঙ্কন করেছেন, তা মহান আল্লাহ পাকের পূর্ণাঙ্গ কুদরত ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার এক বিরল ও বিস্ময়কর নিদর্শন যে, কোটি

---

৪২০. সূরা ত্বহা : ৬৯

৪২১. মানতিকের পরিভাষায় কেয়াসে ইকতেরানীর প্রথমাংশ কে বলা হয় 'সুগরা' ; আর দ্বিতীয় অংশকে বা হয় 'কুবরা।

৪২২. সূরা কেয়ামাহ : ৪

সূচিপত্র

কোটি মানুষ যারা এই দুনিয়ায় এসেছে, তাদের মধ্য হতে কারো রেখা অপর কারো রেখার সাথে মিলে না।

এই আধা ইঞ্চি জায়গায় মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কেমন অলৌকিক নিদর্শন রেখে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তরেখা অপর ব্যক্তির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কখনো একজনের চিহ্ন অপরজনের সাথে মিলে না। এ কারণেই প্রাচীন কাল থেকেই অঙ্গুলির চিহ্ন স্বাক্ষরের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আজও প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং অফিস-আদালতে অঙ্গুলির চিহ্নকে স্বাক্ষরের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হয়। এর পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য যথারীতি প্রশাসক নিয়োজিত রয়েছে। যে মহান সত্ত্বা অঙ্গুলির অগ্রভাগের রেখার ন্যায় সূক্ষ্ম ও জটিল বস্তুকে পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম, তিনি তো নিশ্চিতভাবে অস্থিমজ্জাকেও জীবিত করতে সক্ষম হবেন। অতএব, পরকালের জীবনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ভিত্তিহীন কথা।

(৩) কেয়াসে ইস্‌তেস্‌নায়ী বা পার্থক্যকরন কেয়াসী দলীল: اَلْقِيَاسُ الْاِسْتِثْنَائِيُّ

আর মানতিকী দলিলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো, কেয়াসে ইস্‌তেস্‌নায়ী। এই দলীলটি সাধারণত কোনো বিষয়কে নেতিবাচক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর দু'টি অংশ থাকে। প্রথম অংশ তথা সুগরার মধ্যে যে বিষয়টিকে নেতিবাচক করা উদ্দেশ্য হয়, সেটাকে অন্য একটা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় অংশ তথা কুবরার মধ্যে ওই বিষয়টিকে নেতিবাচক করা হয়, যার উপর প্রথম অংশকে নির্ভরশীল করা হয়েছিল। যেমন, আমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, "এখন দিন নয়।"

তখন আমি বলব, "এখন যদি দিনই হতো, তাহলে সূর্য বিদ্যমান থাকতো। কিন্তু যখন সূর্য বিদ্যমান নেই। কাজেই এখন দিন নয়।" এ ধরনের আরো বহু দলীল পবিত্র কুরআনুল কারীমে রয়েছে। যেমন, শিরককে অস্বীকৃতি ও তাওহীদকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে–

لَوْكَانَ فِيهِمَآ أٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

'অথ্যাৎ যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস[৪২৩] হয়ে যেত।'

এটা হচ্ছে সুগরা। এর কুবরা উহ্য রয়েছে। তা হচ্ছে, "জমিন ও আসমান ধ্বংস হয়নি"। অতএব, বুঝা গেল যে, জমিন ও আসমানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ বা ইলাহও নেই।

---

৪২৩. কেননা এক ইলাহ এক ধরনের কাজ করতে চাইতেন, আর অন্য ইলাহ আরেকটি কাজের ইচ্ছা করতেন। ফলে উভয়ের মাঝে লড়াই বেঁধে যেত। আর এভাবে ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ত।

সূচিপত্র

(৪) সাব্‌র ও তাকসীম অনুসন্ধানও বিভাজন রীতি ঃ السبر والتقسيم

প্রকাশ থাকে যে যুক্তি ভিত্তিক দলীলসমূহের মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হলো, " ঃ السبر والتقسيم সাব্‌র ও তাকসীম" বা বিভাজন রীতি। যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর পদ্ধতি হলো এই যে, প্রতিপক্ষকে বলা হবে যে, তোমার দাবী প্রমাণিত হওয়ার জন্য এই সম্ভাব্য বিষয়গুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি পাওয়া যাওয়া জরুরী। আর যেহেতু এগুলোর মধ্য হতে একটি সম্ভাব্য বিষয়ও পাওয়া যাচ্ছে না; তাই বুঝা যাচ্ছে তোমার দাবী সঠিক নয়।

যেমন, আপনার প্রতিপক্ষের দাবী হলো, যায়েদ পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য। আপনি তার জবাবে বলবেন, পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য হবার জন্য তাকে অবশ্যই হয়তো ন্যাশনাল এসেম্বলীর অথবা পশ্চিম পাকিস্তান এসেম্বলীর কিংবা পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলীর সদস্য হতে হবে। আর যেহেতু সে এই তিনটির কোনোটির সদস্য নয়। কাজেই তাকে পাকিস্তান এসেম্বলীর সদস্য বলা যাবে না। এ পদ্ধতির নামই হলো, " ঃ السبر والتقسيم "।

পবিত্র কুরআন মাজীদে এর অত্যন্ত স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান রয়েছে। কাফের সম্প্রদায় কখনো কখনো হালাল পশুর নরগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিত আবার কখনো মাদীগুলোকে। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাদের এই কর্মরীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেছেন যে, তোমাদের এই হারাম করার কারণ কি?

যুক্তিগতভাবে সম্ভাব্য চারটি কারণ হতে পারে। এর বাইরে পঞ্চম কোনো কারণ হতেই পারে না। (১) হয়তো নর হওয়ার কারণে হারাম বলবে (২) অথবা মাদী হওয়ার কারণে। (৩) অথবা যে গর্ভাশয়ে তা জন্ম নিয়েছে, তাতে হারাম হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যাবে। (৪) অথবা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে হারাম হওয়ার কোনো কারণ বুঝে আসে না; তবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হারাম করেছেন, বিধায় তোমরাও তা হারাম করেছ।

আর এই চারটির সবকটিই অসম্ভব। কারণ প্রথমতঃ নর হওয়াকে হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় না। কারণ তোমরা শুধু নর পশুকেই হারাম মনে কর না; বরং কখনো কখনো মাদী পশুকেও হারাম করে নাও। দ্বিতীয়তঃ মাদী হওয়াকেও হারামের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় না। কারণ তোমরা নর-মাদী উভয় প্রকার পশুকেই হারাম করে নাও। তৃতীয়তঃ গর্ভাশয়ের হারাম হওয়ার কারণ হওয়া এ জন্য সম্ভব নয় যে, তাহলে একই সময়ে উভয় নর-মাদী উভয় প্রকার পশুর হারাম হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ তোমরা এক সময়ে হয়তো নরকে হারাম মনে কর অথবা মাদীকে।

সূচিপত্র

একই সময়ে উভয়টাকে হারাম মনে কর না। চতুর্থতঃ শুধু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নির্দেশের আনুগত্যের ভিত্তিতেও সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ ধরনের কোনো আদেশ নাযিল করেননি।

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ

'আর উটের দু'টি, আর গরুর দু'টি। বল, এদের নর দু'টি কি তিনি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি অথবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এ রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন?।' [৪২৪]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পন্থায় "সাব্‌র ও তাকসীম"-এর মাধ্যমে তাদের ধারণাগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(৫) তাস্‌লীম–স্বীকৃতি ভিত্তিক দলীল ঃ تسليم

যুক্তি দলীলের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ দলীল হলো,"তাস্‌লীম"। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের কোনো কথা অথবা দাবীকে মেনে নিয়ে এ কথা বলা যে, এটা মেনে নেওয়ার পরও উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

কাফেররা বলে বেড়াত যে, আমাদের নিকট কোনো মানুষের পরিবর্তে কোনো ফেরেশতাকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হলো না কেন? তাদের এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কয়েকভাবে দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে হতে একটি হচ্ছে–

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

'আমি যদি তাঁকে ফেরেশতা করেও প্রেরণ করতাম,তাহলে তাঁকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম। [৪২৫]

অর্থাৎ প্রথম কথা তো হলো, কোনো নবীর জন্য ফেরেশতা হওয়া আবশ্যক নয়। বরং এ উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রেরণ করাটাই উত্তম। কিন্তু তারপরও তোমাদের কথা মেনে নিয়ে আমি যদি ফেরেশতাও প্রেরণ করতাম তাহলেও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হতো না। কারণ আমি ফেরেশতাকেও তার আসল গঠন-আকৃতিতে প্রেরণ করতাম না। কেননা তোমাদের মধ্যে তার আসল গঠন-আকৃতি দেখার যোগ্যতা ও ধৈর্য্য নেই। কাজেই তাকে অবশ্যই মানব-আকৃতিতেই প্রেরণ করা হতো। আর তখনও তোমরা তার প্রতি ঈমান আনতে না।

---

৪২৪. সূরা আনআম : ১৪৪

৪২৫. সূরা আনআম : ৯

সূচিপত্র

(৬) ইস্তেকাল-পরিবর্তন ভিত্তিক দলীল ঃ استقال

মানতিকী পদ্ধতিতে মুনাযিরা-বিতর্কের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমনও হয় যে, বাদী বা একটি দলীল পেশ করে। প্রতিপক্ষ বক্র বুঝসম্পন্ন হবার কারণে এর উপর পাল্টা কোনো প্রশ্ন করে বসে। এমতাবস্থায় বাদী তার এই পাল্টা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে অন্য আরেকটি দলীল পেশ করে। এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমার প্রথম দলীলটি ভুল ছিল। বরং এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তোমার এই প্রশ্ন করাটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং মনে হচ্ছে তুমি আমার দলীলটি বুঝতে পারনি। তাই আমি দ্বিতীয় আরেকটি দলীল দিচ্ছি। এই পদ্ধতিকে বলা হয় "ইস্তেকাল"।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি ঘটনায় এর জন্য উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রয়েছে। নমরূদের সাথে যখন তাঁর বিতর্ক হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অস্তিত্ব ও তাওহীদের উপর একটি দলীল পেশ করলেন

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

'আমার প্রভু তো তিনি, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন।[৪২৬]

তখন নমরূদ একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে ফেলল। আর এমন একজন লোককে মুক্ত করে দিল, যার ফাঁসির রায় হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে বলল–

أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ

'আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি।'

হযরত ইবরাহীম (আ.) বুঝতে পারলেন যে, এই আহাম্মক তো জীবন দান করা এবং মৃত্যু দেওয়ার অর্থই বুঝে না। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নির্বাক করে দেওয়ার মতো আরেকটি দলীল পেশ করলেন–

فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

ইবরাহীম বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন।'

এটা ছিল "ইস্তেকাল"। যার দ্বারা নমরূদের বাকপটুতা নিমেষেই চুপসে যায়। فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ 'ফলে কাফের ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল।'

(৭) চাক্ষুষ দলীল ঃ প্রত্যক্ষ অবলোকন ভিত্তিক দলীল مشاہداتی دلائل

---

৪২৬. সূরা বাকারা : ২৫৮

সূচিপত্র

দলীলের তৃতীয় প্রকার হলো, مشاہداتی دلائل (অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে)। পবিত্র কুরআনুল কারীম এ ধরনের দলীল অধিকহারে ব্যবহার করেছে। কারণ মানতিকী ও দার্শনিক দলীল-প্রমাণ মানুষকে চুপ করিয়ে দেয় ঠিকই; কিন্তু অনেক সময় এর দ্বারা কথা অন্তরে বসে না এবং সংশয়ের রোগে নিপতিত ব্যক্তিদের চিকিৎসাও হয় না। আর পবিত্র কুরআনুল কারীমের উদ্দেশ্য কেবল প্রতিপক্ষকে চুপ করানো নয়। বরং সত্য কথাকে অন্তরে স্থাপন করা। দ্বিতীয়তঃ মানতিকী দলীল একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য উপকারী হয়ে থাকে। প্রত্যেক নিরক্ষর ও মূর্খ লোকদের জন্য ফলপ্রসূ হয় না। আর মোশাহাদা এমন একটি চাক্ষুষ বিষয়, যা দেখে একজন গ্রাম্য মূর্খও অবলীলায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠে–

البعرة تدل على البعير والاثر على السير فسماء ذات الابراج والارض فجاج كيف لاتدل على اللطيف الخبير؟

'যখন বিষ্টা প্রমাণ বহন করে উটের অস্তিত্বের আর পদচিহ্ন ইঙ্গিত বহন করে পথিকের, তাহলে কক্ষবিশিষ্ট আকাশ আর সুগভীর গর্তবিশিষ্ট জমিন কেন ইঙ্গিত বহন করবে না, সূক্ষ্মদর্শী ও মহাবিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তার?'

এ জন্য মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বারবার নতুন নতুন ভঙ্গিতে চাক্ষুষ দলীলসমূহ উলেখ করেছেন। তাওহীদের দলীল পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিম্নে একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন–

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)

'নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন। ওর বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। ১. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? ২. তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়। ৩.

সূচিপত্র

কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন ১. এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীমালা এবং ওতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং দুই সাগরের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। ২. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং ওদের অনেকেই তা জানে না।

অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন ১. এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। ২. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

কিংবা তিনি, যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন ১. এবং যিনি স্বীয় করুণার প্রাক্কালে (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। ২. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে অংশী করে, আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।[৪২৭]

অর্থাৎ, যে সত্ত্বা এতসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে না, তা হলে অবশ্যই ইবাদতের জন্য তাকেই মনোনীত করা উচিত এবং অন্যকে তার অংশীদার স্থাপন করা জঘন্য নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি। অতঃপর চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, যে সত্তা একাই (১) এতসব বড় কাজ সম্পাদন করে থাকেন তার জন্য ছোটছোট কাজের ব্যাপারে কোনো সাথীর প্রয়োজন হবে কেন? অন্য এক স্থানে পরকালের সত্যতা প্রমাণকল্পে ইরশাদ করেছেন :

এত বিরাট-বিশাল কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, ছোট ছোট কাজের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য কোনো সহকারীর প্রয়োজন হবে কেন?[৪২৮]

অন্যস্থানে পরকালের বিষয়টিকে প্রমাণ করতে গিয়ে অপর এক স্থানে ইরশাদ করেছেন–

أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ (10) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ (11)

---

৪২৭. সূরা আন-নামাল,৬০-৬৩

৪২৮. আরবের কাফের সম্প্রদায় জানত যে, এ সকল কাজ আলাহ তাআলাই করেন। জমিন ও আসমান তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তবে দুনিয়াবী রাজা-বাদশাহের উপর কেয়াস করে তারা এটা বুঝত যে, তিনি তাঁর এ সকল কাজের ইন্তেজামের জন্য (নাউযুবিলাহ) সহকারী রাখতেন। মুহাম্মদ তাকী

সূচিপত্র

'তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকায় না, কীভাবে আমি তাকে বানিয়েছি, তাকে সুশোভিত করেছি আর তাতে নেই কোন ফাটল? আর পৃথিবী- তাকে করেছি বিস্তৃত আর তাতে সংস্থাপিত করেছি পর্বতরাজি আর তাতে উদ্গত করেছি যাবতীয় সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি। প্রতিটি (আল্লাহ) অভিমুখী বান্দাহর জন্য চক্ষু উন্মোচনকারী ও উপদেশ হিসেবে।আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি আর তা দিয়ে সৃষ্টি করি বাগান আর মাড়াইযোগ্য শস্যদানা, আর উঁচু খেজুর গাছ যাতে আছে খেজুর গুচ্ছ স্তরে স্তরে সাজানো। আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ; আর আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।' [৪২৯]

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মানুষের .দেহ, আত্মা, সৃষ্টি রহস্য, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভূমি বিদ্যার সাথে সম্পর্ক যুক্ত যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, তার অধিকাংশই মোশাহাদা বা চাক্ষুষ দলীলের আওতাভুক্ত। আর যেখানেই মহাশূন্য ও সৃষ্টি জগতের উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করার তাকিদ এসেছে, সেটার উদ্দেশ্যও এই যে, মানুষ সৃষ্টিজগতের নিগূঢ় রহস্য ও অত্যাশ্চর্য বস্তুর উপর চিন্তা-ভাবনা করে তার স্রষ্টার পরিপূর্ণ কুদরতের নিখাদ স্বীকৃতি দিবে। আর অবশেষে তাঁরই সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। এ প্রকারের আওতায় পবিত্র কুরআনুল কারীম বহু সাইন্টিফিক বা বৈজ্ঞানিক মূল তত্ত্বের নেকাবও উন্মোচন করেছে। তবে এ প্রকারের সবগুলো কথাকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের পুরো যোগসূত্র (Context)-এর ভিত্তিতে তথা সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকাতে হবে। এটাকে স্বতন্ত্র একটি সাইন্সের বই মনে করলে মস্তবড় ভুল সৃষ্টি হতে পারে।

(৮) তায্‌রেবা তথা অভিজ্ঞতালব্ধ দলীল ঃ تجرباتی دلائل

পবিত্র কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী জাতির কৃতকর্ম ও পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বহু স্থানে ইরশাদ করেছে–

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9)

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। তারা শক্তিতে ছিল এদের চেয়ে অধিক

[৪২৯].সূরা ক্বাফ : ৬-১১

সূচিপত্র

প্রবল। তারা যমীন চাষ করত আর তা আবাদ করত এদের আবাদ করার চেয়ে বেশি। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর যুলম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করেছিল।"[৪৩০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

'আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি যারা তাদের (ভোগবিলাসপূর্ণ) জীবনে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল। এই তো তাদের বাসস্থান, তাদের পর এগুলোতে খুব অল্প লোকই বসবাস করেছে, অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি।'[৪৩১]

পবিত্র কুরআন মাজীদ এ ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো আলোচনা করে এ কথা প্রমান চায় যে, যেসব জাতি স্বীয় জীবনকে ভ্রান্ত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যারা আমার হেদায়াতের আলোকরশ্মি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমি সর্বদা তাদেরকে ধ্বংসের এমন অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছি, যা থেকে তারা আর কখনো বের হতে আসতে পারেনি।

নিম্নে এসব সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

আকাইদ (অস্বীকৃতি অংশ)ঃ (سلبی پہلو) عقائد

উপরোল্লিখিত আকীদাসমূহ প্রমাণ করা ছাড়াও পবিত্র কুরআনুল কারীম মানুষের আকীদা ও আমলের অনেক গোমরাহীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর ওইসব গোমরাহীতে নিমজ্জিত মানুষের বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহের প্রশান্তিমূলক জবাব দিয়েছে। এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় "আয়াতে মুখাসামাহ" বলা হয়।

সাধারনতঃ এ ধরনের আয়াতগুলোতে চার প্রকারের গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট মানুষকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেমন, ১. মূর্তি পূজারী মুশরিক। ২. খ্রিস্টান। ৩. ইহুদী। ৪. মুনাফিক।

(১) মূর্তি পূজারী মুশরিক ঃ بت پرست مشرکین

প্রকাশ থাকে মূর্তি পূজারী মুশরিকদের গোমরাহী ছিল পাঁচ ধরণের।

---

৪৩০. সূরা রূম : ৯

৪৩১. সূরা কাসাস : ৫৮

সূচিপত্র

১. "الشرك শিরক" ল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে সন্তান হবার বিষয়টিকেই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে–

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)

'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো কাছ থেকে জন্ম লাভ করেননি।'[৪৩২]

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ করে কন্যাদের ব্যাপারটিকে নাকোচ করা হয়েছে যে, একটু নিজের বিবেকটা খরচ করে দেখ যে, তোমরা কন্যা সন্তানের অস্তিত্বকে নিজেদের জন্য সংকোচ ও লজ্জার কারণ মনে কর, অথচ যে মহান সত্ত্বাকে গোটা বিশ্ব জগতের পালনকর্তা হিসেবে স্বীকৃত দাও, তাঁর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত কর!

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)

তবে কি কন্যাসন্তান তাঁর; আর পুত্রসন্তান তোমাদের? তোমাদের কী হলো, তোমরা কেমন ফয়সালা করছ?[৪৩৩]

৩. তাদের তৃতীয় গোমরাহী ছিল "تحريف" বিকৃত সাধন। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী বলে দাবী বলে মনে করতো এবং বলে বেড়াতো যে, আমরা সঠিকভাবে তাঁর নির্দেশিত তরীকার উপর রয়েছি। অথচ শাখাগত বহু আহকাম ও বিধি-বিধান তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়েছিল। উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা, নামাযের পরিবর্তে শিষ ও হাত-তালি দেওয়া, মাসকে আগ-পিছু করে নেওয়া, যেমন– যুদ্ধ করতে করতে যখন কোনো "নিষিদ্ধ মাস" এসে যেত তখন তারা বলতো, এ মাসটি দু'মাস পর্যন্ত চলবে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ সব মনগড়া ও বানোয়াট বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে এসব ভিত্তিহীন কথাগুলো থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

'হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর।'[৪৩৪]

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

'আর কা'বার নিকট তাদের সালাত শিষ ও হাত-তালি ছাড়া কিছু ছিল না।'[৪৩৫]

---

৪৩২. সূরা ইখলাস : ৩
৪৩৩. সূরা তূর : ৩৯ এবং সূরা কালাম : ৩৬
৪৩৪. সূরা আরাফ : ৩১
৪৩৫. সূরা আনফাল : ৩৫

সূচিপত্র

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ .

'নিশ্চয়ই কোনো মাসকে পিছিয়ে দেওয়া কুফরী বৃদ্ধি করে।'[৪৩৬]

৪. তাদের চতুর্থ গোমরাহী ছিল হঠকারীতা যে, তারা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিত না। তারা বলতো, আমাদের ন্যায় চলাফেরা ও আহারকারী ব্যক্তি নবী হতে পারে কীভাবে? পবিত্র কুরআনুল কারীম স্থানে স্থানে তাদের এই গোমরাহীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদেরকে বুঝিয়েছে যে, মানুষ হওয়াটা নবী হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। আর নবী-রাসূল সর্বদা মানুষদের মধ্য হতেই এসেছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم

'আর আমি আপনার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি।'[৪৩৭]

৫. তাদের পঞ্চম গোমরাহী ছিল "পরকাল অস্বীকৃতি"। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে তারা অসম্ভব মনে করতো। পবিত্র কুরআনুল কারীম চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন বর্ণনাশৈলী দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

'তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর ওগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান?।[৪৩৮]

(২) ইহুদীজাতী ঃ يهودى

পবিত্র কুরআন মাজীদ ইহুদীদেরকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা নিজেদের গোমরাহীর মাত্রা ছড়িয়ে গিয়েছিল। মূর্তি পূজকদের যত গোমরাহী ছিল (আখেরাতের বিশ্বাস ব্যতীত) সবগুলোই তাদের মধ্যে ষোলকলায় পাওয়া যেত। মুখে মুখে তো তারা নিজেদেরকে "তাওরাত"-এর অনুসারী বলে দাবী করতো। কিন্তু বাস্তবে তারা এর অনুসারী ছিল না। বরং খোদ তাওরাত তো তাদের দয়া ও অনুগ্রহের শিকার ছিল। তাদের হাতের পুতুল ছিল। যেভাবে মন চাইতো তারা তাতে বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতো। তাওরাতে তাদের বিকৃতি ছিল তিন প্রকারের।"

১. "تحريف لفظى" শাব্দিক বিকৃতি ঃ অর্থাৎ তারা তাওরাতের আয়াতগুলোর ভুল তরজমা করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতো।

---

৪৩৬. সূরা তাওবা : ৩৭
৪৩৭. সূরা ইউসুফ : ১০৯
৪৩৮. সূরা আহকাফ : ৩৩

সূচিপত্র

২."تحريف معنوى" অর্থগত মৌলিক বিকৃতি ঃ অর্থাৎ তাওরাতের আয়াতগুলোর নিজেদের পক্ষ হতে মনগড়া ব্যাখ্যা করে মানুষকে এর উপর আমল করার জন্য আহ্বান করতো। এর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন-

প্রত্যেক নবীর উম্মতের নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, কাফের ও ফাসেক এক নয়। বরং উভয়ই স্বীয় হাকীকত ও স্বরূপের দিক থেকে আলাদা আলাদা এবং উভয়ের পরিণামও ভিন্ন ভিন্ন। কাফের ওই ব্যক্তি, যে কিতাবী দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো, যেমন- তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। এমন ব্যক্তি চিরকালের জন্য জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে ফাসেক হলো ওই ব্যক্তি, যে এই মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও নিজেকে আমল-আখলাকের দিক থেকে দ্বীনে ফিতরাতের রূপে পরিণত করতে পারেনি। আর ওই সব কাজে সে নিজেকে লিপ্ত করে রাখে, দ্বীনে ফিতরাত যেগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এমন ব্যক্তি চিরন্তন শাস্তিযোগ্য হবে না। বরং স্বীয় অপরাধ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাওরাতে এই হাকীকতকেই এভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি সে দোজখেও প্রবেশ করে, তবুও তা অস্থায়ী সময়ের জন্য। এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যে ব্যক্তি দ্বীনে ফিতরাতের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে একমত পোষণ করে স্বীয় যুগের নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, সে এ মর্যাদার অধিকারী হবে।

কিন্তু ইহুদীরা এর উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করেছে যে, আমাদের মুক্তির জন্য শুধু হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়ন করাই যথেষ্ট। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান না আনলেও কোনো অসুবিধা নেই।

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً

'আর তারা (ইহুদীরা) বলল, গোনা-কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।' [৪৩৯]

পবিত্র কুরআন মাজীদ তাদের অলীক আশাকে স্পষ্টভাবে নাকোচ করে দিয়ে ইরশাদ করেছে-

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81)

'হ্যাঁ, যারা মন্দ উপার্জন করবে এবং তার পাপ তাদেরকে বেষ্টন করে নেবে, তারাই আগুনের অধিকারী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী।' [৪৪০]

---

৪৩৯. সূরা বাকারা : ৮০

সূচিপত্র

৩. ইহুদীদের তৃতীয় গোমরাহী ছিল যে, তারা তাওরাতের বহু আয়াতকে গোপন করতো। যাতে দুনিয়াবাসীর সামনে তাদের মর্যাদা সমুন্নত থাকে। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, যদি এ ধরনের আহকাম ও বিধি-বিধানগুলো মানুষ জেনে ফেলে এবং তারা এটা দেখে যে, আমাদের আলেমগণ এর উপর আমল করছে না। তাহলে তাদের উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাবে এবং মান-মর্যাদার যে মাকাম তাদের অর্জিত আছে, তা ধূলোয় মিশে যাবে।

যেমন তারা রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সংবাদবাহী আয়াতসমূহ এবং ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করার বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ গোপন করে রেখেছিল এবং তারা পরস্পরে একে অপরকে তাকিদ করতো যে, দেখ! এ বিষয়গুলো কোনো মুসলমানকে অবগত করবে না। পবিত্র কুরআনুল কারীম স্থানে স্থানে তাদের এই মূর্খতার পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে এবং নবীজী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা পরস্পর একে অপরকে এ কথাগুলো বলে বেড়াচ্ছে–

أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ

'তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা কর, যা আল্লাহ তোমাদের উপর উন্মুক্ত করেছেন। যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে?' [৪৪১]

(৩) খ্রিস্টানজাতী ঃ نصارى

তারা নিজেদেরকে নিজেরা হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী বলতো। তাদের সর্বপ্রথম গোমরাহী হলো তাদের "عقيدة تثليث"। অর্থাৎ তারা বলতো, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার (নাঊযুবিল্লাহ) তিনটি অংশ রয়েছে। যেগুলো কোনো এক দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের সাথে মিশে একই সত্ত্বা। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা বলে মনে হয়। প্রথম অংশ হলো, "পিতা"। দ্বিতীয় অংশ হলো, "পুত্র"। আর তৃতীয় অংশ হলো, "রূহুল কুদুস" বা পবিত্র আত্মা। পুত্রের অংশটি হযরত ঈসা (আ.)-এর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করেছিল।

মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মূর্খতার এ হাস্যকর ধারণাকে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং স্থানে স্থানে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এটি তাদের এমন মাথা-পা কাটা ও ভিত্তিহীন ধারণা, যা থেকে স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) আশ্রয় কামনা করেছেন–

---

[৪৪০]. সূরা বাকারা : ৮১
[৪৪১]. সূরা বাকরা : ৭৬

সূচিপত্র

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118)

'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ঈসা ইবনু মারইয়ামকে বললেন, তুমি কি লোকেদেরকে বলেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে আর আমার মাতাকে ইলাহ্ বানিয়ে নাও।' (উত্তরে) সে বলেছিল, 'পবিত্র মহান তুমি, এমন কথা বলা আমার শোভা পায় না যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই, আমি যদি তা বলতাম, সেটা তো তুমি জানতেই; আমার অন্তরে কী আছে তা তুমি জান কিন্তু তোমার অন্তরে কী আছে তা আমি জানি না, তুমি অবশ্যই যাবতীয় গোপনীয় তত্ত্ব সম্পর্কে পূণরূপে ওয়াকেফহাল।

তুমি আমাকে যে ব্যাপারে নির্দেশ করেছ তা ছাড়া আমি তাদেরকে অন্য কিছুই বলিনি, (তা এই) যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক, আর তাদের কাজ কর্মের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম, অতঃপর যখন তুমি আমাকে উঠিয়ে নিলে, তখন তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক, আর তুমি হলে প্রত্যেক ব্যাপারে সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দাহ আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তুমি তো মহাপরাক্রান্ত মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।'[৪৪২]

(৪) মুনাফিক সম্প্রদায় ঃ منافقين

এরা হচ্ছে ওই পাপিষ্ঠ, কু-প্রকৃতি, কাপুরুষ ও ছোটমনের মানুষের দল, যাদের অন্তর কুফর-শিরিকের সেই মূর্তিপ্রেমে ছিল, অন্যান্য কাফেররা সরাসরি যেগুলোর পূজা করতো। কিন্তু এই বেচারারা এতটুকু সৎ সাহস রাখতো না যে, প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে নিজেদের এই আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ করবে। তাই মুখে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের স্বীকারোক্তি দিত। আর পর্দার অন্তরালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকতো।

তাদের মধ্যে কিছু তো এমন ছিল, যারা শুধু ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে কালিমায়ে তাওহীদ পাঠ করতো। কিন্তু অন্তর কুফর ও শিরিকের সকল কুফল দ্বারা ভরপুর ছিল। আর কিছু ছিল এমন যারা তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে নিজেরাও মুখে ইসলামের স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

---

[৪৪২]. সূরা মায়েদা : ১১৬ ও ১১৮

সূচিপত্র

বলতে গেলে তাদের কাছে আসল বিষয়টি ছিল তাদের নেতাদের অনুসরণ। যদি নেতা কাফের হয়, তাহলে তারাও কাফের থাকতো। আর নেতা যদি মুসলমান হয়, তাহলে তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিত।

যেহেতু এই মুনাফিকদের স্বতন্ত্র কোনো আকীদা-বিশ্বাস ছিল না। বরং মৌখিকভাবে তারা নিজেদেরকে ইসলামী আকীদারই অনুসারী বলে বেড়াতো। তাই এটা স্পষ্ট যে, তাদের আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। তবে পবিত্র কুরআনুল কারীম স্থানে স্থানে তাদের বদ-স্বভাব ও ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের পর্দা উন্মোচন করেছে এবং তাদের নোংরামির চেহারা খুলে দিয়েছে। এর নমুনা দেখার জন্য সূরা তাওবা ও সূরা আনফাল পাঠ করে দেখুন। এ দু'টি সূরাতে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের নোংরামিগুলো এক একটা করে খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হলো ঃ

আহকাম ঃ বিধি-বিধান ঃ [৮৬]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হলো, "احكام আহকাম"। পবিত্র কুরআনুল কারীমে যে সকল আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা সেগুলোর প্রকারভেদের আলোকে তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. ওই সকল আহকাম ও বিধি-বিধান যেগুলো নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহর হক সম্পর্কিত। সংক্ষিপ্ত শব্দে যেগুলোকে "عبادت" বলা যায়। তাহারাত-পবিত্রতা, নামায, যাকাত, রোযা, কুরবানী ও হজের হুকুম-আহকাম এ প্রকারের আওতাভুক্ত। পবিত্র কুরআনুল কারীম এ বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

২.ওই সকল আহকাম ও বিধি-বিধান যেগুলো নিরঙ্কুশভাবে বান্দার হক সম্পর্কিত। যেগুলোকে আমরা "معاملات" বলে ব্যক্ত করতে পারি। যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-ফায়সালা, সাক্ষ্য, আমানত, বন্ধক, জবাইকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ, বিভিন্ন পানীয় ব্যবহার, ওসীয়ত ও মীরাস-উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের বিধি-বিধান স্বয়ং পবিত্র কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে।

৩. ওই সকল আহকাম ও বিধি-বিধান যা কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে عبادات। আর কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে "معاملات"। এ প্রকারের মধ্যে রয়েছে- বিবাহ, তালাক, হুদূদ, তা'যিরাত বা অপরাধ দমন আইন (Criminal laws), দিয়ানাত, কেসাস (Torts), জিহাদ, মানত, শপথ, ও যৌথ কারবার ইত্যাদি বিধি-বিধান পবিত্র কুরআন মাজীদ উল্লেখ করেছে।

সূচিপত্র

পবিত্র কুরআন মাজীদ যেহেতু বিশ্ববাসীকে এমন এক পবিত্রতম সুন্দর জীবন ব্যবস্থা উপহার দিতে চায়, যার উপর আমল করে প্রত্যেক যুগেই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। তাই পবিত্র কুরআনুল কারীম স্বীয় বিধি-বিধান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক "تدريجي انداز ধীরগতি" অবলম্বন করেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ করেই কোনো নির্দেশ দিয়ে দেয়নি। বরং প্রথমে ওই নির্দেশ পালনের জন্য অন্তরকে উপযোগী ও প্রস্তুত করে তুলেছে। তারপর তাতে তা প্রয়োগ করেছে। মদ্যপানের নিষিদ্ধতা এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। আরববাসী মদ্যপানে এতই অভ্যস্ত ছিল যে, তাদের মুখে এর আড়াইশটি নাম ছিল। তাদের থেকে এই নোংরা অভ্যাস ছাড়ানো কুরআনুল কারীমেরই বৈশিষ্ট্য। শুরুতে যখন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট মদের হারাম-হালাল সম্পর্কিত শরীয়তের বিধান জানতে চাওয়া হয়েছিল। তখন পবিত্র কুরআনুল কারীম সঙ্গে সঙ্গেই তা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়নি। বরং ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

'বল, 'ঐ দু'টোতে আছে ভয়ঙ্কর গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকারও কিন্তু এ দু'টোর পাপ এ দু'টোর উপকার অপেক্ষা অধিক।' [৪৪৩]

সুস্থ ফিতরাত-রুচিসম্পন্ন লোকেরা এতেই বুঝে ফেলল যে, এটাকে বর্জন করাই উত্তম। কিছু দিন পর নাযিল হলো–

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।' [৪৪৪]

এখন সাধারণভাবে মানুষের অন্তরে মদের প্রতি অনীহাভাব স্থান করে নিয়েছিল। তাই কিছু দিন পর স্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিধান নাযিল হয়ে গেল–

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

'মদ, জুয়া আর মূর্তী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ, তোমরা তা বর্জন কর।' [৪৪৫]

শানে নুযূল ঃ আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ঃ شان نزول

পবিত্র কুরআনল কারীমে যে পরিমাণ আহকাম উল্লেখ আছে, তা দু'ভাবে নাযিল হয়েছে।

---

৪৪৩. সূরা বাকারা : ২১৯
৪৪৪. সূরা নিসা : ৪৩
৪৪৫. সূরা মায়েদা : ৯০

সূচিপত্র

১. মুসলমান বা কাফেরদের মধ্যে কোনো ভুল প্রথা প্রচলিত ছিল। সেটাকে পরিবর্তন করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই প্রয়োজন অনুভব করলেন। আর এর জন্য আয়াত নাযিল করা হলো। এভাবে কোনো কোনো সময় একই আয়াত একাধিক ভুল প্রথাকে নাকোচ করে দিয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আরবদের একটি প্রথা ছিল যে, তারা নিজেদের অধীনস্ত ইয়াতীম-অসহায় নারীদেরকে ধন-সম্পদ ও রূপ-লাবণ্যের মোহে বিবাহ করে নিত। অতঃপর তাদেরকে ভরণ-পোষণ ও মহর ওই মানে দিত না, অন্যান্য নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে যে মানের দিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আরবরা একই সাথে দশ দশজন নারীকে নিজের বিবাহে রাখতো। আর যখন তাদের ব্যয় বহনে অক্ষম হয়ে পড়তো, তখন অধীনস্থ ইয়াতিমং নারীদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতো।

হযরত ইকরিমা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আরবরা একই সময়ে দশ দশজন স্ত্রী রাখতো। কিন্তু তাদের মাঝে সমতা ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতো না।

আরবদের এসব কু-প্রথা ছিল ভুল ও অন্যায়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যেগুলোর পরিবর্তন ছিল অতীব প্রয়োজনীয়। তাই মহান আল্লাহ এমন পূর্ণাঙ্গ একটি আয়াত নাযিল করলেন, য়া সকল কু-প্রথা ও অনিষ্টের মূলোৎপাটন করে দিয়েছিল–

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

'যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (নারী) ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমত দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার জনকে বিবাহ কর, কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে।'[৪৪৬]

যেসব লোক নিজেদের অধীনে পালিত ইয়াতিম নারীদেরকে বিবাহ করে তাদের পূর্ণ অধিকার দিত না, এ আয়াত তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছে যে, এসব ইয়াতীম নারীদেরকে বিবাহ করা কি প্রয়োজন ছিল তোমাদের? আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য অন্যান্য নারীদের থেকে চার জন পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছেন।

এদেরকে বিবাহ করে নাও। এসব লোক দশ দশটি বিবাহ করে ফেলতো এবং তাদের ব্যয়-নির্বাহে অক্ষম হয়ে ইয়াতীম নারীদের সম্পদ গ্রাস করতো, তাদের জন্য বিবাহের একটি যুক্তিসঙ্গত সীমা বেঁধে দিয়েছেন যে, চার থেকে

---

৪৪৬. সূরা নিসা : ৩

সূচিপত্র

অগ্রসর হয়ো না। তাহলে ব্যয় ভারটা এত বেশি হবে না এবং ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করতে হতনা। আর যারা দশ দশটি বিবাহ করে স্ত্রীদের মাঝে বে-ইনসাফী করার দোষে দোষী ছিল তাদেরকেও বলে দিয়েছে যে, চারের চেয়ে অধিক বিবাহ করবে না, যেন ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখা সহজ হয়। আর যদি এ চারজনের মাঝেও ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখতে আশঙ্কা হয়, তাহলে একজন স্ত্রীর উপরই ক্ষান্ত কর। এভাবে এই একটি আয়াত যুগপৎভাবে একাধিক অনিষ্টের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

২. আহকাম নাযিল হবার দ্বিতীয় কারণ এই হতো যে, কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরাম কোনো প্রশ্ন করতেন। তখন ওই প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত আয়াত নাযিল হতো। এগুলোর উদাহরণ "আসবাবে নুযুল" অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় বিষয়বস্তু

কিসাস ঃ ঘটনাবলী ঃ قصص

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হলো, قصص اورواقعات "কাহিনী ও ঘটনাবলী"। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আলোচিত ঘটনাগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়–

১. অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলী।

২. ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী।

অতীতের ঘটনাবলী ঃ ماضی کے واقعات

অতীতের সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী-রাসূলগণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি বর্ণনা করেছেন। আর এ ছাড়া কোনো কোনো নেক ও অনুগত এবং অবাধ্য ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ঘটনাও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বমোট সাতাশ জন নবীর আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক বিন্যাস অনুযায়ী তাঁদের সম্মানিত নামসমূহ নিম্নরূপ–

১.হযরত আদম (আ.), ২.হযরত নূহ (আ.), ৩.হযরত ইদরীস (আ.),৪. হযরত হুদ (আ.),৫. হযরত সালেহ (আ.),৬. হযরত ইবরাহীম (আ.),৭. হযরত ইসমাঈল (আ.),৮. হযরত ইসহাক (আ.),৯. হযরত লূত (আ.),১০. হযরত ইয়াকুব (আ.),১১. হযরত ইউসুফ (আ.), ১২.হযরত শুআইব (আ.),১৩. হযরত মূসা (আ.),১৪. হযরত হারুন (আ.),১৫. হযরত ইউশা' (আ.) ১৬.হযরত হিযকীল (আ.),১৭.হযরত ইউনুস (আ.) ১৮.হযরত ইল্ইয়াস (আ.),১৯..হযরত ইয়াসা' (আ.),২০.হযরত শামভীল (আ.),২১.

সূচিপত্র

হযরত দাউদ (আ.), ২২.হযরত সুলাইমান (আ.), ২৩. হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ.),২৪. হযরত উযাইর (আ.), ২৫.হযরত যাকারিয়া (আ.), ২৬.হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.) এবং২৭ হযরত ঈসা (আ.) ।

এই নবী-রাসূলগণের ঘটনা ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ঘটনা-আলোচনাও পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে–

(১) "اصحاب الجنة বা কারিয়া জনপদবাসী, (৩) حضرت لقمان হযরত লোকমান (আ.), (৪) اصحاب السبت আসহাবুস সাব্‌ত, (৫)اصحاب الرس আসহাবুর রস্‌স, (৬) حضرت ذولقرنين হযরত যুলকারনাইন, اصحاب الكهف والرقيم (৭)আসহাবুল কাহাফ, (৮)قوم سبا কওমে সাবা, (৯) اصحاب الاخدود আসহাবুল উখদূদ ও (১০)اصحاب الفيل আসহাবুল ফীল ।

এ সব কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করে ইতিহাস রচনা করা পবিত্র কুরআনুল কারীমের উদ্দেশ্য নয় । বরং এ ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে একদিকে যেমন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের পাথেয় যোগায় এবং মুসলমানদেরকে নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করে, অপর দিকে এ কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায় ও উম্মতের শিক্ষণীয় ও প্রজ্ঞাপূর্ণ এ সব ঘটনাবলী ওই মহান সত্ত্বার পবিত্র যবান দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে যিনি সম্পূর্ণ উম্মী-নিরক্ষর ।

আজ পর্যন্ত যিনি কারো কাছে গিয়ে এ ধরনের কোনো জ্ঞান অর্জন করেননি । অতএব, নিশ্চিতভাবে তাঁকে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসব বিষয়ে অবগত করানো হচ্ছে । আর তিনি যে কালাম তেলাওয়াত করেন তাও মানুষের কালাম নয়; বরং তা মহান আল্লাহর কালাম ।

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত এ সব কাহিনী ও ঘটনাবলীর মাঝে ইলম ও প্রজ্ঞার অঢেল ভান্ডার রয়েছে । আর এর প্রতিটি আয়াত মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যার সঠিক ও সর্বোত্তম স মাধান ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে ।

এখানে প্রশ্ন ও তার জবাব

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন ও তার জবাব ঃ واقعات میں تکرار کیوں؟

পবিত্র কুরআনুল কারীমে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সাধারণত মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে কোনো কোনো সময় একই কাহিনী বারবার উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনুল কারীমের ৭২ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে । এমনটি হলো কেন? যদি একটি ঘটনা এক স্থানেই বর্ণনা করা হতো, আর অবশিষ্ট

সূচিপত্র

স্থানে আহকাম বর্ণনা করা হতো, তাহলে সম্ভবতঃ আরো অধিক সহজ হতো এবং অনেক মতবিরোধের নিরসন হয়ে যেত!

এই প্রশ্নের জবাব হলো যে, বিশেষ কয়েকটি হেকমতের কারণে একই ঘটনাকে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হেকমত নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ একবারেই অবতীর্ণ হয়নি। বরং ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে। এবং তা এমন এক উম্মতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের প্রাথমিক যুগে পদে পদে নতুন নতুন পরীক্ষা ও অসংখ্য দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বরং এভাবে বললেও অতিরঞ্জিত হবে না যে, এই উম্মতের গোটা জীবনটাই নিজেদের উন্নতির যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ, জিহাদ-কেতাল, জানবাজি, বীরত্ব ও কঠোর শ্রম-সাধনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে।

এমতাবস্থায় যদি তাদেরকে বার বার সান্ত্বনা না দেওয়া হতো, তাহলে তাঁরা হয়ত মনোবল হারিয়ে ফেলতেন। তাই তো পবিত্র কুরআনুল কারীম এমন প্রত্যেকটি মুহূর্তেই পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ঘটনা শুনিয়েছে, যেখানে তাঁরা কোনো দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার শিকার হয়েছেন এবং বার বার তাঁদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, এ ধরনের পরীক্ষায় তোমরা একাকী নও; বরং সত্যের পথে আহ্বানকারী প্রত্যেকটি কাফেলাই এই কঠিন উপত্যকা পেরিয়ে এসেছে আর অবশেষে সফলতা ও কল্যাণ তাদের পদচুম্বন করেছে।

এ কারণেই কোনো কোনো সময় পবিত্র কুরআনুল কারীমে একজন নবীর ঘটনাও শুধু এক স্থানে নয়; বরং খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেখানে যে নবীর যতটুকু ঘটনা বর্ণনা প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই অবতীর্ণ হয়েছে।

২. দ্বিতীয় হেকমত হলো এই যে, এ সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, আহকামের বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করার জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়নি। বরং তা শুধু আহকামের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করে দেয়। আর কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আকীদার পরিশুদ্ধি, উপদেশাবলী ও উত্তমকর্মের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। আর শাখাগত বিধি-বিধানগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নবী কারীম (ﷺ)-এর শিক্ষা ও ব্যাখ্যার উপর। তিনি তা "وحی غیر متلو"-এর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের রীতি-পদ্ধতি "হাদীসের প্রামাণ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা"-এর স্বপক্ষে অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি দলীল। কেননা ফিকাহ ও আইন শাস্ত্রে যদি শুধু কুরআনই দলীল হতো এবং হাদীসসমূহ দলীল না হতো,

সূচিপত্র

তাহলে পবিত্র কুরআনুল কারীমে শত শত কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করার পরিবর্তে 'আহকাম' বর্ণনা করা হতো। আর কাহিনী ও ঘটনাবলীকে ওহীয়ে গাইরে মাতলু'র মাধ্যমে বর্ণনা করা হতো।

আর এটা তো স্পষ্ট যে, কাহিনী বর্ণনা করা দ্বারা যে উদ্দেশ্য তা এ পদ্ধতিতেও পূর্ণাঙ্গভাবেই সম্পন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা এর উল্টো পদ্ধতি বিন্যাস দিয়ে যেন এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম আকীদা বিশুদ্ধিকরণ ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা শুধু আহকামের নীতিমালাই বর্ণনা করে। আর শাখাগত হুকুম-আহকামের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিক-নির্দেশনা হলো এই–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।'[৪৪৭]

৩. ঘটনা পূণরাবৃত্তির তৃতীয় হেকমত এটাও যে, এর দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের অলৌকিকত্ব প্রকাশ পায়। মানুষের সহজাত স্বভাব হলো যে, সে একই কথা বার বার শুনতে বিরক্তবোধ করে। কয়েক বার শোনার পর একটি অনন্য সুন্দর গল্প-ঘটনাতেও সে কোনো রোমাঞ্চ ও স্বাদ অনুভব করে না। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীম যদিও একই ঘটনা বার বার উল্লেখ করেছে, এতদসত্ত্বেও প্রত্যেকবারেই নতুন ভঙ্গিমা এবং প্রত্যেকবারেই নতুন স্বাদ ও রোমাঞ্চ অনুভব হয়। এই বিষয়টা মানুষকে অবলীলায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে দেয় যে, এই কালাম কোনো মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত রচনা নয়।

(৪) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য স্বতন্ত্র ঘটনাবলী ঃ مستقل واقعات

পবিত্র কুরআনুল কারীম ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কিছু ঘটনাও উল্লেখ করেছে। এ ধরনের ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে কেয়ামতের আলামতসমূহ, কেয়ামতের অবস্থা, হাশর-নশরের দৃশ্য, জাহান্নামের ভয়াবহতা ও জান্নাতের মনভোলানো নেয়ামতরাজির আলোচনা। কেয়ামতের পূর্বে ভূমি থেকে বাকশক্তিসম্পন্ন এক অদ্ভুদ প্রাণীর আত্মপ্রকাশ, ইয়াজুয-মাজুযের দেয়াল

---

৪৪৭. সূরা নিসা : ৬৫

সূচিপত্র

ফেড়ে বেরিয়ে আসা, ইসরাফীল (আ.)-এর সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, প্রশ্ন-উত্তর ও জাহান্নামীদের পরস্পর কথোপকথনের আলোচনা পবিত্র কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে বিদ্যমান রয়েছে।

চতুর্থ বিষয়বস্তু ঃ

উপমা ও উদাহরন ঃ امثال

পবিত্র কুরআনুল কারীমে যেসব উপমা-উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো দুই প্রকার। প্রথমতঃ ওইসব উপমা যা কোনো বিষয়কে বুঝানোর জন্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন–

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ

'অর্থ্যাৎ যারা আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা।'[৪৪৮]

এ উদাহরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত সম্পদের প্রতিদান পরকালে সাতশত গুণ হবে। বরং কোনো কোনো অবস্থায় এর চেয়েও অধিক পাওয়া যাবে। মানব-বিবেক এটাকে কিছুটা অসম্ভব মনে করতে পারতো, তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যেভাবে জমিনে বপনকৃত একটি শস্যদানা গাছে পরিণত হয়ে সাতশত নতুন দানা নিয়ে বিকশিত হয়, সেখানে দুনিয়ায় ব্যয়কৃত সম্পদও মানুষ আখেরাতে সাতশত গুণ বৃদ্ধিসহ পাবে।

এ ধরনের উপমা ও উদাহরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্ট ও প্রভাম্বিত করার জন্য পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার উপমা ও উদাহরণ হলো, যেগুলোকে আমরা প্রবাদ-বচন বা প্রবাদ-সাহিত্য বলে থাকি। এ ধরনের উদাহরণগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীমে দু'ভাবে উল্লেখ হয়েছে। কিছু তো এমন আছে যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বলতে গেলে পবিত্র কুরআনুল কারীমই এর আবিষ্কারক। যেমন

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)

"কল্যাণের প্রতিদান, কেবল কল্যাণই।"[৪৪৯]

---

৪৪৮. সূরা বাকারা : ২৬১

৪৪৯. সূরা : রাহমান : ৬০

সূচিপত্র

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"ক্ষমা কর, এটা তাকওয়ার খুবই নিকটবর্তী।" [৪৫০]

প্রবাদ-বচনের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যা পবিত্র কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবে তো উল্লেখ নেই। তবে ভাবার্থ থেকে তা বুঝা যায়। মনে হয় যেন তা সাধারণ প্রবাদ-বচনের উৎস বা এর দিকে ইঙ্গিত বহনকারী। এ ধরনের উদাহরণকে "আমসালে কামেনা" বলা হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন, আরবীতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে–

ليس الخبر كالعيان

"শোনা কথা কখনো চেখে দেখার মতো হয় না।"

এ ধরনের প্রবাদ পবিত্র কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায়। যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট আবেদন করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান?" তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি এটাকে বিশ্বাস কর না"? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন–

بلى ولكن ليطمئن قلبي

"অর্থ্যাৎ হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করি, (কিন্তু আমি এই আবেদন করেছি) যেন আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

অনুরূপ আরেকটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ–لايلدغ المؤمن من جحر مرتين

"মুমিনকে একই গর্তে দুবার ফেলে ধোঁকা খায়না।"

সূরা ইউসুফের একটি আয়াতে এ বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার পর হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নিকট গিয়ে আবেদন করল যে, আমাদের সাথে বেনইয়ামীনকেও যেতে দিন। তখন তিনি বললেন–

هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ

'অর্থ্যাৎ তোমাদেরকে কি আমি তার ব্যাপারে ততটুকুই নিরাপদ মনে করবো, যেমন নিরাপদ মনে করেছিলাম ইতঃপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে?'[৪৫১]

---

৪৫০. সূরা বাকারা : ২৩৭
৪৫১. সূরা ইউসুফ : ৬৪

হিতীয় অংশ

তাফসির শাস্ত্র

- তাফসির পরিচিতি
- তাফসিরের মূল নীতি
- ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসূলে তাফসীর (কুরআন তাফসীরের) মূলনীতি ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃএতে তাফসীর শাস্ত্রে অধ্যায়নরত, ইচ্ছুক এবং অগ্রহীদের জন্য পাথেয় রয়েছে। বিস্তারিতভাবে এতে আলোচিত হয়েছে তাফসীর শাস্ত্রের পরিচিতি; শব্দ বিশ্লেষণ, নামকরণের কারণ, তার সংজ্ঞাসহ তার আলোচ্যবিষয়সমূহ, যথাঃ ১। কুরআনের শব্দমালা ও পঠন পদ্ধতি, ২। তার শব্দগত অর্থ, ৩। শব্দগত আহকাম, ৪। শব্দের বাক্যগত আহকাম, ৫। তারকীবী অবস্থায় শব্দের সামষ্টিক অর্থ, ৬। অর্থের পূর্ণতা, তাফসীর ও তাবীলের মধ্যে পার্থক্য।

এছাড়াও এতে আলোচিত হয়েছে তাফসীরের মূল উৎসসমূহের বিস্তারিত বিবরণ, যথাঃ ১। স্বয়ং কুরআনুল কারীম, ২। হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ৩। আসারে সাহাবা, ৪। আসারে তাবেয়ীন, ৫ আরবী ভাষা, ৬। সুস্থ বিবেক।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো

সূচিপত্র

ইলমে তাফসীর শাস্ত্র ও ইহার উৎস : علم تفسیر اور اس کے مآخذ

তাফসীর পরিচিতি : تعارف

تفسیر তাফসীর শব্দটি প্রকৃতপক্ষে فسر ফাসরুন ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো, খোলা, উন্মুক্ত করা। এ শাস্ত্রে যেহেতু পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তু ও বক্তব্যকে খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তাই এই শাস্ত্রকে علم تفسیر (বা "তাফসীর শাস্ত্র") বলা হয়। এ জন্য প্রাথমিক যুগে শুধু পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাকেই 'তাফসীর' নামে অভিহিত করা হতো।[৪৫২] যেহেতু নববী যুগের নিকটবর্তী হওয়া এবং বিষয়ভিত্তিক শাস্ত্রগতরূপ না থাকায়, সে যুগে তাফসীর শাস্ত্রের অধিক শাখা-প্রশাখা ছিল না।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন ইহা একটি সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের রূপ লাভ করলো এবং বিভিন্ন দিক থেকে এর উপর গবেষণা করা হলো, তখন তা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এক শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। কালের চাহিদা প্রেক্ষিতে এতে আরো অনেক বিষয় যোগ হতে থাকে। ফলে এসকল বিষয়াবলীকে শামিল করে "ইলমে তাফসীর"-এর সংজ্ঞা হলো এই–

عِلم يُبحَثُ فِيهِ عَن كَيفِيَّةِ النَطقِ بِأَلفَاظِ القُرأن وَمَدلُولاَ تِهاَ وَأَحكَامِهاَ الافرادِيةِ وَالتركِيبِيةِ. وَمُعاَنِيهاَ التِي تُحملُ عَلَيهاَ حالةُ التَّركيبِ وتَتماست لذلكَ

'ইহা এমন এক শাস্ত্র যাতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এর ভাবার্থ এবং এর শব্দগত ও বাক্যগত আহকাম আর ওই শব্দমালার তারকীবী অবস্থার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। সাথে সাথে ওই অর্থগুলোর পূর্ণতা, নাসিখ-মানসূখ এবং শানে নুযূল ও অস্পষ্ট কাহিনীগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়– তাকে ইলমে তাফসীর বা তাফসীর শাস্ত্র বলা হয়।[৪৫৩]

উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে "তাফসীর শাস্ত্র" নিম্নোক্ত বিষয়াবলী নিয়ে সমৃদ্ধ

১. "পবিত্র কুরআনের শব্দমালার উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতি" : অর্থাৎ পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দমালাকে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে পাঠ করা যায়? এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য প্রাচীন আরবী মুফাসসিরগণ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে প্রত্যেকটি আয়াতের সাথে এর পঠন পদ্ধতিটিও বিস্তারিত

---

৪৫২. যেমন, আলামা যারকাশী (রহ.) সংক্ষেপে ইলমে তাফসীরের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন–
৪৫৩. রূহুল মাআনী : ১/৪
২১–

সূচিপত্র

আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিতেন। আর এই উদ্দেশ্যে 'عِلْمُ التَّفْسِيْر' নামে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

২."পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দগত অর্থ" ঃ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর আভিধানিক অর্থ। এর জন্য অভিধান শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এর উপর ভিত্তি করেই তাফসীর গ্রন্থসমূহে অধিকহারে অভিধানবেত্তাদের উদ্ধৃতি ও আরবী সাহিত্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

৩. "শব্দগত স্বতন্ত্র আহকাম" ঃ অর্থাৎ প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে এ জ্ঞান লাভ করা যে, এর মাদ্দা বা মূলধাতু কি? বর্তমান অবস্থায় তা কিভাবে আসল? এর ওজন কি? এ ওজনের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য কি? এ সব জ্ঞান লাভের জন্য علم الصرف (শব্দ-প্রকরণ শাস্ত্র)-এর প্রয়োজন পড়ে।

৪. "শব্দের বাক্যগত আহকাম" ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের ব্যাপারে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, অন্য শব্দের সাথে মিলে তা কি অর্থ প্রকাশ করছে? এর নাহ্ভী তারকীব (Grammatical Analysis) কি? এর উপর বর্তমান হরকতটি কেন এসেছে? এবং শব্দটি কোন্ অর্থের উপর প্রতীয়মান হচ্ছে? এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য 'ইলমে নাহ্ভ' ও 'ইলমে মা'আনী' থেকে সাহায্য নেওয়া হয়।

৫. যৌগিক শব্দের সামষ্টিক অর্থ" ঃ অর্থাৎ পূর্বা-পর মিল রেখে পুরো আয়াতটি কি অর্থ দিচ্ছে? এর জন্য আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ইলম-শাস্ত্র থেকে সহায়তা নেওয়া হয়।

উল্লেখিত শাস্ত্র ব্যতীত কখনো কখনো ইলমে আদব ও ইলমে বালাগাত থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়। আবার কখনো ইলমে হাদীস থেকে আবার কখনো উসূলে ফিকাহ থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়।

৬. "অর্থের পরিপূর্ণতা" ঃ অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের পটভূমি এবং যেসব বিষয় পবিত্র কুরআনুল কারীমে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এর জন্য অধিকতর 'ইলমে হাদীস' থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু এ ছাড়াও এই ময়দান এতই বিস্তৃত যে, সকল প্রকার ইলম ও শাস্ত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞান এতে সংকুলান হয়ে যায়। কারণ পবিত্র কুরআনুল কারীম কোনো কোনো সময় সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য বলে দেয়। কিন্তু এর মধ্যে অজানা তত্ত্ব ও তথ্যের এক সীমাহীন জগৎ নিহিত থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تُبْصِرُونَ

সূচিপত্র

'আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (চিন্তা কর), তোমরা কি অনুধাবন করবে না?' [৪৫৪]

চিন্তা করে দেখুন, সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটির ব্যাখ্যা ও বিশদ বিশ্লেষণে গোটা শরীরবৃত্তি বিদ্যা (Physiology) ও সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান (Psychology) সংকুলান হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও এ কথা বলা যায় না যে, মহান আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মধ্যে স্বীয় সৃষ্টির যে নিগূঢ় রহস্যের অজানা তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাফসীরের এই সংশ্লিষ্ট অংশে বিবেক, চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ প্রমাণাদির মাধ্যমে অসংখ্য-অগণিত বিষয়াবলী শামিল হয়ে যায়।

তাফসীর ও তাভীল প্রসঙ্গ ঃ تفسير وتاويل

পূর্ব যুগে 'তাফসীর'-এর জন্য অপর একটি শব্দ "তাভীল" অধিকহারে ব্যবহৃত হতো। স্বয়ং পবিত্র কুরআন মাজীদও তাফসীরের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (আর আল্লাহ ব্যতীত এর তাফসীর কেউ জানে না)। তাই পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে এ আলোচনা এসে দাঁড়িয়েছে যে, উক্ত শব্দ দু'টি কি সমার্থবোধক? নাকি উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে?

ইমাম আবু উবাইদ (রহ.) প্রমুখ বলেন, শব্দ দু'টি পারস্পরিক সমার্থবোধক। অনেকে শব্দ দু'টির মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করার চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন এত অধিক মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, সবগুলো উল্লেখ করাও সহজ সাধ্য ব্যাপার।

এসম্পর্কে কয়েকটি মতামত এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

১. 'তাফসীর' হলো বাক্যস্থিত প্রতিটি শব্দের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যার নাম। আর 'তাভীল' হলো বাক্যের সমষ্টিগত ব্যাখ্যার নাম।

২. শব্দমালার প্রকাশ্য অর্থ বর্ণনা করাকে বলা হয় 'তাফসীর'। আর আসল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাকে বলা হয় 'তাভীল'।

৩. ওই আয়াতের ব্যাখ্যাকেই 'তাফসীর' বলা হয়, যার মধ্যে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে না। আর 'তাভীল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাবলীর মধ্য হতে দলীলের সাথে যে কোনো একটি গ্রহণ করে নেওয়া।

৪. ইয়াকীন বা পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে ব্যাখ্যা করাকে বলা হয় 'তাফসীর'। আর দোদুল্যমানতার সাথে ব্যাখ্যা করাকে বলা হয় 'তাভীল'।

---

[৪৫৪] . সূরা যারিআত : ২১

সূচিপত্র

৫. শব্দমালার ভাবার্থ বর্ণনা করার নাম হলো, 'তাফসীর'। আর ভাবার্থ থেকে নির্গত শিক্ষা ও ফলাফলের সবিস্তার বর্ণনার নাম হলো, 'তাভীল'।

কিন্তু বস্তুত, এ ব্যাপারে আবু উবাইদ (রহ.)-এর মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দ দু'টির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যারা পার্থক্য বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতামতের উপর চিন্তা করলে অনুমান করা যায় যে, তা নির্দিষ্ট ও সর্বসম্মত কোনো পরিভাষার মর্যাদা পায়নি।

আর যদি বাস্তবেই এগুলোর মাঝে পার্থক্য থাকতো, তাহলে এত কঠোর মতপার্থক্যের কোনো অর্থ ছিল না। ঘটনাটি মনে হয় এমন যে, কোন কোন আলেম 'তাফসীর' ও 'তাভীল' শব্দ দু'টিকে পৃথক পৃথক পরিভাষার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতে এমন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, কোনো পরিভাষাই বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। এ কারণেই প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি মুফাসসিরগণ ওই শব্দগুলোর সাথে সাধারণত সমার্থবোধক শব্দের ন্যায় ব্যবহার করে আসছেন এবং আকুণ্ঠ চিত্তে একটির স্থানে অন্যটিকে ব্যবহার করে আসছেন। কাজেই এই আলোচনায় সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাফসীরের মূল উৎস ঃ تفسیر کے مآخذ

ইলমে তাফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কুরআন তাফসীরের মূল উৎস কি? অর্থাৎ ওই সকল মাধ্যম, যেগুলো দ্বারা আমরা কোনো আয়াতের তাফসীর করতে পারি। এ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। নিম্নে তা উপস্থাপন করা গেল।

সর্বপ্রথম এ কথা বুঝে নিন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলো দুই ধরনের। কিছু আয়াত তো এতই সুস্পষ্ট, বিকশিত ও সহজবোধ্য যে, আরবী ভাষায় পারদর্শি যে কোনো ব্যক্তি তা পাঠ করতেই সাথে সাথে এর উদ্দেশ্য তার বুঝে এসে যাবে। তাই এ জাতীয় আয়াতগুলোর তাফসীরের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মতবিরোধের প্রশ্নই আসে না। এ জাতীয় আয়াতের তাফসীরের উৎস শুধুমাত্র আরবী ভাষা।

আরবী ভাষার উপর দক্ষতাপূর্ণ দৃষ্টি ও সুস্থ বিবেক ছাড়া এগুলোর উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।[৪৫৫]

---

[৪৫৫] সঠিক কথা হলো, ইলমে তাফসীরের একটি প্রকার এমন রয়েছে, যা নকলী দলীল-প্রমাণের উপর মওকূফ থাকে। আর তার আরেকটি প্রকার এমন রয়েছে, যা অন্য বিষয়ের উপর মওকূফ থাকে না। আল-বুরহান [যারকাশী] : ২/১৭১, অনুচ্ছেদ : ৪১, আল-ইতকান : ২/১৮৩, পরিচ্ছেদ : ৭৮, (আখিরুল কালাম আলাত তাফসীর বির রায়

সূচিপত্র

তবে পবিত্র কুরআনুল কারীমে দ্বিতীয় প্রকারে সেসব আয়াত সন্নিবেশিত, যেগুলোর মধ্যে কোনো সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা কিংবা ব্যাখ্যাগত জটিলতা পাওয়া যায়। অথবা সেগুলো পরিপূর্ণভাবে বুঝার জন্য সেগুলোর পুরো পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অথবা সেগুলো থেকে আইনের কোনো সূক্ষ্ম মাস'আলা সাব্যস্ত হয় কিংবা কোনো নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়। এসব আয়াতের তাফসীরের জন্য শুধু আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য অনেক ইলম ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সামনে এ ধরনের আয়াতসমূহের তাফসীরে মূল উৎসগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে 'কুরআন তাফসীরের-এর মোট ৬টি উৎস।

(১.) স্বয়ং কুরআন মাজীদ। (২.) হাদীসে নববী স.। (৩.) সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য। (৪.) তাবেঈনদের বক্তব্য। (৫.) আরবী ভাষা। (৬.) সুস্থ বিবেক।

এই উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণন ব্যাখ্যা ও ইলমে তাফসীরে সেগুলোর অবস্থান সম্পর্কে নিম্নে কিছু আলোচনা পেশ করা হলো।

প্রথম উৎস ঃ স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীম ঃ پہلا ماخذ، خود قرآن کریم

কুরআন তাফসীরের প্রথম উৎস হলো, স্বয়ং কুরআনুল কারীম। অর্থাৎ কোনো কোনো সময় পবিত্র কুরআনুল কারীমের এক আয়াত অপর আয়াতের তাফসীর করে থাকে। এক স্থানে একটি বিষয় অস্পষ্টভাবে বলা হয়, আর অন্য স্থানে (অপর আয়াত দ্বারা) এই অস্পষ্টতা দূর করে দেওয়া হয়। যেমন, সূরা ফাতিহায় ইরশাদ হয়েছে–

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

'অর্থ্যাৎ আমাদেরকে সরল পথ দেখান। তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন।'

এখানে এ কথা স্পষ্ট করা হয়নি যে, যাদেরকে তিনি নেয়ামত দান করেছেন, তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য কারা? কিন্তু ইরশাদ হয়েছে–

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

'অর্থ্যাৎ আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে।'[৪৫৬]

অনুরূপভাবে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

---

৪৫৬. সূরা নিসা : ৬৯

সূচিপত্র

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

'অতঃপর আদম (আ.) তাঁর রবের পক্ষ থেকে কিছু বাক্য শিখে নিলেন, ফলে আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন।'[৪৫৭]

কিন্তু সেই বাক্যগুলো কি এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তবে অপর এক স্থানে এই বাক্যগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)

'তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[৪৫৮]

এমনিভাবে এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।'[৪৫৯]

এখানে এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, 'সত্যবাদী' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? কিন্তু অপর একটি আয়াতে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে–

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী।[৪৬০]

---

৪৫৭. সূরা বাকারা : ৩৭
৪৫৮. সূরা আরাফ : ২৩
৪৫৯. সূরা তাওবা : ১১৯
৪৬০. সূরা বাকারা : ১৭৭

সূচিপত্র

এই আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, "সত্যবাদী" দ্বারা ওই সকল লোক, যাদের মধ্যে উপর্যুক্ত গুণগুলো পাওয়া যায়। এখানে শুধু তিনটি উদাহরণ পেশ করা হলো। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ ধরনের আরো বহু আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।

"কুরআন দ্বারা কুরআন" তাফসীরের দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ এমনও হয়ে থাকে যে, এক ক্বেরাতে কোনো কথা অস্পষ্ট থাকে। আর অন্য ক্বেরাত দ্বারা সেই অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়। যেমন এক ক্বেরাতে ওযু করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ'

আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী আয়াতটির অনুবাদ এমনও হতে পারে–

'তোমরা তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত করা)।' [৪৬১]

আবার এ রকমও হতে পারে–

"নিজেদের মাথা ও পা সমূহ মাসেহ করা।"

কিন্তু অন্য ক্বেরাতে وَأَرْجُلِكُمْ -এর স্থলে وَأَرْجُلَكُمْ এসেছে। এই ক্বেরাত অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি অনুবাদই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, "তোমাদের পাগুলো ধুয়ে নাও"। অতএব, এই ক্বেরাতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পূর্বোল্লিখিত ক্বেরাতেও পা ধুয়ে নেওয়ারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এতে 'মাসেহ' করার অর্থও হতে পারে তবে তা উদ্দেশ্য নয়।

এভাবে মুতাওয়াতির ক্বেরাতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন মাজীদের যে তাফসীর করা হয়, তা নিশ্চিত ও অকাট্য হয়ে থাকে। মাশহুর ক্বেরাত দ্বারা যদিও নিশ্চয়তা হাসিল হয় না, তথাপি তাফসীরের ক্ষেত্রে এক বিরাট গুরুত্ব হয়েছে। কিন্তু 'শায়' ক্বেরাতের ব্যাপারে আহলে ইলম বা বিজ্ঞজনদের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ তাফসীরের ক্ষেত্রে এর কোনো গুরুত্ব দেন না। আর কেউ কেউ "খবরে ওয়াহিদ"-এর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ মাস'আলার পুরো বিবরণ উসূলে ফিক্‌হের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

"কুরআন দ্বারা কুরআন" তাফসীরের তৃতীয় আরেকটি উদাহরণ হলো এই যে, যে আয়াতের তাফসীর করা উদ্দেশ্য হবে, স্বয়ং ওই আয়াতের অগ্র-পাশ্চাত্যের যোগসূত্র (Context)-এর উপর চিন্তা-গবেষণা করা হবে। এভাবে অনেক সময় আয়াতের কোনো উদ্দিষ্ট মাস'আলার ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, সূরা আহযাবে উম্মাহাতুল মুমিনীনকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে–

---

[৪৬১] . সূরা মায়েদা : ৬

সূচিপত্র

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।' [৪৬২]

শরঈ নীতিমালার ব্যাপার অজ্ঞ কোনো কোনো লোক এ আয়াতে নবী পত্নীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে দেখে এ দাবীকরে বসেছে যে, পর্দার হুকুম শুধু নবী-পত্নীদের সাথেই নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণ নারীদের জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য নয়! কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীমের অগ্র-পশ্চাতের যোগসূত্র এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করছে। এই আয়াতের আগে ও পরে নবী-পত্নীদেরকে সম্বোধন করে আরো কয়েকটি নির্দেশ উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হলো–

(১.) বচনভঙ্গিতে নম্রতা ও আকর্ষণীয় ভাব পরিহার করা। (২.) ভালো কথা বলা। (৩.) নামাজ কায়েম করা। (৪) যাকাত আদায় করা। (৫) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করা।

এই বিধানগুলোর মধ্য হতে কোনো একটিও এমন নেই, যার ব্যাপারে কোনো বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা বলতে পারবে যে, তা শুধু নবী-পত্নীদের সাথেই নির্দিষ্ট এবং অন্যান্য নারীদের এর উপর আমল করা জরুরী নয়। সুতরাং এ সবগুলো বিধানের মধ্য হতে শুধু মাঝখান থেকে একটি বাক্যের ব্যাপারে এ কথা বলা যায় যে, তা সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়–কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে রাসূল ছাড়াও পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতের অগ্র-পশ্চাতের যোগসূত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নবী-পত্নীদেরকে এখানে সম্বোধন করার কারণ হলো যে, তাদের উপর শরঈ আহকামের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তাঁদের এসব বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এমনিভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

'আর যখন তাঁদের (নবী-পত্নীদের) কাছে তোমরা কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।' [৪৬৩]

এই আয়াতের ব্যাপারেও কোনো কোনো অজ্ঞ লোক এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, এই নির্দেশটি শুধু নবী-পত্নীদের সাথে নির্দিষ্ট। অথচ এ আয়াতের পরের আয়াতটি এ কথা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এ নির্দেশ সমগ্র নারী জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইরশাদ হয়েছে–

---

[৪৬২]. সূরা আহযাব : ৩৩

[৪৬৩]. সূরা আহযাব : ৩৪

সূচিপত্র

ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

'এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।'[৪৬৪]

এ কথা সুস্পষ্ট যে, মনের পবিত্রতার ব্যাপারটি শুধু নবী-পত্নীদের জন্যই উদ্দেশ্য নয়। বরং সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য তা আবশ্যকীয়। কাজেই বিশেষ কিছু নারীর জন্য আয়াতের নির্দেশকে সীমিত করে নেওয়া কীভাবে বৈধ হতে পারে?[৪৬৫]

অনুরূপভাবে সূরা আহযাবের অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)

'হে নাবীর পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।'[৪৬৬]

কোনো কোনো ব্যক্তি এ আয়াতের ক্ষেত্রে এ কথা বলে দিয়েছে যে, এখানে "আহলে বাইত" বলতে শুধু নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঔরসজাত সন্তান-সন্ততিতে বুঝানো হয়েছে! নবী-পত্নীগণ এর অন্তর্ভুক্ত নন। অথচ পবিত্র কুরআনুল কারীমের অগ্র-পশ্চাতের যোগসূত্র এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কেননা এ আয়াতের পূর্ব ও পরের সবগুলো সম্বোধন নবী-পত্নীদের করা হয়েছে। তাই এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তাঁরা "আহলে বাইত"-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না? বিশেষ করে পরের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ

'আর (হে নবী-পত্নীগণ!) তোমাদের ঘরে যা তেলাওয়াত করা হয়– তা তোমরা স্মরণ কর।'[৪৬৭]

এ আয়াতে بُيُوتِ শব্দ থেকে বুঝে আসে যে, পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত "আহলে বাইত"-এর মাঝে নবী-পত্নীগণ তো সর্বাগ্রে অন্তর্ভুক্ত। তাঁদেরকে এ থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ মাত্র কয়েকটি আয়াত তুলে ধরাছি। অন্যথায় পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপর গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাফসীরের বহু কঠিন কঠিন মাস'আলা অগ্র-পশ্চাতের যোগসূত্র দেখে সমাধান করা যায়। অবশ্য কখনো কখনো অগ্র-পশ্চাতের যোগসূত্র দ্বারা

---

৪৬৪. সূরা আহযাব : ৫৩

৪৬৫. পর্দার বিধান ব্যাপক হওয়ার উপর আরো বহু স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এখানে শুধু উদাহরণস্বরূপ আয়াতের অগ্র-পশ্চাতের যোগসূত্র সম্পর্কিত আয়াতকটি তুলে ধরা হলো।

৪৬৬. সূরা আহযাব : ৩৩

৪৬৭. সূরা আহযাব : ৩৪

সূচিপত্র

আয়াতের তাফসীর এতই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো যুক্তিবাদীই এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এ ধরনের তাফসীর নিশ্চিত ও অকাট্য হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো যোগসূত্র দ্বারা যে তাফসীর করা হয়, তা এতটা স্পষ্ট হয় না। তাই সেটাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের মতামত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

এই ছিল "কুরআন দ্বারা কুরআন" তাফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। কোনো কোনো মনীষী তো এমন পূর্ণাঙ্গ তাফসীরও লিখেছেন, যার মধ্যে প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীর অন্য কোনো আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। এ ধরনের একটি তাফসীর আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) 'আল-ইতকান' গ্রন্থে এর আলোচনা করেছেন।[৪৬৮]

এ ধরনেরই মূল্যবান একটি তাফসীর পবিত্র মদীনার একজন আলেম শায়েখ মুহাম্মদ আমীন ইবনে মুহাম্মদ মুখতার শানক্বীতী (রহ.) কয়েক বছর পূর্বে রচনা করেছেন। যা "আযওয়াউল বয়ান ফী ঈযাহিল কুরআনী বিল কুরআন" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি কুরআন দ্বারা কুরআন তাফসীরের বিভিন্ন প্রকার ও ধরন অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।[৪৬৯]

দ্বিতীয় উৎস ঃ হাদীসে নববী (ﷺ) ঃ دوسرا ماخذ، احادیث نبوی

কুরআন তাফসীরের দ্বিতীয় উৎস হলো, নবী কারীম (ﷺ)-এর হাদীস সমূহ। পবিত্র কুরআন মাজীদ একাধিক স্থানে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দু'জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে এ দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, তিনি তাঁর কথা ও কর্ম দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা করবেন। যেমন, সূরা নাহলে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

'অর্থ্যাৎ আর আমি আপনার প্রতি এ জন্যই কুরআন নাযিল করেছি যে, আপনি মানুষের কাছে সেসব কথা স্পষ্ট করে দিবেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।'[৪৭০]

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তিনি মানুষের নিকট পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা করে দিবেন। আরো ইরশাদ হয়েছে–

---

৪৬৮. আল-ইতকান : ২/১৭৫

৪৬৯. আযওয়াউল বয়ান : ১/৭-৩৭, দারুল ইস্পাহানী, জিদ্দা থেকে প্রকাশিত– ১৩৭৮ হিজরী।

৪৭০. সূরা নাহল : ৪৪

সূচিপত্র

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (164)

নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন, যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনাচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত (সুন্নাহ) শিক্ষা দিচ্ছে, যদিও তারা পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।"[৪৭১]

অনুরূপভাবে সূরা নিসা'য় ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

'নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন সে অনুযায়ী, যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন।'[৪৭২]

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)

'আমি তোমার প্রতি কিতাব এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি সে সকল বিষয় স্পষ্ট করে দিতে পার যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, আর (এ কিতাব) বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমাত স্বরূপ।'[৪৭৩]

এ আয়াতগুলোতে স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীম এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সমগ্র জাহানের সর্দার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিল এটা যে, তিনি দুনিয়াবাসীকে কুরআনুল কারীমের দিক-নির্দেশনা এবং অজানা তথ্য ও নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবহিত করবেন। কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার পদ্ধতি শেখাবেন। অতএব, স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকেই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা-দীক্ষা কুরআন তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এমনিতেও এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য লম্বা-চওড়া কথার কোনো প্রয়োজন নেই যে, কোনো আসমানী গ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন, যার উপর ওই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। এ পৃথিবীতে ওই ব্যক্তির চেয়ে নির্বোধ আর কে হতে পারে, যে এ কথা বলে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম তো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, কিন্তু এর তাফসীর আমি অধিক জানি?

---

৪৭১. সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪
৪৭২. সূরা নিসা : ১০৫
৪৭৩. সূরা নাহল : ৬৪

সূচিপত্র

কতিপয় লোক এই ভুল বুঝাবুঝি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী ও দিক-নির্দেশনার গুরুত্ব তো স্বীকৃত। কিন্তু সেসব বাণী ও দিক-নির্দেশনা যেহেতু আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি, তাই আমরা সেগুলোর উপর ভরসা করতে পারি না!

তবে এই প্রতারণার অর্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এক দিকে তো নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মু'আলিম বা শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন বার বার এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য তাঁকে পাঠানো হচ্ছে। তাই কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা ও নীতির অনুসরণ করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। আর অপর দিকে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যাখ্যাবলী কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার কোনো সুব্যবস্থা করবেন না–এ কথা এমন কোনো ব্যক্তি বলতে পারবে, যে মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম প্রজ্ঞা ও পূর্ণাঙ্গ কুদরতের প্রতি বিশ্বাস রাখে? যে পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি পাঠ করেছে–

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।'[৪৭৪]

আবার কেউ কেউ তো এতটুকু পর্যন্ত বলে ফেলে যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের যুগের জন্য মুআল্লিম ছিলেন বটে; তবে (নাঊযুবিল্লাহ) আমাদের যুগের জন্য তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন বাকি রয়নি! এই লাগামহীন কথার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, ওই সকল সাহাবায়ে কেরাম যাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী, যারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের এক একটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ জানতেন। যারা কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে শুধু সচেতনই ছিলেন না; বরং বাস্তব জীবনেও তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যারা এক একটি আয়াতের পটভূমি স্বচক্ষে অবলোকন করতেন, তাঁদের তো কোনো নবীর দিক-নির্দেশনা ব্যতীত কুরআন বুঝে আসতো না।

কিন্তু তাঁদের মুকাবিলায় এই যুগের মানুষ, যাদের না মাতৃভাষা আরবী, না কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট তাদের সম্মুখে রয়েছে আর না এর পটভূমি সম্পর্কে তারা অবগত আছে–তাদের পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর জানার জন্য কোনো পয়গাম্বরের দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন নেই!? যদি মস্তিষ্কে লেশমাত্র বিবেক-বুদ্ধি এবং অন্তরে ন্যায়-নিষ্ঠার সামান্যতম অংশও বাকি থাকে, তাহলে এই অসংলগ্ন ও লাগামহীন কথাকে কেউ মেনে নিতে পারে না।

---

[৪৭৪]. সূরা বাকারা : ২৮৬

সূচিপত্র

এটা একটা বিশাল আলোচনা সাপেক্ষ একটি বিষয় যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও দিক-নির্দেশনা যেসব সূত্রযোগে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য? এই বিষয়ে তাহকীক ও গবেষণার জন্য ইলমে হাদীস ও 'আসমাউর রিজাল' (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত)-এর পুরো গ্রন্থাগার বিদ্যমান রয়েছে। নিজের কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য জোরপূর্বক শরঈ অনুমোদন তালাশ করা আলাদা কথা। কিন্তু যদি সাচ্চা হৃদয়ে ওই বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে মানুষ এ ফলাফলে উপনীত না হয়ে পারবে না যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনাকে এমনিতেই আজকের দুনিয়া পর্যন্ত অবশ্যঅনুসরণ যোগ্য স্থির করেননি; বরং এর সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা দেখে মানব-বিবেক হয়রান হয়ে যায়! হাদীসের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা বাদ দিয়ে শুধু এক আসমাউর রিজালকেই দেখে নিন। দেখবেন, এটা এই উম্মতের এমন অবাক করা কীর্তি ও গর্বের বিষয়, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি যার নজীর পেশ করতে পারবে না।

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত যে কেউ কোথাও কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন, আসমাউর রিজালের গ্রন্থগুলোতে এর চুল-চেরা বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। কোথায় তার জন্মস্থান? কার কার কাছ থেকে তিনি ইলমে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন? কোন্ কোন্ রাবী'র সাথে তার সাক্ষাত লাভ হয়েছে? তার সাধারণ জীবন ও চাল-চলন কেমন ছিল? স্মৃতিশক্তি কেমন ছিল? রেওয়ায়েত বর্ণনা করতে গিয়ে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন? তার সমসাময়িক ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম তার ব্যাপারে কি কি মন্তব্য করেছেন? আজও হাদীস গ্রন্থের যে কোনো হাদীসের যে কোনো রাবী'র নাম বের করে দেখুন, আসমাউর রিজালের গ্রন্থগুলোতে তার ব্যাপারে উপযুক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে যাবেন।

এখানে আমার হাদীস সংরক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে নেই। এর জন্য হাদীস সংকলনের উপর লিখিত বড় বড় অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তবে এখানে কেবল এতটুকু ইশারা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস সমূহ থেকে বিমুখ হওয়া এমন একটি কর্মনীতি, যার উপর পবিত্র কুরআনুল কারীম, সাধারণ জ্ঞান ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে কোনো দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে ফলাফল সর্বদা এটাই দাঁড়াবে যে, এর মূলে বিবেক-বুদ্ধির মধ্যে পড়েনি।

সূচিপত্র

তবে এটা ঠিক যে, বিদ্যমান হাদীসের ভান্ডারে সহীহ ও দুর্বল সব ধরনের রেওয়ায়েতই পাওয়া যায়। তাই যেখানে যে রেওয়ায়েত পাওয়া যাবে সেটা পড়েই কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

বরং উসূলে হাদীসের নিরিখে এটাকে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন আছে যে, তা হাদীস শাস্ত্রের নীতি-সম্মত হয়েছে কি-না? বিশেষ করে তাফসীর গ্রন্থাদিতে যেসব রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এগুলোর তথ্যানুসন্ধান এজন্য বেশি প্রয়োজন যে, অধিকাংশ মুফাসসির নিজেদের গ্রন্থাদিতে সব ধরনের রেওয়ায়েত কেবল একত্রিতই করে দিয়েছেন। উসূলে হাদীসের মানদণ্ড ও পদ্ধতি অনুযায়ী সেগুলোর তাহকীক ও বিচার-বিশ্লেষণের আলোচনায় যাননি। তাই এ সকল রেওয়ায়েত থেকে ওই ব্যক্তিই যথাযথভাবে উপকৃত হতে পারেন, যিনি ইলমে হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দূরদৃষ্টি রাখেন। যিনি সহীহ ও দুর্বল বর্ণনা পরখ করার উসূল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে।

তৃতীয় উৎস ঃ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ঃ تيسرا ماخذ، اقوال صحابہ

যে সকল মনীষী নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে সরাসরি পবিত্র কুরআনুল কারীমের শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ এমন ছিলেন, যাঁরা সরাসরি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর اقوال (বাণী) ও افعال (কর্ম) থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীম, এর তাফসীর ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে নিজেদের পুরো জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু আরবী ভাষা-ভাষীই ছিলেন না। বরং কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ভাষাজ্ঞানের উপর ভরসা করার পরিবর্তে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে এক সবক এক সবক করে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পড়েছেন।

ইমাম আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহ.) প্রখ্যাত তাবেঈ আলেম বলেন-

حدثنا الذين كانوا يقرءون القرأن كعثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر أيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل

'সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে যারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের শিক্ষা প্রদান করতেন, যেমন– হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখ তাঁরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে দশটি আয়াত শিক্ষা লাভ

করার পর ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না, যতক্ষণ না ওই আয়াতগুলোর পরিপূর্ণ ইলমী ও আমলী বিষয়ের ইলম অর্জন না হতো।'[৪৭৫]

এ জন্যই মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন–

كَانَ الرَّجلَ إِذَا قَرَأَ البَقَرَةَ وَأل عِمرانَ جَدَّ فِي أعيننَا

'যখন কোনো ব্যক্তি সূরা বাকারা ও আলে-ইমরান পড়ে নিতো, তখন সে আমাদের দৃষ্টিতে অনেক সম্মানিত হয়ে যেত।'

'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' গ্রন্থে বর্ণিত আছে–

أَقَامَ ابنُ عُمَرَ عَلَى حِفظِ البَقَرَةِ ثَمَانِ سِنِينَ

'হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী শুধুমাত্র সূরা বাকারা আয়ত্ত করেছেন।[৪৭৬]

বস্তুত এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এত দুর্বল মেধার অধিকারী ছিলেন না যে, শুধু সূরা বাকারার শব্দমালা আত্মস্থ করতে তাঁর আট বছর সময় লেগে যাবে। নিশ্চয়ই এ দীর্ঘ সময় এ জন্য ব্যয় হয়েছে যে, তিনি কুরআনের শব্দমালা হেফজ করার সাথে সাথে তার তাফসীর ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন–

والذى لا اله غيره ما نزلت اية من كتاب الله الا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. ولوأعلم احدا أعلم يكتاب الله منى تناله المطايا لاتيته

'অর্থ্যাৎ শপথ! ওই সত্ত্বার, যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই। পবিত্র কুরআনুল কারীমের এমন কোনো আয়াত নাযিল হয়নি, যার ব্যাপারে আমি অবগত নই যে, আয়াতটি কার সম্পর্কে ও কোথায় নাযিল হয়েছে? আমি যদি এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান পাই, যিনি পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন এবং তার নিকট সওয়ারী পৌছতে সক্ষম হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তার নিকট যাব।[৪৭৭]

তাই তো রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসমূহের পর কুরআন তাফসীরের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে, ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও উক্তিসমূহ যারা এ রকম প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর শিখেছিলেন। তবে এখানেও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

---

৪৭৫. আল-ইতকান : ২/১৭৬ পরিচ্ছেদ : ৭৮

৪৭৬. আল-ইতকান : ২/১৭৬ পরিচ্ছেদ : ৭৮

৪৭৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৩

সূচিপত্র

১. সাহাবায়ে কেরামের তাফসীর বিষয়ক বাণী ও উক্তিগুলোতেও সহীহ ও দুর্বল সব ধরনের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। কাজেই ওই কথাগুলোর উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে উসূলে হাদীসের ভিত্তিতে তা যাচাই-বাছাই করে নেওয়া আবশ্যক।

২. সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও উক্তি তখনই দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে যখন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে আয়াতের কোনো সুস্পষ্ট তাফসীর নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত না থাকবে। যদি তাঁর পক্ষ হতে বর্ণনাকৃত কোনো তাফসীর সহীহ হাদীসসমূহে পাওয়া যায়, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের বাণী শুধু সমর্থন হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর যদি তাঁদের কোনো কথা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তাফসীরের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. যেখানে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে বর্ণিত কোনো তাফসীর উপস্থিত না থাকে এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরসমূহের মধ্যে কোনো মতবিরোধ না থাকে, সেখানে তাদের বাণী ও উক্তিই গ্রহণযোগ্য হবে।

৪. যেখানে সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরসমূহের মধ্যে কোনো মতবিরোধ পরিলক্ষিত হবে, সেখানে প্রথমে দেখতে হবে যে, এই মতবিরোধপূর্ণ বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব কি-না? যদি সম্ভব হয় তাহলে সামঞ্জস্য করা হবে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে একজন মুজতাহিদ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যে রায়কে অধিক শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত মনে করবেন, সেটাকে গ্রহণ করতে পারেন।[৪৭৮]

চতুর্থ উৎস ঃ তাবেঈনদের বাণী ও উক্তি ঃ چوتھا ماخذ، تابعین کے اقوال

তাবেঈ বলতে ওইসব বুযুর্গদের বুঝানো হয়, যারা সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাবেঈনদের রায় গ্রহণযোগ্য কি-না এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) এ ব্যাপারে একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো, তাবেঈ যদি কোনো তাফসীর কোনো সাহাবী থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের তাফসীরের যে হুকুম, এর ক্ষেত্রেও ওই হুকুমই প্রযোজ্য হবে।

---

৪৭৮. এই নীতিমালা "আল-বুরহান" : ২/১৭২ এবং "আল-ইতকান" : ২/১৭৬-১৭৮ হতে সার-সংক্ষেপ করে উলেখ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

আর যদি তাবেঈ নিজের পক্ষ হতে কোনো বক্তব্য পেশ করে থাকেন তাহলে দেখতে হবে, তাঁর বক্তব্যের বিপরীতে অন্য কোনো তাবেঈর বক্তব্য আছে কি-না? যদি থেকে থাকে তাহলে তাঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং ওই আয়াতের তাফসীরের জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীম, আরবী ভাষা, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস, সাহাবায়ে কেরামেরগণের আসার ও অন্যান্য শরঈ দলীল-প্রমাণের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। যদি তাবেঈদের মাঝে কোনো মতবিরোধ না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে।[৪৭৯]

পঞ্চম উৎস ঃ আরবী ভাষা ঃ پانچواں ماخذ، لغت عرب

আমরা উল্লেখ করেছি, পবিত্র কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতের ভাবার্থ একেবারেই স্পষ্ট এবং যার ভাবার্থে কোনো ধরনের জটিলতা, অস্পষ্টতা, সংশয় ও অতি সংক্ষিপ্ততা না থাকে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করতে কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত হবার প্রয়োজন নেই। সেখানে আরবী ভাষা ও অভিধানই তাফসীরের একক উৎস।

কিন্তু যেখানে কোনো অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, অথবা যে আয়াত কোনো ঘটনার প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত হয়, কিংবা তা থেকে কোনো ফিকহী মাস'আলা আবিষ্কার করা যায়, সেখানে শুধু ভাষা ও অভিধানের উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় তাফসীরের মূলভিত্তি তো স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীম, সুন্নাতে রাসূল, আছারে সাহাবা ও তাবেঈনের উপরই হবে। তবে এগুলোর সাথে সাথে আরবী ভাষাকেও সামনে রাখতে হবে।

যার কারণ হলো, আরবী একটি ব্যাপক ও সমৃদ্ধ ভাষা। এতে একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একই বাক্যের একাধিক অর্থ হতে পারে। কাজেই শুধু আভিধানিক দিক থেকে কোনো একটি অর্থকে নির্ধারণ করে নিলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।

আর এ কারণেই কেউ কেউ "শুধু আরবী ভাষা ও অভিধান"কে পৃথক একটি উৎস হিসেবে মেনে নিতেই অস্বীকার করেছেন।

অধিকন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর প্রতি এ কথা সম্বোধিত আছে যে, তিনি শুধু ভাষা ও অভিধানের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর করাকে 'মাকরূহ' বলেছেন। তবে আল্লামা যারাকাশী (রহ.) বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে অভিধানকে একেবারেই বর্জন করা হবে।

---

৪৭৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৫
২২-

সূচিপত্র

বরং উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কোনো আয়াতের স্পষ্ট-বাহ্যিক ও বহুল প্রচলিত অর্থ বর্জন করে এমন অর্থ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ, যা স্বল্প প্রচলিত ও শুধু অভিধান নির্ভর। প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ আরবদের প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী নাযিল হয়েছে।

তাই যেখানে কুরআন, হাদীস বা আছারে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কুরআনের কোনো শব্দের তাফসীর না পাওয়া যায়, সেখানে আয়াতের শুধু তাফসীরই করা হবে, যা আরবের প্রচলিত ভাষায় শ্রবণ মাত্রই বুঝে আসে। এ স্থলে আরবী কবিতা দ্বারা দলীল পেশ করে এমন কোনো স্বল্প প্রচলিত অর্থ বর্ণনা করা একেবারেই ভুল, যা অভিধান গ্রন্থসমূহে তো লেখা রয়েছে ঠিকই; কিন্তু প্রচলিত সাধারণ ভাষায় তা ব্যবহার হয় না।[৪৮০]

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে উপলব্দি করুন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে– যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট তাঁর সম্প্রদায় পানি প্রার্থনা করল, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন–

اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ

'আপনি আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন।'[৪৮১]

কোনো আরবী ভাষা-ভাষীর সামনে এ বাক্যটি বললে সে স্পষ্টভাবে এর এই অর্থই বুঝবে যে, 'লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করা'র নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আর বস্তুত এ বাক্যের এই তাফসীরটিই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান আভিধানিক দূরবর্তী কোনো অর্থের উপর ভিত্তি করে এই দাবী করেছেন যে, এ বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, "লাঠির উপর ভর দিয়ে এই পাথরভূমিতে চলুন"।[৪৮২]

এতে اضرب -এর অর্থ "আঘাত করা"-এর পরিবর্তে "চল" এবং الحجر-এর অর্থ "পাথর"-এর পরিবর্তে "ময়দান" বর্ণনা করা এমন এক জোর-জবরদস্তি, যার সমর্থনে অভিধান গ্রন্থের এক বা আধা উদ্ধৃতি পাওয়া গেলেও আরবের সাধারণ প্রচলিত রীতি এটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করে।[৪৮৩]

---

৪৮০. আল-বুরহান : ২/১৬০, পরিচ্ছেদ : ৪১

৪৮১. সূরা বাকারা : ৬০

৪৮২. স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান কৃত 'তাফসীরুল কুরআন' : ১/৯১, মাতবুয়ায়ে লাহোর।

৪৮৩. এখানে আমরা স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান কর্তৃক বর্ণিত এই 'অর্থ' উদাহরণ হিসেবে পেশ করলাম। অন্যথায় তার বর্ণনাকৃত এই ব্যাখ্যার সমর্থন কোনো অভিধান থেকেও পাওয়া যায় না। আর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এতে কয়েকটি ভুল রয়েছে। যেমন– "..." শব্দটি 'চলা'র অর্থে ব্যবহৃত হলে এর সাথে অবশ্যই ... অব্যয়টি থাকে। যেমন– ... আর এই আয়াতে ... অব্যয়টি নেই।

সূচিপত্র

ইমাম আহমদ (রহ.) অভিধানের সাহায্যে এ ধরনের তাফসীর করাকে নিষিদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর এটা স্পষ্ট যে, অভিধানের সাহায্যে এ ধরনের কাজ করাকে কোনো বিবেক ও ন্যায়-নীতি সম্পন্ন ব্যক্তি সঠিক বলতে পারে না।

ষষ্ঠ উৎস ঃ সুস্থ বিবেক ঃ عقل سليم ছয়টা মাখজ

সুস্থ বিবেক তো প্রত্যেকটি বিষয়েই আবশ্যক। আর এটা তো স্পষ্ট যে, সুস্থ বিবেক ব্যতীত পূর্বোল্লিখিত ৫টি উৎস থেকে উপকৃত হওয়াও সম্ভব নয়। তারপরও এখানে এটাকে স্বতন্ত্র একটি উৎস হিসেবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের মা'আরিফ ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি কূল-কিনারাহীন এক সমুদ্রের ন্যায়। উল্লিখিত পাঁচটি উৎসের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তুকে যদিও প্রয়োজন মাফিক তো বুঝা যায়। কিন্তু এর মা'আরিফ ও হাকাইক, হেকমত এবং নিগূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলীর ব্যাপারে এ কথা কোনো যুগেই বলা যায় না যে, এখন এর সমাপ্তি ঘটেছে এবং এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার অবকাশ নেই। বরং এর পরিবর্তে এ কথা বলতে হয় যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের ওই মা'আরিফ ও হাকাইক, হেকমত ও নিগূঢ় সহস্য এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণার দরজা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত।

যে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ইলম ও বিবেক, আল্লাহভীতি ও ইনাবতের দৌলত দ্বারা সৌভাগ্যবান করেছেন। তিনি চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অভিনব নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য হাসিল করতে পারেন। এ কারণেই প্রত্যেক যুগের মুফাসসিরগণ নিজ নিজ বুঝ ও উপলব্ধি অনুযায়ী এ অধ্যায়ে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজন করে চলেছেন। আর এটাই ওই বিষয় যার দু'আ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর জন্য করেছিলেন–

اللهم عَلمهُ التأْوِيلَ وَفَقِّههُ فِي الدِينِ

'হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাফসীরের জ্ঞান দান করুন এবং দীনের বুঝ দান করুন।'

কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, এধরণের বিবেক ও উপলব্ধি শক্তি দ্বারা উদ্ঘাটিত ওই সব হাকাইক-নিগূঢ় রহস্য এবং তত্ত্ব তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যা শরঈ নীতিমালা ও পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ না হবে। আর যদি শরঈ নীতিমালা উপেক্ষা করে কোনো নিগূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম বিষয় উন্মোচন করা হয়, তাহলে দ্বীনের ক্ষেত্রে এর নূন্যতম কোনো মূল্য নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ঃ باب دوم

তাফসীর শাস্ত্রের অগ্রহণযোগ্য উৎস ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ এতে বিস্তারিতভাবে তাফসীরের এমনসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে কুরআনের তফসীরে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভট কথাবার্তা, কল্পকাহিনীর প্রবেশ ঘটেছে। যেগুলোর দ্বারা উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ইসলামের উপর কল্পকাহিনীনির্ভরতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীনতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

এছাড়াও এতে প্রাসঙ্গিকভাবে এমনসব মূল্যবান বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে, যার জন্য এর আকর্ষণ অতি বেশি।

পরিচ্ছেদে তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎসসমূহ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যথাঃ

১। ইসরাইলী রেওয়ায়াত। তবে এর প্রকারভেদ রয়েছে। যার জন্য কতক রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য আর কতক মাওকুফ ও অগ্রহণযোগ্যতার তালিকায়। এ আলোচনায় ইসরাইলী রেওয়ায়াতের উৎস, বা সেসমস্ত রেওয়ায়াত বর্ণনাকারীদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আলোচিত হয়েছেন সাহাবী কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

২। সূফীগণের তাফসীর। এতে উদাহরণ উল্লেখের পাশাপাশি এটিও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, সূফীয়ায়ে কেরাম কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত তাফসীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। বরং সেগুলো ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

৩। তাফসীর বির-রায় বা মনগড়া তাফসীর। এটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

এরপর তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার কারণ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যথাঃ

১। অযোগ্যতা। এর অধীনে তিনি "কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা" নামক শিরোনামে বর্তমান সমাজে প্রচলিত কিছু ধোকা ও প্রতারণার বিষয় সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, যথাঃ

সূচিপত্র

১. কুরআন অত্যন্ত সহজসাধ্য বিষয় ।আধুনিক সমাজের কতক মানুষ এই ফিৎনায় মাত্রাতিরিক্ত পতিত । অথচ তারা সহজসাধ্যতার প্রকৃত মানে বুঝতে পারেনি ।

২. উলামায়ে কেরামের ঠিকাদারী ।এতে "আলেমরাই কেবল কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারবে কেন!" উদাহরণসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

৩. উলামায়ে কেরাম ও পোপতন্ত্র কেউ-কেউ মধ্যযুগীয় পোপতন্ত্রের সাথে উলামায়ে মুহাম্মাদীকে মিলিয়ে ফেলেছেন । অথচ উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে সুস্থ বিবেক সম্পন্ন যেকোনো মানুষই এ মত থেকে সরে আসতে বাধ্য হবেন! এতে আপনি সেই আলোচনাই পাবেন ।

২। কুরআনকে নিজের চিন্তাধারার অধীনে করা ।এক্ষেত্রে "ইসলাম ও আধুনিকতা" নামক বইয়ে একটি চমৎকার কথা বর্ণিত হয়েছে । "মতাদর্শ স্থির করে দলীল অন্বেষণ নয়, বরং দলীল অনুযায়ী মতাদর্শ স্থাপনই সুস্থনীতি" (মূলকথা) ।

৩। সমকালীন দর্শণে প্রভাবান্বিত হওয়া । এটি মূলত দ্বিতীয় আলোচনারই অনুষঙ্গ, যে ব্যাপারে স্বয়ং সংকলকই ইঙ্গিত করেছেন । তবে অন্য কারণে তাকে স্বতন্ত্র রূপ দেয়া হয়েছে । এখানে মুজিযা অস্বীকারকরণের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যার মধ্যে মিঃ নিউটনের সূত্রের সাথে মুজিযার সাংঘর্ষিক দিক এবং পাশাপাশি পাশ্চাত্য প্রভাবিত স্যার সৈয়দ আহমাদের হীনমন্যবাদময় চিন্তাধারা নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে । এই আলোচনায় এই রোগের প্রতিষেধক রয়েছে যে, কোনো আয়াত, বা হাদীস বিজ্ঞান, বা পাশ্চাত্য মতবাদের বিরোধিতা করলেই টানাহেঁচড়া করে সে থিওরির সাথে কুরআনের সামঞ্জস্যতা দেখানোর যে মানসিকতা ।

এছাড়াও "বিবেক পরিপন্থী ও বিবেকোর্ধ তাফসীর" শিরোনাম দিয়ে আমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে ।

৪। কুরআনের বিষয়বস্তুকে ভুল মনে করা ।

এ পরিচ্ছেদে তাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করা হয়েছে, যারা কুরআনে বৈজ্ঞানিক খাপ খাওয়াতে চায়, অবশেষে না পেয়ে কুরআনের ত্রুটি ভাবতে শুরু করেন । অথচ প্রত্যেকটি বিষয়ের আলাদা বিষয়বস্তু রয়েছে, সে অনুযায়ীই তার কর্মনির্ধারিত হয় । পাশাপাশি কুরআনের উদ্যেশ্যও এতে স্পষ্ট করা হয়েছে ।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎস ঃ تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ

তাফসীরের গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য উৎস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর তাফসীরের ওই সকল অগ্রহণযোগ্য উৎসগুলোও শনাক্ত করা প্রয়োজন, যেগুলোকে কোনো কোনো লোক তাফসীরের ভিত্তি মনে করে ভুল বুঝে; বরং অনেক সময় গোমরাহীর শিকার হয়ে যায়।

প্রথম ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ঃ اسرائیلی روایات

"ইসরাঈলিয়াত" বা "ইসরাঈলী রেওয়ায়েত" সেসব বর্ণনাকে বলা হয়, যা ইহুদী বা খ্রিস্টানদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। যার কিছু অংশ সরাসরি 'বাইবেল' বা 'তালমূদ' থেকে নেওয়া হয়েছে। কিছু নেওয়া হয়েছে 'মাশনা' ও এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ থেকে। আর এর কিছু হলো, ওই সকল মৌখিক বর্ণনা যা আহলে কিতাবের বক্ষ হতে বক্ষে নকল হয়ে আসছে এবং আরবের ইহুদী-খ্রিস্টানদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। তাফসীরের প্রচলিত গ্রন্থসমূহে এ ধরনের রেওয়ায়েতের বিরাট একটি অংশ বিদ্যমান রয়েছে। ওই সকল রেওয়ায়েতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে জগদ্বিখ্যাত মুহাক্কিক ও মুফাসসির হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেন যে, এ ধরনের রেওয়ায়েত তিন প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

১. প্রথম প্রকার ওই সকল ইসরাঈলিয়াত, বহিরাগত অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা যেগুলোর সত্যায়ন করা হয়েছে। যেমন, ফেরাউনের ডুবে মরা। হযরত মূসা (আ.)-এর যাদুকরদের সাথে মুকাবিলা হওয়া এবং তাঁর তূর পাহাড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এ সব রেওয়ায়েত এ জন্য গ্রহণযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম অথবা সহীহ হাদীস সেগুলোর সত্যায়ন করেছে।

২. দ্বিতীয় প্রকার ওই সকল ইসরাঈলিয়াত যেগুলোর মিথ্যা হওয়াটা বহিরাগত দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন এ কাহিনী যে, হযরত সুলাইমান (আ.) জীবন সায়াহ্নে এসে (নাঊযুবিল্লাহ) মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন।[৪৮৪] এই রেওয়ায়েতটি অকাট্যভাবে বাতিল। কেননা পবিত্র কুরআনুল কারীম অকাট্যভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অনুরূপভাবে হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারেও মনগড়া একটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, (নাঊযুবিল্লাহ) তিনি তাঁর সেনাপতি আউরিয়া'র স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন![৪৮৫]

---

৪৮৪. বাইবেল : কিতাব সালাতীন আউয়াল : ১১/২-১৩

৪৮৫. প্রাগুক্ত : সামুঈল ১৩/১৪

সূচিপত্র

৩. তৃতীয় প্রকার ওই সকল ইসরাঈলিয়াত, যেগুলোর ব্যাপারে বহিরাগত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এ কথা সাব্যস্ত হয়নি যে, এগুলো সত্য। আবার এটাও সাব্যস্ত হয়নি যে তা মিথ্যা। যেমন, তাওরাতের বিধি-বিধান ইত্যাদি। এসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের ব্যাপারে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ হয়েছে–

لاتصدقوه ولاتكذبوه

না এগুলোকে সত্য হিসেবে স্বীকৃত দিবে, না মিথ্যা হিসেবে।'

এ ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণনা তো করা জায়েয। কিন্তু না এগুলোর উপর কোনো দ্বীনি মাস'আলার ভিত্তি রাখা যায়, আর না এগুলোকে সত্য বা মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন করা যায়। এ ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণনা করা দ্বারা বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীম সূরা কাহাফে এ ধরনের বর্ণনার ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে।[৪৮৬] ইরশাদ হয়েছে–

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا (22)

'অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নিভর করে কেহ কেহ বলেঃ তারা ছিল তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর; এবং কেহ কেহ বলেঃ তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর; আবার কেহ কেহ বলেঃ তারা ছিল সাত জন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর; বলঃ আমার রাব্বই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে; সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করনা এবং তাদের কেহকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করনা।'[৪৮৭]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে আহলে কিতাবদের বিভিন্ন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আর সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন–

১. ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এবং তাদের মতভেদ বর্ণনা করা জায়েয। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বর্ণনা করেছেন।

---

[৪৮৬]. তাফসীরে ইবনে কাসীর [ভূমিকা] : ১/৪, ইবনে তাইমিয়া (রহ.) রচিত "উসূলে তাফসীর" পৃ: ৩৩
[৪৮৭]. সূরা কাহাফ : ২২

সূচিপত্র

২. ওই রেওয়ায়েতগুলোর মধ্য হতে যেগুলো ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোর ভুলের উপর সতর্কও করে দেওয়া উচিত। যেমন, প্রথম দুটি মতকে আলাহ সুবহানাহু তা'আলা رجمًا بالغيب বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. যে রেওয়ায়েতের ভুল হবার উপর কোনো দলীল-প্রমাণ না পাওয়া যাবে, সেটার ব্যাপারে চুপ থাকতে হবে। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তৃতীয় বর্ণনার উপর চুপ রয়েছেন।

৪. এই রেওয়ায়েতগুলোর সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট।

৫. এই রেওয়ায়েতগুলোর ক্ষেত্রে অধিকতর তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকা উচিত।

৬. এ ধরনের রেওয়ায়েতের ব্যাপারে অধিক তাহকীক ও খুঁটিনাটি তালাশে উঠে-পড়ে লেগে যাওয়া জায়েয নয়। কারণ এগুলোর সাথে দুনিয়া ও আখেরাতের উল্লেখযোগ্য কোনো কল্যাণ সম্পৃক্ত নেই।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতের বেলায় তো এটা স্পষ্ট যে, এটা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েতের ব্যাপারে তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না। কিন্তু অন্যান্য দলীল-প্রমাণের আলোকে বুঝা যায় যে, এটা ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত। তাফসীরের গ্রন্থাদিতে যেসব রেওয়ায়েত কা'বুল আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত, সেগুলোর অধিকতর এ প্রকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এ দু'জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেওয়া আবশ্যক।

কা'বুল আহবার কে ছিলেন? ঃ كعب الاحبار كون تھے

কা'বুল আহবারের পূর্ণ নাম কা'ব ইবনে মাতে' হিময়ারী। আর তিনি কা'বুল আহবার বা কা'বুল হিব্‌র উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী। ইহুদী আলেমদের মাঝে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি জাহেলী ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের সুযোগ হয়নি। হিজরী ১২ সনে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাসনামলে তিনি পবিত্র মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাবকাতে ইবনে সাদ'-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, "রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করনি?" উত্তরে তিনি বলেছেন, "আমার পিতা আমাকে তাওরাতের একটি কপি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এর উপর আমল করতে থাক।

সূচিপত্র

তাওরাত ছাড়া আর যতগুলো গ্রন্থ ছিল, সবগুলো তিনি বন্ধ করে সেগুলোর উপর মোহর এঁটে দিয়েছিলেন। যাতে আমি সেগুলো পাঠ করতে না পারি। এর সাথে সাথে পিতা-পুত্রের ওসীলা দিয়ে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমি এ মোহর কখনো খুলব না। কিন্তু যখন দীন-ইসলাম পৃথিবীতে বিজয়ী হতে লাগল, তখন আমার অন্তরে এ খেয়াল উদয় হলো যে, আমার পিতা আমার কাছে কোনো ইলম গোপন করার অপচেষ্টা করেননি তো? তখন আমি কিতাবাবৃত ওই মোহরগুলো ছিঁড়ে ফেললাম এবং সেগুলো অধ্যয়ন করলাম। তখন তাতে আমি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর উম্মতের আলোচনা দেখতে পেলাম। এ জন্য আমি এখন মুসলমান হয়ে এসেছি।

সাধারণতঃ কা'বুল আহবার (রহ.)-এর 'সিকাহ' বা গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) কিছু কিছু বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তাঁর ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এই ঘটনাটি যে, যখন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) মসজিদে আকসা নির্মাণ ইচ্ছা করলেন তখন তিনি মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ নিলেন যে "মসজিদটিকে সাখরা'র সামনে বানানো হবে না-কি পেছনে?"

এতে কা'বুল আহবার পরামর্শ দিলেন যে, "মসজিদ সাখরা'র পেছনে নির্মাণ করা হোক।" এ কথা শোনে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, আরে ইহুদী নারীর সন্তান! তোমার মধ্যে তো এখনো ইহুদীসুলভ প্রভাব রয়ে গেছে। আমি তো সাখরা'র সামনে নির্মাণ করব, যেন নামাযের মধ্যে সাখরা'র দিকে মুখ করতে না হয়।"

আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) লিখেন, এ ঘটনার পর কা'বুল আহবারের অন্তরে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ব্যাপারে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমনকি তাঁকে এমন লোকদের সাথে মেলামেশা ও উঠা-বসা করতে দেখা গেছে, যারা হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে শহীদ করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। আর এর পূর্বে তিনি আহলে কিতাবের কোনো কোনো গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আপনাকে কোনো এক সময় হত্যা করা হবে। এ সকল ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) লিখেন–

"এ সব বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে একত্রিত করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত

সূচিপত্র

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং হযরত মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কা'বুল আহবারের উপর পূর্ণ ভরসা রাখতেন না।'[৪৮৮] আল্লামা কাউসারী (রহ.) কা'বুল আহবারের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের উক্তি থেকে যে ফলাফল বের করেছেন, সেগুলোর সাথে মতবিরোধের অবকাশ রয়েছে।[৪৮৯] তবে এ কথার উপর সবাই একমত যে, তাঁর অধিকাংশ রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে তা সত্যায়িত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর উপর ভরসা করা যাবে না।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ ঃ وهب بن منبه

দ্বিতীয় ব্যক্তি যার কাছ থেকে অধিকহারে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে তিনি হলেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ। মৃত্যু ঃ ১১০ হিঃ তিনিও ইয়ামানের সান'আ নগরীর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর শাসনামলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা মানাব্বিহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতময় যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ ছিলেন আবেদ ও যাহেদ তাবেঈ। হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) প্রমুখের কাছ থেকে তিনি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিকট আহলে কিতাব আলেমদের অনেক রেওয়ায়েত ও গ্রন্থাবলীর বিশাল জ্ঞানভান্ডার মওজুদ ছিল।

এমনকি এ ব্যাপারে তিনি নিজেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও কা'বুল আহবারের জ্ঞান সম্ভারের বাহক মনে করতেন।[৪৯০] ইমাম ইবনে সা'দ লিখেছেন যে, তিনি এসব বর্ণনা সম্বলিত"আহাদিসুল আম্বিয়া" নামক একটি গ্রন্থও সংকলন করেছিলেন।[৪৯১] মাসউদী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি "আল-মাবদা" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৪৯২] আর হাজী খলীফা (রহ.) "কাশফুয যুনূন" গ্রন্থে সম্ভবত এটাকেই "কিতাবুল ইসরাঈলিয়াত"

---

৪৮৮. মাকালাতুল কাউসারী : পৃঃ ৩৩, ৩৪ প্রবন্ধ ঃ কা'বুল আহবার ওয়াল ইসরাঈলিয়াত।

৪৮৯. মিসরের মুহাক্কিক আলেম ড. রমজী ওই সব সন্দেহ ও সংশয়ের দলীল ভিত্তিক বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করেছেন। দেখুন : আল-ইসরাঈলিয়াত ও আসরুহা ফিত তাফসীর : পৃঃ ১৭২-১৭৩ দারুয যিয়াহ : বৈরুত, ১৯৭০ ঈ.

৪৯০. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/১০১

৪৯১. তবকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৯৭

৪৯২. মুরাওয়াজুয যাহাবী : ৫/১২৭

সূচিপত্র

নামে উল্লেখ করেছেন।[৪৯৩] অনুরূপভাবে ইয়াকুত হামাভী (রহ.) এবং কাযী ইবনু খালিকান (রহ.) তাঁর আরো একটি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। যার নাম হলো "যিকরুল মুলূকিল মাফতূহা মিন হিম্ইয়ার ও আখবারিহীম ও গাইরি যালিকা" কাযী ইবনে খালিকান নিজেই এ গ্রন্থ দেখেছেন।[৪৯৪]

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ-এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারী নিয়ে মুহাদ্দিস ও জারাহ্-তা'দীলের ইমামগণ কোনো মন্তব্য করেননি। হাফেয যাহাবী (রহ.) বলেন, "তিনি ثقة নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ছিলেন এবং ইসরাঈলী গ্রন্থ সমূহ থেকে অধিকহারে বর্ণনা করতেন।" ইমাম আবু যুর'আ (রহ.) ও ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁকে ثقة (নির্ভরযোগ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম আযলী (রহ.) বলেন, "ওয়াহাব ثقة নির্ভরযোগ্য তাবেঈ ছিলেন।

শুধুমাত্র ইমাম আমর ইবনে আলী আল-ফালাস তাঁকে ضعيف (দুর্বল) হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এর কারণ এটা ছিল না যে, ওয়াহাব (রহ.)-এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল। বরং এর কারণ ছিল এই যে, ওয়াহাব জীবনের শুরুতে 'কাদরিয়্যাহ' সম্প্রদায়ের আকীদার প্রতি ঝুঁকে ছিলেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, "পরবর্তীতে তিনি এই আকীদা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

আর আবু সিনান (রহ.) স্বয়ং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "আমি প্রথমে কাদরিয়্যাহ আকীদার প্রবক্তা ছিলাম। কিন্তু পরে আমি তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি।"[৪৯৫]

এর দ্বারা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জারাহ-তা'দীলের ইমামগণের মধ্য হতে কেউ তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেননি। এ জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। অতএব, তিনি যেসব বর্ণনা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্বোধন করেন, যদি সেগুলো উসূলে হাদীসের পুরো শর্তানুযায়ী হয়ে থাকে, তাহলে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করা হবে।

তবে অতীতের যেসব কাহিনী ও ঘটনাবলী এবং ভবিষ্যতের যেসব সংবাদ তিনি কোনো উদ্ধৃতি ছাড়াই বর্ণনা করেন, সেগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের করণীয় হলো– আমরা এগুলোকে সত্যও বলব না এবং মিথ্যাও বলব না। বর্তমান যুগের কতক লেখক, যেমন– মরহুম সাইয়্যেদ রশীদ রেযা তাঁর বিরল ও আশ্চর্যকর ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর

---

৪৯৩. বাহসুন ফী নাশআতী ইলমিত তারিখ ইনদাল আরব [ড. আবদুল আজিজ আদ-দাওরী] : পৃ: ১১৪
৪৯৪. মু'যামুল উদাবা [হামাভী] : ৬/২২২, ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান [ইবনে খালিকান] : ২/১৮০
৪৯৫. তাহযীবুত তাহ্যীব : ১১/১৬৮

সূচিপত্র

উপর ভিত্তি করে তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, শুধু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করা কোনো অপরাধ নয়। হ্যাঁ, এটা ভিন্ন কথা যে, এসব রেওয়ায়েতের উপর কোনো ইসলামী আকীদা ও অন্য ইসলামী বিধানের ভিত্তি রাখা যায় না।[৪৯৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ঃ حضرت عبداللہ بن عمر

কা'বুল আহবার (রহ.) ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) তো ছিলেন তাবেঈদের মধ্য হতে এবং সবচেয়ে বেশি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এ দু'জনের কাছ থেকেই বর্ণিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী সম্ভবত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)। এর কারণ হলো এই যে, তিনি রীতিমতো সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন।[৪৯৭] ওই যুগে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বহু গ্রন্থ এই ভাষায় ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় এই ধরণের এত পরিমাণ গ্রন্থ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হস্তগত হয়েছিল যে, দু'টি উটের উপর সেগুলো বহন করতে হতো।[৪৯৮] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সরাসরি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সাথে ইসরাঈলীয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই।

বরং সেগুলো যদি বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তাহলে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার ন্যায় তাঁর বর্ণনাগুলোও অবশ্য মান্য হবে। হ্যাঁ, যেসব রেওয়ায়েত তিনি সরাসরি কোনো আহলে কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন তা ইসরাঈলিয়াত। সেগুলোকে আমরা না সত্য বলতে পারি, আর না মিথ্যা বলতে পারি।

অনুরূপভাবে যেসব রেওয়ায়েত স্বয়ং তাঁর উক্তি হিসেবে বর্ণিত আছে, সেগুলোর ব্যাপারেও প্রবল ধারণা যে, সেগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এবং সেগুলোকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

মিসরের এক হাদীস অস্বীকারকারী লেখক 'আবু রিইয়া' নিজ গ্রন্থ ...(আযওয়াউ আলাস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ)-এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর উপর এই ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করেছেন যে, তিনি কখনো কখনো ইসরাঈলী রেওয়ায়েতকে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্বন্ধ করে দিতেন! কিন্তু এই অভিযোগটি শুধু একশতে একশত ভাগ অসত্য ও

---

৪৯৬. মরহুম সাইয়্যেদ রশীদ রেযা প্রমুখের এই চিন্তাধারার বিস্তারিত প্রত্যাখ্যানের জন্য দেখুন : ড. রমজী'র গবেষণালব্ধ গ্রন্থ "আল-ইসরাঈলিয়াত ও আসরুহা ফিত তাফসীর : পৃ: ১৮৮।

৪৯৭. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/২৬১

৪৯৮. ফাতহুল বারী : ১/১৬৬

সূচিপত্র

বিভ্রান্তিকরই নয়; বরং তা স্বয়ং আবু রিইয়া সাহেবের ইলম ও আমানতদারীর মুখও ফাটিয়ে দিয়েছে। কেননা তিনি নিজের দলীল পেশ করতে গিয়ে হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.)-এর 'ফাতহুল বারী' থেকে এই ইবারত উদ্ধৃত করেছেন–

ان عبد الله عمرو كان قداصاب زاملتين من كتب اهل الكتاب وكان يروبها للناس عن النبى صلى الله عليه وسلم فتجنت الاخذ عنه كثيرمن أئمة التابعين وكان يقال له لاتحدثنا عن الزاملتين

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহলে কিতাবের নিকট হতে দু'টি উটের বোঝা পরিমাণ গ্রন্থ লাভ করেছিলেন। তিনি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্বন্ধ করে সেসব গ্রন্থের কথা মানুষের নিকট বর্ণনা করতেন। তাই অনেক বড় বড় তাবেঈ তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। এমনকি লোকেরা তাঁকে বলতো আপনি ওই দুই উটের বোঝা থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবেন না।"

এই উদ্ধৃতির মধ্যে চিহ্নিত অংশটুকু হাফেয ইবনে হাযার (রহ.)-এর 'ফাতহুল বারী'তে নেই। আবু রিইয়া সাহেব নিজের পক্ষ হতে এ অংশটুকু বাড়িয়ে হাফেয ইবনে হাযার (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা আপনি হাদীস অস্বীকার এবং পশ্চিমা লেখকদের আমানত-বিশ্বস্ততা ও অজ্ঞতাবহতার অনুমান করতে পারেন।[৪৯৯]

দ্বিতীয় সূফীয়ায়ে কেরামদের তাফসীর ঃ صوفیا کرام کی تفسیریں

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের অধীনে সূফীয়ায়ে কেরামের এমন কিছু উক্তি বর্ণিত আছে, যেগুলোকে বাহ্যিকভাবে কুরআনের তাফসীর বলে মনে হয়। কিন্তু বস্তুত তা আয়াতের বাহ্যিক ধারাবাহিক পরম্পরায় বর্ণিত অর্থের বিপরীত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ

'লড়াই কর সেসব কাফেরদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে মিলে আছে (অর্থাৎ তোমাদের নিকটবর্তী)।'

কোনো কোনো সূফী এই আয়াতের অধীনে বলেছেন–

قاتلوا النفس فانها تلى الانسان

---

৪৯৯. এ ক্ষেত্রে আবু রিইয়া'র বিস্তারিত প্রত্যাখ্যানের জন্য দেখুন : ড. আজ্জাজ আল-খতীব রচিত ... [আসসুন্নাতু কাবলাত তাদভীন] এবং ড. রমজী রচিত ... [আল-ইসরাঈলিয়াত ও আসরুহা ফী কুতুবিত তাফসীর] : পৃ: ১৫৮

সূচিপত্র

'লড়াই কর নফসের সাথে, কেননা তা মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী।

এ ধরনের উক্তিকে কেউ কেউ পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর মনে করে বসেছেন। অথচ বাস্তবে তা তাফসীর নয়। সূফীয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, কুরআনুল কারীমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই এবং বাহ্যিক শব্দমালা থেকে যে অর্থ বুঝে আসছে, তা উদ্দেশ্য নয়। বরং সূফীয়ায়ে কেরাম প্রকৃত উৎস থেকে উৎসারিত বাহ্যিক অর্থ ও বিষয়বস্তুর উপর পূর্ণ ঈমান রাখেন এবং এ কথার নিখাদ স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, মূলতঃ এটাই পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর। তবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় তাঁদের অন্তর্দেশে আল্লাহপ্রদত্ত যে ভাবাবেগ ও তত্ত্বগত রহস্যের উন্মেষ ঘটে; এটাকে তাঁরা এর সাথে সংযোজন করে দেন। সুতরাং উল্লিখিত দৃষ্টান্তে সূফীগণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই আয়াতে কাফেরদের সাথে যে জিহাদ ও কেতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের সাথে জিহাদ ও কেতালের নির্দেশটাই এই আয়াতের মূল দাবী। কিন্তু এ আয়াতের আলোকেই আধ্যাত্মিকভাবে মানুষকে এটাও ভাবতে হবে যে, তার চেয়ে নিকটবর্তী অবাধ্য শত্রু হচ্ছে তার "নফস"। যা তাকে মন্দ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। কাজেই কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের পাশাপাশি নফসের সাথেও লড়াই চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। নিকট অতীতের প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্লামা মাহমূদ আলূসী (রহ.)-এর তাফসীরে অধিকহারে সূফীয়ায়ে কেরামের এ ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। সূফীগণের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেন–

"পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূফীয়ায়ে কেরাম থেকে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত ওইসব সূক্ষ্ম বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে, যা আধ্যাত্মিক সাধকদের হৃদয়ে উন্মোচিত হয়।

এ সকল উক্তি এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। সূফীয়ায়ে কেরামের এই আকীদা নয় যে, বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং বাতেনী অর্থই উদ্দেশ্য। কেননা এটাতো বাতেনী নাস্তিকদের আকীদা। যেটাকে তারা সামগ্রিকভাবে শরীয়তকে অস্বীকার করার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে। এ ধরনের আকীদার সাথে আমাদের সূফীয়ায়ে কেরামের কোনো সম্পর্ক নেই। আর হবেই বা কি করে? যখন তাঁরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে এ কথা বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের বাহ্যিক তাফসীরের জ্ঞান সর্বাগ্রে অর্জন করতে হবে।[৫০০]

---

[৫০০]. রূহুল মা'আনী : ১/৪৭, ভূমিকা। এই বিষয়টিই আলামা সুয়ূতী (রহ.) শায়েখ তাজুদ্দীন ইবনে আতা উলাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। (আল-ইতকান : ২/১৮৫)

সূচিপত্র

তবে সূফীয়ায়ে কেরামের এসব উক্তির ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ঃ

১. এ উক্তিগুলোকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআনুল কারীমের আসল উদ্দেশ্য সেটাই যা তাফসীরের মূল উৎস থেকে বুঝে আসে। আর এই উক্তিগুলো কেবল "ভাবাবেগের উন্মেষ"-এর মর্যাদা রাখে। কাজেই এ ধরনের উক্তিকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর ধরে নেওয়াটা গোমরাহী। যেমন, ইমাম আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহ.) "হাকায়েকুত তাফসীর" নামে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা এ ধরনের উক্তি সম্বলিত ছিল। এই তাফসীরের ব্যাপারে ইমাম ওয়াহেদী (রহ.) বলেন–

"যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখবে যে, এটা তাফসীর, সে তো কাফের হয়ে যাবে।"[৫০১]

২. এ ধরনের উক্তির মধ্যেও শুধু ওইসব উক্তি সঠিক বলে মনে করা হবে, যা পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অথবা শরীয়তের কোনো স্বীকৃত মূলনীতির বিপরীত না হয়। যদি এই আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ প্রকাশের অন্তরালে দীনের কোনো স্বীকৃত উসূল ও মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তবে তা হবে স্পষ্ট নাস্তিকতা।

৩. এ ধরনের আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিকৃতির পর্যায়ে না পৌঁছে। যদি পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীকে তছনছ করে কোনো কথা বলা হয়, তবে তাও নাস্তিকতা ও গোমরাহী। যেমন, এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনুল কারীমের ... আয়াতটির অধীনে বলেছে, প্রকৃতপক্ষে আয়াতটি ছিল ... দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, "নফস"। আর আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, "যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে লাঞ্ছিত করবে, সে শিফা পেয়ে যাবে। এ কথাটি স্মরণ রাখবে।" আল্লামা সিরাজুদ্দীন বালকিয়ানী (রহ.)-কে এই তাফসীরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, "এমনটি যে বলবে, সে নাস্তিক।"[৫০২]

৪. প্রাচীনকালে "বাতেনিয়া" নামে নাস্তিকদের একটি দল অতিবাহিত হয়েছে। তাদের দাবী ছিল যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দ থেকে বাহ্যিক যে অর্থ বুঝে আসে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রতিটি শব্দ দ্বারাই একটি বাতেনী বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেটাই হলো পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রকৃত তাফসীর। এ ধরনের বিশ্বাস রাখা উম্মতের সর্ব

---

৫০১. আল-ইতকান : ২/১৮৪
৫০২. প্রাগুক্ত

সূচিপত্র

সম্মতিক্রমে কুফরী ও নাস্তিকতা। অতএব, সূফীয়ায়ে কেরামের কোনো উক্তির ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস রাখলে তা হবে বাতেনিয়া মতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সূফীয়ায়ে কেরামের উক্তিসমূহ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বিশেষ পর্যায়ে ও অবস্থায় উপনীত ব্যক্তিগণ নিঃসন্দেহে এগুলো দ্বারা উপকৃতও হয়েছেন।

এ কারণেই আল্লামা আলূসী (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ "রূহুল মা'আনী"তে আয়াতের পূর্ণ তাফসীর লেখার পর من باب الاشارة فى الايات নামে একটি পৃথক শিরোনাম তৈরি করে, তাতে এ জাতীয় উক্তিসমূহ উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার মোদ্দাকথা হলো, সূফীয়ায়ে কেরাম পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতের অধীনে তাঁদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিমূলক যেসব উক্তি উল্লেখ করেছেন, তা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী নয়। কেউ কেউ তাঁদের উপর বাতেনিয়া মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হবার যে অভিযোগ আরোপ করেছেন তা ঠিক নয়। তথাপি আমরা হাফেয ইবনে সালাহ (রহ.)-এর এই উক্তিটি উদ্ধৃত না করে পারছি না–

ومع ذلك فيالليتهم لم يساهلوا مثل ذلك لما فيه من الايهام والالباس

'এতদসত্ত্বেও হায়! তাঁরা যদি এ ধরনের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে এতটা অসতর্ক ও উদাসীন না হতেন (তবে কতই না ভালো হতো)! কেননা এতে ভুল-বুঝা-বুঝি ও সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়।'[৫০৩]

তৃতীয় তাফসীর বির-রায় বা মনগড়া তাফসীর : تفسير بالرأى

এক হাদীসে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

من تكلم فى القرآن برايه. فاصاب فقد اخطا

'যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনুল কারীমে নিজের মনগড়া কিছু বলবে, সে যদি সঠিকও বলে থাকে তবুও সে ভুল করল।'

আল্লামা মাওয়ার্দী (রহ.) বলেন, কোনো কোনো অতিরঞ্জনপ্রিয় ব্যক্তি এই হাদীসের এ অর্থ বুঝেছেন যে, চিন্তা-গবেষণা ও রায়ের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে কোনো কথাই বলা জায়েয নেই। এমনকি ইজতেহাদের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে এমন অর্থও উদ্ঘাটন করা যাবে না, যা শরঈ মূলনীতি মাফিক হয়! কিন্তু ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীমই চিন্তা-গবেষণা ও আবিষ্কার-উদ্ঘাটনকে একাধিক স্থানে পছন্দনীয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

---

[৫০৩]. আল-ইতকান : ২/১৮৪

সূচিপত্র

আর যদি চিন্তা-গবেষণার উপর সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ হতে শরঈ আহকাম ও বিধি-বিধান বের করার দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং, এই হাদীস দ্বারা সব ধরনের রায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উদ্দেশ্য নয়।[৫০৪]

তাই তো সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাহ'র অন্যান্য দলীল-প্রমাণের আলোকে এ হাদীসের উদ্দেশ্য কক্ষনো এই নয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে গভীর চিন্তা-গবেষণা, বিবেক-বুদ্ধি ও রায় কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। বরং এ হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের জন্য যেসব নীতিমালা নির্ধারিত ও সর্বসম্মত, সেগুলোকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র রায়ের উপর ভিত্তি করে যে তাফসীর করা হবে, তা নাজায়েয হবে। এভাবে তাফসীর করতে গিয়ে কেউ যদি কোনো সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছে, তবু সে ভুলকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, সে ভুল পথ অবলম্বন করেছে।

তাফসীরের মূলনীতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার অনেকগুলো অবস্থা হতে পারে। যেমন–

১. যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে কথা বলার কোনো যোগ্যতা রাখে না, ওই ব্যক্তির শুধু নিজের রায়ের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করতে আরম্ভ করা।

২. কোনো আয়াতের তাফসীর স্পষ্টভাবে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অথবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের কাছ থেকে প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে নিজের বিবেক-বুদ্ধি থেকে কোনো অর্থ বর্ণনা করতে শুরু করা।

৩. যেসব আয়াতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাবেঈনের কাছ থেকে স্পষ্ট কোনো তাফসীর উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে অভিধান ও ভাষা-সাহিত্যের নিয়ম-নীতি পদদলিত করে কোনো ব্যাখ্যা বর্ণনা করা।

৪. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি আহকাম ও বিধি-বিধান বের করার জন্য ইজতেহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ইজতেহাদ করতে আরম্ভ করা।

৫. দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সাথে পবিত্র কুরআনুল কারীমের মুতাশাবিহ (অবোধগম্য) আয়াতসমূহ (যেগুলোর ব্যাপারে স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীমই বলে দিয়েছে যে, এ গুলোর একশতে একশভাগ অর্থ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানে না)-এর কোনো তাফসীর বর্ণনা করা এবং সেগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করা।

---

[৫০৪]. আল-ইতকান : ২/১৮০ হতে সংগৃহীত।

সূচিপত্র

৬. পবিত্র কুরআনুল কারীমের এমন কোনো তাফসীর করা, যা দ্বারা ইসলামের নির্ধারিত ও সর্বজনস্বীকৃত অন্য কোনো আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান আহত হয়।

৭. তাফসীরের ক্ষেত্র, যেখানে চিন্তা-গবেষণা ও বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহার বৈধ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কোনো অকাট্য দলীল ছাড়াই নিজের রায়কে নিশ্চিতভাবে সঠিক এবং অন্যান্য মুজতাহিদদের রায়কে নিশ্চিতভাবে বাতিল সাব্যস্ত করা।

উপরোক্ত সবগুলো পন্থাই তাফসীর বির-রায় বা মনগড়া তাফসীর। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, অপর একটি হাদীসে সবগুলো নিষিদ্ধ পদ্ধতিকে এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে–

"مَن قَالَ فِي القُرأنِ بِغَيرِ عِلم فليتبوا مقعدَهُ مِنَ النَّار"

'যে ব্যক্তি না জেনে পবিত্র কুরআন মাজীদের ব্যাপারে কোনো কথা বলে সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।'

অবশ্য তাফসীরের নীতিমালা ও ইসলামের সর্বসম্মত নিয়মনীতির অনুসরণ করে যদি তাফসীরের ক্ষেত্রে এমন কোনো রায় পেশ করা হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী নয়, তাহলে তা হাদীসে উল্লিখিত শাস্তির আওতায় পড়বে না। তবে এ ধরনের রায় প্রকাশ করাও কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান এবং ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শিতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর উলামায়ে কেরাম এর জন্যও কিছু কার্যকর নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যা উসূলে ফিকাহ ও উসূলে তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলোর অত্যন্ত মূল্যবান ও উপকারী সারাংশ আল্লামা বদরুদ্দীর যারকাশী (রহ.)স্বীয় গ্রন্থ البرهان فى علوم القران [আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন)-এর ৪১তম অধ্যায়ে বিশেষ করে "التفسير اقسام" (তাফসীরের প্রকারভেদ)-এর শিরোনামের ১৬৪-১৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এ অধ্যায়ের পুরো আলোচনাই অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু যেহেতু আরবী ভাষা ও জ্ঞানের পারদর্শিতা ব্যতীত তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না, তাই এখানে শুধু এর তরজমা পেশ করা অনর্থক। আরবী ভাষায় পারদর্শীগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

তাফসীরের ক্ষেত্রে গোমরাহীর উপকরণ ঃ تفسیر میں گمراہی کے اسباب

ইলমে তাফসীর যেমনিভাবে অত্যন্ত মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয়, তেমনি অন্য দিকে এই ঝুঁকিপূর্ণ উপত্যকায় পা রাখা সীমাহীন বিপজ্জনকও বটে। কারণ মানুষ যদি কোনো আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে বসে, তবে এর অর্থ হলো, সে আল্লাহ তাআলার দিকে এমন কথার সম্বন্ধ করল, যা আল্লাহ তাআলা

সূচিপত্র

বলেননি। এর চেয়ে বড় গোমরাহী আর কি হতে পারে? যেসব লোক আবশ্যকীয় শর্তাবলী পূরণ করা ছাড়াই কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করেছে, তারা যথেষ্ট শ্রম-সাধনা করার পরও এই নিকৃষ্টতম গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে। তাই সেসব কারণসমূহের উপর একটু নজর বুলিয়ে নেওয়া উচিত, যা মানুষকে তাফসীরের ক্ষেত্রে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়।

প্রথম কারণ ঃ অযোগ্যতা ঃ پہلا سبب، نااہلیت

কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে গোমরাহীর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বিপজ্জনক কারণ হচ্ছে, মানুষের নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে নিজের রায় পেশ করতে শুরু করা। বিশেষ করে আমাদের এ যুগে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার এ কারণটি সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। এ ভুল ধারণা ব্যাপকতর হচ্ছে যে, শুধু আরবী ভাষা শিক্ষা করলেই মানুষ কুরআনুল কারীমের আলেম হয়ে যায়! এরপর যেভাবে বুঝে আসে সেভাবেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর করতে পারে। অথচ চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে, পৃথিবীর এমন কোনো বিদ্যা ও বিষয় নেই যার মধ্যে শুধু ভাষা শেখার দ্বারাই পারদর্শিতা অর্জিত হতে পারে।

আজও পর্যন্ত কোনো সচেতন ব্যক্তি ইংরেজি ভাষায় পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও দাবী করেনি যে, সে ডাক্তার হয়ে গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে দুনিয়াবাসীর উপর জুলুমের অনুশীলন চালাতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি প্রকৌশল বিদ্যার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করার পর প্রকৌশলী হবার দাবী করতে পারে না। আইন শাস্ত্রের সর্বোচ্চ গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে আইন বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। যদি কেউ এমন দাবী করে,তাহলে বিশ্ববাসী তাকে নির্বোধ ও আহাম্মক বলবে। কারণ সবাই এটা সবাই জানে যে, এসব জ্ঞান-শাস্ত্র ও বিষয়াদি শুধু ভাষাজ্ঞান ও নিছক একাকী অধ্যয়ন দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং এর জন্য বছরের পর বছর সাধনা করা প্রয়োজন। এগুলোকে দক্ষ শিক্ষকের কাছ থেকে পড়তে হয়। এর জন্য বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। অতঃপর কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্যে থেকে এগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। তখন গিয়ে একজন মানুষ ওই শাস্ত্র ও বিষয়ের প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তি বলার যোগ্য হয়।

যখন এসব শাস্ত্র ও বিষয়ের অবস্থা এ রকম, তখন পবিত্র কুরআন তাফসীরের ন্যায় বিষয় অবশেষে শুধু আরবী ভাষা শিখে নেওয়ার উপর ভিত্তি করে কীভাবে হাসিল হয়ে যাবে? আপনারা পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে লক্ষ্য করেছেন যে, তাফসীর শাস্ত্র আয়ত্ত করার জন্য কত ব্যাপক পরিধি বিশিষ্ট জ্ঞান-

সূচিপত্র

ভান্ডারের প্রয়োজন হয়? পবিত্র কুরআনুল কারীম সাধারণ গ্রন্থাদির ন্যায় এমন কোনো ধারাবাহিক বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ নয়; যার মধ্যে এক বিষয়ের সমস্ত কথা একই স্থানে লেখা হয়ে থাকে। বরং তা পৃথিবীর সমুদয় গ্রন্থাবলীর বিপরীত স্বতন্ত্র ও এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতি-নীতির মর্যাদা রাখে।

সুতরাং, কোনো আয়াতকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে প্রথমতঃ আয়াতটির বিভিন্ন পঠন-রীতি এবং এ বিষয়ের অন্যান্য আয়াতসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট সবগুলো বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ছাড়া আপনারা দেখেছেন যে, বহু আয়াত বিশেষ কোনো ঘটনা সম্বলিত প্রেক্ষাপটের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, যেটাকে 'শানে নুযূল' বলা হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত শানে নুযূল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ না হবে, ততক্ষণ আয়াতের পূর্ণ অর্থ বুঝা যাবে না। সাথে সাথে এ বাস্তবতাও আপনাদের সামনে পরিষ্কার হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম বহু সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতমূলক কথার ব্যাখ্যা ও তাফসীরের বিষয়টি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী ও হাদীসের উপর ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে এটা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এর তাফসীরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো মৌলিক বা আমলী শিক্ষা রয়েছে কি-না? যদি থেকে থাকে, তাহলে তা বর্ণনার সর্বসম্মত মৌলিক নীতিমালার যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হয় কি-না? সাথে সাথে এটাও লক্ষ্য রাখতে হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম-যারা কুরআন নাযিলের সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁরা এই আয়াতের কি অর্থ বুঝেছিলেন।

এ ব্যাপারে যদি রেওয়ায়েতের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য থাকে, তাহলে কিভাবে এটাকে নিরসন করা যেতে পারে? উপরন্তু আরবী একটি ব্যাপকতর ভাষা, যার মধ্যে এক একটি শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার এক একটি অর্থের জন্য কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ওই যুগের আরবদের কথ্যরীতির উপর সম্যক ধারণা লাভ না হবে; ততক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ নির্ধারণ করা খুবই কঠিন হয়। তাছাড়া কেবল শব্দের আভিধানিক অর্থ জানলেই কাজ চলবে না। কারণ আরবী ভাষায় নাহভী তারকীব বা বৈয়াকরণ পার্থক্যের দরুণ অর্থের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

আর আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতা ব্যতিরেকে এর সমাধান সম্ভব নয় যে, এ স্থানে ব্যাকরণের কোন্ রীতিটি আরবদের কথ্যরীতির সবচেয়ে নিকটবর্তী? আর সর্বশেষ কথা হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা স্বীয় কালামের ভেদ ও নিগূঢ় তত্ত্ব এমন ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত করেন না যে, তাঁর অবাধ্যতায় কোমর বেঁধে নেমেছে। অতএব, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের জন্য আল্লাহ

সূচিপত্র

সুবহানাহু তা'আলার দাসত্ব, তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক, ইবাদত-আনুগত্য, তাকওয়া ও সত্যানুসন্ধানের অফুরন্ত প্রেরণ থাকা অত্যাবশ্যক।

এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন তাফসীরের জন্য শুধু আরবী ভাষায় সাধারণ অবগতিই যথেষ্ট হতে পারে না। বরং এর জন্য উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, উসূলে ফিকাহ, নাহু, সরফ, ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পান্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান এবং এর সাথে পবিত্রতা ও তাকওয়ার প্রয়োজন। এ সকল প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা ব্যতিরেকে তাফসীরের উপত্যকায় পা রাখা, নিজেকে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পথে পরিচালিত করার নামান্তর। আর এ ধরনের কর্মরীতি অবলম্বনের ব্যাপারেই দু'জাহানের সর্দার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছিলেন–

"مَن قَالَ فِي القُرانِ بِغَيرِ عِلمٍ فَليَتَبَوأ مَقعَدهُ مِنَ النارِ"

'যে ব্যক্তি না জেনে কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে কোনো কথা বলে, সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।'

কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা যেগুলোর নিরসন জরুরী ঃ چند غلط فہمیاں

১. কুরআন অত্যন্ত সহজসাধ্য বিষয় ঃ

কোনো কোনো লোক বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারীম স্বয়ং নিজের ব্যাপারে বলেছে

لَقَد يَسرنَا القُرأنَ لِلذكرِ فهل مِن مُدكرٍ

'আর নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, অতএব, আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী? [৫০৫]

অতএব, পবিত্র কুরআনুল কারীম যখন একটি সহজ গ্রন্থ, কাজেই এর জন্য লম্বা-চওড়া কোনো ইলম ও শাস্ত্র হাসিলের প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই এর মতন পড়েই এটাকে বুঝতে সক্ষম! কিন্তু এ দলীল পেশ করা মস্তবড় এক ধোঁকা। যা স্বয়ং ক্ষুদ্র জ্ঞান ও স্থূল দৃষ্টির উপর ভিত্তিশীল।

প্রকৃত ঘটনা হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ দুই ধরনের।

প্রথমতঃ ওই সকল আয়াত যেগুলোতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, দৃষ্টান্ত ও উপদেশমূলক বিষয়াবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–পৃথিবীর অস্থায়ীত্ব, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা, আলাহর ভয় ও পরকালের চিন্তা সৃষ্টিকারী কথা, জীবনের অন্যান্য সাদাসিধে তথ্য ও বিষয়।

---

[৫০৫]. সূরা কামার : ১৭

সূচিপত্র

এ জাতীয় আয়াতসমূহ নিঃসন্দেহে সহজ। আরবী ভাষায় পারদর্শী যে কোনো ব্যক্তি সেগুলো উপলব্ধি করে উপদেশ অর্জন করতে পারে। বরং এটা কুরআনুল কারীমের নির্ভরযোগ্য কোনো অনুবাদ দেখেও বিশেষ একটা পর্যায় হাসিল হয়ে যায়। উল্লিখিত আয়াতে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে, 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি।' এমনকি পবিত্র কুরআনুল কারীম এ বিষয়টিকেও মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট রাখেনি; বরং ... (উপদেশের জন্য) শব্দটি বৃদ্ধি করে এই হাকীকতকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের

দ্বিতীয় প্রকার ওই সকল আয়াত, যা বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্বলিত। এ জাতীয় আয়াতগুলোকে যথাযথভাবে বুঝা এবং এগুলো থেকে বিধি-বিধান ও মাস'আলা-মাসাইল বের করা সবার কাজ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে এ উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের মাতৃভাষা যদিও আরবী ছিল এবং আরবী শেখার জন্য তাঁদের কারো নিকট শিক্ষা অর্জন করার প্রয়োজনও ছিল না; তথাপি তাঁরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের শিক্ষা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময়-কাল ব্যয় করতেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) প্রমুখ ইমাম আবদুর রহমান সুলামী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যেসব সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমের শিক্ষা অর্জন করেছে, যেমন– হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখ, তাঁরা আমাদেরকে বলেছেন যে, যখন তাঁরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের দশটি আয়াত শিখে নিতেন, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না, যতক্ষণ ওই আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ইলমী ও আমলী বিষয়গুলো আয়ত্ত না করতে পারতেন। তাঁরা বলতেন–

فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا

'আমরা কুরআন এবং ইলম ও আমল একই সাথে শিক্ষা করেছি।'

যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ.)-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শুধু সূরা বাকারা আয়ত্ত করতেই পুরো আট বছর ব্যয় করে দিয়েছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন,

সূচিপত্র

আমাদের মধ্য হতে যিনি সূরা বাক্বারা ও সূরা আলে-ইমরান শিখে নিতেন, আমাদের দৃষ্টিতে তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে যেতেন।[৫০৬]

ভাবার বিষয় হলো এই যে, এ সকল সাহাবায়ে কেরাম যাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। যারা আরবী কবিতা ও সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। দীর্ঘ দীর্ঘ কাসীদা হালকা দৃষ্টিতেই যাদের আত্মস্থ হয়ে যেত। তাঁদের পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্ত করতে এবং এর অর্থ বুঝতে এত দীর্ঘ সময় ব্যয় করার কি প্রয়োজন ছিল যে, শুধু একটি সূরা শিক্ষা করতে আট-আটটি বছর ব্যয় হয়ে যাবে? এর কারণ ছিল এটাই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম ও এর জ্ঞান অর্জন করার জন্য শুধু আরবী ভাষার দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না।

বরং এর জন্য নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্য ও তাঁর শিক্ষা থেকে উপকৃত হবার প্রয়োজন ছিল। এটা সুস্পষ্ট যে, আরবী ভাষায় দক্ষতা ও সরাসরি ওহী অবতরণের প্রেক্ষাপটের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্ত্বে যখন সাহাবায়ে কেরামের "আলেমে কুরআন" হওয়ার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন ছিল, তাহলে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার শত শত বছর পর আরবী ভাষায় যৎসামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করে কিংবা শুধু অনুবাদ দেখে মুফাস্সিরে কুরআন হবার দাবী করা কত বড় দুঃসাহস এবং ইলম ও দীনের সাথে কত আফসোসপূর্ণ উপহাস! যারা এ ধরনের দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে তাদের জন্য রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীটি খুব ভালো করে স্মরণ রাখা উচিত–

"مَن قَالَ فِي القُرأنِ بِغَيرِ عِلمٍ فَليَتَبَوأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

'যে ব্যক্তি না জেনে কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে কোনো কথা বলে, সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।'[৫০৭]

২. উলামায়ে কেরাম ও ঠিকাদারী ঃ علماوراجارہ داری

কতিপয় লোক এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম গোটা মানব জাতির জন্য এক দিক-নির্দেশক গ্রন্থ। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী এর দ্বারা উপকৃত হবার অধিকার রাখে। এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের উপর শুধু উলামায়ে কেরামের "ঠিকাধারী" প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

কিন্তু এটাও অত্যন্ত স্থূল ও আবেগপ্রবণ অভিযোগ। বাস্তবপ্রিয় ও মু'আমালা বিষয়ক উপলব্ধির সাথে এর দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও নেই। নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনুল কারীম গোটা মানবজাতির জন্য হেদায়াতের মূলপুঁজি। কিন্তু

---

৫০৬. আল-ইতকান : ২/১৭৬

৫০৭. আবু দাউদ, আল-ইতকান : ২/১৭৯ থেকে উদ্ধৃত।

সূচিপত্র

এর দ্বারা এ কথা কি করে সাব্যস্ত হলো যে, যে কোনো বকলম-মূর্খও কুরআন থেকে আইনগত সূক্ষ্ম বিষয়াবলী ও দার্শনিক মাসাইল বের করতে পারবে? আর এর জন্য কোনো ধরনের যোগ্যতা ও গুণাবলীর প্রয়োজন নেই।

এর উপমা এমন যে, কোনো আইন বিশেষজ্ঞ অথবা কোনো দার্শনিক কিংবা ডাক্তার যদি নিজ বিষয়ের উপর কোনো গ্রন্থ রচনা করে, তাহলে স্পষ্টত এর দ্বারা গোটা মানবজাতিকে উপকৃত করাই তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখন যদি এমন কোনো ব্যক্তি– যার এ শিক্ষা ও বিষয়ে প্রাথমিক ধারণাও নেই, এ অভিযোগ নিয়ে দাঁড়ায় যে, এ গ্রন্থগুলো তো গোটা মানবজাতির উপকারার্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, আইন বিশেষজ্ঞ এবং দার্শনিক ও ডাক্তাররা কেন এগুলোর উপর নিজেদের "ঠিকাদারী" প্রতিষ্ঠা করে নিল? তাহলে এমন ব্যক্তির বিবেকের উপর মাতম-বিলাপ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? কোনো গ্রন্থ থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হবার জন্য যোগ্যতার কিছু অপরিহার্য গুণাবলী নির্ধারণ করা যদি "ঠিকাদারী" প্রতিষ্ঠা করার সংজ্ঞায় পড়ে যায়, তবে আর পৃথিবীর কোনো জ্ঞান ও শাস্ত্রকে মূর্খ ও আনাড়ীদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা যাবে না।

বস্তুতঃ ইলম ও বৈষয়িক যে কোনো গ্রন্থই মানবতার উপকারার্থেই রচিত হয়। কিন্তু তা থেকে উপকৃত হবার দু'টিই পদ্ধতি। হয়তো মানুষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো দক্ষ শিক্ষকের অধীনে থেকে এই ইলম ও বিষয়গুলো অর্জন করবে এবং এর জন্য যেই শ্রম ও যে পরিমাণ সময় ব্যয় করা দরকার তাতে ব্যয় করবে। আর যদি সে এমনটি করতে না পারে, তাহলে যারা এই ইলম ও বিষয়গুলো অর্জন করার জন্য নিজেদের জীবনকে ব্যয় করেছেন, তাঁদের মধ্য হতে যার উপর অধিক আস্থা ও ভরসা হয়, তাঁর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের উপর ভরসা করবে। যে ব্যক্তি এ দুই পদ্ধতি ভিন্ন তৃতীয় কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে, তাহলে সে নিজের উপরও জুলুম করবে এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও বিষয়ের উপরও জুলুম করবে।

কুরআন ও সুন্নাহ'র ব্যাপারটাও ঠিক তদ্রূপ যে, নিঃসন্দেহে তা গোটা মানবতার জন্য হেদায়াতের সংবিধান।

কিন্তু তা থেকে হেদায়াত লাভ করারও দু'টিই পন্থা। হয়তো মানুষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে দক্ষ শিক্ষকদের নিকট থেকে এ শাস্ত্রের জ্ঞান হাসিল করে পূর্ণ যোগ্যতা-পারদর্শিতা অর্জন করবে। নতুবা সেসব মনীষীদের ব্যাখ্যা ও তাফসীরের উপর ভরসা করবে। যে ব্যক্তি এই দুই পদ্ধতি ভিন্ন তৃতীয় কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে, তাহলে সে নিজের উপরও জুলুম করবে এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও বিষয়ের উপরও জুলুম করবে।

সূচিপত্র

কুরআন ও সুন্নাহ'র ব্যাপারটাও ঠিক তদ্রুপ যে, নিঃসন্দেহে তা গোটা মানবতার জন্য হেদায়াতের সংবিধান। কিন্তু তা থেকে হেদায়াত লাভ করারও দু'টিই পন্থা। হয়তো মানুষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে দক্ষ শিক্ষকদের নিকট থেকে এ শাস্ত্রের জ্ঞান হাসিল করে পূর্ণ যোগ্যতা-পারদর্শিতা অর্জন করবে। নতুবা সেসব মনীষীদের ব্যাখ্যা ও তাফসীরের উপর ভরসা করবে, যাঁরা এই ইলম ও বিষয়ের জন্য স্বীয় জীবনকে ওয়াক্ফ করেছেন। পৃথিবীর যে কোনো জ্ঞান ও বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একশতে একশ' ভাগ যুক্তিযুক্ত এই নীতিমালাকে "ঠিকাদারী" অভিযোগে অভিযুক্ত করা স্থূল আবেগপ্রবণতা ছাড়া আর কি হতে পারে? গোটা দুনিয়ায় কি শুধু কুরআন ও সুন্নাহই (নাঊযুবিল্লাহ) এমন লা-ওয়ারিশ রয়ে গেল যে, এগুলো থেকে মাস'আলা উদ্ঘাটন করার জন্য কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন নেই! প্রত্যেক যেমন-তেমন ব্যক্তিই এর উপর জুলুম-চর্চা চালাতে পারে?

৩. উলামায়ে কেরাম ও পোপতন্ত্র ঃ علماور پاپائیت

পূর্বোল্লিখিত অভিযোগটিই কেউ কেউ শিরোনামে কিছুটা পরিবর্তন করে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, ইসলামে "পোপতন্ত্র"-এর কোনো অবকাশ নেই। এটা শুধু খ্রিস্টান ধর্মের বৈশিষ্ট্য যে, এতে বাইবেলের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করার অধিকার একমাত্র পোপের জন্যই সংরক্ষিত। অন্য কোনো ব্যক্তির এতে মত পেশ করার কোনো সুযোগ থাকে না। ইসলাম পোপতন্ত্রের মূলোৎপাটন করেছে। কাজেই এটা কি করে সম্ভব যে, এ দ্বীনে ফিতরাতেও পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের পূর্ণ অধিকার উলামায়ে কেরামের বিশেষ একটি শ্রেণীর উপর অর্পণ করা হবে?

কিন্তু এ অভিযোগটিও পোপতন্ত্র ও উলামায়ে ইসলাম সম্পর্কে ভুল উপলব্ধির ফসল। "উলামা" এমন কোনো বিশেষ শ্রেণী বা গোত্রের নাম নয়; যাদের ভিত্তি হবে বর্ণ-বংশ, জাতিভেদ, ধন-সম্পদ কিংবা পদ-সিংহাসনের শর্তাবলীর উপর। আবার "উলামা" এমন কোনো ধরা-বাঁধা সংগঠনের নাম নয়; যার সদস্য হওয়া ছাড়া মানুষ 'আলেম' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য হবে না। বরং জ্ঞান-সম্মান, জীবনচরিত ও কৃতকর্মের বিশেষ কিছু গুণাবলীর ধারক-বাহক যে কোনো ব্যক্তিই 'আলেমে দ্বীন'। চাই তিনি যে কোনো ভূ-খ-ের অধিবাসীই হোন। যে কোনো ভাষাই কথা বলেন। বংশগত দিক থেকে যে কোনো বংশের সাথেই সম্পর্ক রাখেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের 'উলামা' ও খ্রিস্টানদের 'পোপদের' মাঝে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো বিদ্যমান–

সূচিপত্র

১. "পোপতন্ত্র" এমন এক প্যাঁচানো ধর্মব্যবস্থার নাম, যা ব্যাপকতর এক ধরা-বাঁধা সংগঠনে আবদ্ধ। এতে রয়েছে অগণিত পদবী ও মর্যাদা। এসব পদবী ও মর্যাদায় উত্তীর্ণদের সংখ্যা নির্ধারিত। কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি এসব পদবী ও মর্যাদায় উত্তীর্ণদের নিয়োগ দিয়ে থাকে এবং তারাই উত্তীর্ণ ব্যক্তির উপর আবশ্যকীয় ও ঐচ্ছিক বিষয়াবলী অর্পণ করে থাকে। কোনো ব্যক্তি নিছক স্বভাবজাত যোগ্যতা, জ্ঞান-সম্মান অথবা জীবনচরিত ও কর্মযোগ্যতার ভিত্তিতে জোর করে এ সংগঠনের কোনো পদ অর্জন করতে সক্ষম হয় না।

যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে নির্বাচন না করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ওই সংগঠনের কোনো পদ অলঙ্কিত করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে তার সকল রায় সম্পূর্ণ অকার্যকর ও প্রভাবহীন থাকবে। চাই সে ইলম ও সম্মানের দিক থেকে যতই উচ্চ শিখরে অবস্থান করুক না কেন। এর ফলাফল হলো এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চ স্তরের পাণ্ডিত্য অর্জন করে নেয়, তবুও সে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে চার্চের মজবুত দুর্গ ভাঙ্গতে সক্ষম হবে না।

আর যদি এই নির্দিষ্ট সংগঠনটি নিজেদের পবিত্র গ্রন্থাদি এবং নিজেদের নবী ও পূর্বসূরীদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে; তবুও সংগঠনের বহিরাগত কোনো আলেমের এর বিরুদ্ধে টু শব্দ করার অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে কোনো যুগেই "উলামায়ে ইসলাম"-এর এ ধরনের আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠন ছিল না। যার সদস্য হওয়া ব্যতিরেকে ধর্মীয় বিষয়ে মুখ খোলা নিষেধ, যার পদবীর গণ্ডি বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত এবং যার মধ্যে নিয়োগের সিদ্ধান্ত বিশেষ কিছু ব্যক্তিবর্গের হাতে। বরং এর পরিবর্তে যিনি দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থেকে কুরআন-সুন্নাহ ও তৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা এবং আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জন করেছেন তিনিই "আলেমে দ্বীন" হওয়ার যোগ্য হয়ে যান। সীমিত সংখ্যক মানুষের কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায় তাঁকে ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করে না। বরং তাঁর ইলম ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা এর সিদ্ধান্ত করে থাকে।

চার্চের ক্ষমতাসীনরা নিজ পদ ও ক্ষমতার বলে জোরপূর্বক নিজের কথা মানতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম আলেম স্বীয় ইলম, সম্মান, জীবনচরিত ও কর্মদক্ষতার শক্তিতে এ অবস্থান অর্জন করে নেয়। ওখানে চার্চের কঠোর নীতি কোনো ব্যক্তিকে অবশ্য আনুগত্য ও অবশ্য অনুসরণীয় সাব্যস্ত করে। আর এখানে সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকারী মূল শক্তি হলো, মুসলিম উম্মাহর আন্তরিক সম্মতি। গির্জার পদারোহীদের একটি সংখ্যা নির্ধারিত থাকে। এ সংখ্যা পূর্ণ

হয়ে যাবার পর কোনো ব্যক্তি যত বড় আলেমই হোক না কেন, স্বীয় যুগের গির্জার কোনো সিদ্ধান্তের সাথে মতবিরোধ করতে পারে না।

পক্ষান্তরে উলামায়ে দীনের এমন কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই। ইলমে দ্বীনের আবশ্যকীয় শর্তাবলী পূর্ণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি "আলেমে দ্বীন" হবার অধিকার লাভ করতে পারেন।

২. অতঃপর গির্জাভিত্তিক নীতিতে ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা ও তাফসীরের সকল অধিকার মাত্র একজন সদস্যের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, যাকে "পোপ" বলা হয়। ধর্মের কোটি কোটি ভক্তবৃন্দের মধ্য হতে মোট সত্তরজন কার্ডিনাল (Cardinals) এ "পোপ" নির্বাচন করে থাকে। এই পোপের ক্ষমতাবলী হচ্ছে যে, সে হাওয়ারীদের প্রধান (জনাব পাত্বরিস)-এর একক প্রতিনিধি। ধর্মীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সর্বশেষ নির্ভরযোগ্যতা রাখেন। ধর্মের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তার অনুসরণ প্রত্যেক মসীহীর জন্য বাধ্যতামূলক। তার মুখ নিঃসৃত বাণী আইন সমতুল্য। বড় থেকে বড় কোনো আলেমের জন্য তার সাথে মতবিরোধ করার অধিকার নেই। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় তার ক্ষমতাবলীর ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া হয়েছে–

"সুতরাং পোপ ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে তিনিই নির্ভরযোগ্যতা (Authority) ও নিষ্পাপত্বের [Infallibiliy বাহক। গোটা গির্জার অধিকারী এবং তিনিই আইন প্রণেতা ও জর্জের সমতুল্য হিসেবে সেসব এখতেয়ার সংরক্ষণ করেন, যা গোটা গির্জার অর্জিত হয়।"[৫০৮]

একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, গোটা ইসলামের ইতিহাসে কোনো আলেমে দ্বীন কখনো এ ধরনের সর্বময় ক্ষমতার দাবী করেছেন কি?

৩. অতঃপর খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী "পোপ" চিন্তাধারামূলক বিষয়ের ঘোষণা করতে গিয়ে নিষ্পাপ ও গোনাহমুক্ত হয়ে থাকেন। যেমন ব্রিটানিকায় রয়েছে–

"অতএব, পোপের বিশেষ দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমতঃ যখন তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ধর্ম-বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা করেন, তখন তিনি নিষ্পাপ ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে যান। দ্বিতীয়তঃ তিনি ধর্মের সকল অনুসারীর উপর জর্জ পর্যায়ের পূর্ণ ক্ষমতা (Sovereign Jurisdiction) সংরক্ষণ করেন। এ দু'টি অধিকারের দাবী ও প্রয়োগ শতবর্ষ পূর্ব থেকে পোপ করে

---

[৫০৮]. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, পোপ, ১৮/২২২-২২৩

সূচিপত্র

আসছেন। ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে ভাটিকান কাউন্সিলে সেটাকে স্পষ্টভাবে সাংবিধানিক রূপও দান করা হয়।"[৫০৯]

পক্ষান্তরে সকল উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত আকীদা হচ্ছে যে, নবী-রাসূলগণের পর কোনো ব্যক্তি নিষ্পাপ নয়। অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ভুল হতে পারে। আর এ কারণেই উলামায়ে কেরাম স্বাধীনভাবে একে অপরের সমালোচনা করে আসছেন। আর এই ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগ থেকে আজ অবধি অব্যাহত আছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিখ্যাত কোনো আলেমও যদি কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যায় কোনো ভুল-ভ্রান্তি করে বসেন, তাহলে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তাঁকে পাকড়াও করে উম্মতে মুসলিমাকে এর কুফল থেকে রক্ষা করতে পারেন।

৪. অতঃপর গির্জার মধ্যে যে সত্তরজন কার্ডিনাল (Cardinal) পোপ নিযুক্ত করে থাকেন এবং তাকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, স্বয়ং পোপ এককভাবে তাদের নাম শনাক্ত করে থাকেন। যেমন ব্রিটানিকায় উল্লেখ রয়েছে–

"কার্ডিনাল নিযুক্ত করা বর্তমানে এককভাবে পোপের দায়িত্ব। গোপনীয়ভাবে পোপ যেসব সদস্যদের নির্বাচন করে থাকেন, তাদের নাম প্রকাশের মাধ্যমেই এ কাজটি পূর্ণতা লাভ করে। এর জন্য অন্য কোনো রীতি-নীতি অনুসরণের প্রয়োজন নেই।..অনুরূপভাবে সীক্রড কলেজের ভোটাধিকার প্রয়োগ বা মঞ্জুরীরও কোনো প্রয়োজন নেই।"[৫১০]

এ ছাড়াও গির্জার এ নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায়, যারা ধর্মের সাদা-কালোর অধিপতি হয়, কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতেই তাদের নিযুক্তি নির্ধারিত হয় না। বরং বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব এতে কাজ করে থাকে।

সেই ব্রিটানিকারই আরেকটি বক্তব্য লক্ষ্য করুন–

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজত্বে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের উপদল কর্তৃক গির্জা পরিষদ গঠিত হয়। তবে ইংরেজী ভাষা-ভাষী সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আইরিশ (আয়ারল্যান্ড অধিবাসী) ও জার্মানী সম্প্রদায়ের সর্বাধিক কোটা অর্জিত ছিল।..এতদ্ব্যতীত পূর্বাঞ্চলীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায় (যেমন, গ্রীক, রোমান ও আর্মেনিয়া) এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় বিদ্যমান রয়েছে।"[৫১১]

এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর উলামায়ে ইসলামের সাথে পোপতন্ত্রের তুলনা করুন। উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতালের তফাত। উলামায়ে ইসলামের না

---

[৫০৯]. প্রাগুক্ত, ১৮/২২৩, আরো দেখুন ঃ প্রবন্ধ : নিষ্পাপ (Infallibility)

[৫১০]. প্রাগুক্ত, ৪/৮৫৫, আরো দেখুন ঃ প্রবন্ধ : কার্ডিনাল (Cardinal)

[৫১১]. প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ রোমান ক্যাথলিক চার্চ, ১৯/৪২১

সূচিপত্র

আছে ধরা-বাঁধা কোনো সংগঠন, আর না আছে কোনো ধর্মীয় বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী কোনো ব্যক্তি। না আছে নিষ্পাপ ও ত্রুটিমুক্ত হওয়ার কোনো দাবীদার। আর না আছে সীমিত সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কোনো দল, যার মধ্যে আর কেউ যোগ হতে পারে না। না আছে কেউ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের সমালোচনার ঊর্ধ্বে। আলেম উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য না প্রয়োজন আছে কোনো একক ব্যক্তির অনুমতি ও মঞ্জুরীর।

আর না এ পদের জন্য কোনো বর্ণ-বংশ বা ভাষা-ভূমির শর্ত আছে। বরং ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা অধিকাংশই ছিল আরবদের হাতে। কিন্তু উলামা সৃষ্টি হয়েছেন অনারব ও দাসদের বংশ থেকে। আর গোটা মুসলিম বিশ্ব তাঁদের ইলম, সম্মান, পবিত্রতা ও তাকওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে চলেছে।

অতএব, যখন এ কথা বলা হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলমে দখলদারিত্বের জন্য এসব জ্ঞান ও বিষয়ে পারদর্শিতার প্রয়োজন, তখন এর উপর "পোপতন্ত্র"-এর অভিযোগ আরোপ করা সত্য ও ন্যায়ের সাথে চরম বিদ্রূপ ব্যতীত আর কিছু নয়।[৫১২]

পক্ষান্তরে দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ অন্যান্য গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার মতোই। যেমনিভাবে পৃথিবীর অন্য সকল শিক্ষা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কথা ওই সময় পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও বিষয় দক্ষ শিক্ষকম-লীর কাছ থেকে অর্জন করে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা হাসিল না করে। ঠিক তদ্রূপ কুরআন ও সুন্নাহ'র ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কথা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইলম ও জ্ঞান নিয়মতান্ত্রিকভাবে অর্জন করে দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থেকে এর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা হাসিল না করবে। যদি এ কথাটিকে কেউ "পোপতন্ত্র" বলে ব্যাখ্যা দেয়, তাহলে পৃথিবীর কোনো ইলম ও শাস্ত্র এই পোপতন্ত্র হতে মুক্ত হতে পারবে না।

---

৫১২. এখানে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা তুলে ধরা যে, উলামায়ে ইসলাম ও পোপদের মাঝে কি কি পার্থক্য? পোপতন্ত্রের নীতিতে কিছু ভালো দিক রয়েছে আর কিছু খারাপদিক রয়েছে, তা এখানে আমাদের পর্যালোচনার বহির্ভূত। নতুবা বাস্তবতা তো হলো এই যে, প্রোটেস্টেন্ট সম্প্রদায়ের প্রোপাগান্ড [যেখানে পোপতন্ত্রের প্রকৃত অকল্যাণগুলো তুলে ধরা হয়েছে] শুধু বদনাম করার জন্য এমন বহু মিথ্যা অভিযোগ এনেছে করেছে, যা এর উপর আরোপ করা যায় না। কিন্তু এখানে ওই আলোচনার স্থান নয়।–মুহাম্মদ তাকী।

সূচিপত্র

2-قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا

দ্বিতীয় কারণ ঃ কুরআনুল কারীমকে স্বীয় চিন্তাধারার অধীন করাঃ

কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহা গোমরাহী হলো, মানুষ আগ থেকেই নিজের মন-মস্তিষ্কে কোনো চিন্তা-চেতনা নির্ধারণ করে রাখে। এরপর পবিত্র কুরআনুল কারীমকে ওই সব চিন্তা-চেতনার অধীনস্থ করার চেষ্টা করে। যেমন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এগুলোকে চিহ্নিত করেছেন।[৫১৩] প্রাচীনকাল থেকে বাতিল সম্প্রদায়, বাহ্যপূজারী ও সমকালীন দর্শনে প্রভাবিত লোকেরা পবিত্র কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করেছে। পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী ধুমড়ে-মুচড়ে নিজ চিন্তা চেতনার অনুকূলে আনার চেষ্টা করেছে। অথচ পৃথিবীর কোনো বিষয়ে কোনো ক্ষেত্রেই এই কর্মপন্থা সত্য ও ন্যায়ের সাথে যায় না। বিশেষ করে পবিত্র কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করা এত বড় অন্যায় যে, এর তুলনায় আর কোনো অন্যায় হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনুল কারীম বহু স্থানে নিজেকে নিজে 'হেদায়াত গ্রন্থ' হিসেবে উল্লেখ করেছে। "হেদায়াত"-এর অর্থ হলো, "যে ব্যক্তির উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছার পথ জানা নেই তাকে পথ-প্রদর্শন করা।" অতএব, পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে "হেদায়াত" লাভ করার জন্য অপরিহার্য হলো যে, মানুষ নিজের মন-মস্তিষ্ককে ওই ব্যক্তির ন্যায় শূন্য ও খালি রাখবে, যার নিজের গন্তব্যের পথ জানা নেই। এরপর অন্তরে এই বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম যে পথ প্রদর্শন করবে সেটাই আমার জন্য কল্যাণ ও সফলতার মাধ্যম হবে।

আমার সীমিত বিবেক-জ্ঞান সেটাকে গ্রহণ করুক আর না-ই করুক। আমার বিবেক-জ্ঞান যদি এতই নির্ভরযোগ্য হতো যে, এর জোরে আমি সবকিছু জেনে নিতে পারতাম, তাহলে আর পবিত্র কুরআনুল কারীমের শরণাপন্ন হবার কি প্রয়োজন ছিল? এই বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে যখন মানুষ পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিকে ধাবিত হবে এবং পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্তাবলীগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখবে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।

পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি নিজ বিবেক-জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পূর্ব থেকেই নিজের মন-মগজে বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করে নেয় এবং তারপর নিজের ওই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির চশমা দিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীম পড়তে

---

৫১৩. (ইবনে তাইমিয়া) উসূলুত তাফসীর পৃঃ ২৩, মাকতাবায়ে ইলমিয়া, লাহোর।

সূচিপত্র

আরম্ভ করে, তাহলে এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, সে মহান আল্লাহর ওই পবিত্র গ্রন্থ থেকে হেদায়াত লাভের জন্য নয়; বরং স্বীয় বিবেক-প্রসূত চিন্তাধারার সমর্থন আদায়ের জন্য পাঠ করছে। এটাতো স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি নিজের বিবেক-জ্ঞানের উপর এত ভরসা করে এবং নিজের বিবেককে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুগত নয়; বরং [নাঊযুবিল্লাহ] পবিত্র কুরআনুল কারীমকে নিজের বিবেক ও খায়েশের অনুগত করতে চায়, পবিত্র কুরআনুল কারীম তাকে হেদায়াতের আলো দিতে প্রস্তুত নয়। এমন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সঠিক গন্তব্যে পৌঁছার পরিবর্তে গোমরাহীর চোরাবালিতে ধসে যেতে থাকে এবং তার হেদায়াত নসীব হয় না। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারেই পবিত্র কুরআনুল কারীম ইরশাদ করেছে–

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

'মহান আল্লাহ এ (কুরআন)-এর মাধ্যমে বহু লোককে গোমরাহ করেন এবং বহু লোককে হেদায়াত দান করেন।'

অতএব, পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে হেদায়াত লাভ করার সঠিক পদ্ধতি হলো, নিজের মগজকে অন্যান্য চিন্তা চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে একজন সত্যানুসন্ধানীর ন্যায় পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এর মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝার জন্য যেসব ইলমের প্রয়োজন, সেগুলো শিক্ষা করে এর তাফসীর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। আর এ পন্থায় যা কিছু প্রমাণিত হবে, একজন সত্যনিষ্ঠ মুমিনের ন্যায় এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর যে ব্যক্তির এতটুকু সামর্থ্য নেই অথবা স্বীয় মন-মস্তিষ্কের উপর তার এতটুকু আস্থা নেই, তার জন্য সঠিক পদ্ধতি হলো এটাই যে, সে নিজে সরাসরি "কুরআন তাফসীর"-এর উপত্যকায় পা রাখার পরিবর্তে ওই সকল মনীষীর তাফসীরের উপর ভরসা করবে, যারা নিজেদের জীবনটা এ কাজে ব্যয় করেছেন এবং যাদের ইলমী দক্ষতা, ইখলাস ও আল্লাহ ভীতির উপর তার অধিক আস্থা হয়।

زمانے کے افکار سے مرعوبیت

তৃতীয় কারণ ঃ সমকালীন দর্শনে প্রভাবান্বিত হওয়া ঃ

পবিত্র কুরআন তাফসীরের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় গোমরাহী হলো এই যে, সমকালীন দর্শন ও বিবেক-প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মানসিকভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে ওই সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাকে সত্য ও অসত্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করবে। এই গোমরাহী মূলতঃ দ্বিতীয় গোমরাহীর আওতায় এসে যায়। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে আমাদের এ যুগে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়াটা

সূচিপত্র

বিশেষ করে এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে, তাই স্বতন্ত্রভাবে এই গোমরাহীর আলোচনা করা হচ্ছে।

ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু লোকের একটি দল সর্ব যুগেই বিদ্যমান ছিল, যারা কুরআন ও সুন্নাহ'র ইলমে বুৎপত্তি অর্জন করা ছাড়াই সমকালীন দর্শনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। আর ওইসব দর্শন তাদের মন-মগজে এমন নিকৃষ্টভাবে চেপে বসেছে যে, তারা ওই দর্শন-প্রসূত চিন্তা ও মতাদর্শের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার যোগ্যতা থেকেই মাহরূম হয়ে গেছে। এরপর যখন তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের বহু কথা তাদের আইডিয়েল দর্শনের বিপরীত অনুমিত হয়েছে, তখন তারা দর্শনকে মিথ্যা আখ্যায়িত করার পরিবর্তে পবিত্র কুরআনুল কারীমের মাঝে বিকৃতি ও পরিবর্তন আরম্ভ করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের শব্দগুলোকে টেনে-হেঁচড়ে নিজেদের দার্শনিক চিন্তা-ধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল বানাতে শুরু করেছে।

যখন মুসলমানদের মধ্যে ইউনানী-গ্রীক দর্শনের চর্চা আরম্ভ হয় এবং লোকেরা কুরআন ও সুন্নাহ'র জ্ঞানে পরিপক্বতা অর্জন করা ছাড়াই এ দর্শন বিদ্যা অর্জন করতে শুরু করে, তখন এই ফিতনাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিছু লোক যারা গ্রীক-দর্শন দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল, তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমকে ভেঙ্গে-চুরে এ দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার চেষ্টায় মত্ত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেক লোক নিষ্ঠাবানও ছিল। তারা মনে-প্রাণে এ কথা বুঝতেন যে, গ্রীক-দর্শন অপ্রতিরোধ্য এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র উত্তরাধিকার প্রাপ্ত তাফসীর ও দার্শনিক চিন্তা-স্রোতের মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। তাই এই তাফসীরকে পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ'র এমন ব্যাখ্যা করা উচিত, যা গ্রীক-দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

তবে বস্তুত এটা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ'র সাথে মূর্খতাসুলভ বন্ধুত্ব। যা ইসলামের কোনো খেদমত করার পরিবর্তে মুসলমানদের মাঝে মতাদর্শগত বিভেদ-বিক্ষিপ্ততা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং মু'তাযিলা ও জাহ্‌মিয়াদের ন্যায় বহু নতুন নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, ওই সকল দক্ষ ও দৃঢ়চিত্ত উলামায়ে কেরাম যারা কুরআন ও সুন্নাহ'র ইলমে গভীরতা অর্জন করেছিলেন এবং যারা কুরআন ও সুন্নাহ'র পরিবর্তে সমকালীন প্রচলিত কোনো চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত ছিলেন না, তাঁদের একটি বড় অংশের অন্যান্য কাজ-কর্ম রেখে দিয়ে তাদের প্রতিরোধে নিয়োজিত হতে হয়েছে। তাঁরা গ্রীক-দর্শনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে দলীল-প্রমাণভিত্তিক সেসব

সূচিপত্র

লোকের বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন, যারা গ্রীক-দর্শনে প্রভাবিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহ'য় অর্থগত বিকৃতি সাধনে লিপ্ত হয়েছিল।

মোটকথা, দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত মতাদর্শগত বহস-মুবাহাসা, তাঁসনীফ ও মুনাযিরার বাজার গরম থেকেছে এবং উভয় দলের নিজ নিজ অবস্থানের সমর্থনে পুরো 'কুতুবখানা' (লাইব্রেরী) তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পরিপক্ব ও দৃঢ়চিত্ত উলামায়ে কেরামের অবস্থান ছিল এই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয়। বরং তা বিশ্বজগতের স্রষ্টা ওই মহান সত্ত্বার গ্রন্থ, যিনি এ বিশ্ব ও তাতে সংঘটিতব্য সকল ঘটনা ও বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত। এ পৃথিবীতে পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিক আর কেউ জানতে পারে না। অতএব, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা এবং তাতে বর্ণিত সকল তত্ত্ব ও তথ্য সদা প্রাণবন্ত, বর্তমান ও অপরিবর্তনীয়। যেসব বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন ও চিন্তাধারার উপর কালের আবর্তন-বিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে, সেসব ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনুল কারীম সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য না দিয়ে এমন সর্বব্যাপী মৌলনীতি বর্ণনা করেছে, যা সব ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এর আলোকে যে কোনো পরিবর্তিত অবস্থা ও পরিবেশে দিক-নির্দেশনা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব বিষয় পবিত্র কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে অথবা যেগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও তাফসীর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে প্রমাণিত আছে, কালের আবর্তন-বিবর্তনে সেগুলো পরিবর্তন হবার বিষয় নয়।

দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, এর অকাট্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহীন অধিকাংশ মতবাদ বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আর যে যুগে যে মতবাদের প্রচলন হয়েছে, তা মানুষের মন-মগজে এমনভাবে চেপে বসেছে যে, মানুষ এ মতবাদের বিপরীত কোনো কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত থাকেনি। কিন্তু যখন কালের কোনো উত্থান-পতনে এ মতবাদের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে, তখন ওই মতবাদটি এতই ধিকৃত হয়েছে যে, সেটাকে মুখ দিয়ে বের করাটাও পশ্চাৎগামীতার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এখন তার স্থলে নতুন কোনো মতাদর্শ মন-মগজে অবস্থান গেড়ে নিয়েছে এবং এর চাকচিক্যময় প্রভাব বিরোধী সকল মতবাদের কণ্ঠ চেপে ধরেছে। অতঃপর দীর্ঘ একটি কাল অতিক্রম করার পর নতুন এই মতবাদটিও নিজের প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে। তৃতীয় কোনো মতবাদ এর স্থান দখল করে নিয়েছে।

মানবীয় চিন্তা-গবেষণার ইতিহাসে সর্বদা এমনটিই হয়ে আসছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পরম সত্য ও বাস্তবতার পিপাসা মানুষকে অকাট্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত না পৌঁছাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমনটি হতেই থাকবে। পবিত্র

সূচিপত্র

কুরআন মাজীদ যে মহাসত্য এবং তত্ত্ব ও তথ্যের পথ-প্রদর্শন করেছে, তা যেহেতু এমন এক সত্ত্বার বর্ণিত বিষয়, যার সম্মুখে গোটা বিশ্বজাহান এবং তাতে সংঘটিত সকল ঘটনা-প্রবাহ হাতের তালুর চাইতেও স্পষ্ট ও পরিষ্কার। তাই দর্শন ও গবেষণার এই বিন্দু কণাকে তার মুকাবেলায় পেশ করা মানায় না।

আপনি কালের যে মতবাদ ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে এর ছাঁচে সাজানোর চেষ্টা করছেন; হতে পারে ওই মতবাদটিই অজ্ঞতার যুগের স্মারক হবে আর আপনি এটাকে মুখে আনতেও লজ্জাবোধ করবেন।

অভিজ্ঞতার আলোকে দৃঢ়চিত্ত প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরামের এ গবেষণা পন্থা সম্পূর্ণরূপে সত্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আজকের দর্শন ও সাইন্সের উত্থান গ্রীক-দর্শনের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আর তাদের প্রাকৃতিক, মৌলিক ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কতগুলো চিন্তাধারা শুধু ভুল প্রমাণিত হয়নি; বরং সেগুলোর ভিত্তির উপর অতি প্রাকৃতিক (Metaphysical) চিন্তাধারার যে প্রাসাদ দাঁড় করানো হয়েছিল, তাও মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। একদা যারা গ্রীক-দর্শনের চাকচিক্যে বিমোহিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে এই আদলে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিল, তারা যদি আজ জীবিত থাকতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের আফসোস ও লজ্জার কোনো সীমা থাকতো না।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, স্থূল ও বাহ্যপূজারীদের একটি দল ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় ভীত ও প্রভাবিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহ'র এমন তাফসীর গড়তে সচেষ্ট, যা চলমান পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে।

এ দলটি কুরআন তাফসীরে যাবতীয় যুক্তিগ্রাহ্য, প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ নিয়ম-নীতিতে পদদলিত করে শুধু একটি নীতির উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সাথে জুলুম চর্চায় লিপ্ত রয়েছে। আর সেই নীতিটি হচ্ছে, মহান আল্লাহর এই কালামকে যে কোনোভাবে হোক টেনে-হেঁচড়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাথে খাপ খাইয়ে দিতে হবে! এই লোকগুলো কখনো এ কথা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য প্রস্তুত নয় যে, যে কালামের উপর তাভীল ও অপব্যাখ্যার চর্চা চালাচ্ছে সেটা কোন্ সত্ত্বার কালাম? যে মতবাদ ও চিন্তাধারার খাতিরে তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে, সেটার স্থায়ীত্ব কতটুকু? মানবীয় চিন্তা-গবেষণার কাফেলা যখন এই মতবাদ ও চিন্তা-ধারাগুলোকে পদদলিত করে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে, তখন এ ধরনের তাফসীর ও ব্যাখ্যার কি পরিণতি হবে?

সূচিপত্র

মু'জিযা প্রসঙ্গ ঃ معجزات کا مسئلہ

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যখন পশ্চাত্যের বিখ্যাত দার্শনিক নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করলেন, তখন এ মহাবিশ্ব ও তাতে বিদ্যমান সকল বস্তুর ব্যাপারে একটি মতবাদ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। যেটাকে "মিকানিকী জীবনাদর্শ" বলা হয়। সহজ ভাষায় যার খোলাসা হলো, এ মহাজগৎ ইল্লত ও মা'লূলের নিয়ম-নীতির ভেতরে এমনভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে যে, তা এ শৃঙ্খল হতে এক চুলও এদিক-ওদিক নড়তে পারে না। এখানে বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুরই একটি স্বভাব-প্রকৃতি রয়েছে, যা তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

আর স্বভাব কখনো তার সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যেমন আগুনের স্বভাব হলো সর্বদা দাহন করা। এভাবে দাহন-স্বভাব আগুনের সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, এটা কখনো হতে পারে না যে, আগুন বিদ্যমান আছে, কিন্তু তা থেকে থেকে দাহিকাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

গোটা দুনিয়ায় যখন এ মতবাদের ডঙ্কা বাজতে আরম্ভ হলো, তখন পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ এমন সব বিষয় ও ঘটনাবলী নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন, যেগুলোকে তারা প্রকৃতি ও স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে (Super Natural) মনে করতেন এবং যেগুলো তাদের জ্ঞাত ইল্লত-মা'লূলের মতবাদ পরিপন্থী ছিল। ফলে তারা সেসব বিষয়কে কল্পনা-প্রসূত বলে আখ্যায়িত করলেন, যেগুলো স্বভাবগত কার্যকারণের অধীনে সংঘটিত হয়নি। এই মতবাদের চাকচিক্য এবং সর্বোপরি "প্রকৃতি ঊর্ধ্ব" বিষয়াবলীর ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইসলামী বিশ্বের কোনো কোনো আধুনিকপ্রিয়কেও চরম শঙ্কিত ও প্রভাবিত করে ফেলল।

"বস্তুত তারা যখন দেখলেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে নবী-রাসূলগণের এমন বহু মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী উল্লেখ রয়েছে যা তাদের এই থিউরী বা মতবাদের সাথে খাপ খায় না, তখন তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর মধ্যে এমন টানা-হেঁচড়া আরম্ভ করে দিলেন, যার দ্বারা এ সকল মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পরিভাষায় "স্বভাব-প্রকৃতি ঊর্ধ্ব" (Super Natural) হবার পরিবর্তে স্বভাবগত কার্যকারণের অধীনে এসে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ইল্লত-মা'লূলের উপরোক্ত মতবাদ অনুযায়ী 'দাহন করা' আগুনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল, যা কখনো এর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীম সুস্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন আগুনকে তার জন্য শীতল করে দেওয়া হয়েছিল।

ইসলামী বিশ্বের কোনো কোনো প্রগতিবাদী হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপের ঘটনাটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসেছেন।

আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের মধ্যে এমন টানা-হেঁচড়া আরম্ভ করে দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অর্থ বিকৃতির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তেরশত বছরের দীর্ঘ এ সময়ে কুরআন ও সুন্নাহ'র কোনো প্রাজ্ঞ আলেমের ধারণা ও কল্পনাতেও যা আসেনি। গোটা মুসলিম উম্মাহর মতামতের বিপরীত পবিত্র কুরআনুল কারীমের অর্থ বিকৃতির বৈধতা দিতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সাহেব লিখেছেন–

"তাদের (পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের)-এর যুগে 'স্বাভাবিকত্ব ও স্বাভাবিকত্বের ঊর্ধ্ব'-এর বিষয়টি উন্নতি করেছিল না। স্বাভাবিক নীতির দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং এর ভুল-ত্রুটির উপর সতর্ককারী কোনো বস্তু ছিল না। ব্যস, এ সব কারণ এবং এ ধরনের আরো বহু কারণ ছিল, যার ফলে পবিত্র কুরআন মাজীদের এ ধরনের শব্দাবলীর প্রতি তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট হয়নি। যেমন... হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় এ কথার উপর সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই যে, প্রকৃতপক্ষেই তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা (পূর্ববর্তী আলেমগণ) এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করেননি!"[৫১৪]

অথচ হাদীস ও অন্যান্য বর্ণনাগুলো থেকে আপাতত দৃষ্টি সরিয়ে নিলেও এ ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভাষা হলো এই–

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70)

'তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে মার আর তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর- যদি তোমরা কিছু করতেই চাও। আমি বললাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।'তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আমি তাদেরকেই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়লাম।'[৫১৫]

(অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে)–

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98)

'তারা বলল, তার জন্য একটি স্থাপনা তৈরি কর, তারপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। আর তারা তার ব্যাপারে একটা ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে দিলাম।'[৫১৬]

---

৫১৪. স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ খান ঃ তাফসীরে কুরআন-এর ভূমিকা, ১/১৭

৫১৫. সূরা আম্বিয়া : ৬৮-৭০

৫১৬. সূরা সফফাত : ৯৭-৯৮

সূচিপত্র

উপরোক্ত সুস্পষ্ট আয়াতের শব্দাবলীর মধ্যে তাভীল ও বিকৃতির জুলুম-চর্চা শুধু এই ভিত্তিতেই করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অগ্নিকুণ্ড থেকে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসার এই ঘটনাটি পাশ্চাত্যের সমকালীন "ন্যাচারাল সেন্স" পরিপন্থী ছিল। আর তাই স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান সাহেব ও তার সমমনা অন্যান্য প্রগতিবাদীরা পাশ্চাত্যের এই "Natura ন্যাচারাল সেন্স"-এর খাতিরে পবিত্র কুরআন তাফসীরের সকল নিয়ম-নীতিকে শুধু পদদলিতই করেনি এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলী নিয়ে টানা-হেঁচড়া আরম্ভ করেনি; বরং ইসলামের মৌলিক আকীদার মধ্য হতে "স্বশরীরে পুনরুত্থান"-এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ আকীদার উপরও ক্রস চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতা, শয়তান ও জ্বিনের অস্তিত্বের বিশ্বাসকেও কল্পনাপূজা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নবী-রাসূলগণের সকল মু'জিযাকে " Super Natural স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে" বলে এগুলোকেও অস্বীকার করেছেন। আর এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোটা কুরআনকে কাব্যিক উপমার ভাণ্ডার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এসব লোকদের তাফসীর দেখে মনে হয়, পবিত্র কুরআনুল কারীম নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলীকে স্বীয় সরল বর্ণনা-রীতির পরিবর্তে রূপক ও ধাঁধার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করে বর্ণনা করেছে। যা দীর্ঘ তেরশত বছর পর পাশ্চাত্যের অন্ধভক্ত ও অনুরক্তদের কাছে এই প্রথমবার স্বমহিমায় উন্মোচিত হয়েছে! পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট শব্দমালাকে মনগড়া রূপক অর্থের লেবাস পরিধান করানো তাদের একটি সাধারণ খেলা। যার অসংখ্য উদাহরণ তাদের তাফসীরসমূহে পাওয়া যায়। আর এ সকল অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান সাহেবের ভাষায় নিম্নরূপ–

"যখন মু'জিযাকে স্বাভাবিকত্বের ঊর্ধ্বে সাব্যস্ত করা হবে, যাকে ইংরেজিতে (Super Natural) বলা হয়, তখন এটাকে অস্বীকার করে। সেগুলোর সংঘটিত হওয়াকে এমনই অসম্ভব সাব্যস্ত করা হয়, যেমন মৌখিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করা এবং প্রকাশ্য বলে যে, এ ধরনের কোনো বিষয় সংঘটিত হবার কোনো প্রমাণ নেই, যা স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে হয়। যাকে তোমরা মু'জিযা নামে অভিহিত করে থাক। আর যদি নিছক কথার কথা, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কুদরতের উপর সোপর্দ করে এটাকে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও এটা হবে এক অনর্থক বিষয়।"[৫১৭]

---

[৫১৭]. স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান ঃ তাফসীরুল কুরআন : ১/১০

সূচিপত্র

পক্ষান্তরে উলামায়ে ইসলামের অবস্থান ছিল এই যে, মু'জিযা সংঘটিত হওয়ার যুক্তির নিরিখে অসম্ভবের কিছুই নয়। হ্যাঁ, এ বিষয়গুলো অস্বাভাবিক তো অবশ্যই হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যখন তাঁর কোনো নবীর সত্যতা সর্বসাধারণ ও নিরক্ষর লোকদের সামনে প্রকাশ করতে চান, তখন তাঁদের হাতে এমন অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর বিষয় প্রকাশ করেন, যেগুলো দেখে প্রত্যেক ব্যক্তি এ কথা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ পাকের এ নবীর আল্লাহর পক্ষ হতে সমর্থন ও সত্যায়ন রয়েছে। কিন্তু যেহেতু পাশ্চাত্যে "ন্যাচারাল সেন্স"-এর জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল; তাই স্যার সাইয়েদ সাহেব প্রমুখরা এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করতেন।

কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ কুদরতের ক্বারিশমা লক্ষ্য করুন যে, যে সময় স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও তার সমমনা প্রগতিবাদীরা "ন্যাচারাল সেন্স"-এর ধুঁয়া তুলে সকল নবী-রাসূলের মু'জিযাসমূহ অস্বীকার করছিল এবং এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দমালার মধ্যে জটিল ব্যাখ্যা ও বিকৃতির চর্চা করছিল, ঠিক তখনই বিজ্ঞানজগতে এক মহা বিপ্লব মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। নতুন গবেষণার আলোকে নিউটনের মতবাদ ভুল প্রমাণিত হচ্ছিল। আইনস্টাইন তার বৈপ্লবিক আপেক্ষিক মতবাদের রেখা টেনে দিচ্ছিল।

যা বিজ্ঞানের অতীত স্বীকৃত বিষয়গুলোর চিত্র পাল্টে দিয়েছে। আর এরই উপর ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীতে যে আণবিক বিজ্ঞানের ডঙ্কা বেজে উঠেছে, তা মধ্যাকর্ষণ-নীতি ও কার্যকারণ-নীতিকে খন্ডন করে স্বাভাবিকত্ব ও অস্বাভাবিকত্বের পার্থক্যকেই নিঃশেষ করে দিল। যেমন, বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ও সর্বজন স্বীকৃত বিজ্ঞানী স্যার অর্থার ইডিংটন (Eddington) এ প্রসঙ্গে লিখেন–

"বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা অভ্যন্তরীণ এবং অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য কিংবা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।"[৫১৮]

এভাবে তিনি আরো লিখেন–

"বাহ্যিক জগতে কার্যকারণ নীতি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, স্বাভাবিক ও স্বাভাবিকত্ব ঊর্ধ্ব-এর মাঝে সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্য বাকি থাকে না।"

---

[৫১৮]. ঊফফরহমঃড়হ; ঞযব ঘধঃৎব ড়ভ চযুংরপধষং ডড়বষফ. চ. ৩০৩
"মাযহাব ওয়া সাইন্স" মাওলানা আবদুল বারী নদভী কৃত বই থেকে সংগৃহীত। পৃ: ৮৬, লাহোর, ১৯৭৬ ঈ.

সূচিপত্র

বিজ্ঞানের স্বীকৃত বিষয়াবলীতে এত বড় বিপ্লব কিভাবে ঘটে গেল? আমাদের যুগের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী স্যার জেমস জিন্স (Sir James Jeans)-এর মুখ থেকেই এর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত শুনুন–

"গ্যালিলিও এবং নিউটনের সপ্তাদশ শতাব্দীর এই মহাসাফল্য ও বিজয় মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর পরবর্তী বিকৃতি ও পরিবর্তন অথবা তার পুনঃসৃষ্টি তার পূর্বের অনিবার্য ফলাফল। এমনকি গোটা প্রাকৃতিক জগতের পুরো ইতিহাস শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ওই ভূমিকারই অনিবার্য ফলাফল, যার মধ্যে তা প্রথম দিন ছিল।

এই কল্পনারই অনিবার্য ফল হচ্ছে, ওই আন্দোলন যা গোটা বস্তু জগতকে একটি যন্ত্রে পরিণত করে দিয়েছিল এবং মানিয়েও নিয়েছিল। এই সূরতহাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত ও প্রচলিত ছিল। গোটা জগতকে প্রাকৃতিক যন্ত্রচালিতে রূপান্তরিত করা পুরো ন্যাচারাল সাইন্সের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। ...

অতঃপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের মাসগুলোতে বার্লিনের ম্যাক্স পাঙ্ক (Max Plank) কোয়ান্টাম মতবাদের গোড়া পত্তন করেন। যা অবশেষে উন্নতি লাভ করে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের এক পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ মৌলনীতির স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আর ধীরে ধীরে তা সামনে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রযুগের অবসান ঘটায় এবং নব যুগের সূচনা করে।"

শুরু শুরুতে পাঙ্কের মতবাদ থেকে শুধু এটা জানা গিয়েছিল যে প্রাকৃতিক বস্তুজগতে ধারাবাহিকতার বিষয়টি কার্যকরী নয়। কিন্তু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইন বলেছেন যে, বস্তুত পাঙ্কের এই মতবাদটি বিরাট বিপ্লব সৃষ্টিকারী ফলাফলের বাহক। আর জেমস জিন্সের ভাষায়–

"এই মতবাদটি ওই কার্যকারণ নীতিকেই তার নিজ মসনদ থেকে নীচে নামিয়ে দেয়, যার এখন পর্যন্ত বস্তুজগতের পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধশীল পথ-প্রদর্শক মৌলনীতির মাকাম অর্জিত ছিল। পুরানো বিজ্ঞানের এই অকাট্য ঘোষণা ও দাবী ছিল যে, স্বভাব বা প্রকৃতি কার্যকারণ নিয়মের ধরা-বাঁধা নীতি থেকে এক কদমও বের হতে পারে না। ইল্লত "আলিফ"-এর পর অনিবার্য ভাবে "বা"-এর মা'লূলেরই সৃষ্টি বা প্রকাশ হওয়া চাই।

কিন্তু নতুন বিজ্ঞান এখন শুধু এতটুকুই দাবী করতে পারে যে, "আলিফ"-এর পর "বা" ও "জিম" ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এতটুকু সঠিক যে, "আলিফ"-এর পর "বা"-এর আত্মপ্রকাশ হওয়া "জীম"-এর তুলনায় অধিক সম্ভাব্য বিষয় আর "বা"-এর পর "জীম" এর আত্মপ্রকাশ হওয়া "দাল"-এর তুলনায় অধিক সম্ভাব্য বিষয়।

সূচিপত্র

জেমস জিন্স বলেছেন যে, এই সম্ভাবনাময় বা প্রবল ধারণা ব্যতীত তথাকথিত কোনো ইলত (কারণ)-এর পর তথাকথিত বিশেষ কোনো মা'লূল সৃষ্টি হবার বিধানটি না তো অকাট্যভাবে বলা যেতে পারে আর না এর কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। বরং

"This is matter which lies on the kness of gods whatever gods there be"

"এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে ন্যস্ত; চাই আল্লাহ যাঁকেই বলা হয়।"[৫১৯]

মোটকথা, বিংশ শতাব্দীতে এসে আণবিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিজ্ঞানের যে উত্থান ঘটেছে, তা পুরোনো ধারণা ও থিউরীগুলোকে মূল থেকে উৎপাটন করে দিয়েছে যে, মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুর বৈশিষ্টাবলী তার সত্ত্বা হতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না এবং আগুন থেকে তার দাহিকা শক্তির গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এখন আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য হলো যে, অধিকাংশ সময় আগুন জ্বালায়-পোড়ায় এবং এটাই প্রবল সম্ভাবনা যে, যেখানে আগুন থাকবে সেখানে তার তাপ ও তার জ্বালানো ক্ষমতাও থাকবে। কিন্তু যদি কখনো এর বিপরীত হয়, তাহলে তা না হয় আকল বা বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী, আর না হয় বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম-নীতি পরিপন্থী।

সুতরাং আজকের বিজ্ঞানীরা মু'জিযার ব্যাপারে বেশির চেয়ে বেশি তাদের অজ্ঞতা পেশ করতে পারে। সেগুলোকে অসম্ভব বলে সেগুলোর মৌলিকত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। আর সম্ভবতঃ এ কারণেই বিংশ শতাব্দীতে এসে পাশ্চাত্যের জনগোষ্ঠী আবারও সেসব বিষয়ের দিকে ফিরে আসছে যেগুলোকে তারা ইতিপূর্বে "স্বাভাবিকত্বের ঊর্ধ্বে" মনে করে 'কল্পনাবিলাস' আখ্যায়িত করতো। এমনকি অবস্থা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, কোনো কোনো সংবাদ সূত্রানুযায়ী পাশ্চাত্যের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে "যাদুবিদ্যা" শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা শুরু করেছে।

প্রগতিবাদীদের মন-মানসিকতা সর্বদা এমনই থাকে যে, তারা সমকালীন প্রোপাগান্ডা দ্বারা প্রভাবিত ও ভীত হয়ে খুবই তাড়াহুড়া করে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। বিষয়টির পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই এর উপর চিন্তা ও মতবাদের পুরো প্রাসাদ দাঁড় করিয়ে দেয়। মু'জিযার ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে যে, যে সময় স্যার সাইয়্যেদ আহমদ ও তার সমমনা প্রগতিবাদীরা

---

[৫১৯]. জেমস জিন্স রচিত : গুংঃবৎরড়ঁং টহরাবৎংব পৃ: ২৭-৩২ মাওলানা আবদুল বারী নদভী রচিত "মাযহাব ও সাইন্স" পৃ: ৮৩-৮৫ হতে সংগৃহীত।

সূচিপত্র

মু'জিযাকে অসম্ভব হিসেবে সাব্যস্ত করছিল, তখন পাশ্চাত্যে সাধারণভাবে এর অস্বীকারের ধ্বনিই গুঞ্জরিত হচ্ছিল। তবে এমনটিও ছিল না যে, দর্শন ও বিজ্ঞানজগতের সকল মানুষই হিউম ও হ্যাকসলের ন্যায় মু'জিযাকে অস্বীকার করে বসেছিল। বরং বহু শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক তখনও মু'জিযার প্রবক্তা ছিল। যাদের মধ্যে নিউটন, ফ্রায়েড সিম্পসন, ক্যালূন ও ল্যাস্টার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জার্মানীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী লোটাজ তো মু'জিযার সমর্থনে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মু'জিযা কখনো বিবেক-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়।[৫২০]

বর্তমান যুগের যেসব উক্তি পেশ করা হলো, আমরা সেগুলোকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করিনি। কারণ পবিত্র কুরআনুল করীমের সত্যতা ওইসব উক্তির সমর্থন থেকে অমুখাপেক্ষী। কুরআন তো তখনও সত্যই ছিল, যখন বিজ্ঞানীরা অস্বাভাবিক পন্থায় সংঘটিত বিষয়াবলীকে নিয়ে উপহাস করতো। আর আজও ওই কুরআন সত্য, যখন বিজ্ঞানীরা নিজেই অস্বাভাবিক পন্থায় সংঘটিত বিষয়াবলীর সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিচ্ছেন।

কথার কথা যদি কাল আবার বিজ্ঞানের সকল মত ও থিউরী পাল্টে যায়, তখনও তার সত্যতার বিন্দুমাত্রহ্রাস পাবে না। তাই বিজ্ঞানীদের এ উক্তিগুলো আমরা শুধু এ কথা বলার জন্যই পেশ করেছি যে, যেসব লোক অধুনা প্রচলিত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ও ভীত হয়ে পবিত্র কুরআন মাজীদের তাফসীরের ক্ষেত্রে কাট-ছাঁটের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাদের ভিত কতো দুর্বল ও স্থায়ীত্বহীন ছিল! তারা এমন এক কালামকে সম-সাময়িক উত্থিত মতবাদের পালায় ওজন করার চেষ্টা করেছিলেন, যার জ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যতের সকল দিগন্তকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং যার সামনে মানবীয় চিন্তা-গবেষণার চেষ্টা-প্রচেষ্টা শিশুদের খেলার চেয়ে খেলার চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে না।

অতএব, যদি পবিত্র কুরআন মাজীদকে নিজ মতবাদের অনুগত বানানো পরিবর্তে বাস্তবেই যদি তা থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতে হয়, তাহলে

---

৫২০. দেখুন ঃ ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, পৃঃ ৫৮৭-৫৮৮, ১৯৯৫ ঈ. প্রবন্ধ মু'জিযা [গরৎধপষব]। এ প্রবন্ধের মধ্যে মু'জিযার সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর আলফ্রেড, এ, গার্ডে চমৎকার আলোচনা করেছেন এবং এতে প্রমাণ করেছেন যে, মু'জিযা শুধু বিবেক ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্ভব এমনটি নয়; বরং এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও মু'জিযার আলোচ্য বিষয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে পাঠোপযোগী–

১. সীরাতুন নবী ঃ মাওলানা আবদুল বারী নদভী রচিত।

২. মাওয়াকিফুল আকল ওয়াল ইলম ওয়াল আলাম ঃ শায়েখ মুস্তফা সবরিবেক রচিত।

৩. ইসলাম আওর মু'জিযাত ঃ হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) রচিত।

সূচিপত্র

সমকালীন মতবাদের চশমা দিয়ে অধ্যয়ন করার পরিবর্তে সেভাবেই অধ্যয়ন করতে হবে, যেভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন দু'জাহানের সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.)। আর এর ব্যাখ্যা ও তাফসীর করতে গিয়ে সমকালীন প্রচলিত চিন্তা ও মতবাদের ডামাডোল দ্বারা প্রভাবিত হবার পরিবর্তে ওই উসূল ও নিয়ম-নীতি ব্যবহার করুন, যা তাফসীরের স্বভাব-যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে স্বীকৃত।

এইসব উসূলের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে যে বিষয় স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে সেটাকে দ্বিধা-সংকোচ ও লজ্জিত হয়ে নয়; বরং পূর্ণ ইয়াকীন, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করুন। প্রচলিত মতবাদ ও থিউরী এর হাজারো পরিপন্থী হোক, দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, চরম সত্য সেটাই, যা পবিত্র কুরআনুল কারীম বলে দিয়েছে। যদি মানবতার ভাগ্যে কোনো সফলতা লেখা থাকে, তাহলে সে হাজারো হোঁচট খাওয়ার পর কুরআনে বর্ণিত মহা সত্যের কাছে পৌছেই যাবে।

বিবেক পরিপন্থী ও বিবেকোর্ধ্ব তাফসীর ঃ خلاف عقل اور ماورائے عقل

এখানে মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যদি তাফসীরের প্রসিদ্ধ মূলনীতি অনুযায়ী এমন কোনো কথা পবিত্র কুরআন মাজীদের দিকে সম্বন্ধ হয়, আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার আলোকে যেটাকে আমরা বিবেক ও বাস্তবতা পরিপন্থী হিসেবে খোলা চোখে দেখতে পাই। তারপরও পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রাচীন তাফসীরকে আঁকড়ে ধরে থাকার অর্থ কি এই নয় যে, আমরা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বক্তব্যকে বাস্তবতা বিরোধী আখ্যায়িত করছি এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি এমন কথার সম্বন্ধ করছি সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ বাস্তবতা দ্বারা যা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

এর জবাব হলো, পবিত্র কুরআনুল কারীমের যে তাফসীর অকাট্যভাবে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সর্বসম্মত ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে, আজ পর্যন্ত কখনো তা বিবেক ও অকাট্য প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বিরোধী প্রমাণিত হয়নি। চৌদ্দশত বছরের সুদীর্ঘকালে জ্ঞান-গবেষণা ও আবিষ্কারের অসংখ্য বিপ্লব সাধিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমনটি হয়নি যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো অকাট্য প্রমাণিত তাফসীর প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বিরোধী পরিলক্ষিত হয়েছে। আর যেহেতু মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কালাম আর নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এর মৌখিক ও আমলী তাফসীরের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল, তাই তাঁর বর্ণিত সকল তাফসীরই মহান আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ীই হয়েছে এবং

তাঁর বর্ণিত কোনো তাফসীর ভবিষ্যতেও কখনো বিবেক অথবা প্রত্যক্ষ বাস্তবতা পরিপন্থী হতেই পারে না।.

অবশ্য এ ক্ষেত্রে দু'ভাবে ভ্রান্তি হয়ে থাকে–

১. যেসব লোক কালের প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদ দ্বারা খুব দ্রুত প্রভাবিত ও ভীতু হয়ে যেতে অভ্যস্ত, তারা কোনো বিষয়কে "বিবেক বিরুদ্ধ" হবার সিদ্ধান্তটা খুব তাড়াতাড়িই নিয়ে ফেলেন। এটা একটা স্বীকৃত বিষয় যে, যে কোনো বিস্ময়কর বিষয়ই "বিবেক বিরুদ্ধ" হয় না। আর না প্রত্যেক ওই বস্তুকেই অসম্ভব বলা যায়, যার কার্যকারণ বুঝে না আসে। এ ধরনের বিষয়কে দূরবর্তী [improbable], অসাধারণ (Extra ordinary) অথবা বিস্ময়কর [astonishing] বলা যেতে-পারে; কিন্তু অসম্ভব [impossible] বলা স্বয়ং বিবেক বিরুদ্ধ। যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনবগত তার জন্য এটা অবশ্যই বোধগম্য নয় যে, ওয়ারলেস সেটের মধ্যে হাজারো মাইল দূরে অবস্থান করা মানুষের আওয়াজ কিভাবে শোনা যাচ্ছে? যদি কোনো অজপাড়া গাঁয়ের মূর্খ লোকের কাছে এ কথা বলা হয় তাহলে আশ্চর্যের কিছু নয় যে, সে এটা মেনে নিতে অস্বীকারই করে দিবে। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, ওয়ারলেসের মধ্যে দূর-দূরান্তের কোনো মানুষের আওয়াজ শোনা যাওয়াটা "বিবেক বিরুদ্ধ" বা "অসম্ভব"।

কেউ কেউ পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। বরং তারা এমন প্রত্যেকটি বিষয়কেই "বিবেক বিরুদ্ধ" বা "অসম্ভব" বলে আখ্যায়িত করেন, যা শুধু বিস্ময়কর অথবা বেশির চেয়ে বেশি প্রচলিত অভ্যাস পরিপন্থী ও দূরবর্তী বিষয় (improbable) বলে মনে হয়। অথচ কুরআন ও হাদীসে এ জাতীয় বিষয় পাওয়া যাওয়াটা কক্ষনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আমরা এই গ্রন্থের শুরুতেই বলে এসেছি যে, নবুওয়াতের ওহীর সূচনাই হয় সেখান থেকে, যেখানে এসে আকল ও বিবেকের দৌড় শেষ হয়ে যায়।

ওহী ও রিসালাতের আসল উদ্দেশ্যই তো এটা যে, এর মাধ্যমে মানুষকে এমন বিষয়ে অবগত করা হবে, যেগুলো সে শুধু আকল ও বিবেক দ্বারা জানতে সক্ষম হয় না। যদি ওহী ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা না থাকতো, তাহলে আকল ও বিবেক দ্বারা পুনরুত্থান, আখেরাত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম ও ফেরেশতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপলব্ধি করা যেত না। যদি শুধু আকল ও বিবেক দ্বারাই এসব বিষয় জানা যেত, তাহলে নবী-রাসূলগণের আবির্ভাব, তাঁদের প্রতি ওহী অবতরণ এবং তাঁদের আসমানী গ্রন্থ দেওয়ার কোনো

সূচিপত্র

প্রয়োজন ছিল না। কাজেই ওহী ও রিসালতের প্রতি ঈমান থাকলে এ কথাও মানতে হবে যে, ইলমের এই মাধ্যমটি দ্বারা আমরা এমন বহু বিষয় জানতে পারি, যা নিছক আকল ও বিবেক দ্বারা জানা যেত না এবং যেগুলোর কল্পনা ও উপলব্ধি আকল ও বিবেকের জন্য মুশকিল ছিল।

আর যখন এ বিষয়টি স্থির হয়ে গেল যে, কুরআন ও হাদীসে এ ধরনের বিস্ময়কর বিষয়ের অস্তিত্ব এর বিষয়বস্তুর সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ; বরং আবশ্যকও বটে, তাহলে পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো প্রকাশ্য ও সর্বসম্মত তাফসীরকে শুধু এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না যে, এর দ্বারা একটি বিস্ময়কর বিষয় প্রমাণিত হয়। যতক্ষণ না তা বাস্তবিক পক্ষেই বিবেক বিরুদ্ধ. তথা অসম্ভব না হয়। অবশ্য পবিত্র কুরআনুল কারীমের অকাট্য তাফসীরসমূহের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো কথা এমন বিবেক বিরুদ্ধ ও অসম্ভব প্রমাণিত হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত হতেই পারে না। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমরা সামনে "তাফসীরের মূলনীতি" অধ্যায়ে করবো।- ইনশাআল্লাহ।

২. দ্বিতীয় ভ্রান্তি কোনো কোনো সময় এই হয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো তাফসীর অকাট্য ও নিশ্চিত হয় না। না পবিত্র কুরআনুল কারীমের পূর্বপর আয়াতের সম্পর্ক দ্বারা, না নবী কারীম (ﷺ)-এর অকাট্য কোনো তাফসীর দ্বারা আর না উম্মতের সর্বসম্মত রায় দ্বারা; এতদসত্ত্বেও ওই তাফসীরটি সর্ব সাধারণের নিকট এতই প্রসিদ্ধ লাভ করে যে, মানুষ এটাকে সুনিশ্চিত ও অকাট্য তাফসীর মনে করতে থাকে। আর যখন তা আকল ও বিবেকের কোনো অকাট্য দলীল অথবা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার ভিত্তিতে ভুল প্রমাণিত হয়, তখন কোনো কোনো অজ্ঞ লোক এর উপর বাড়াবাড়ি করে।

আবার কেউ কেউ পবিত্র কুরআনুল কারীম বা এর নিশ্চিত ও অকাট্য তাফসীরের ব্যাপারে এ ধারণা করতে শুরু করে যে, এটা এভাবে 'বিবেক বিরুদ্ধ' হতে পারে। অতএব, এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের যেসব তাফসীর অকাট্য বিবেক বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বিরোধী বলে মনে হয়, সেটা কোন্ স্তরের? কেবল গণ-প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে এটাকে সুনিশ্চিত তাফসীর মনে করে নেওয়া ভুল।

এই আলোচনাটি আরো বিস্তারিতভাবে "তাফসীরের মূলনীতি"র অধ্যায়ে আসবে যে, যখন আকলী ও নকলী দলীলের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়, তখন সঠিক কর্মপন্থা কি হবে? ওখানে এই আলোচনাটি অবশ্যই অধ্যয়ন করে নেওয়া চাই।

সূচিপত্র

قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا

চতুর্থ কারণ ঃ পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তুকে ভুল মনে করা

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে চতুর্থ গোমরাহী হলো, কোনো কোনো লোক পবিত্র কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তুকে যথার্থ মনে করেন না। তারা এতে এমন কথা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, যা এর আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। যেমন, কেউ কেউ পবিত্র কুরআন মাজীদ দ্বারা বস্তুজগতের সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ থিউরীগুলো প্রমাণ করতে চায়। তারা এ কথা মনে করেন যে, যদি পবিত্র কুরআনুল কারীম দ্বারা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো প্রমাণিত না হয় তাহলে (নাঊযুবিল্লাহ) এটা কুরআনুল কারীমের ত্রুটি হবে! তাই তারা পুরো নিষ্ঠার সাথে পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো থেকে বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো প্রমাণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে কোনো কোনো সময় পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীকে ভুল অর্থের লেবাস পরিয়ে দেন। অথচ বাস্তবতা হলো এই যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের মূল বিষয়বস্তু 'বিজ্ঞান' নয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমের যেখানেই বিশ্বজগতের তাত্ত্বিক কোনো আলোচনা এসেছে, তা আনুষঙ্গিক হিসেবেই এসেছে। অতএব, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোথাও যদি সুস্পষ্টভাবে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এর উপর ঈমান রাখতে হবে। কিন্তু পূর্ব থেকেই মন-মগজে বিজ্ঞানের কোনো বিষয় ধারণ করে সেটাকে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে জোর করে বের করার চেষ্টা করা এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ হতে আইনের বিধান অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন মাজীদ নিজের বিষয়বস্তু এবং অবতরণের উদ্দেশ্যকে অস্পষ্ট রাখেনি। বরং বহু আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একে কেন নাযিল করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের আয়াতগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা করুন–

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (16)

'তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। আল্লাহ তদ্বারা তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে এবং নিজ অনুমতিক্রমে তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে

সূচিপত্র

বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন আর তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।' [৫২১]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)

'হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছেন, যিনি রাসূলদের একটি বিরতির পর তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করছেন। যেন তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, "আমাদের নিকট কোনো সুসংবাদদাতা কিংবা সতর্ককারী আসেনি"। ব্যস! (এখন) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছেন।' [৫২২]

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)

'আর আমি সত্য বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক। কাজেই মানুষদের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে, আর তোমার কাছে যে সত্যবিধান এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও একটি কর্মপথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মাত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সেই ব্যাপারে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।' [৫২৩]

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)

'আর এ ভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। এবং যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।' [৫২৪]

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (2)

---

[৫২১]. সূরা মায়েদা : ১৫-১৬
[৫২২]. সূরা মায়েদা : ১৯
[৫২৩]. সূরা মায়েদা : ৪৮
[৫২৪]. সূরা আনআম : ৫৫

সূচিপত্র

'এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং এর সম্পর্কে আপনার মনে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে আপনি এর মাধ্যমে (আল্লাহর নাফরমানী হতে) সতর্ক করতে পারেন এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ।'[৫২৫]

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'তোমরা কি এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছ যে তোমাদের মধ্যেকার একজন লোকের নিকট তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।'[৫২৬]

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ(3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ(4)

'এগুলো হিকমাতে ভরপুর কিতাবের আয়াত।সৎকর্মশীলদের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত। যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় আর তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।'[৫২৭]

تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ(2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ(3)

'এ কিতাব বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।তবে তারা কি বলে যে, সে নিজেই তা রচনা করেছে (এবং আল্লাহর নিকট থেকে আগত কিতাব ব'লে মিথ্যে দাবী করছে, না তা নয়), বরং তা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত) সত্য যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সকর্তকারী আসেনি, সম্ভবতঃ তারা সঠিকপথ প্রাপ্ত হবে।'[৫২৮]

تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5)لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ(6)

'[এ কুরআন] মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা) কর্তৃক নাযিলকৃত। যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করেন, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, কাজেই তারা উদাসীন।'[৫২৯]

---

৫২৫. সূরা আরাফ : ২
৫২৬. সূরা আরাফ : ৬৪
৫২৭. সূরা লুকমান : ২-৪
৫২৮. সূরা সাজদা : ২-৩
৫২৯. সূরা ইয়াসীন : ৫-৬

সূচিপত্র

'নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে যথাযথভাবে এই কিতাব নাযিল করেছি। অতএব, আপনি আল্লাহর ইবাদত করুন তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।'[৫৩০]

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7)

'এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তুমি উম্মুল কুরা (মক্কা শহর) ও তার চার পাশে যারা আছে তাদেরকে সতর্ক করতে পার, আর সতর্ক কর একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (একত্রিত হওয়ার পর) এক দল যাবে জান্নাতে, আরেক দল যাবে জাহান্নামে।'[৫৩১]

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারপর আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি এর অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। তারা আল্লাহর মুকাবিলায় আপনার কোনো কাজে আসবে না। আর নিশ্চয়ই জালিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকীনদের বন্ধু। এ কুরআন মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত।'[৫৩২]

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23)

'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন- এমন কিতাব যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার বিষয়াবলী পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গা এতে শিউরে উঠে। তখন তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি বিনম্র হয়ে যায়। এ হল আল্লাহর হিদায়াত, যাকে ইচ্ছে তদ্ধারা হিদায়াত করেন। আর আল্লাহ যাকে পথহারা করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।'[৫৩৩]

---

৫৩০. সূরা যুমার : ২
৫৩১. সূরা শুরা : ৭
৫৩২. সূরা জাসিয়া : ১৮-২০
৫৩৩. সূরা যুমার : ২৩

সূচিপত্র

এখানে শুধু উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো। যদি শুধু এগুলো নিয়েই গভীর চিন্তা-গবেষণা করা হয় তাহলে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সন্তুষ্টি মাফিক জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনায় ও উৎসাহ প্রদান করা।

এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বা সৃষ্টিজগৎ ও ভূ-মন্ডল সংক্রান্ত যত কথা তাতে এসেছে, এর সবই এসেছে ওই মৌলিক উদ্দেশ্যের সমর্থন ও শক্তিশালী করার জন্য। অতএব, পবিত্র পবিত্র কুরআনুল কারীমে যদি বিজ্ঞানের কোনো প্রসিদ্ধ বিষয় উল্লেখ না থাকে, তবে এটা না কোনো দোষের বিষয় আর না আশ্চর্যের। কেননা এটা তার বিষয়বস্তুই নয়। অনুরূপভাবে যদি অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা পবিত্র কুরআনুল কারীমে পাওয়া না যায়, তবে এটাও কোনো আপত্তির বিষয় নয়। কারণ তা ইতিহাসের কিতাব নয়। বরং তাতে যে খন্ড খন্ড ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, তা শুধু দৃষ্টান্ত ও উপদেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর দ্বারা ওইসব অমুসলিমদের অভিযোগ খন্ডন হয়ে যায়, যারা এ কথা বলেন যে, পাশ্চাত্যের দেশসমূহ যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুগত উন্নতি সাধন করেছে, পবিত্র কুরআনুল কারীম সে ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করেনা কেন? আর ওইসব লোকদের ভ্রান্তিও দূর হয়ে যাবে, যারা এসব অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয় যে কোনোভাবে প্রমাণ করার কাজে লেগে যান। কারণ এ প্রয়াসের উপমা এমন যে, কোনো ব্যক্তি আইন শাস্ত্রের গ্রন্থের উপর এই অভিযোগ করতে আরম্ভ করে যে, এতে এ্যাটম বোমা তৈরির ফর্মূলা উল্লেখ নেই কেন? তখন এর জবাবে অপর কোনো ব্যক্তি আইন শাস্ত্রের শব্দাবলীকে ভেঙ্গেচুরে তা থেকে এ্যাটম বোমা তৈরির ফর্মূলা বের করার চেষ্টায় নিমগ্ন হলো। স্পষ্ট যে, এটা ওই অভিযোগের জবাব নয়; বরং একটা উপহাস হবে।

অনুরূপভাবে যারা পবিত্র কুরআন মাজীদে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের বিষয়াবলী না পাওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীকে ভেঙ্গে তছনছ করে জোরপূর্বক তা থেকে বিজ্ঞানের বিষয়াবলী টেনে বের করা তার সঠিক জবাব নয়। বরং তার সঠিক জবাব হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের গ্রন্থ নয়। বস্তুগত উন্নতি সাধনের পথ-পরিক্রমা এর আলোচনার বিষয়ও নয়। যেহেতু এ বিষয়গুলো মানুষ বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হতো, তাই সেগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু

সূচিপত্র

তা'আলা মানুষের স্বীয় চেষ্টা-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আর এমন সব বিষয়কেই পবিত্র কুরআন মাজীদের আলোচ্য বিষয় বানিয়েছেন, যা শুধু মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় না। বরং সেগুলোর উপলব্ধির জন্য ওহীয়ে এলাহীর দিক-নির্দেশনা একান্ত জরুরী।

আর এ কারণেই মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মাধ্যমে বর্তমান স্তর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ঈমান ও ইয়াকীনের মহা সম্পদ, মন ও আত্মার পবিত্রতা, আমল ও আখলাকের বিশুদ্ধতা, আল্লাহ তা'আলার সাথে দাসত্বের সম্পর্ক এবং পরকালের জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার প্রেরণা– যা ওহীয়ে এলাহী ছাড়া অর্জন করা যায় না এবং যেগুলোকে পবিত্র কুরআনুল কারীম স্বীয় আলোচ্য বিষয় বানিয়েছে, বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার এ বিস্ময়কর উত্থানের পরেও মানুষ তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিক-নির্দেশনা অর্জন না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অর্জন হতেও পারে না।

আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কক্ষনো এটা নয় যে, পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে বিজ্ঞানের কোনো বিষয় উদ্ঘাটন করা কোনো অপরাধ। আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে আনুষঙ্গিকভাবে বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বের বর্ণনা এসেছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াত থেকে যদি স্পষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক কোনো বিষয় জানা যায়, তা বর্ণনা করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভুল-ভ্রান্তিগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

১. বিজ্ঞানের যেসব কথা পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে, তা আনুষঙ্গিক হিসেবেই হয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্য ওইসব তত্ত্বাবলীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কথা স্মরণ করিয়ে এর মাধ্যমে ঈমানকে সুসংহত ও মজবুত করা। অতএব, এই ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনুল কারীমকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ মনে করা অথবা মেনে নেওয়া একেবারেই ভুল।

২. যেখানে বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা নেই সেখানে শুধু শুধু পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর পূর্বা-পর সম্পর্ক ছেদ করে বিজ্ঞানের কোনো দাবীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার চেষ্টা করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। একটি উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে–

যখন বিজ্ঞান জগতে "পৃথিবী স্থির, আর সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলো তার চতুর্পাশে ঘূর্ণায়মান" মতবাদটি প্রসিদ্ধি অর্জন করল, তখন কোনো কোনো লোক এ মতবাদটিকে পবিত্র কুরানুল কারীম দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা

সূচিপত্র

করেছেন। তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন–

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا

'নাকি (ওই সত্ত্বা ইবাদতের উপযুক্ত) যিনি পৃথিবীকে স্থির বানিয়েছেন।'

তাদের দাবী ছিল যে, এখানে قرارا শব্দটি এ কথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, 'পৃথিবী আপন স্থানে স্থির'। অথচ পবিত্র কুরআনুল কারীমের উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বর্ণনা করা যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তোমরা পৃথিবীর মধ্যে 'কম্পমান' থাকার পরিবর্তে 'স্থিতিশীল' থাকছ এবং এতে বসতে-শুইতে এবং অবস্থান করতে তোমাদের কোনো কষ্ট সহ্য করতে হয় না। এখন এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই অনুগ্রহের সাথে পৃথিবীর স্থিতিশীল ও গতিশীল হবার কোনো সম্পর্ক নেই।

বরং পৃথিবী স্থিতিশীল হোক আর গতিশীল হোক, সর্বাবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ তা'আলার এই নেয়ামত লাভ করছে। অতএব, এ আয়াত দ্বারা পৃথিবীর স্থিতিশীলতা প্রমাণ করা এক অহেতুক জবরদস্তি। পরবর্তীতে বিজ্ঞান যখন পৃথিবী স্থিতিশীল হবার পরিবর্তে গতিশীল ও ঘূর্ণায়মান হবার থিউরী পেশ করল, তখন কোনো কোনো ব্যক্তির এ থিউরীটিও পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণ করার চিন্তা মাথায় চাপল এবং তারা নিম্নোক্ত আয়াতটিকে পৃথিবী গতিশীল হওয়ার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করলেন–

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

'আর তোমরা পাহাড়সমূহকে দেখে এই ধারণা কর যে, এগুলোকে স্থির। অথচ তা (কেয়ামতের দিন) মেঘমালার ন্যায় চলতে থাকবে।'[৫৩৪]

তারা এই আয়াতের تمر শব্দটির অনুবাদ "চলতে থাকবে"-এর পরিবর্তে "চলছে করে এই দাবী করেছেন যে, এই আয়াতে পৃথিবী গতিশীল হবার বর্ণনা রয়েছে। কারণ পাহাড়-পর্বত চলার অর্থ হলো যে, পৃথিবী গতিশীল হয়ে চলছে! অথচ এই আয়াতের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট (Contrxt) পরিষ্কারভাবে এটা জানান দিচ্ছে যে, এটা কেয়ামতের অবস্থার বর্ণনা। আর এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসব পাহাড়-পর্বত, যেগুলোকে আজ তোমরা নিজ স্থানে সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল ভাবছ, কেয়ামতের দিন এ সবগুলোই মেঘমালার ন্যায় শূন্যে উড়তে থাকবে। কিন্তু কুরআন থেকে বিজ্ঞানের থিউরী আবিষ্কারের অতি উৎসাহ আয়াতের পূর্বপর প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য করার সুযোগই দেয়নি।

---

৫৩৪ · সূরা নমল : ৮৮

সূচিপত্র

আসল কথা হচ্ছে, পৃথিবীর স্থিতিশীল ও গতিশীল হবার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীম নিশ্চুপ রয়েছে এবং পুরো কুরআনের কোথাও এ বিষয়ের আলোচনা নেই। কারণ এ বিষয়টি তার আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। কুরআন দ্বারা না পৃথিবীর স্থিতিশীলতার প্রমাণ মিলে আর না গতিশীল হবার প্রমাণ মিলে। অতএব, বিজ্ঞানের প্রামাণ্যসূত্রে এ ক্ষেত্রে যে মতবাদই অবলম্বন করা হবে, কুরআন এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর না এতে দীন ও ঈমানের কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়।

এখানে এ কথাটিও স্পষ্ট করে দেওয়া সমীচীন হবে যে, কুরআন থেকে বৈজ্ঞানিক বিষয় আহরণ করার চেষ্টা অনেক সময় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথেই হয়ে থাকে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অমুসলিমদেরকে এ কথা বলে দেওয়া যে, দেখ! যে বিষয়টি তোমরা শত শত বছরের শ্রম-সাধনা দ্বারা জানতে পেরেছ, এটা পূর্ব থেকেই আমাদের কুরআনে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যদি এই আবিষ্কার তাফসীরের মূলনীতিকে ভেঙ্গেচুরে করা হয়, তাহলে তা কুরআনের সাথে মূর্খ বন্ধুর আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। যখন মানুষ কুরআন দ্বারা পৃথিবীর স্থিতিশীলতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তারা সেটাকে কুরআনের খেদমত হিসেবেই মনে করেছিল।

কিন্তু যদি তাদের এই চেষ্টা সফল হয়ে যেত এবং বিশ্বব্যাপী এটা মেনে নেওয়া হতো যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম পৃথিবীর স্থিতিশীল হবার প্রবক্তা, তাহলে আজকের যুগে যখন পৃথিবীকে স্থিতিশীল মনে করা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে "কুফরী কথা"-এর নামান্তর রূপে গণ্য হয়, পবিত্র কুরআনের সাথে এ 'মূর্খ বন্ধুত্ব'-এর পরিণতি কি হতো? সুতরাং বিজ্ঞান সম্পর্কে যেসব কথা অকাট্যভাবে কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোকে তো পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রতি সম্পৃক্ত করা যায়। কিন্তু যেসব কথা অকাট্যরূপে কুরআন স্পষ্ট করেনি সেগুলোকে অযথাই কুরআনুল পবিত্র কারীমের প্রতি সম্পৃক্ত করা একবারে ভুল ছিল এবং আজও তা ভুল হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে।[৫৩৫]

---

[৫৩৫]. বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) কর্তৃক রচিত "আল-ইন্তেবাহাতুল মুফীদা" এবং এর সহায়ক গ্রন্থ "হলুল ইন্তেবাহাত" ২/২৭-৪৬

সূচিপত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ باب سوم

তাফসীরের কয়েকটি আবশ্যকীয় মূলনীতি ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ

এতে এমন কিছু নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে, যার অজ্ঞতার বশত: ধোকায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এ আলোচনাটি একটু কঠিন। বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। নিম্নে সেগুলোর শিরোনামভিত্তিক আলোচনা করা হল, যথাঃ

১। কুরআন কারীম ও রূপক অর্থ। এতে রূপকের অধীনস্ত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২। কুরআনুল কারীম ও আকলী দলীল। এতে আকলী দলীল কখন উপস্থাপন করা যেতে পারে, কখন তা গ্রহণযোগ্য হবে, তার প্রকার; ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তা ৩ প্রকার, যথাঃ ১। অকাট্য, ২। ধারণানির্ভর, ৩। কাল্পনিক আকলী দলীল। অনুরূপ নকলী দলীলও তিন প্রকার, যার মধ্যে.১ মুতাওয়াতির অকাট্য, ২খবরে ওয়াহিদ ধারণানিভর ও ৩. কাল্পনিক অগ্রহণযোগ্য হাদীসের উসূল অন্তর্ভূক্ত হয়।

জানতে অধ্যায়ন করুন!

৩। শরয়ী বিধিবিধান ও বিবেকবুদ্ধি।

এখানে শরীয়তের মূল চাহিদা হিসেবে "আনুগত্য" শব্দের উল্লেখ উঠে এসেছে। এতে সেসমস্ত লোকের আলোচনা হয়েছে, যারা নিজেদের বুঝ-বুদ্ধিতে না ধরার অভিযোগে ওহীর বিধানকে প্রয়োগ করতে সম্মত নয় (নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক)!

এ আলোচনার অধীনে সংস্কারমূলক কিছু আলোচনা ।১. স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি এবং হেদায়াত ও গোমরাহী২. ইসলামী বিধি-বিধানের রহস্য ও দ্বীনের ক্ষেত্রে সেগুলোর অবস্থান

৩. শরঈ বিধান হেকমত ও কল্যাণের উপর নির্ভরশীল নয়৪. শরঈ বিধি-বিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'অনুসরণের পরীক্ষা'৪। শরঈ বিধিবিধানের আসল উদ্যেশ্য "অনুসরণের পরীক্ষা" ।৫। কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যার সঠিক পদ্ধতি ।৬। কালের বিবর্তণ ও শরঈ আহকাম। ৭। যুগ পরিবর্তনের অর্থ। ৮। বিবেক-বুদ্ধির সঠিক কার্জ পরিধি।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

তাফসীরের কয়েকটি আবশ্যকীয় মূলনীতিঃ تفسیر کے چند ضروری اصول

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর ও তা থেকে বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন আহরণ করার বিষয়টি একটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর পূর্ণাঙ্গ মূলনীতিসমূহ অনুধাবনের জন্য আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাহ্ব-সরফ (আরবী ব্যাকরণ), বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র) এবং ইলমে হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক, বিধায় এই গ্রন্থে এ সকল উসূল মূলনীতি বর্ণনা করা সম্ভব নয় ।

ফিকাহ শাস্ত্রের অধিকাংশ মূলনীতি, পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন আহরণ করার মূলনীতির সাথেই সংশ্লিষ্ট। যে ব্যক্তি এ বিষয়বস্তুর সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করতে চায়, তাকে কোনো দক্ষ উস্তাদের কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি অধ্যয়ন করতে হবে । আমরা এখানে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করবো । যা ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও বুঝে আসতে পারে ।

মূলতঃ যেগুলো উপেক্ষা করার কারণেই তাফসীরের ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি; বরং বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । এগুলো আসলে তাফসীরের পূর্ণাঙ্গ মূলনীতি নয়; বরং এ বিষয়ের বিশেষ বিশেষ কিছু নির্বাচিত আলোচনা । বর্তমান সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্বাচিত করে পেশ করা হচ্ছে। (আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী ।) والله الموفق والمعين

প্রথম পবিত্র কুরআনুল কারীম ও (রূপক) মাযাজ অর্থ قرآن کریم اور مجاز

প্রথম জরুরী কথা হলো এই যে, কোনো কোনো সময় একটি শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না হয়ে বরং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । উদাহরণস্বরূপ شیر (শের) শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো বিশেষ একটি হিংস্র জন্তু । কিন্তু অনেক সময় এই শব্দটি "বীর পুরুষ"-এর অর্থের জন্যও ব্যবহৃত হয় । কবি উনাইসের প্রসিদ্ধ পঙক্তি–

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے

কোন বীর–পুরুষের আগমন, যার প্রভাবে কাঁপছে রণাঙ্গন? ঃ

এখানে .شیر.. দ্বারা কোনো হিংস্র প্রাণীকে বুঝানো হয়নি । বরং বীর পুরুষকে বুঝানো হয়েছে । এ ধরনের আরো অনেক শব্দ বিশেষ কোনো সম্পর্কের দরুণ এমন কোনো অর্থে ব্যবহার হয়, যা তার আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থ নয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমেও বহু শব্দ তার প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি । বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে,

সূচিপত্র

প্রত্যেকেরই এই অধিকার থাকবে যে, সে পবিত্র কুরআন মাজীদের যে শব্দকে চাইবে প্রকৃত অর্থে আর যে শব্দকে চাইবে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে পারবে। বরং উম্মতের উলামায়ে কেরাম এর জন্য এমন একটি মূলনীতি প্রস্তুত করেছেন, যা একশতে একশ ভাগ যুক্তিসঙ্গত এবং যার উপর সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। এখানে সেই মূলনীতিটি বুঝে নেওয়া জরুরী।

মূলনীতিটি হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর ক্ষেত্রে তার প্রকৃত অর্থই হবে আসল উদ্দেশ্য। রূপক অর্থ শুধুমাত্র ওই সময়ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যখন কোনো বাধ্য-বাধকতার কারণে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। আর যেখানে কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকে না সেখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করা কোনোভাবেই বৈধ হবে না। এই বাধ্য-বাধকতার দিকগুলো নিম্নরূপ–

১. বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ বা অকাট্য প্রত্যক্ষ বাস্তবতার নিরিখে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

(বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব না হওয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা "পবিত্র কুরআনুল কারীম ও আকলী দালাইল" (قرأن الكريم اور عقلی دليل) শীর্ষক শিরোনামের অধীনে সামনের মূলনীতিতে আসবে ইনশাআল্লাহ।)

২. সাধারণ্যে প্রচলিত বাক্যরীতির দিক থেকে ওই শব্দ অথবা বাক্যের প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। যেমন, কাফেরদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.

'তারা খুব অল্পই ঈমান আনয়ন করে।'

এখানে (قليل) শব্দের অর্থ 'সামান্য', 'অল্প' বা 'কম' ইত্যাদি। এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণ্যে প্রচলিত বাক্যরীতি অনুযায়ী এই অর্থ উদ্দেশ্য হয় না যে, 'তারা ঈমান তো আনয়ন করে তবে সামান্য।' বরং আসল উদ্দেশ্য হলো এই যে, "তারা ঈমানই আনয়ন করে না।" আর এভাবে (قليلا) শব্দটি রূপকভাবে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরেজিতে (few) শব্দটিও এভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩. রূপক অর্থ গ্রহণ করার জন্য তৃতীয় অত্যবশ্যকীয় হলো, ইবারতের পূর্বাপর কোথাও এমন ইঙ্গিত থাকে, যা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করাকে অসম্ভব করে দেয়। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

'সুতরাং যার মন চায় ঈমান আনুক, আর যার মন চায় কুফরী করুক।'

সূচিপত্র

এই শব্দগুলোর পরিষ্কার আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থ এটাই হবে যে, [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ হতে ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে সমপর্যায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরেই ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

'আর নিঃসন্দেহে আমি জালেমদের (কাফেরদের) জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি আগুন।'

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঈমান ও কুফর সমভাবে জায়েয। বরং উদ্দেশ্য এই যে, উভয়টির পরিণাম স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মানুষের এখতেয়ার আছে, সে কুফরী অবস্থায় থেকে যাক কিংবা ঈমান আনয়ন করুক। প্রথমোক্ত অবস্থায় তাকে জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে।[৫৩৬]

উপরোক্ত বাধ্য-বাধকতাগুলো ব্যতীত কোনো শব্দের প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থ গ্রহণ করা কখনো জায়েয হবে না। এটি একটি সর্বসম্মত মূলনীতি এবং এর যুক্তিগ্রাহ্যতাও অনস্বীকার্য। কেননা আল্লাহর কালামের রূপক অর্থ ব্যবহারের অবাধ অনুমতি প্রদান করা হলে পবিত্র কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াত অর্থগত বিকৃতি থেকে নিরাপদ থাকবে না। প্রত্যেকেই নিজের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি পবিত্র কুরআনুল কারীমে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এ কথা বলতে পারবে যে, এখানে শব্দের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য।

বরং বিষয়টি শুধু প্রকৃত ও রূপক অর্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক সময় একই শব্দ ও বাক্যের একাধিক অর্থ হতে পারে এবং প্রত্যেকটিই প্রকৃত অর্থ হয়। এমতাবস্থায়ও সর্বজনস্বীকৃত নিয়ম হলো, যে অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত বাক্যরীতির অধিকতর নিকটবর্তী হিসেবে প্রকাশিত হবে, সেটাই গ্রহণ করা হবে। দূরবর্তী অর্থগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিকটবর্তী অর্থ গ্রহণ করার পূর্বে উপরোক্ত বাধ্য-বাধকতা সমূহের কোনো একটি পাওয়া না যায়। অথবা স্বয়ং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো হাদীস দ্বারা অন্য কোনো অর্থ প্রমাণিত না হয়। যেমন, এ প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.) উল্লেখ করেন–

---

৫৩৬. আমরা এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এর মূলনীতির আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধশালী আলোচনার জন্য উসূলে ফিকহের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বিশেষ করে ফখরুল ইসলাম বাযদূভী (রহ.) রচিত "উসূলে বাযদূভী" এর আবদুল আজীয বুখারী প্রণিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ "কাশফুল আসরার।"

সূচিপত্র

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ مِنَ الآخَرِ فَيَجِبُ الْجَمْلُ عَلَى الظَّاهِرِ إِلاَّ أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْخَفِيُّ دُونَ الْجَلِيِّ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ

'(কুরআনুল কারীমে একাধিক অর্থ হওয়ার) এক প্রকার হলো, একটি অর্থ অপর অর্থের তুলনায় অধিক স্পষ্ট হবে। এমতাবস্থায় ওই অর্থটিই গ্রহণ করা হবে, যা অধিক স্পষ্ট হবে। তবে হ্যাঁ, যদি এমন কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এখানে বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে গোপন অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তবে এই গোপন অর্থই গ্রহণ করা আবশ্যক হবে।'[৫৩৭]

এই উসূলটি এতই সুস্পষ্ট (self evident) ও যুক্তিগ্রাহ্য যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম তো আল্লাহ তা'আলার কালাম; মানবীয় জীবনধারার সাধারণ কথাবার্তায়ও একে এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই। যদি এটাকে উপেক্ষা করা হয় তাহলে কোনো মানুষের কথাকেই সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব হবে না। যেমন ধরুন, একজন মুসাফির রেল স্টেশনে পৌঁছে তার চাকরকে বলল, 'টিকেট নিয়ে আস।' এখন চাকর যদি রেলওয়ের টিকেট না এনে 'ডাকটিকেট' নিয়ে আসে, তাহলে গোটা দুনিয়ার মানুষ তাকে নির্বোধ আখ্যায়িত করবে। যদিও টিকেট শব্দটি দ্বারা উভয় টিকেট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু চাকরের নির্বুদ্ধিতা এই যে, সে রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে টিকেট শব্দের প্রকাশ্য ও নিকটবর্তী অর্থ গ্রহণ না করে দূরবর্তী একটি অর্থ গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে কোনো শহরের শাসক কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে এই নির্দেশ দিল যে, অমুক স্থানে একটি 'খাল' খনন করুন। যাতে আশ-পাশের এলাকা সেচ সুবিধা পেতে পারে। এখন যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এ কথার অর্থ এটা নেয় যে, খাল খনন করার অর্থ এখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। যার দ্বারা আশ-পাশের এলাকার লোকজন লেখাপড়া শিখবে। সে যদি তার এই দাবীর সমর্থনে বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকদের কথা থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে যে, তাঁরা বিদ্যালয়কে বুঝানোর জন্য 'খাল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

তাহলে এ ধরনের ইঞ্জিনিয়ারকে আপনি কি বলবেন? স্পষ্ট কথা যে, গোটা দুনিয়া তাকে পাগল আখ্যায়িত করবে। কারণ 'খাল' শব্দটি নিঃসন্দেহে রূপকভাবে বিদ্যালয়ের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই নহর শব্দের ব্যাখ্যা 'বিদ্যালয়' করা তখনই সঠিক হতো, যখন নহর শব্দের মূল ও প্রকৃত অর্থের

---

৫৩৭. আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : ২/১৬৭

সূচিপত্র

পরিপন্থী কোনো দলীল-প্রমাণ বা ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকত। অথচ উল্লিখিত উদাহরণে এ ধরনের কোনো দলীল উপস্থিত ছিল না।

এমনিভাবে কতক লোক এই সুস্পষ্ট মূলনীতিকে উপেক্ষা করে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর করতে গিয়ে ভয়াবহ গোমরাহীর শিকার হয়েছে। প্রাচীনকালে كرامت কারামাতা বা বাতেনিয়া নামে নাস্তিকদের একটি দল অতিবাহিত হয়েছে। তারা তাদের ভ্রান্ত মাযহাবের গোটা প্রাসাদ এর উপর দাঁড় করিয়েছিল যে, তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি শব্দকে এর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ থেকে সরিয়ে অভিনব ও বিরল-বিস্ময়কর অর্থের লেবাস পরিয়ে দিত। যেমন তাদের দাবী ছিল যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে 'সালাত' (নামায) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমাম (আধ্যাত্মিক নেতা)-এর আনুগত্য করা। 'হজ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই নেতার সাক্ষাত ও সেবা করা। 'সওম' (রোযা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই নেতার গোপন ভেদ ফাঁস করা থেকে বিরত থাকা, পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়। যিনা (ব্যভিচার) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাতেনী ফেরকার কোনো গোপন ভেদ ফাঁস করে দেওয়া।[৫৩৮]

এমনিভাবে মূসা (আ.)-এর লাঠি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয় লাভ করা। আর মেঘের ছায়া বিস্তার করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁর হুকুমত প্রতিষ্ঠা হওয়া।[৫৩৯]

আমাদের যুগেও বহু লেখক এই মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে তাফসীরের ক্ষেত্রে বিপজ্জনকভাবে হোঁচট খেয়েছেন। যেমন, ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য দর্শনের স্থূল জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ইসলামী দুনিয়ার কতক প্রগতিবাদী ব্যক্তি ইসলামী আকীদার মধ্য হতে ওই সব বিষয়কে অস্বীকার করে বসেছিলেন, যেগুলোকে পাশ্চাত্যের লোকেরা 'প্রসু" বলে তিরস্কার করত।

আর এ কারণে তারা পবিত্র কুরআনুল কারীমে এমন কিছু বিকৃতি সাধন করেছে যেগুলো দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। আর এ উদ্দেশ্যে তারা সমগ্র কুরআনুল কারীমের প্রায় অর্ধেক আয়াতকে রূপক বলে আখ্যায়িত করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পবিত্র কুরআন মাজীদের বহু স্থানে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, তাঁর সম্মুখে ফেরেশতাদের সিজদাবনত হওয়া এবং ইবলীসের অস্বীকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু যেহেতু ওই সময় পাশ্চাত্যে চার্লস ডারউইন (Darwin)-এর মতবাদটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এর কিছু গন্ধ দূর্গন্ধ ভারতবর্ষেও এসে

---

৫৩৮. দেখুন : আবদুল কাহের আল-বাগদাদী আল-ইস্পারাইনী রচিত : ... পৃ: ২৯৬)

৫৩৯. আলামা শাহরাস্তানী (রহ.) রচিত ... ও এর টীকাগ্রন্থ ১/৩৩৪)

সূচিপত্র

পৌঁছেছিল, তাই প্রগতিবাদী লেখকগণ এই দাবী করে বসল যে, পবিত্র কুরআন মাজীদে হযরত আদম (আ.), ফেরেশতা ও ইবলীশের যে ঘটনা বর্ণনা করেছে, তা স্রেফ একটা কাল্পনিক বিষয়। বাস্তবে না আদম (আ.) বলতে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল, না ফেরেশতা আর না ইবলীসের! যেমন–উপমহাদেশের অন্যতম শিয়া মতাদর্শের লেখক স্যার সাইয়েদ আহমদ খান লিখেছেন–

"আদম শব্দ দ্বারা এমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, যেটাকে সাধারণ মানুষ ও মসজিদের মোল্লাগণ 'বাবা আদম' বলে থাকে। বরং 'আদম' দ্বারা মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে।"[৫৪০]

একটু পরে লিখেন–

"এ ঘটনায় চারটি পক্ষের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (১.) খোদা।[৫৪১] (২.) ফেরেশতা (মালাকূতী শক্তি)। (৩.) ইবলীস বা শয়তান (তথা পাশবিক শক্তি)। (৪.) আদম (অর্থাৎ উভয় শক্তি দেখতে মানুষ, যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয় শামিল)। এ ঘটনাটি তুলে ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব প্রকৃতির বর্তমান কথা দ্বারা মানবের প্রকৃতি বর্ণনা করা।"

এখন প্রশ্ন হলো, পবিত্র কুরআন মাজীদ তো ফেরেশতাদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকেন। এর জবাব দিতে গিয়ে স্যার সাইয়েদ আহমদ সাহেব লিখেন–

"যে সত্ত্ব যে কর্মের জন্য নির্ধারিত সে তার ওই কর্মেই রত থাকে। সেটাই হচ্ছে, ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। বর্ধন শক্তির বর্ধিত হওয়া, বাকশক্তির কথা বলা, দাহন শক্তির দহন করা, প্রবাহ শক্তির প্রবাহিত হওয়া এবং স্থির থাকা বস্তুর স্থির থাকা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়।"

আবারও প্রশ্ন দেখা দিল যে, হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাতে থাকা, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর জবাবে তিনি যে "রূপক" (মাযাজের) কারিশমা দেখিয়েছেন তা লক্ষ্য করুন–

"আমরা শুরু থেকেই এই ঘটনা (অর্থাৎ হযরত আদম ও ইবলীসের ঘটনা)-কে বাস্তবিক কোনো ঘটনা হিসাবে স্বীকার করেনি। বরং শুধু মানব স্বভাবের

---

[৫৪০]. স্যার সাইয়েদ আহমদ খান কৃত "তাফসীরুল কুরআন" ১/৪৮

[৫৪১]. সৌভাগ্যের কথা যে, তিনি 'খোদা'-এর ব্যাখ্যা ব্রাকেটের মধ্যে 'মূলধাতু' ইত্যাদি বলেননি।

সূচিপত্র

প্রকৃতিকে মানব স্বভাবের ভাষায় ব্যক্ত করা হিসেবে মনে করে থাকি। অতএব, মানুষের জান্নাতে থাকা তার স্বভাবের একটি অবস্থার বর্ণনা। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো আদেশ-নিষেধের মুকাল্লাফ (যোগ্যপাত্র) ছিল না। ... আর নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট গমন করা এবং এর ফল খাওয়া তার স্বভাবের এই অবস্থার বর্ণনা যখন সে গাইরে মুকাল্লাফ থেকে মুকাল্লাফ (আদেশ-নিষেধের পাত্র) হয়েছে। আর (هبوط) অর্থাৎ অবতরণ করা শব্দটির ব্যবহার শুধু 'স্থানান্তরিত' হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।"[৫৪২]

তারপরও কেউ প্রশ্ন করতে পারতো যে, এ ঘটনায় ইবলীস সেজদা করা থেকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেছিল, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা এ কথার অর্থ কি? এর জবাবে তিনি বলেছেন–

"পশুত্ব শক্তির সূচনা হয়েছে আগুন ও উষ্ণতা স্বভাব দিয়ে। আগুন দ্বারা মাখলূক সৃষ্টি করা দ্বারা যথাযথভাবে তার স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে।"

এবার পুরো ঘটনার সারকথা তার ভাষায় এমন–

"মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের এই স্বভাব-প্রকৃতিকে বাগানের সাথে উপমিত করেছেন। তাই সকল স্বভাবকে বুঝানোর জন্য বাগান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভালো-মন্দ উপলব্ধির বয়সে উপনীত হওয়াকে বৃক্ষ দ্বারা, কল্যাণ ও অকল্যাণের উপলব্ধিকে ফল খাওয়া দ্বারা, আর মানুষের নিজের দোষ-ত্রুটিকে গোপন করাকে বৃক্ষের পাতা দিয়ে শরীর আবৃতকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু চিরন্তন বৃক্ষের ফল পর্যন্ত তাকে পৌছাননি। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি একটি অস্থায়ী জিনিসের অস্তিত্ব এবং এর কোনো স্থায়ীত্ব নেই।"[৫৪৩]

খান সাহেবের উপরোক্ত বাক্যগুলোর উপর কোনো ইলমী ও জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।[৫৪৪]

পবিত্র কুরআন মাজীদে হযরত আদম (আ.) ও ইবলীসের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং উপরোক্ত মনগড়া ব্যাখ্যা-বিকৃতিকে এর সাথে মিলিয়ে দেখুন। আপনি নিজেই আন্দাজ করতে পারবেন যে, প্রকৃত ও রূপক অর্থের ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত যে মূলনীতিটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেটাকে উপেক্ষা করে কেমন কেমন অনর্থক কথাবার্তা পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে?

---

৫৪২. স্যার সাইয়েদ আহমদ খান কৃত "তাফসীরুল কুরআন" ১/৫১

৫৪৩. স্যার সাইয়েদ আহমদ খান কৃত "তাফসীরুল কুরআন" ১/১৫৯

৫৪৪. তবে উপরোক্ত বিকৃতিগুলো দেখে আমার বাতেনী গ্রুপের প্রসিদ্ধ নেতা উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-কায়রাওয়ানীর কথা মনে পড়ে গেল। যিনি তার এক অনুসারীকে লিখেছিলেন–

সূচিপত্র

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বহু স্থানে জান্নাতের নেয়ামতের আলোচনায় ভরপুর। এতে জান্নাতের সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা, প্রবাহমান ঝর্না, নয়নাভিরাম ঘরবাড়ি, অনিন্দ্য সুন্দর এবং পবিত্র যৌথ জীবন-যাপন, সুস্বাদু খাবার ও ফল-ফলাদির বর্ণনা এত অধিক পরিমাণে হয়েছে যে, এগুলো গণনা করাও মুশকিল। কিন্তু স্যার সাইয়েদ আহমদ খান সাহেব বলেন যে, এগুলো সবই রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

এগুলো দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো, "সর্বোচ্চ আনন্দ-খুশী ও আরাম"-এর বর্ণনা দেওয়া। আর এসব কিছু এ জন্যই বর্ণনা করা হয়েছে যেন, মূর্খ ধরনের লোকেরা এসব আনন্দ ও তৃপ্তির লোভে দিন-রাত ইবাদত-আনুগত্যে নিমগ্ন থাকে।

(তিনি লিখেন)- "একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মন-মস্তিষ্ক এ ধারণা করে যে, প্রতিশ্রুতি ও ধমকি, বেহেশত ও দোজখ শব্দগুলো দ্বারা যা বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো দ্বারা হুবহু ওই জিনিসগুলোই উদ্দেশ্য নয়; বরং এগুলো বর্ণনা করে শুধু সর্বোচ্চ আনন্দ-খুশি ও আরামকে মানবীয় উপলব্ধির উপযোগী উপমায় পেশ করা উদ্দেশ্য। এর দ্বারা জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের উপভোগ করা, আল্লাহর আদেশ মেনে চলার উৎসাহ এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকার জন্য অন্তরে এ আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আর এক ধর্মান্ধ মোল্লা অথবা প্রবৃত্তি পূজারী পরহেজগার এমন মনে করে যে, 'বাস্তবেই বেহেশতে অসংখ্য সুন্দরী হুর পাওয়া যাবে। সুস্বাদু পানীয় পান করবে, ফল-ফলাদি খাবে, দুধ ও মধুর নদীতে গোসল করবে। মনমতো আনন্দ-উল্লাস করবে।' এই অনর্থক ধারণা ও কল্পনায় দিন-রাত আল্লাহর নির্দেশ পালনের এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে তারা বিরত থাকার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।"[৫৪৫]

বাস্তব কথা হলো, প্রকৃত অর্থ ও রূপক অর্থের এ নীতিমালা উপরে বর্ণিত হয়েছে, যদি সেটাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে এমন কোনো ভ্রান্ত আকীদা ও মন্দ কর্ম বাকি থাকে না যেগুলোকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না। অবশেষে বাতেনী ফেরকার লোকেরা এই রূপক অর্থকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে অগ্নিপূজার আকীদা সাব্যস্ত করে দিয়েছিল। আজও বহু খ্রিস্টান পাদ্রী পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতে দূর-দূরান্তের তাভীল ও জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে কুরআনকে খ্রিস্টান ধর্মের সহায়ক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টায় রত থাকে।

অতঃপর (তাদের ধারণা অনুযায়ী) যখন পবিত্র কুরআন মাজীদের অর্ধেকটাই রূপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য বৃক্ষের বর্ধন শক্তি,

---

[৫৪৫]. স্যার সাইয়েদ আহমদ খান কৃত "তাফসীরুল কুরআন" ১/৩৫

সূচিপত্র

সমুদ্রের প্রবাহমান শক্তি এবং আগুনের দাহন শক্তি, আর আদম (আ.) দ্বারা উদ্দেশ্য মানবজাতি এই ইবলীস দ্বারা উদ্দেশ্য অকল্যাণমূলক অপশক্তি হতে পারে, তাহলে দোজখ দ্বারা পার্থিব দুঃখ-কষ্ট, জান্নাত দ্বারা পার্থিব আনন্দ-খুশিও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর আল্লাহর ব্যাপারেও বলা যেতে পারে যে, (নাঊযুবিল্লাহ) তা কোনো না কোনো স্বতন্ত্র সত্ত্বার নাম নয়; বরং সৃষ্টির মূলধাতু বা মূলশক্তির নাম! এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ব্যাপারে যে কাল্পনিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেটা (নাঊযুবিল্লাহ) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু এজন্য বর্ণনা করেছেন যে, যেন আরবের বেদুঈনদেরকে এর দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত করে সৎকর্মের দিকে আহ্বান করা যায়!

এখন দেখুন! রূপক অর্থের এই হাতিয়ার দীন-ধর্মকে একেবারেই উপড়ে দিয়েছে এবং কুরআনের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর ঈমান রাখার প্রয়োজনও আর বাকি থাকল না। আর এ কথাটি শুধু বুদ্ধিগত স্বীকৃত বিষয়ই নয়। বরং রূপক অর্থ ব্যবহারের অবাধ অনুমতি প্রদান করে বাতেনীয়া একেবারে এ ধরনের দাবীই উত্থাপন করেছিল। আল্লামা আবদুল কাহের বাগদাদী (রহ.) লিখেন–

"বাতেনী ফেরকার প্রসিদ্ধ পৃষ্ঠপোষক উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান কায়রাওয়ানী তার একটি গ্রন্থে লিখেছেন যে, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথাটি অনর্থক। আর জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য বস্তুত দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস। আর আযাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তপূজারীদের নামায, রোযা, হজ ও জিহাদের চক্করে ফেঁসে থাকা।"[৫৪৬]

সুতরাং, পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত হেদায়াত গ্রন্থ হিসেবে উপকৃত হতে হলে এ ধরনের কর্মরীতি একেবারেই অযৌক্তিক, অনর্থক ও বিপজ্জনক যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের যে কথাই নিজের মতবাদের বিরুদ্ধে মনে হবে, সেটার মধ্যেই তাভীল বা মনগড়া ব্যাখ্যার দ্বার উন্মুক্ত করে এ কথা বলতে শুরু করবে যে এর বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থের পরিবর্তে এখানে অমুক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। বর্তমান যুগের যেসব লেখক তাফসীর শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা ছাড়াই পবিত্র কুরআন মাজীদের তাফসীরের জন্য কলম ধরেছেন, তাদের মধ্যে এই নীতিগত ভুলটা ব্যপকহারে পরিলক্ষিত হয়েছে। সেগুলোকে পাঠ করার সময় যদি উপরোল্লিখিত নীতিমালাকে সামনে রাখা হয়, তাহলে এ ধরনের রচনাবলীর বহু ভুল-ভ্রান্তি নিজে নিজেই সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের নিকট উন্মোচিত হয়ে যাবে।

---

৫৪৬. আল-ফরকু বাইনাল ফিরাক : পৃ: ২৫৯

সূচিপত্র

2-قرآن کریم اور عقلی دلائل

দ্বিতীয়. পবিত্র কুরআনুল কারীম ও আকলী দলীল ঃ

আধুনিক যুগের কোনো কোনো লেখক কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্যে উপর কখনও কখনও এ অজুহাত তুলে দূর-দূরান্তের তাভীল ও জটিল ব্যাখ্যা করেন যে, এই বক্তব্যগুলোর বাহ্যিক অর্থ "আকল যুক্তি বিরুদ্ধ।" ফলে এগুলোর এমন ব্যাখ্যা করতে হবে, যা আকল ও বিবেক বিরুদ্ধ হবে না। এ ক্ষেত্রে যেহেতু ভুল বুঝাবুঝিটা বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে, তাই এই বিষয়টিকে আমরা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই।

সর্বপ্রথম এ কথাটি বুঝে নিন যে, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যেসব বিষয় প্রমাণিত হয়, সামনে গিয়ে আমরা সেগুলোকে "নকলী দলীল" তথা বর্ণনানির্ভর দলীল হিসেবে উল্লেখ করবো। আর আকল ও বিবেক দ্বারা যেসব বিষয় জানা যায়, সেগুলোকে আমরা "আকলী দলীল" (علماء متكلمين) তথা যুক্তিভিত্তিক হিসেবে উল্লেখ করবো।

মূলতঃ এ ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির আসল কারণ হলো, আমাদের উলামায়ে কেরাম ও মুতাকাল্লিমীনগণ তাদের গ্রন্থাবলীতে এই নিয়মটি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যদি 'নকলী দলীল' 'আকলী দলীলে'র বিরুদ্ধে হয়, তবে আকলী দলীলের উপর ভিত্তি করে আমল করতে হবে। আর নকলী দলীলটি যদি সনদের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য না হয় তাহলে তার ব্যাপারে বলা হবে যে, তা বিশুদ্ধ নয়। আর যদি সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বলা হবে যে, এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যদি সাবলীলভাবে দ্বিতীয় কোনো অর্থ করা যায়, তখন বলা হবে যে এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যদি সাবলীলভাবে কোনো অর্থ বোধগম্য না হয়, তাহলে বলা হবে যে, এর সঠিক অর্থ আমরা অবগত হতে পারিনি। এর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলারই আছে। নকলী দলীলের এই শেষ প্রকারটিকেই বলা হয় " متشبهات(অবোধগম্য)।"[৫৪৭]

এই নিয়মটি উলামায়ে কেরাম ও মুতাকাল্লিমীনদের নিকট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু এটাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করার কারণে কতক লেখক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, কুরআন সুন্নাহর যে কোনো কথাই নিজের কোনো রায় ও দৃষ্টিভঙ্গি বিরুদ্ধ হবে, সেটার ব্যাপারেই এ কথা বলে তাভীল আরম্ভ করে দিবে যে, এটা 'আকল বিরুদ্ধ'। অথচ যে সব মুতাকালিম এ নিয়ম বর্ণনা

---

[৫৪৭]. ইমাম রাযী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ .... -এ লিখেন-

সূচিপত্র

করেছেন, তারা এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। এখানে ওই ব্যাখ্যাটি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত।

হাকীমূল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) স্বীয় পুস্তিকা (الانتباهات المفيدة)"আল-ইন্তেবাহাতুল মুফীদা"-এর মধ্যে এই নিয়মটিকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে আমরা হুবহু তাঁর ভাষায়ই নিয়মটি উল্লেখ করছি। তারপর ইনশাআল্লাহ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হবে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন-

"আকলী ও নকলী দলীলের মাঝে পরস্পর বিবাদের চারটি ধরণ হতে পারে।

১. উভয়টা 'কাতয়ী' অকাট্য হবে। অবশ্য এর কোনো অস্তিত্ব নেই, হতেও পারে না। কারণ সত্যবাদীদের মাঝে দ্বন্দ্ব হওয়াটা অসম্ভব।

২. উভয় দলীল ধারণাভিত্তিক হবে। এখানে উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করার জন্য যদিও বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে আসার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু

حمل اللفظ على الظاهر'মূল শব্দের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থই প্রযোজ্য হওয়া'-এর ভাষার রীতি অনুযায়ী নকলী দলীলকে প্রাধান্য দিবে এবং আকলী দলীলের অর্থকে দলীল মনে করবে না।

৩. নকলী দলীল অকাট্য আর আকলী দলীল কাল্পনিক হবে। এখানে নকলী দলীলকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪. আকলী দলীল অকাট্য হবে আর নকলী দলীল অনুমানভিত্তিক বা অর্থগত দিক থেকে ধারণানির্ভর হবে। এ ক্ষেত্রে আকলী দলীলকে অগ্রাধিকার দিবে। আর নকলী দলীলে যুক্তিগ্রাহ্য তাভীল ও ব্যাখ্যা করবে। ব্যস, শুধুমাত্র এ একটি স্থান, যেখানে নকলী দলীলের উপর আকলী দলীল প্রাধান্য পাবে। এ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে এর দাবী বা এর ব্যবহার করার অবকাশ নেই।[৫৪৮]

আর এ নিয়মটি সঠিকভাবে বুঝার জন্য প্রথমে এ কথাটি আত্মস্থ করে নেওয়া চাই যে, আকলী দলীলসমূহ তিন ধরনের হতে পারে।

১. অকাট্য আকলী দলীল ঃ قطعی عقلی دلائل

অর্থাৎ, এমন সব আকলী ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল যা একশতে একশ ভাগ নিশ্চিত। যেগুলোকে কোনো ধরনের মতপার্থক্য ছাড়াই সকল মানুষ মেনে আসছে এবং সেগুলোর পরিপন্থী যে কোনো কথা একশতে একশ ভাগ অসম্ভব। যেমন, 'দুই আর দুইয়ে মিলে চার হয়।' এটা একটা আকলী ও

---

৫৪৮. আল-ইন্তেবাহাতুল মুফীদা : হলুল ইন্তেবাহাত সহ : পৃ: ১/৬৬ ও ৭৪

সূচিপত্র

বুদ্ধিভিত্তিক দলীল। যার বিপরীত কখনো হতে পারে না। অর্থাৎ দুই আর দুই মিলে কখনো তিন বা পাঁচ হতে পারে না। একইভাবে এ কথাটিও বুদ্ধিভিত্তিক অকাট্যভাবে অসম্ভব যে, একই ব্যক্তি একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিতও রয়েছে আবার অনুপস্থিতও রয়েছে।

২. ধারণানির্ভর আকলী দলীল ঃ ظنی عقلی دلائل

অর্থাৎ ওই সকল আকলী ও বুদ্ধিভিত্তিক কথাবার্তা, যা শতভাগ তো নিশ্চিত নয়, তবে বিবেক ও অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলোর সত্যতার বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের কথার সত্যতার উপর সকল বিবেকবান ব্যক্তি সব সময় একমত থাকেন না। বরং বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন অঞ্চল ও বিবেক-বুদ্ধির ভিন্নতার কারণে এসব বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারামূলক মতপার্থক্য চলতে থাকে। যেমন, নিউটনের মধ্যাকর্ষণ থিউরী (Theory of Gravity), আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা থিউরী (Theory of Relativity) এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, এ মতবাদগুলোর কোনোটিই শতভাগ নিশ্চিত ছিল না। বরং ওই দার্শনিকগণ নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা তাদের কাছে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে অধিকতর সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং এর সত্যতার ব্যাপারে তাদের প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ মতবাদকে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে প্রমানিত বা সম্ভাবনাময় শতভাগ সঠিক বলা যায় না। এ কারণেই অন্যান্য দার্শনিকগণ তাদের মতবাদের সাথে মতানৈক্য করেছেন। এক কালে হয়তো কোনো একটি মতবাদ মন-মস্তিষ্কে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আবার পরবর্তীকালে সেই মতবাদই বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত বলে বিবেচিত হয়েছে।

৩. কল্পনা-প্রসূত আকলী দলীল ঃ وہمی نقلی دلائل

অর্থাৎ, এমন দলীল যেগুলোর ভিত্তি নিশ্চিত কিংবা প্রবল ধারণার পরিবর্তে শুধুমাত্র খেয়াল ও কেয়াসের উপর হয়ে থাকে। যেমন, আজ থেকে কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের এ খেয়াল ছিল যে, মঙ্গল গ্রহে কোনো জীবনের অস্তিত্ব আছে। স্পষ্ট কথা যে, এ মতবাদের বুনিয়াদ কোনো অকাট্য বা প্রবল ধারণার উপর নয়; বরং শুধুমাত্র খেয়াল ও অনুমানের উপর ছিল।

এভাবে নকলী বা বর্ণনাভিত্তিক দলীলসমূহও তিন ধরনের–

সূচিপত্র

১. অকাট্য নকলী দলীল ঃ قطعی نقلی دلائل

এগুলো এমন দলীল যা শতভাগ নিশ্চিত। অর্থাৎ কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে এগুলোর শব্দমালাও অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং সনদ ও প্রমাণের দিক থেকেও নিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য। যেমন, পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বক্তব্য– (তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না। (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) এ আয়াত এ কথার অকাট্য ও নিশ্চিত দলীল যে, ইসলামে ব্যভিচার হারাম। কেননা, মুসলমানদের পবিত্র কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কালাম হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। আর উক্ত আয়াত দ্বারা নিশ্চিতভাবে এ কথার প্রমাণ মিলে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীম ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করতে চায়। অনুরূপভাবে যেসব বিষয় মুতাওয়াতির হাদীস[৫৪৯] বা উম্মতের অকাট্য ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হবে, সেগুলোও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

২. ধারণা নির্ভর নকলী দলীল ঃ ظنی نقلی دلائل

অর্থাৎ এমনসব দলীল যা প্রথম প্রকারের ন্যায় অকাট্য নয়। তবে এগুলো দ্বারা যে বিষয় প্রমাণিত হয় তা সঠিক হবার বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন, ওই সকল হাদীস যা মুতাওয়াতির তো নয়, তবে সেগুলোতে উসূলে হাদীসের শর্তাবলী পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায়। যদিও এ সকল হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব হয় এবং এগুলো বিপরীত করা জায়েয নেই। কিন্তু যেহেতু তা প্রমাণ হবার দিক থেকে পবিত্র কুরআন মাজীদ ও মুতাওয়াতির হাদীসের মতো অকাট্য ও নিশ্চিত হয় না, তাই এগুলোকে দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের কোনো হাদীস যদি পবিত্র কুরআনুল কারীম অথবা মুতাওয়াতির হাদীসের বিপরীত হয়, তাহলে এর এমন ব্যাখ্যা করা হবে, যা কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীসের অনুকূলে থাকে। আর যদি এমন ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর না হয়, তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

---

[৫৪৯]. 'মুতাওয়াতির হাদীস' ওইসব হাদীসকে বলা হয়, যেগুলোর বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এত অধিক সংখ্যক হয় যে, একই সময়ে কোনো মিথ্যার উপর তাদের সকলের একমত হয়ে যাওয়াকে বিবেক অসম্ভব মনে করে। সনদ ও প্রমাণের দিক থেকে এসব হাদীস একশতে একশ ভাগ অকাট্য ও নিশ্চিত হয়ে থাকে। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ [অর্থাৎ যেসব হাদীসের বর্ণনাকারী কোনো এক যুগে শুধু একজন, দু'জন বা তিনজন হয়ে গেছে] ধারণামূলক হয়ে থাকে। অর্থাৎ এগুলোর প্রমাণ এমন নিশ্চিত নয়, মুতাওয়াতির হাদীসগুলো যেমন নিশ্চিত হয়ে থাকে। অবশ্য তা যদি পুরোপুরি উসূলে হাদীসের শর্তানুযায়ী হয়ে থাকে তখন তা সহীহ হবার প্রবল ধারণা হয়। তাই সমস্ত উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, এগুলোর অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

৩. কল্পনা প্রসূত নকলী দলীল ঃ وہمی نقلی دلائل

অর্থাৎ এমন নকলী দলীল যেগুলো সঠিক হবার জন্য প্রবল ধারণাও প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং তা শুধু খেয়াল ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। যেমন, ওই সকল হাদীস যা, উসূলে হাদীসের শর্ত মাফিক নয়।

উপর্যুক্ত এই ছয়টি প্রকারের মধ্য হতে দুইটি প্রকার (অর্থাৎ কাল্পনিক আকলী দলীল ও কাল্পনিক নকলী দলীল)-এর তো কোনো ধর্তব্যই নেই। তাই তা আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। অবশিষ্ট চারটি প্রকারকে সামনে রেখে আকলী ও নকলী দলীলসমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যের বুদ্ধিভিত্তিক চারটি প্রকার হতে পারে।

১. ঃ নকলী দলীল ও আকলী দলীল উভয়টি অকাট্য হবে। এ প্রকারটি মূলত দৃষ্টিভঙ্গিগত একটি বিষয়। কার্যত আজ পর্যন্ত এমনটি হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে না যে, অকাট্য কোনো নকলী দলীল অকাট্য কোনো আকলী দলীলের বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। যদি কোথাও বাহ্যিকভাবে এমনটি দৃষ্টিগোচরও হয়, তাহলে নকলী দলীল শুধুমাত্র তার সনদ ও প্রমাণের দিক থেকে অকাট্য হবে।

কিন্তু এর যে বিষয়টা অকাট্য আকলী দলীলের বিপরীত মনে হচ্ছে, এর উপর তার প্রামাণ্যতাটা অকাট্য হবে না। আর যদি ওই বিষয়ের উপর তার প্রামাণ্যতাটা অকাট্য হয়, তাহলে সনদ ও প্রমাণের দিক থেকে তা অকাট্য হবে না। এমনটি আজ পর্যন্ত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না যে, কোনো নকলী দলীল তার প্রমাণ ও প্রামাণ্যতা উভয় দিক থেকে অকাট্য হবে। অতঃপর তা কোনো অকাট্য আকলী দলীলের বিপরীত হবে।

২.ঃ নকলী দলীল অনুমান ভিত্তিক হবে আর আকলী দলীল অকাট্য হবে এবং উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে। এটা ওই প্রকার যার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ও মুতাকালিমীন বলেছেন যে, এমতাবস্থায় আকলী দলীলের উপর নির্ভর করা হবে এবং নকলী দলীলের এমন অর্থ বর্ণনা করা হবে যা অকাট্য আকলী দলীলের অনুকূলে হয়। যেমন, পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

'রহমান (আল্লাহ) আরশের উপর আসীন হয়েছেন।' اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

এটা পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত। তাই প্রমাণের দিক থেকে অকাট্য। অর্থাৎ এটা আল্লাহর কালাম হওয়াটা নিশ্চিত। কিন্তু এর যে অনুবাদ করা হলো তা অকাট্য নয়। কেননা আরবী পরিভাষায় اسْتَوٰى শব্দটির একাধিক অর্থ হতে পারে। আর যে অর্থ নেওয়া হয়েছে তা অকাট্য নয়। কাজেই এটা ওই নকলী

সূচিপত্র

দলীলের উদাহরণ, যা (প্রামাণ্যতার দিক থেকে) অনুমানভিত্তিক। অপরদিকে বাহ্যিকভাবে এর যে অর্থ বুঝে আসে (অর্থাৎ আরশের উপর সোজা হওয়া, তা আকলী দলীলের বিপরীত। কারণ "সোজা হওয়া" দেহের একটি গুণ। আর আকলের অকাট্য দলীলের দাবী হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কোনো দেহ বিশিষ্ট নন। আর এভাবে এই ধারণানির্ভর নকলী দলীলটি অকাট্য আকলী দলীলের বিপরীত হয়ে দাঁড়াল।

তাই তো উম্মাহ'র মুফাসসিরগণ সর্বসম্মতভাবে অকাট্য আকলী দলীলকে গ্রহণ করেছেন। আর উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আবার কতক উলামায়ে কেরাম একটাকে (মাযাজ) 'রূপক' বলেছেন এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রাবল্য, কুদরত ও ক্ষমতা ইত্যাদি। আর কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত ওই সকল মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

'এর তাভীল-ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।'

অনুরূপভাবে হযরত যুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে–

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

'এমনকি তিনি (যুলকারনাইন) যখন পশ্চিম প্রান্তে পৌছলেন, একটি কাদা মিশ্রিত নালায় সূর্যকে অস্তমিত অবস্থায় দেখতে পেলেন।'

এটাও পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত। অতএব, আল্লাহর কালাম হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাহ্যিকভাবে এই বাক্যের যে অর্থ বুঝে আসে যে, 'বাস্তবেই সূর্য একটি কাদাযুক্ত ডোবায় অস্তমিত হচ্ছিল।' বিবেক ও প্রত্যক্ষ দর্শনের অকাট্য দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক নয়। কারণ এটা নিশ্চিত কথা যে, সূর্য ও জমিন উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন দু'টি সত্ত্বা। যা কোনো অবস্থাতেই পরস্পর মিলিত হতে পারে না। কাজেই আয়াতের এই বাহ্যিক অর্থ নেওয়া কোনোভাবেই সঠিক হবে না।

বরং এর অর্থ হলো, যুলকারনাইন ওই সময় যে স্থানে পৌছেছিলেন, সে স্থানের পর আর কোনো জনবসতি ছিল না। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত শুধু জলাশয় আর জলাশয়ই ছিল। তাই প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভব হচ্ছিল, সূর্যটা মনে হয় এই ক্লেদাক্ত জলাশয়েই অস্তমিত হচ্ছে। এই অর্থটি যদিও আয়াতের শব্দমালা থেকে নেওয়া প্রথমোক্ত অর্থের ন্যায় স্পষ্ট নয়, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দমালা হতে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করার পূর্ণ অবকাশ রয়েছে, তাই

সূচিপত্র

এই আয়াতটি প্রথমোক্ত আয়াতের অর্থের উপর ধারণা নির্ভর প্রমাণ বহন করে। আর যখন বিবেক ও প্রত্যক্ষ অকাট্য দলীলের সাথে তার সংঘর্ষ হলো, তখন এই অকাট্য দলীলই প্রাধান্য পাবে। আর তাই সর্বসম্মতভাবে আয়াতের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে, যা অকাট্য দলীলের অনুকূলে ছিল।

৩. নকলী দলীল অকাট্য আর আকলী দলীল ধারণানির্ভর। এ কথা স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় নকলী দলীলই অগ্রাধিকার পাবে। কেননা ধারণানির্ভর দলীল অকাট্য দলীলের মুকাবিলা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, চার্লস ডারউইন তার তা থিওরি দৃষ্টিকোন থেকে বিবর্তনবাদে এই দাবী করেছিল যে, মানব বংশ হঠাৎ করেই অস্তিত্বে আসেনি। বরং জীব-জগৎ কালের অতিক্রমের সাথে সাথে একটি বিবর্তন ক্রমধারার সাথে সম্পৃক্ত থেকেছে এবং এ বিবর্তনের ফলে তার বহু আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। মানব রূপে পরিণত হবার পূর্বে তার সর্বশেষ আকৃতি ছিল বানর বা বন-মানুষ। এই বানর বা বন-মানুষেরই একটি বংশ বিবর্তনের ক্রমধারায় মানব আকৃতি ধারণ করেছে।

স্পষ্ট কথা যে, চার্লস ডারউইনের এই মতবাদ ছিল নিছক অনুমান নির্ভর। আর নিজের মতের স্বপক্ষে তিনি যেসব দলীল পেশ করেছেন, যদি সেগুলোকে দলীল বলা সঠিকও হয় তাহলেও এগুলো বেশির চেয়ে বেশি ধারণা নির্ভর দলীল ছিল। যার বিপরীত পবিত্র কুরআনুল কারীম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

'হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৫৫০]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30)

'স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি কাল শুষ্ক ঠনঠনে মাটির কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। আমি যখন তাকে পূর্ণ মাত্রায় বানিয়ে দেব আর তাতে আমার পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দেব, তখন

---

৫৫০. সূরা নিসা : ১

সূচিপত্র

তোমরা তার প্রতি সাজদায় পড়ে যেও। তখন ফেরেশতারা সবাই সাজদাহ করল।[৫৫১]

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয় এবং এ জাতীয় আরো বহু আয়াত সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, মানবজাতির সূচনা হয়েছে একজন মানুষ (হযরত আদম (আ.)) থেকে। যাকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমের এসব দলীল-প্রমাণ অকাট্য। অতএব, এগুলো দ্বারা চার্লস ডারউইনের মতবাদ অকাট্যভাবে খন্ডিত হয়ে যায়। আর এ ধরনের মতবাদ [যেগুলোকে বেশির চেয়ে বেশি ধারণানির্ভর বলা যেতে পারে]-এর কারণে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে পরিহার করা বা এর কোনো দূরবর্তী জটিল ব্যাখ্যা করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

৪. (علماء متكلمين) নকলী দলীলও ধারণানির্ভর এবং আকলী দলীলও ধারণানির্ভর হবে। এ ক্ষেত্রেও (উলামা ও মুতাকাল্লিমীন) একমত যে, এমতাবস্থায় নকলী দলীল অগ্রাধিকার পাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আকলী দলীল অকাট্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নকলী দলীল ধারণানির্ভর হওয়ার কারণে কুরআন ও সুন্নাহ'কে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া বৈধ হবে না। এর কারণ সেটাই যা 'কুরআনুল কারীম ও (মাযাজ) রূপক অর্থ' শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনুল কারীমই নয়; বরং পৃথিবীর সব ধরনের কথাবার্তায় স্বাভাবিক নিয়ম হলো, প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করা।

রূপক অর্থ কেবল তখনি অবলম্বন করা যাবে, যখন কোনো বাধ্য-বাধকতা এসে দাঁড়াবে। যদি কোনো অকাট্য আকলী দলীল প্রকৃত অর্থের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়, তখন তো বাধ্য-বাধকতা সুস্পষ্ট। আর ওই অবস্থায় রূপক অর্থ গ্রহণ করাও স্পষ্টভাবে বোধগম্য। কিন্তু যখন আকলী দলীল ধারণানির্ভর হয়, তাহলে রূপক অর্থ কিংবা দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করার বাধ্য-বাধকতা প্রমাণিত হয় না। কারণ আকল ও বিবেকের ধারণা নির্ভর দলীল কখনো ব্যাপক সমৃদ্ধ ও চিরস্থায়ী হয় না।

একজন ব্যক্তি ধারণা নির্ভর দলীলকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অন্যজন সেটাকে অস্বীকার করে বসে। এক যুগে সেটার ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়, আবার অন্য যুগে সেটাকে অজ্ঞতা মনে করা হয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস খুলে দেখুন, এ ধরনের কত অসংখ্য মতবাদ দ্বারা তা ভরপুর। একই যুগে একজন দার্শনিক একটি মতবাদের প্রবক্তা এবং সে নিজের ধারণা নির্ভর দলীলকে অপরাপর সকল দলীলের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ওই যুগেই

সূচিপত্র

অপর একজন দার্শনিক তার বিপরীত মতবাদকে সঠিক বলে মনে করে এবং সে তার দলীলকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

অতঃপর কালের চক্রে সময় যখন সামনে গড়ায় তখন জানা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগের সকল দার্শনিকদের দলীল-প্রমাণ ভিত্তিহীন ও ভুল ছিল। ধারণানির্ভর এ ধরনের দলীল-প্রমাণের সঠিক সংখ্যার হিসাব তো মুশকিল, যেগুলোকে সামনে গিয়ে আকল ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতার অকাট্য দলীল-প্রমাণ চিরদিনের জন্য বাতিল সাব্যস্ত করেছে।

পক্ষান্তরে চৌদ্দশত বছরের সুদীর্ঘ সময়ে এ ধরনের ধারণানির্ভর নকলী দলীল-প্রমাণ এক-দু'টিই পাওয়া যাবে যেগুলোকে আকলের অকাট্য দলীল অথবা প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নিশ্চিতভাবে ভুল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। অতএব, যদি ধারণানির্ভর প্রত্যেক আকলী দলীলের কারণেই নকলী দলীলের মধ্যে তাভীল ও ব্যাখ্যার দরজাকে খুলে দেওয়া হয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ'কে শিশুদের খেলার সামগ্রী ব্যতীত আর কি ফলাফল বের হতে পারে? হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সিউহারুভী (রহ.) খুবই চমৎকার কথা লিখেছেন–

"মূলতঃ এ ধরনের জ্ঞান-গর্ভ আলোচনার জন্য ইসলামের দিক-নির্দেশনা হলো যে, যেসব বিষয় বাস্তব নিরীক্ষণ ও সন্দেহাতীত সীমায় পৌঁছে গেছে এবং ওহীয়ে এলাহী ও কুরআনী ইলম সেই মূলতত্ত্বগুলোকে অস্বীকার করে না (কারণ কুরআন কখনো মুশাহাদা ও বাদাহাত প্রত্যক্ষ ও সজহ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করাকে কখনো অস্বীকার করেনা। তাহলে নিঃসন্দেহে সেগুলোকে মেনে নিতে হবে। কারণ এ ধরনের তাত্ত্বিক বিষয়কে অস্বীকার করা অনর্থক পক্ষপাতিত্ব ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়।

আর যেসব বিষয় এখনো ইয়াকীন ও প্রত্যয়ের ওই স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি, যেগুলোকে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বলা যায়, তাহলে এগুলোর খাতিরে পবিত্র কুরআনুল কারীমের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার তাভীল বা ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। আর অযথাই সেগুলোকে আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার ছাঁচে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা কখনো জায়েয নয়।

বরং এ .পর্যন্ত সময়ের অপেক্ষা করা চাই যে, এসব বিষয় স্বীয় মূলতত্ত্ব এমনভাবে প্রকাশিত করে দিবে যে, তখন এগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ হবে, সুস্পষ্ট বিষয় ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। কারণ এটাই বাস্তবতা যে, ইলমী বিষয়গুলোকে বার বার নিজ অরস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনী ইলমকে কখনো একটি বারের জন্যও নিজ অবস্থান থেকে সরে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।"[৫৫২]

---

[৫৫২] . কাসাসুল কুরআন : ১/৪৯ হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা। মাসআলা নং ১০

সূচিপত্র

অতএব, বুনিয়াদী উসূল তো এটাই যে, যখন আকলী ও নকলী 'যন্নী' দলীলের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন নকলী দলীলই অগ্রাধিকার পাবে এবং ধারণানির্ভর আকলী দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নকলী দলীলসমূহের মধ্যে দূরবর্তী কোনো তাভীল বা ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করা জায়েয হবে না। তবে এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ধারণানির্ভর সকল দলীল-প্রমাণই এক পর্যায়ের হয় না। বরং এগুলোর মধ্যেও বিভিন্ন স্তর থাকে। যেমন, কোনো কোনো ধারণানির্ভর দলীল অন্য ধারণানির্ভর দলীলের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। যেমন এ কথাটিও ধারণানির্ভর যে, "জমিন নড়াচড়া করে।" আর এ কথাটি 'যন্নি' ধারণানির্ভর যে, "মানবজাতির সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে 'নেয়ান্দারথেল' (Neanderthal) নামক এক প্রজাতি বসবাস করতো।"[৫৫৩]

তবে এ কথাটি সুস্পষ্ট কথা যে, প্রথমোক্ত কথাটিতে যে পরিমাণ শক্তি বিদ্যমান, দ্বিতীয়টিতে তা নেই।

অনুরূপভাবে ধারণানির্ভর নকলী দলীলের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো যে, একটি হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য সকল গ্রন্থে রয়েছে। আরেকটি হাদীস সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত আছে বটে; কিন্তু হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ, হাদীসের অন্যান্য বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় স্পষ্টতই প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিক শক্তিশালী হবে। এভাবে ধারণানির্ভর দলীলসমূহের মাঝে স্তরের ব্যবধান হতে পারে। অতএব, ধারণানির্ভর আকলী দলীল যদি প্রথম স্তরের হয় আর ধারণানির্ভর নকলী দলীল যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের হয়, এমতাবস্থায় একজন মুজতাহিদ আকলী দলীলটিকে নকলী দলীলের উপর প্রাধান্য দিয়ে নকলী দলীলের এমন ব্যাখ্যা করতে পারেন, যা বাহ্যিক শব্দের দিক থেকে তুলনামূলক দূরের, কিন্তু আকলী দলীলের অনুকূলে হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আকলী দলীলটি প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নকলী দলীলের এই ব্যাখ্যাটিকে অকাট্য ও নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা উচিত হবে না। বরং এভাবে বলা চাই যে, 'এর এমনও একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা আকলী দলীলের দিক থেকে অগ্রগণ্য বলে মনে হয়।'

কিন্তু যেহেতু ধারণানির্ভর এই দলীলসমূহের স্তরগুলোকে মেপে মেপে একটি নিয়মের অধীনে নিয়ে আসা মুশকিল, তাই এই সিদ্ধান্ত দেওয়া যে কোনো ব্যক্তির কাজ নয় যে, কোনটি কোন্ স্তরের ধারণানির্ভর দলীল। এ সিদ্ধান্ত তিনিই দিতে পারেন, যার আকলী ও নকলী দলীলসমূহের উপর পুরো

---

[৫৫৩]. দেখুন ঃ ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, প্রবন্ধ : গধহ [মানুষ]। ১৪/৭৬৪

অভিজ্ঞতা এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র জ্ঞানে পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে আহলে ইলম বিজ্ঞজনদের মাঝে মতপার্থক্যও সৃষ্টি হয়ে যায়।

তবে এবিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে। পবিত্র কুরআনুল কারীম ইরশাদ করেছে যে, যখন হযরত যুলকারনাইন ইয়াজূয-মাজূযকে প্রতিরোধ করার জন্য দেয়াল নির্মাণ করেছেন, তখন তিনি বলেছেন–

هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا)

'এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার পালনকর্তার ওয়াদাকৃত সময় আসবে, তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য'। [৫৫৪]

অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এখানে "পালনকর্তার ওয়াদা" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কেয়ামত দিবস। অর্থাৎ যখন কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং ইয়াজূয-মাজূযের বের হয়ে আসার সময় হয়ে যাবে, তখন এ দেয়ালটি ভেঙ্গে যাবে। যদিও পবিত্র কুরআনুল কারীম শুধু "পালনকর্তার ওয়াদা" শব্দ উল্লেখ করেছে, এর চেয়ে বেশি তাফসীর ও ব্যাখ্যা করেনি। কিন্তু যেহেতু পবিত্র কুরআন মাজীদে একাধিক স্থানে এই শব্দটি কেয়ামতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এজন্য মুফাসসিরগণ এখানেও শব্দটির এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। তবে এই তাফসীরটি অকাট্য নয়; বরং ধারণানির্ভর।

অপরদিকে এ পর্যন্ত ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক যত গবেষণা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুলকারনাইন কর্তৃক তৈরিকৃত দেয়ালটি অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। যদিও এসব গবেষণা ধারণানির্ভর। কারণ যুলকারনাইন কর্তৃক তৈরিকৃত দেয়াল অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে সুনির্দিষ্ট করাও অত্যন্ত কঠিন।

এতদসত্ত্বেও এমন একজন ব্যক্তি, যা আকলী দলীল ও নকলী দলীলের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য করার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে এবং এ সব বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী, সে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক গবেষণাগুলো প্রথম স্তরের ধারণানির্ভর দলীল। আর উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরটি দ্বিতীয় স্তরের ধারণানির্ভর দলীল।

অতএব, এসব গবেষণা অনুযায়ী এ কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতে 'পালনকর্তার ওয়াদা"-এর অর্থ কেয়ামত না হয়ে ওই সুনির্দিষ্ট সময়ও হতে পারে, যে সময়ে ওই দেয়ালটি

---

[৫৫৪]. সূরা কাহাফ : ৯৮

সূচিপত্র

ভেঙ্গে যাওয়া আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বিধানে স্থিরকৃত রয়েছে। যেমন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের বিপরীত ও তাফসীরের প্রতিই নিজের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে, যুলকারনাইন এই উক্তি দ্বারা কেয়ামতের কোনো নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল না।

বরং তিনি একটা সাধারণ অর্থে প্রচলিত একটি কথা বলতে চেয়েছিলেন যে, যখন আমার পালনকর্তার হুকুম হবে তখন দেয়াল ভেঙ্গে যাবে। কেয়ামতের পূর্বে ইয়াজূয-মাজূযের বের হবার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীম অন্যত্র যে আলোচনা করেছে, দেয়াল ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।[৫৫৫]

কিন্তু যেমনটি পেছনে বলা হয়েছে যে, ধারণানির্ভর দলীলসমূহের স্তর বিন্যাস অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্মতর এবং এর জন্য নকলী ও আকলী দলীলের ইলমে বাস্তব দৃঢ়তা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও দক্ষতার প্রয়োজন। অতএব, এ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সতর্কতা, প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা ও আল্লাহভীতির সাথে কাজ করতে হবে। সমকালীন কোনো মতবাদের চাকচিক্য প্রভাবিত হয়ে তড়িঘড়ি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোমরাহীর দিকে ধাবিত করে।

এই হলো আকলী দলীল ও নকলী দলীলের মাঝে দ্বন্দ্বের সময় সঠিক করণীয় পদ্ধতি। যেটাকে পূর্ববর্তী সকল উলামায়ে কেরামের গ্রহণীয় পদ্ধতি ছিল এবং যার যুক্তিগ্রাহ্যতার উপর কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না।

তৃতীয়ঃ. শরঈ বিধি-বিধান ও আকল (যুক্তি) احکام شرعیہ اور عقل-

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের একটি নিকৃষ্টতম পদ্ধতি হচ্ছে যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট শব্দাবলী থেকে যেসব শরঈ বিধান সাব্যস্ত হচ্ছে, সেগুলোকে শুধু এ অজুহাতে অস্বীকার করা যে, এর মূল হেকমত ও রহস্য আমাদের বোধগম্য হয়নি।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দাপটে এই ভয়াবহ মহামারী ব্যাপকরূপ ধারণ করেছে যে, যে সব শরঈ বিধি-বিধানের উপর চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করে আসছিল এবং পবিত্র কুরআনুল কারীম বা হাদীসে নববীর মাধ্যমে যেগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত রয়েছে, সেগুলো কতক লোকের মেজাজ ও উপলব্ধি বিরুদ্ধ মনে হচ্ছে। আর তাই

---

৫৫৫. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) কৃত : "আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতী ঈসা (আ.)" পৃঃ ১৯৭, এবং মাওলানা ইউসুফ বিননূরী (রহ.) কৃত : "নফহাতুল আম্বর" পৃঃ ১৫৮ ও "কাসাসুল কুরআন"।

সূচিপত্র

কুরআন ও সুন্নাহ'র যেসব 'নস' বা বক্তব্য দ্বারা তা প্রমাণিত, সেগুলোতে তারা অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির দরজা খুলে দেয়। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলে যে, আমাদের এ বর্তমান যুগে এই শরঈ বিধানগুলো (নাঊযুবিল্লাহ) হেকমত পরিপন্থী! যেমন চুরির শাস্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট বিধান হলো–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

'আর পুরুষ চোর এবং নারী চোর, উভয়ের হাত কেটে দাও।'

পাশ্চাত্যের লেখক সমাজ দীর্ঘকাল থেকে ইসলামের এই নির্ধারিত শাস্তিগুলোর উপর আপত্তি করে আসছে এবং চোরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে হাত কর্তনের এই শাস্তিকে অত্যন্ত কঠোর মনে করছে। এমনকি (নাঊযুবিল্লাহ) তারা এটাকে বর্বরোচিত বলে আখ্যায়িত করছে। তাই ইসলামী বিশ্বের কতিপয় প্রগতিবাদী, যারা পাশ্চাত্যের প্রতিটি অভিযোগের জবাবে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে সদা প্রস্তুত থাকে তারা এখন এ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আছে যে, কিভাবে ইসলামের নির্ধারিত এই শাস্তিগুলোতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে পাশ্চাত্যের মুরুব্বীদের সন্তুষ্ট করা যায়! আর এ লক্ষ্যেই তারা সূরা নূর-এর উল্লিখিত আয়াতে টানা-হেঁচড়া করে অপব্যাখ্যার চেষ্টা করতে থাকে।

এ সমকালীন একজন লেখক তো নিজের এক প্রবন্ধে এমন কথাও লিখে দিয়েছেন যে, উল্লিখিত আয়াতে "চোর" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,"পুঁজিপতি"। আর তার হাত কেটে দেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার শিল্প-কারখানা জব্দ করে নেওয়া। আর এই আয়াতে চোরের শাস্তি বর্ণনা করা হয়নি। বরং পুঁজিপতিদের সকল শিল্প-কারখানা জাতীয় কোষাগারে জমা করার কথা বলা হয়েছে!

এই অবস্থাই হলো ওই সকল লোকের, যারা সুদ, জুয়া, মদ ইত্যাদির কোনো না কোনো প্রকারকে বৈধ সাব্যস্ত করার চিন্তায় মগ্ন থাকে। আর নিজেদের এসব কর্মকান্ডের সমর্থনে তারা কথা বলে যে, বিবেক-বুদ্ধির আলোকে বর্তমান যুগে এগুলোর অবৈধ হবার কারণ আমাদের বুঝে আসে না। তাই এখানে মৌলিকভাবে এটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, শরঈ বিধি-বিধান ও বিবেক-বুদ্ধির মাঝে কি সম্পর্ক? শরঈ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগমাত্রা কতটুকু? এবং এর সীমারেখা কি?

বাস্তব কথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান সুষ্ঠ বিবেকের সম্পূর্ণ অনুকূলে। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অনস্বীকার্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত করা যায় যে, মানবতার সংস্কার ও সফলতার জন্য এর

সূচিপত্র

চেয়ে উত্তম ও সেরা আর কোনো পথ হতে পারে না। তবে এ আলোচ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট যেসব ভুল বুঝাবুঝি পাওয়া যায়, সেগুলো যেহেতু কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, তাই এখানে এ আলোচনাকেও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। নিম্নে আমরা ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা আলোকপাত করছি।

এ ভূমিকাগুলো ভালোভাবে আত্মস্থ হয়ে যাওয়ার পর ভালো ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে। তবে যারা এ বিষয়টির সন্তোষজনক তাহকীক ও গবেষণা করতে চান, তাদের প্রতি অনুরোধ যে, তারা যেন এ আলোচনার কোনো একটি অংশ দেখেই দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। বরং সমগ্র আলোচনা ও তার সকল ভূমিকা ধীর-স্থিরভাবে অনুসন্ধিৎসু গভীর দৃষ্টি ও মনোযোগের সাথে একবার পাঠ করেন। (মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই হেদায়াত ও তাওফীকের মালিক)

آزاد عقل اور ہدایت و گمراہی؟

১. স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি এবং হেদায়াত ও গোমরাহী ঃ

যেমনটি পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র কোনো বিধান সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত নয়। তবে এ দুনিয়ায় প্রত্যেকের বিবেক-বুদ্ধি অন্যজনের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে, সবার সমপর্যায়ের থাকে না; বরং কম-বেশি হয়। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি নির্ণয় করতে হবে যে, ভালো-মন্দের পার্থক্যের জন্য কোন্ ধরনের বিবেক-বুদ্ধিকে ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করা যায়?

যদি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়ন ওই নিছক আকল ও বিবেকের ভিত্তিতে করা হতে থাকে, যা দ্বীনের সব ধরনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত, তাহলে পৃথিবীতে এক অরাজকতার প্রলয়কান্ড বিরাজ করবে। যার উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ মানবতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, যদি মানব-বিবেককে সব ধরনের বাধ্য-বাধকতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে তার দ্বারা শাশ্বত চারিত্রিক অনুশাসন ও মানবীয় মূল্যবোধগুলোও প্রমাণ করা যাবে না, যা একটি ভদ্র শিশুও সঠিক বলে মনে করে। যেমন, নিজের আপন বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াটা এতই চরম ঘৃণিত অপরাধ যে, কোনো ধর্ম ও জাতির মাঝে তা পছন্দ করা হয় না।

এমনকি একজন কট্টর নাস্তিকও এটাকে ঘৃণার চোখে দেখে। কিন্তু আপনি যদি নিছক বিবেক ও মুক্তবুদ্ধির ভিত্তিতে এই জঘণ্য অপকর্মটিকে অবৈধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি কক্ষনো তা পারবেন না। কারণ নিছক বিবেক ও মুক্তবুদ্ধির ভিত্তির উপর এই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয় যে, একজন বোন তার ভাইয়ের আরাম-আয়েশের জন্য রান্না-বান্না করতে পারে, তার শোয়ার

সূচিপত্র

জন্য বিছানা-পত্র গুছিয়ে দিতে পারে, তার কাপড় সেলাই করে দিতে পারে, তার সকল প্রয়োজন পুরো করে দিতে পারে। সে অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে।

মোটকথা, নিজের ভাইয়ের আরাম-আয়েশের জন্য সে এ ধরনের যত খেদমতই করে, সমাজ এটাকে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং তার প্রশংসা করে। কিন্তু এই বোন-ই যদি নিজের ভাইয়ের জৈবিক চাহিদা মিটানোর জন্য নিজেকে পেশ করে, তাহলে গোটা দুনিয়া তার প্রতি অভিসম্পাৎ ও ভর্ৎসনার বৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যদি প্রত্যেকটি বিষয়ের মীমাংসার ভার লাগামহীন মুক্ত বিবেক-বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করা হয়, তাহলে তা সঙ্গত কারণেই নিজ অবস্থান থেকে এই প্রশ্ন করতে পারবে যে, একজন ভাই যদি তার বোনের কাছ থেকে সব ধরনের আরাম আয়েশ হাসিল করতে পারে, তাহলে জৈবিক চাহিদা ও দৈহিক সুখ-সম্ভোগ তার কাছ থেকে হাসিল করতে বাধা কেন? এ প্রশ্ন চরিত্র এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রসম-রেওয়াজ ও মূল্যবোধের সীমারেখার দৃষ্টিতে অত্যন্ত আকস্মিক; বরং চরম ঘৃণ্য বলে অনুভূত হয়।

কিন্তু যে বিবেক-বুদ্ধি কোনো ধরনের বাধ্য-বাধকতার অনুগত না হয়, তাকে আপনি এ কথা বলে শান্ত করতে পারবেন না যে, এটা চারিত্রিক ও নৈতিকতার দিক থেকে চরম নিকৃষ্ট ও হীন কাজ। তখন প্রশ্ন হবে যে, নির্ভেজাল বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে এতে দোষের কি আছে? আপনি এর জবাবে বলবেন যে, এতে বংশ সংমিশ্রণের ফেতনা সৃষ্টি হবে।

কিন্তু প্রথমতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের এ যুগে এ ধরনের জবাবের কোনো অর্থই হয় না। আর দ্বিতীয়তঃ যদি এর দ্বারা বংশ সংমিশ্রণ ঘটেই যায়, তাহলে নির্ভেজাল বিবেক-বুদ্ধির ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণ করুন যে, বংশ মিশ্রণ দূষণীয় বিষয়। কারণ সেখানেও বিবেক ও মুক্তবুদ্ধি বলে উঠবে, বংশ সংমিশ্রণকে মন্দ ও দূষণীয় বলাটা ধর্ম ও নৈতিকতার কারিশমা। আর যে বিবেক-বুদ্ধি ধর্ম ও নৈতিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, তার জন্য কোনো মন্দকে মন্দ হিসেবে প্রমাণ করার করতে হলে নিরেট ও বিশুদ্ধ কোনো আকলী বা বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের প্রয়োজন।

আপনি বলবেন যে, এটা চরম লজ্জাহীন কাজ। কিন্তু নিরেট বিবেক ও মুক্তবুদ্ধি এর জবাবে বলবে, 'লজ্জা' ও 'লজ্জাহীনতা' এসব দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম, নৈতিকতা ও সমাজের সৃষ্ট। নতুবা বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটা আশ্চর্যকর বিষয় যে, একজন নারী সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ব্যক্তির নিকট তার দেহ সোপর্দ করলে এটা হয় "লজ্জাশীলতা" আর যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সাহচর্যে থেকে সে বেড়ে উঠেছে, তাকে দেহ সোপর্দ করলে হয়

সূচিপত্র

"লজ্জাহীনতা"?....আপনি বলবেন, মানবীয় স্বভাব-রুচি এটাকে গ্রহণ করে না। মুক্তবুদ্ধি এর জবাবে বলবে, স্বভাব-রুচি বিরুদ্ধ হবার আকলী বা যুক্তিযুক্ত দলীল কি? বস্তুত এটা মন্দ ভাবার কারণ হলো, শতাব্দীকাল থেকে মানুষ এটাকে মন্দ বলে আসছে। আজ যদি সমাজের বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত বিবেক দ্বারা চিন্তা করা হয়, তাহলে এতে দোষের কি আছে? ফলকথা, নিছক বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আপনি কেয়ামত পর্যন্ত এ প্রশ্নের সমাধান করতে সমর্থ হবেন না।

আর এই প্রশ্ন কোনো কল্পিত বিষয় নয়। বরং আজকের লাগামহীন মুক্তবুদ্ধি চর্চা তো এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপন করেই রেখেছে। প্রাচীনকালেও কেউ যখন্ কোনো নিছক বিবেক ও মুক্তবুদ্ধির মাধ্যমে কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে, তখন সর্বদা সে এই বুদ্ধিভিত্তিক প্রশ্ন-উত্তরের মার-প্যাঁচে ফেঁসে গেছে।

বিশ্বাস না হলে বাতেনী ফেরকার জীবন-গ্রন্থ অধ্যয়ন করে দেখুন। এ ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ নেতা উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান

স্বীয় গ্রন্থ "السياسة والبلاغ الاكيد والناموس الاعظم" (আস-সিয়াসাতু ওয়াল বালাগুল আকইয়াদ ওয়ান-নামূসুল আ'যম)-এ লিখেছে–

"এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, মানুষ বিবেক-বুদ্ধির দাবীদার হয়েও এ রকম নির্বোধের ন্যায় কাজ করে যে, তার কাছে একজন রূপসী ও সুন্দরী বোন বা মেয়ে থাকে। অথচ স্বয়ং তার স্ত্রীও এত সুন্দরী নয়। এতদসত্ত্বেও সে নিজের বোন ও মেয়েকে নিজের জন্য হারাম মনে করে। এদেরকে একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করে দেয়। যদি এই মূর্খ নিজের বিবেককে কাজে লাগাতো, তাহলে সে অনুধাবন করতে পারতো যে, একজন অচেনা লোকের পরিবর্তে নিজের বোন ও মেয়েকে ভোগ করার অধিকার তার বেশি ছিল। মূলতঃ এ অজ্ঞতার সার্বিক কারণ হলো, এদের দিক-নির্দেশক তাদের জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে হারাম করে দিয়েছেন!"[৫৫৬]

এই চরম ঘৃণিত বক্তব্যের প্রতি যত ইচ্ছে ধিক্কার দিন এবং অভিসম্পাৎ করুন। কিন্তু সাথে সাথে বুকে হাত রেখে বলুন, নিছক মুক্ত বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আপনি এই দলীলের কোনো জবাব দিতে পারবেন? বাস্তব কথা হলো, দুনিয়াজুড়ে যে বিবেক-বুদ্ধিপূজারী দল সকাল-সন্ধ্যা লাগামহীন

---

[৫৫৬]. "আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক" পৃঃ ২৯৭ আবদুল কাহের আল-বাগদাদী রচিত।

সূচিপত্র

মুক্তবুদ্ধির স্লোগান দিতে থাকে, তারা যদি সকলে মিলে এই অভিযোগের বুদ্ধিভিত্তিক জবাব দিতে চায়, তবুও কেয়ামত পর্যন্ত তারা সক্ষম হবে না।

আর এখানে মজার ব্যাপার হলো, এই উবায়দুল্লাহ কাইরাওয়ানী, যার বক্তব্য উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে– সে সরাসরি কুরআনকে অস্বীকার করতো না। বরং অন্যান্য বাতেনীদের ন্যায় বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে পবিত্র কুরআনুল কারীমে তাভীল ও জটিল ব্যাখ্যা করতো। আর সে দাবী করত যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের যে অর্থ বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে, প্রকৃতপক্ষে তা উদ্দেশ্য নয়।

এগুলো সবই রূপক, উপমা, উদাহরণ ও সাদৃশ্য–যার প্রকৃত অর্থ অন্য কিছু। অনুরূপভাবে আপনি যদি ব্যভিচারের অবৈধতা মুক্তবুদ্ধি ও নিছক বিবেক দ্বারা প্রমাণ করতে চান, তাও পারবেন না। কেননা মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি এই প্রশ্ন করতে পারে যে, যদি একজন পুরুষ ও একজন নারী পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে চায়, তাতে দোষের কি আছে? আর এর ভিত্তিতেই পশ্চিমা আইনে পারস্পরিক স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কেননা ওই আইন প্রণেতাদের বিবেক-বুদ্ধিগত দৃষ্টিতে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মাঝে কোনো অপরাধ পরিলক্ষিত হয় না। বরং এই কিছু দিন পূর্বে বৃটিশ আইন প্রণয়ন বিভাগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে তুমুল হাততালির সাথে সমকামিতায় (Homo Sexuality) লিপ্ত হওয়া আইনতঃ বৈধ বলে রায় দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের পেছনেও কারণ একটাই যে, নিছক মুক্ত বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাজে শাস্তিযোগ্য কোনো বিষয় নজরে আসেনি।

আর এটা কোনো অসাধারণ কথা নয় যে, মানব মস্তিষ্ক-রচিত আইন-কানুনের এটা অনিবার্য বৈশিষ্ট্য যে, মানবতার সঠিক তত্ত্বাবধান করে তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করতে সর্বদাই ব্যর্থ থাকে। আর এর মাধ্যমে মানুষ বিবেক-বুদ্ধির নামে এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় যা অত্যন্ত লজ্জাকর।

এর কারণ হলো, "নিছক আকল-বুদ্ধি"কেই আইন তৈরির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। এ দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষের আকল-বুদ্ধি অপরজনের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। কালের কোনো প্রচলিত রীতি সমকালীন সকলকেই একটি কাজের ভালো বা মন্দের উপর একমত করলেও পরবর্তী কালের আকল-বুদ্ধি ওই কাজটির ব্যাপারে ভিন্ন কোনো মত পেশ করে। কারণ আকল ও বিবেক-বুদ্ধির কাছে সর্বজনস্বীকৃত এমন কোনো মানদন্ড নেই, যার ভিত্তিতে (Values) মান-পরিমাণ নির্ণয় করে সেটার আলোকে কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে।

সূচিপত্র

আর এ কারণেই বর্তমান যুগের আইন বিশারদগণও বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হাজারো দাবী করা সত্ত্বেও বছরের পর বছর আলোচনা করে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, আইন প্রণয়নের এই মৌলিক বিষয়টি আমরা এখনো নির্ণয় করতে পারিনি যে, কোনো বস্তুকে ভালো বা মন্দ বলার জন্য কি মানদণ্ড নির্ণয় করা উচিত? বর্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ আইন বিশারদ ড. প্যাটন (Dr.George Whitecrou paton) এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বীয় গ্রন্থ 'উসূলে কানুন' (আইন প্রণয়ন বিধিমালা)-এ লিখেন–

"একটি আদর্শিক আইন তৈরির বিধিমালায় কোন্ ধরনের কল্যাণ ও স্বার্থের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক? এটা এমন একটা প্রশ্ন, যার সমাধানে আইনের দর্শনকে নিজের দায়িত্ব আদায় করতে হয়। মৌলিকভাবে এটা একটা "প্রাকৃতিক আইন" (Natural Law)-এর বিষয়। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব আমরা দর্শনশাস্ত্র থেকে যতটুকু লাভ করতে চাই, হুবহু ততটুকু জবাব দর্শন থেকে লাভ করা মুশকিল ব্যাপার। কারণ এখন পর্যন্ত আইনগত ভারসাম্যতার সর্বজন স্বীকৃত কোনো মাপকাঠি আমাদের হস্তগত হয়নি। আসল কথা হলো, একমাত্র ধর্মই এমন বিষয় যার মধ্যে এ ধরনের ভিত্তি পাওয়া যেতে পারে। তবে ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাস কিংবা মেধার মাধ্যমে মেনে নেওয়া আবশ্যক। শুধুমাত্র তর্কশাস্ত্রের দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির জোরে নয়।"[৫৫৭]

সামনে গিয়ে এই লেখকই ওই সব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন, যা আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য, এর দর্শনতত্ত্ব ও এর নীতিগত ভিত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো এতই মতবিরোধপূর্ণ যে, জর্জ প্যাটন লিখেন–

"আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমাণ এত অসংখ্য যে, তা আলোচনা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত লেখকদের সম-পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এমন লেখক পাওয়া খুবই মুশকিল, যিনি আইনের কোনো আদর্শিক উদ্দেশ্য রচনা করেনি।"

একটু পরে গিয়ে তিনি আরো বিস্তারিতভাবে বলেন যে, এ আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যেক যুগের আইন বিশারদগণ বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার ছোটাছুটিতে প্যাঁচিয়ে যাওয়া একটা রশিকে কিভাবে আরো বেশি প্যাঁচিয়ে তুলেছেন! পরিশেষে তিনি লিখেন–

---

[৫৫৭]. Paton. Jurisprudence. 34rd ed. 1967 p. 121

"The orthodox natural law theory based its absolutes on the revealed truths of religion. If we attempt to secolarize jurisprudence, where can we find an agreed basis of vlues?" (p. 126)

"প্রকৃতভাবে আইনের দৃষ্টিভঙ্গি স্বীয় ব্যাপৃত নীতিমালার ভিত্তি ধর্মীয় সত্য-তত্ত্বের উপর থাকত। আমরা যদি আইন প্রণয়নের বিধিমালাকে ধর্মহীন বানানোর চেষ্টা করি তাহলে (ভারসাম্য) মান-পরিমাণের সর্বসম্মত ভিত্তি আমরা কোথা থেকে লাভ করব?"

সারকথা হলো, যদি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত ওহীর দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে শুধু বিবেক-বুদ্ধিকে মা-বাপহীন মুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার কোনো ভিত্তি আর অবশিষ্ট থাকে না। মানুষকে গোমরাহী ও নির্বুদ্ধিতার এমন এমন অন্ধকার গুহায় নিয়ে নিক্ষেপ করে, যেখানে হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনার সামান্যতম কিরণচ্ছটারও ঝলক পড়ে না। কারণ এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ওহীকে বাদ দিয়ে মানুষ যখন নিছক আকল ও বিবেক-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে, তখন সে এটাকে মুক্তবুদ্ধি মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে থেকে যায়। যা আকল-বুদ্ধির দাসত্বের নিকৃষ্টতম রূপ। যারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিছক আকল-বুদ্ধির অনুসরণের দাবী করে থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত পর্যায়ের আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত রয়েছে। তাদের তুলনায় ওই সকল লোক অধিক সত্যানুসন্ধানী ও সাহসী, যারা স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে বলে যে, আমাদের আকল-বিবেক মুক্ত ও লাগামহীন নয়। বরং আমাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের দাস। আইন দর্শনের আলোচনায় আধুনিক চিন্তাবিদদের একটি দলের উল্লেখ করা হয়। যাদের দর্শন Noncognitivist Ethical Theory-নামে প্রসিদ্ধ আছে। বর্তমান যুগের বিখ্যাত আইন বিশারদ ড. ফ্রয়েডম্যান-এর ভাষায় এ দর্শনের সারকথা হচ্ছে–

"Reason is and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office than to serve and obey them."

"আকল ও বিবেক-বুদ্ধি মূলত মানবিক আবেগের দাস। আর তা আবেগের দাস হওয়াটা উচিতও বটে। এর কাজ এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না যে, তা ওইসব আবেগের সেবা ও আনুগত্য করতে থাকবে।"

এ দর্শনের পরিণাম ফল বর্ণনা করতে গিয়ে ড. ফ্রয়েডম্যান লিখেন–

সূচিপত্র

"আর এটা ব্যতীত প্রত্যেকটি জিনিস যেমন, 'একটি সাধারণ বিধান', 'লজ্জা-শরম', বরং 'ভালো-মন্দ' জাতীয় কল্পনা, 'অমুক কাজটি হওয়া উচিত' এবং 'অমুক কাজটি এর উপযুক্ত'–এ ধরনের শব্দাবলী নিছক মনস্কামনা ও আবেগেরই ফসল। আর ইলমে আখলাক বা নৈতিক জ্ঞানের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই।"[৫৫৮]

তাদের এই দর্শন ভালো নাকি মন্দ? এ আলোচনা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে লক্ষ্য করুন। তারা কিন্তু একেবারে সত্য কথাই বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ওহীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর বিবেক-বুদ্ধি ও নৈতিকতা নামের কোনো জিনিসের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। এরপর মানুষের অস্তিত্ব এবং আমল ও কর্মকা-ের উপর নিছক তার আবেগ ও প্রবৃত্তির শাসন চলতে থাকে। এই আবেগ ও প্রবৃত্তি তাকে যেখানেই নিয়ে যেতে চায়, সেখানেই যেতে সে বাধ্য। অতঃপর মানুষের হৃদয় যদি কোনো বিষয়কে গ্রহণ নাও করে, তবু প্রবৃত্তি রোধ করার মতো তার কাছে নির্দিষ্ট কোনো ভিত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

যেমন, বৃটেনে সমকামিতাকে সাংবিধানিক বৈধতা এমন অসহায় অবস্থায় দেওয়া হয়েছিল যে, প্রদানকারী পর্ষদের কোনো কোনো সদস্যের হৃদয়ও সেটার উপর সন্তুষ্ট হতে পারছিলনা। কিন্তু প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর বিবেক-বুদ্ধির কাছে এ চাহিদাকে রোধ করার জন্য কোনো অবলম্বন ছিল না। এ বিষয়টির উপর চিন্তা-গবেষণা করার জন্য Wolfenden Committee গঠন করা হয়েছিল এবং যাদের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে এসেম্বলীতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, ওই প্রতিবেদনের এই বাক্যগুলো কতইনা দৃষ্টান্তমূলক–

"যতক্ষণ পর্যন্ত আইনের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধকারী সোসাইটি জেনে-বুঝে এবং চিন্তা-গবেষণা করে এ বিষয়ের চেষ্টা না করবে যে, সমাজের মধ্যে অপরাধের আশঙ্কা গোনাহের আশঙ্কার সমান হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত চরিত্র ও নৈতিকতা বিরোধী চিন্তা-গবেষণার কর্তৃত্ব বাকি থাকবে। যা সংক্ষিপ্ত, তবে পরিষ্কার ভাষায় আইন বহির্ভূত।"[৫৫৯]

কিন্তু পবিত্র কুরআনুল কারীম, যা মানবতাকে প্রবৃত্তির অন্ধপথে দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য নয়; বরং হেদায়াতের পরিচ্ছন্ন ও সরল পথ প্রদর্শনের জন্য এসেছে এবং যা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, মানবের প্রকৃতিতে ভালো ও মন্দ উভয়ের চাহিদা ও প্রবৃত্তি সুপ্ত রাখা আছে– ওই কুরআন তার অনুসারীদেরকে এই ভয়াবহ অন্ধকার পথে ছেড়ে দিতে পারে

---

[৫৫৮]. Friedmann : Legal Theory, London 1967. P. 36, 37

[৫৫৯]. Friedmann : Legal Theory, London 1967 P. 46

সূচিপত্র

না। কুরআনের পরিভাষায় ওহীর অনুসরণমুক্ত বিবেক-বুদ্ধির নাম হচ্ছে,...(হাওয়া)। যার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মাজীদের ঘোষণা হচ্ছে এই–

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

'সত্য যদি তাদের ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার অনুসারী হত তাহলে আকাশ পৃথিবী আর এ দু'য়ের মাঝে যা আছে সব লন্ডভন্ড হয়ে যেত।' [৫৬০]

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم (14)

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত যার কাছে তার মন্দ কর্ম সুশোভিত করা হয়েছে আর তারা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে।' [৫৬১]

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)

'আর আপনি ওই ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।' [৫৬২]

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ (16)

'অতএব, যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন কিছুতেই তাতে ঈমান আনয়নে আপনাকে বাধা দিতে না পারে; অন্যথায় আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।' [৫৬৩]

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

'আর আল্লাহর দিক-নির্দেশনা ব্যতীত যে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?' [৫৬৪]

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ

'সুতরাং আপনি দাওয়াত দিতে থাকুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।' [৫৬৫]

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ

---

[৫৬০]. সূরা মুমিনূন : ৭১
[৫৬১]. সূরা মুহাম্মদ : ১৪
[৫৬২]. সূরা কাহাফ : ২৮
[৫৬৩]. সূরা ত্বহা : ১৬
[৫৬৪]. সূরা কাসা : ৫০
[৫৬৫]. সূরা শুরা : ১৫

সূচিপত্র

'তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ।' [৫৬৬]

সারকথা, ইসলামের ভিত্তি ওই বিবেক-বুদ্ধির উপর নয়, যা কু-প্রবৃত্তির দাস। বরং ইসলামের ভিত্তি ওই বিবেক-বুদ্ধির উপর, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত হেদায়াতের অনুসারী এবং আপন সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। আর এটাই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সংজ্ঞা।

2-اسلامی احکام کی حکمتیں اور دین میں ان کا مقام

২. ইসলামী আহকামের হেকমত এবং দীনের মধ্যে সেগুলোর অবস্থান

আমাদের উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা দ্বীনের মাধ্যমে যেসব বিধি-বিধান প্রদান করেন, [নাঊযুবিল্লাহ] সেগুলো বিবেক ও হেকমত পরিপন্থী। বরং প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সকল বিধি-বিধান সুস্থ বিবেকের সম্পূর্ণ অনুকূলে। আর অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী যে, সার্বিক কল্যাণ ও সফলতার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো মাধ্যম হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এই বিধানের প্রতিটি নির্দেশেই সুপ্ত রয়েছে অসংখ্য হেকমত, কল্যাণ ও মানবতার উপকার-উপকরণ। কিন্তু এটা আবশ্যক নয় যে, আমাদের সীমিত বিবেক-বুদ্ধি ওই সকল হেকমত ও কল্যাণকে জ্ঞানের আওতায় পরিবেষ্টন করতে সক্ষম হবে।

এটা একেবারেই স্পষ্ট কথা যে, বিশ্ব জগতের ওই মহান স্রষ্টা, যার সামনে রয়েছে পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর যাবতীয় বস্তুরাজি এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সকল অবস্থা, তাঁর ইলম ও হেকমতকে পূর্ণ অনুধাবন করা কার পক্ষে সম্ভব? অতএব, এটা একেবারেই সম্ভবপর যে, কুরআন ও সুন্নাহ'র কোনো বিধানের প্রকৃত হেকমত ও কল্যাণ আমাদের বুঝে আসবে না। কিন্তু কোনো বিধানের হেকমত বুঝে না আসার অর্থ কখনো এটা হওয়া উচিত নয় যে, সেই হুকুমটিকেই সঠিক বলে মেনে নেওয়া হবে না। কারণ মানুষ যদি নিজে থেকেই তার সকল প্রকার কল্যাণকর বিষয় বুঝতে সক্ষম হতো, তাহলে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের এবং আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করার কোনো দরকারই ছিল না। ওহী ও রিসালতের পবিত্র ধারা তো এজন্যই চালু করা হয়েছিল যে, এর মাধ্যমে মানুষকে এমন সব বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হবে, নিছক বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যেগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যদি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি, তাঁর অসীম কুদরত ও শাশ্বত জ্ঞানের প্রতি, তাঁর প্রেরিত

---

[৫৬৬]. সূরা বাকারা :৮৭

সূচিপত্র

নবী-রাসূলগণ ও তাঁর নাযিলকৃত গ্রন্থাবলীর প্রতি দৃঢ় ঈমান থাকে, তাহলে অবশ্যই এ কথাও মানতে হবে যে, তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি হুকুমের কল্যাণ-তত্ত্ব সর্বোতভাবে বুঝে আসা আবশ্যক নয়। যদি তাঁর কোনো বিধান আমাদের সীমিত দৃষ্টি ও বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত হয়, তাহলে সেটাকে মেনে নিতে অস্বীকার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা নয়।

এ বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝা যাক। পৃথিবীর যে কোনো দেশেই কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন আইন প্রণেতাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি আইনেরই কিছু কল্যাণ ও উপকারিতা থাকে এবং ওইসব কল্যাণগুলোর খাতিরেই আইন কার্যকর করা হয়। কিন্তু দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কি সে দেশের প্রতিটি আইনের সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কে অবগত থাকা অপরিহার্য? এটাই স্পষ্ট যে, দেশের অধিকাংশ নাগরিকই এমন পাওয়া যায়, যারা আইন ও তা মেনে চলার বাধ্য-বাধ্যকতার উপর নিহিত কল্যাণ সম্পর্কে কিছুই জানে না।

এখন কোনো দেশের যে আইন সে দেশের সেরা মেধাসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ সামগ্রিক কল্যাণকে সামনে রেখে প্রণয়ন করেছেন, সেটাকে কি শুধু এই ভিত্তিতে অযোগ্য ও ভুল বলা যেতে পারে যে, গ্রাম্য কতিপয় নিরক্ষর লোকের এই আইনের কল্যাণ ও উপকারিতা বুঝে আসেনি? যদি কোনো মূর্খ লোক শুধু এ জন্য কোনো আইন মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, এর কল্যাণ ও উপকারিতা আমার বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত, তবে জেলখানা ব্যতীত তার জন্য আর জায়গা কোথায়?

অতঃপর আইন বিশেষজ্ঞ এবং একজন মূর্খ মানুষের মধ্যে জ্ঞানের দিক থেকে যে কোনো না কোনো সম্পর্কের কল্পনা করা যায়, কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা এবং একজন ক্ষুদ্র মানুষের জ্ঞানের মাঝে তো কোনো সম্পর্কই কল্পনা করা যায় না। কাজেই একজন মানুষের জন্য এ কথাটি কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, সে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সরাসরি ও সুস্পষ্ট কোনো বিধানকে শুধু এ ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে বসবে অথবা তাতে কোনো জটিল ব্যাখ্যা বা বিকৃতি সাধনে লিপ্ত হবে যে, এর কল্যাণ ও উপকারিতা তার বুঝে আসছে না?

حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا

৩. শরঈ বিধান হেকমত ও কল্যাণের উপর নির্ভরশীল নয়ঃ

সর্বযুগেই আহলে ইলম-বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত থেকেছে যে, শরঈ বিধি-বিধানের নির্ভরতা ও স্থিতি তার হেকমতের উপর নয়। বরং তার ইল্লত বা কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল ও স্থিতিশীল।

সূচিপত্র

যেহেতু আমাদের এ যুগে বহুজনই ইল্লত (কার্যকারণ) ও হেকমত (কল্যাণ ও উপকারিতা)-এর রহস্য পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না, তাই এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এ দু'টির হাকীকত সম্পর্কেও জেনে নেওয়া আবশ্যক।

"علت ইলত"ওই বস্তুকে বলা হয়, যা কোনো আইনের অবশ্য পালনীয় হওয়ার জন্য অনিবার্য উপকরণ হয়। এ মর্যাদা এমন একটি অপরিহার্য চিহ্নের ন্যায়, যা দেখার সাথে সাথে আইনের প্রতি অনুগতদের জন্য ওই নির্দেশ পালন করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে "হেকমত" বলা হয় ওই কল্যাণ ও উপকারিতাকে যা আইন প্রণয়নের সময় আইন প্রণেতার দৃষ্টিতে থাকে। যেমন, পবিত্র কুরআনুল কারীম মদ নিষিদ্ধ হবার হুকুম দিয়েছে এবং "নেশা"কে নিষিদ্ধ হবার অনিবার্য চিহ্নরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাজেই যে জিনিসেই নেশা পাওয়া যাবে, তা-ই পান করা নিষিদ্ধ হবে। আর এই নিষিদ্ধ হবার পেছনে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। যার মধ্য হতে একটি হলো, মানুষ যেন মদ পান করে হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে এমন কাজে লিপ্ত না হয়, যা মানবীয় সম্মান ও গাম্ভীর্য বহির্ভূত।

এর উদাহরণে পবিত্র কুরআনুল কারীমের ইরশাদ

(حث) "তোমরা মদ্যপান থেকে বেঁচে থাক" একটি নির্দেশ। আর "নেশা" হলো এই নির্দেশের ইল্লত বা কার্যকারণ। আর মানুষের হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে মন্দ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানো হলো এর "হেকমত"। এখন নিষিদ্ধতার হুকুমের নির্ভরতা ও স্থিতি হবে তার ইলত তথা নেশার সাথে। তাই যে কোনো বস্তুর মধ্যে নেশা পাওয়া যাবে, তাকেই হারাম বলা হবে। এই হুকুমের হেকমতের উপর তার স্থিতি হবে না।

সুতরাং কেউ যদি এ কথা বলে যে, আমি মদ পান করা সত্ত্বেও বিপথগামী হই না এবং হুঁশ-জ্ঞানও হারাই না, তাই আমার জন্য মদ পান করা বৈধ হওয়া উচিত। অথবা কেউ যদি এ কথা বলে যে বর্তমানে উন্নত উপকরণ আবিস্কৃত হয়েছে, যা মদের ক্ষতিকর দিকগুলোর হ্রাস করিয়ে দিয়েছে। বিপুল সংখ্যক মদ্যপায়ী মদ পান করা সত্ত্বেও হুঁশ-জ্ঞানের সাথেই নিজে কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়, তাই বর্তমানে মদ পান করা বৈধ হওয়া উচিত। তাহলে স্পষ্ট কথা হলো যে, তাদের এই আবেদন যৌক্তিক হলেও কর্ণপাতযোগ্য হবে না।

অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীস স্বীয় অনুসারীদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য এই হুকুম দিয়েছে যে, 'সফর' অবস্থায় পুরো সালাত আদায়ের পরিবর্তে 'কসর' করা। অর্থাৎ অর্ধেক সালাত আদায় কর। এই উদাহরণে 'কসর' একটি হুকুম। 'সফর' তার 'ইল্লত' বা কার্যকারণ। আর 'কষ্ট হতে বাঁচানো' তার হেকমত। তাই হুকুমের স্থিতি ও নির্ভরতা তার ইল্লত তথা সফরের উপর

সূচিপত্র

হবে। হেকমতের উপর নয়। অতএব, এখন যদি কেউ বলতে শুরু করে যে, বর্তমানে বিমান এবং ট্রেনের বিলাসবহুল রুম সফরকে সহজ করে দিয়েছে এবং এখন আর পূর্বেকার ন্যায় কষ্টকর অবস্থা নেই। তাই বর্তমানে কসরের বিধানও অবশিষ্ট নেই! তাহলে তার এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, হুকুমের ইল্লত ও কার্যকারণ দেখে এর উপর আমল করা। হুকুমের হেকমত ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে হুকুম পালন করা আমাদের কাজ নয়।

আর এই নিয়ম শুধু ইসলামী শরীয়তে আছে এমনটি নয়; বরং বর্তমান সময়ে প্রচলিত আইনেও এই নিয়ম চালু রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সরকার এই ট্রাফিক আইন চালু করেছে যে, যখন কোনো চৌরাস্তায় লাল সিগন্যাল জ্বলে উঠবে, তখন সব ধরনের গাড়ির জন্য থেমে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। এই উদাহরণে গাড়ি ও যানবাহনের জন্য "থেমে যাও" হুকুমটি একটি আইন। "রেড সিগন্যাল" এই আইনের ইল্লত বা কার্যকারণ। আর "যানজট ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা এড়ানো" এই আইনের হেকমত। কাজেই এই আইনের স্থিতি ও নির্ভরতা হবে তার ইল্লত তথা "লাল সিগন্যাল"-এর উপর। এর "হেকমত" তথা যানজট ও দুর্ঘটনা এড়ানো"-এর উপর নয়। অতএব, যদি কখনো যানজট বা দুর্ঘটনার আশঙ্কা না থাকে, তবুও লাল সিগন্যাল দেখামাত্র থেমে যাওয়া অপরিহার্য হবে। কোনো চালক যদি এই ভেবে সিগন্যাল অতিক্রম করে যায় যে, তার দৃষ্টিতে কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই, তবে সে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

মোটকথা, প্রচলিত আইনেও হুকুমের স্থিতি ও নির্ভরতা সর্বদা তার ইল্লত ও কার্যকারণের উপরই হয়, হেকমতের উপর নয়। দুনিয়ার সাধারণ আইন-কানুনের ব্যাপারেই যখন এ রূপ, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার তৈরি আইন-কানুনে তো এই নিয়ম আরো অধিক মেনে চলা আবশ্যক। এর একটি কারণ তো এই যে, আমরা প্রত্যেকটি শরঈ বিধানের সকল হেকমত ও উপযোগিতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম নই। এ জন্য যদি আহকামের স্থিতি হেকমতের উপর রাখা হয়, তাহলে এমনটি হতে পারে যে, আমরা কোনো একটি উপকারকেই হুকুমের একমাত্র হেকমত মনে করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলব। অথচ এর অন্যান্য আরো বহু হেকমত রয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, হেকমত, কল্যাণ ও উপযোগিতা সাধারণতঃ এমন কোনো ধরা-বাঁধা, নিয়ন্ত্রিত ও সুস্পষ্ট বিষয় হয় না, যা দেখে যে কেউ এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এখানে এ হেকমত অর্জিত হচ্ছে নাকি হচ্ছে না? এখন যদি হুকুমের স্থিতি তার হেকমতের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে

সূচিপত্র

শরীয়তের কোনো আহকাম ও আইন-কানুন প্রয়োগ ও কার্যকরই হতে পারত না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই এ কথা বলতে পারত যে, আমি অমুক হুকুমের উপর আমল করিনি, কেননা তখন এর হেকমত পাওয়া যাচ্ছিল না। যেমন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি এই স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে, চৌরাস্তার মোড় অতিক্রম করার সময় সে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এখন দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে নাকি নেই? যদি আশঙ্কা থাকে তবে থেমে যাবে।

আর যদি আশঙ্কা না থাকে তবে সিগন্যাল পার হয়ে যাবে। তাহলে এর পরিণাম ফল চরম বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসলীলা ছাড়া আর কি হতে পারে? অনুরূপভাবে যদি মদ্যপানের নিষিদ্ধতাকে তার ইলত তথা নেশার পরিবর্তে তার হেকমতের উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই এ কথা বলতে পারে যে, মদ্যপানে আমার এমন নেশা হয় না, যা আমার হুঁশ-জ্ঞান বিলুপ্ত করে আমার স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এমতাবস্থায় মদ্যপানের নিষিদ্ধতার হুকুমটি স্রেফ একটি খেলার পুতুল ছাড়া আর কি ফলাফল প্রকাশ করতে পারে?

পক্ষান্তরে, আহকামের ইলত বা কার্যকারণ এমন ধরা-বাঁধা-সম্বন্ধযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয় যে, যে কেউ তা দেখে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, এখানে ইলত বা কার্যকারণ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, এর দ্বারা হুকুম অমান্য করার ক্ষেত্রে পাকড়াও করাটাও সহজ হতে পারে। আর এই ইলতের উপরই বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের নির্ভরতা ও স্থিতি সাব্যস্ত করেই শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আইন-কানুনের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

আর এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর উলামায়ে কেরাম ইসলামী বিধি-বিধানের হেকমত-কল্যাণ ও উপযোগিতাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য বিরাট-বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং প্রতিটি হুকুমের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেউ এ দাবী করেনি যে, তিনি ইসলামী বিধি-বিধানগুলোর সকল হেকমত পেয়ে গেছেন।

কেউ এমন বিভ্রান্তির চক্করেও পড়েননি যে, ভবিষ্যতে এগুলোর হেকমত ও উপযোগিতা প্রত্যক্ষ করেই হুকুমের উপর আমল করা হবে। যেমন, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ (حجة الله البالغة) "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ"-এর উদ্দেশ্যেই রচনা করেছিলেন যে, এর মাধ্যমে শরঈ-আহকামের হেকমতগুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে দিবেন। আর যারা শরঈ বিধানের হেকমতকে অস্বীকার করে তিনি কঠোরভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই তিনি লিখেন–

সূচিপত্র

لا يحل ان يتوقف فى امتثال الاحكام الشرع اذا صحت بها الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من الناس فى معرفة كثير من المصالح ولكون النبى صلى الله عليه وسلم اوثق عندنا من عقولنا ولذلك لم يزل هذا العلم مضنونا به على غير اهله

"এটা কখনো জায়েয নেই যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত শরঈ বিধি-বিধানের উপর আমল করার ব্যাপারে শুধু এ জন্যই দ্বিধা করা হবে যে, এগুলোর কল্যাণ ও উপকারিতা আমাদের জানা নেই। কারণ বহু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সেগুলোকে অনুধাবনে অক্ষম। এ ছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আমাদের বিবেক-বুদ্ধির চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য। আর এ কারণেই এই ইলমকে সর্বদা অনুপযুক্ত লোকদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।"[৫৬৭]

احکام شریعت کا اصل مقصد اتباع کا امتحان ہی۔

৪. শরঈ বিধি-বিধানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'অনুসরণের পরীক্ষা':

শরঈ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা অনুযায়ী মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য হলো, "মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার দাসত্ব।" ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।'[৫৬৮]

আর এই দাসত্বের পদ্ধতি তো পবিত্র কুরআনুল কারীম স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের মাঝে সীমাবদ্ধ। ইরশাদ হয়েছে–

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মান্য করে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করো না, তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর।'[৫৬৯]

يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ (21)

---

[৫৬৭]. হুজ্জাতুলাহিল বালেগাহ : ১/৬, এর আরো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা তাহকীকের জন্য দেখুন উক্ত গ্রন্থের ১//১২৯, 'আল-ফারকু বাইনাল মাসালিহি ওয়াশ শারাইয়ী' অধ্যায়।

[৫৬৮]. সূরা জারিআত : ৫৬

[৫৬৯]. সূরা আরাফ : ৩

সূচিপত্র

'হে আমার কওম! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর। তোমরা তাদের অনুসরণ কর, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না এবং তাঁরা সৎপথ প্রাপ্ত'।[৫৭০]

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم

'আর অনুসরণ কর সেসব উত্তম কথার, যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে।'[৫৭১]

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155)

'আর এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।'[৫৭২]

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ

'সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর।'[৫৭৩]

পবিত্র কুরআনুল কারীমই এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মানব সৃষ্টি করা ও তাকে বিভিন্ন আহকাম ও বিধি-বিধানে বেঁধে দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ পরীক্ষা নেওয়া যে, কে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে করে না।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম।[৫৭৪]

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ

'আর তুমি এ যাবৎ যে ক্বিবলার উপর ছিলে, তাকে এ উদ্দেশে ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পায়ের ভরে উল্টো দিকে ফিরে যায়।'[৫৭৫]

---

৫৭০. সূরা ইয়াসীন : ২০-২১
৫৭১. সূরা যুমার : ৫৫
৫৭২. সূরা : আনআম : ১৫৫
৫৭৩. সূরা আরাফ : ১৫৮
৫৭৪. সূরা মুলক : ২
৫৭৫. সূরা বাকারা : ১৪৩

সূচিপত্র

আর বান্দার কাজই যখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ এবং এর ভেতরেই তার পরীক্ষা। কাজেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের কোনো হুকুম আসার পর বান্দার কাজ হবে শুধু ওই হুকুমের সামনে নিজের মস্তক অবনত করে দেওয়া। তখন বান্দার আর এই অধিকার বাকি থাকে না যে, এ হুকুম তার পছন্দ হলে গ্রহণ করবে আর পছন্দ না হলে প্রত্যাখ্যান করবে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না।'[৫৭৬]

অতএব, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ও তাঁর রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ শ্রবণের পর যদি কোনো ব্যক্তি শুধু এই ভিত্তিতে সেটাকে মানতে গড়িমসি করে যে, এর হেকমত ও কল্যাণ তার বোধগম্য হচ্ছে না– তাহলে সে বিবেক-বুদ্ধির নয়; বরং তার কু-প্রবৃত্তি অথবা শয়তানের অনুসরণ করছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (3)

'মানুষের মধ্যে কতক লোক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।'[৫৭৭]

এসব লোক শুধু পরকালেই নয়; বরং দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ততার স্বীকার হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যারা শেষ সীমায় অবস্থান করে আল্লাহর 'ইবাদাত করে। অতঃপর তার কল্যাণ হলে, তা নিয়ে সে তৃপ্ত থাকে, আর কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে সে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে দুনিয়াতেও আর আখিরাতেও- এটাই হল স্পষ্ট ক্ষতি।'[৫৭৮]

সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতিটি নির্দেশের পেছনে যদিও অসংখ্য হেকমত-কল্যাণ ও উপযোগিতা থাকে, তবে বান্দার দায়িত্ব হলো, সে ওই হুকুমের আনুগত্যের আসল উদ্দেশ্য যেন তার হেকমত ও উপযোগিতাকে বানিয়ে না নেয়। বরং একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার আনুগত্য, তাঁর সন্তুষ্টি এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণই

---

৫৭৬. সূরা আহযাব : ৩৬
৫৭৭. সূরা হজ : ৩
৫৭৮. সূরা হজ : ১১

সূচিপত্র

যেন আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই যখন পবিত্র কুরআন মাজীদে সুদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হলো এবং এর উপর কাফেররা এই প্রশ্ন করেছিল–

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

'তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই।[৫৭৯]

এর জবাবে অনেক আক্‌লী ও যুক্তিযুক্ত দলীল-প্রমাণ পেশ করা যেত এবং ক্রয়-বিক্রয় এবং সুদের মধ্যকার লেন-দেনের মাঝে কি পার্থক্য তাও তুলে ধরা যেত, কিন্তু ওই সব যুক্তিগত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীম সেই একই ধরণের জবাব দিয়েছে–

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا'

আর আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।[৫৮০]

অর্থাৎ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যখন দু'টি বস্তুর মধ্য হতে একটি হালাল ও অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন; তখন আর তোমাদের জন্য আকলী বা যুক্তিযুক্ত দলীল তলব করার অবকাশ নেই। এ দু'য়ের মাঝে এ পার্থক্য কি তোমাদের জন্য কম যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ উভয় বিধানকে সমান ও এক রকম রাখেননি; বরং একটি জায়েয ও অপরটিকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন।

পবিত্র কুরআন মাজীদের বহু স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও ইবলীসের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ওই ঘটনায় এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, ইবলীস হযরত আদম (আ.) কে সাজদা করতে অস্বীকার করে এই দলীল পেশ করেছিল যে, (انا خير منه) "আমি আদম থেকে উত্তম"। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আগুন থেকে। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" চিন্তা করুন, নিরেট মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে এই দলীলে মন্দ কি ছিল? কিন্তু এই "আকলী-যুক্তিগত দলীল"ই তার বিতাড়িত হবার কারণ হয়ে গেল। আসল কারণ ছিল সেটাই যে, সরাসরি সুস্পষ্ট নির্দেশ এসে যাওয়ার পর এর বিপরীত বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির অনুসরণ মূলত আকল-বুদ্ধির নয়; বরং প্রবৃত্তির দাসত্ব। প্রাচ্যের বিখ্যাত কবি মরহুম আল্লামা ইকবাল এ কথাটিকেই অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন–

صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے

---

৫৭৯. সূরা বাকারা : ২৭৫

৫৮০. সূরা বাকারা : ২৭৫

সূচিপত্র

جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول

অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বদা প্রত্যুষে আমাকে বলেছেন, যে ব্যক্তি আকলের গোলাম। তাকে অন্তর দিয়ে কবুল করোনা।

৫. কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যার সঠিক নিয়মনীতি ঃ

আর যখন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত বিধি-বিধানের আনুগত্য করা, তাহলে এর সহজ-সরল পদ্ধতি হলো যে, কুরআন ও সুন্নাহ'র যে বিধান স্পষ্ট ও পরিষ্কার, সেটাকে তার স্পষ্ট অর্থেই গ্রহণ করা। এই স্পষ্ট অর্থটি আমাদের মন পছন্দ করছে না, শুধু এই অজুহাতে তাতে ভেঙ্গে-চুরে তাভীল ও বিকৃতির সাধন না করা চাই। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ আমাদের হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনার জন্য নাযিল করেছেন এবং এ জন্য নাযিল করেছেন যে, আমরা তার বিধি-বিধানকে শুধু নিজের আকল-বিবেক দ্বারা অনুধাবন করতে সক্ষম হতাম না। অতএব, আমরা যদি এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে দূর-দূরান্তের জটিল ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করি, তাহলে তা আল্লাহ পাকের বিধি-বিধানের নয়; বরং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে। আর এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্যই পাল্টে যাবে।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যাপারটা তো অত্যন্ত উঁচু স্তরের কথা। স্বয়ং মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত আইন-কানুনের অবস্থা হলো এই যে, যখন পার্লামেন্ট কোনো আইন পাশ করে ফেলে, তখন জজের জন্য ওই আইনের শাব্দিক ও সরাসরি অনুসরণ করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আইনটি ভুলও মনে হয়, তবু সে এর অনুসরণে বাধ্য। আর তার জন্য এ অবকাশও থাকে না যে, নিজের ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে আইনের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে, যা উক্ত আইনের শব্দাবলী ও বাক্যের সাথে অসামঞ্জস্যশীল ও দূর-দূরান্তের। বর্তমান আইন প্রণয়নের বিধিমালায় "আইনের ব্যাখ্যা" (Interpretation of Statutes) সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় থাকে। ড. জর্জ প্যাটনের ভাষায় উক্ত আলোচ্য বিষয়ের সারকথা হলো নিম্নরূপ–

"ইংরেজী মোকাদ্দমাসমূহে আইন ব্যাখ্যার তিনটি মূলনীতি প্রস্তাব করা হয়েছে। (১.) প্রথমটিকে বলা হয় শাব্দিক নীতি। এর অর্থ হলো, যদি কোনো আইনের ধারার বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়, তাহলে পরিণতি যা-ই হোক সর্বাবস্থাতেই সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সূচিপত্র

(২.) দ্বিতীয় মূলনীতিকে বলা হয় 'সোনালী নীতি'। এর সারকথা হলো, আইনের শব্দাবলীকে সর্বদাই তার প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করা হবে। যতক্ষণ না আইনের এই অর্থ গ্রহণ করায় আইনের নিরর্থকতা বা আইনের অবশিষ্ট ধারার সাথে স্পষ্ট কোনো বৈপরীত্য সৃষ্টি হবে।

(৩.) তৃতীয়টিকে বলা হয় 'বিপর্যয় নীতি' (Mischief Rule)। যা এ বিষয়ের উপর জোর দেয় যে, এই আইনের সাধারণ বিধিমালা কি? কি ধরনের অপরাধ সংঘটন করা তার লক্ষ্য?"

সামনে গিয়ে এই তৃতীয় মূলনীতিটির বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেন- "এই নীতিতে পার্লামেন্টের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের আনুগত্য করতে হবে। এ নীতি আমাদেরকে (আইনের শব্দ হতে) বেশি দূর যাওয়া অবকাশ দেয় না। কারণ এটা একটা সর্বসম্মত বিষয় যে (আইন ব্যাখ্যার সময়) পার্লামেন্টের ভেতরগত ইচ্ছার (Subjective Intention) প্রতি চিন্তা করা যায় না। বরং পার্লামেন্টের ইচ্ছা আবশ্যিকভাবে তার প্রণীত আইন থেকেই উদ্ঘাটন করা যায়।"[৫৮১]

এ হলো মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত আইনের অবস্থা।

এ ব্যাপারে প্যাটনের ভাষায় স্বয়ং আইন বিশারদদের স্বীকারোক্তি হলো এই যে"এ রকম মনে করা অতিরঞ্জন হবে যে, মানুষের প্রতিটি কাজের কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে। বরং এর পরিবর্তে অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা কোনো একটি কাজ আগেই করে ফেলি, চিন্তা করি পরে। আমাদের এই কর্মপন্থা শুধু ওই অবস্থার সাথেই নির্দিষ্ট নয়, যখন কোনো দ্রুত ঘটমান অবস্থায় স্বীয় জান বাঁচানোর জন্য লাফ দিয়ে থাকি। বরং যখন আমরা সামাজিক কোনো রসম-রেওয়াজের প্রচলন ঘটাই, তখনও আমরা এই কর্ম-কৌশল অবলম্বন করে থাকি। এমনকি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বা আইনের রূপ দেওয়ার সময় যুক্তিযুক্ত পলিসি পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, যে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে আইন তৈরি করা হয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে তা সে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থেকে ভিন্নতর হয়ে যায়।"[৫৮২]

.কিন্তু একজন বিচারকের জন্য এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, এ আইনের কাঠামো থেকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে না, তবু সে এ আইনের শাব্দিক আনুগত্য করতে বাধ্য। এতে দূর-দূরান্তের কোনো ব্যাখ্যা করার অধিকার তার নেই। চাই তার দৃষ্টিতে তার কৃত ব্যাখ্যা মূল লক্ষ্যের অধিক নিকটবর্তী হোক। প্যাটনের ভাষায়-

---

[৫৮১]. paton : A Tex Book of Jurisprudence P. 217.

[৫৮২]. প্রাগুক্ত : পৃ: ১১৯, অধ্যায় : ৫, অনুচ্ছেদ : ৩৬

সূচিপত্র

"কোথাও যদি অন্যায়সূলভ আইন-কানুন কার্যকর হয়, তবে আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান তা রহিত করতে পারে।

কিন্তু একজন বিচারকের জন্য এই আইনের আনুগত্য করা অপরিহার্য। চাই এই আইনের নীতি তার যতই পছন্দ হোক।"[৫৮৩]

কারণ জজ বা বিচারক মূলত আইন প্রণেতা নন। বরং তিনি আইনের ব্যাখ্যাকারী মাত্র। তার দায়িত্ব আইন প্রণয়ন করা নয়; বরং আইনের আনুগত্য করা। আর আনুগত্যের গন্ডিতে আবদ্ধ সীমারেখার ভেতরে থেকেই তিনি আইনের ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আনুগত্যের সীমালঙ্ঘন করে সংশোধন ও পরিমার্জন করার স্টেজে পৌছার অধিকার তার নেই।

এটাই হলো মানবরচিত আইনের দৃশ্যপট। যেখানে চিন্তাগত ভুল-ভ্রান্তির হাজারো সম্ভাবনা বিদ্যমান। যেখানে আইন প্রণেতাদের সততা ও বিশ্বস্ততা সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। না তাদের চিন্তা ও বুদ্ধিকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র বলা যায়। আর না এ কথারও কোনো নিশ্চয়তা আছে যে, বাস্তবিক পক্ষেই তারা এই আইনের সম্ভাব্য সকল ফলাফল ও পরিণতির উপর যথাযথ চিন্তা-ফিকির করেছেন।

এতদ্ব্যতীত মানব রচিত ও আইন-কানুন, যা আগামী দিনের ব্যাপারে জানে না যে, কি অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ে তার সূর্যোদয় ঘটবে? আর আইন প্রণেতাদেরও এ কথা তার জানা নেই যে, আমাদের প্রণীত ও আইন-কানুন দ্বারা আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিল হবে, নাকি হবে না?

যখন শুধু ধারণা ও অনুমানের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে প্রণীত আইনের আনুগত্যই এ পর্যায়ের অপরিহার্য হয়, তাহলে এই সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, যার সীমাহীন জ্ঞানে সৃষ্টি জগতের বিন্দু-বিসর্গও গোপন নেই, যিনি কালের সকল আবর্তন-বিবর্তন ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত, যিনি মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত– তাঁর প্রদত্ত আইনে শুধু নিজের পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে দূর-দূরান্তের তাভীল ও ব্যাখ্যা তালাশ করা কোন্ বিবেক-বুদ্ধি, কোন্ সততা ও কোন্ ইনসাফের দৃষ্টিতে ঠিক হবে?

ঙ. কালের বিবর্তন ও শরঈ আহকাম : زمانے کی تبدیلی اور احکام شرعیہ

এখানে আরো একটি ভুল বুঝাবুঝির অবসান করা প্রয়োজন। বর্তমানে এ কথাটি প্রায় প্রত্যেক "প্রগতিবাদী"র মুখে মুখেই উচ্চারণ হচ্ছে যে, কোনো জীবন বিধানই অপরিবর্তনীয় (Static) না থেকে অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল (Dynamic) হওয়া চাই। আর এটাই "প্রগতিশীল

---

[৫৮৩]. প্রাগুক্ত : পৃ: ২১১, অধ্যায় : ৯, অনুচ্ছেদ : ৪৯

সূচিপত্র

মানসিকতা"র বৈশিষ্ট্য যে, তার দৃষ্টিতে যখন কোনো জিনিস মন্দ প্রতিভাত হয়, তখন তা সর্বাবস্থায় আপাদমস্তক মন্দই হয়। আর যখন ভালো বলে প্রতিভাত হয়, তখন সর্বাবস্থায় আপাদমস্তক মন্দ বলেই বিবেচিত হয়। যত্রতত্র ইহার ব্যবহার একটি ফ্যাশনে রূপ নেয়। এই 'অপরিবর্তনীয়' (Static) এবং'পরিবর্তনশীল' (Danamic) দু'টি পরিভাষার অবস্থাও তাই।

প্রথমটিকে মন্দ বলা আর দ্বিতীয়টির প্রশংসা করা আজ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনো প্রগতিবাদীকে দেখবেন, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রেই 'অপরিবর্তনীয়' কথাটি শোনতেই তাদের ভ্রু-কুচকে উঠে। আর 'পরিবর্তনশীল' কথাটি শুনতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠে। এটা তাদের অভ্যাসের অংশে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে বড় বড় নৈতিক কিংবা ধর্মীয় নীতিমালাগুলো অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকতে পারেনি। বরং তারা জীবনের প্রতিটি বিষয়কেই পরিবর্তনশীলতার যাঁতাকলে পিষ্ট করে দিয়েছে। তাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে না কোনো ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস নিরাপদ থেকেছে আর না কোনো নৈতিক মূল্যবোধ সঠিক ও নিরাপদ থেকেছে।

অথচ বাস্তবতা হলো এই যে, প্রত্যেকটি জিনিসের সর্বাবস্থায় 'অপরিবর্তনীয়' থাকা যেমন মানবতার জন্য কল্যাণকর, তেমনি প্রত্যেকটি জিনিসের সর্বাবস্থায় 'পরিবর্তনশীল' হওয়াটাও কল্যাণকর নয়। এ দুনিয়ায় উত্তম জীবন যাপনের জন্য মানুষের যেমন প্রয়োজন রয়েছে যুগের পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী নিজের কর্মকৌশলে পরিবর্তন আনার, তেমনি তার নিকট সর্বযুগে এবং সর্বাবস্থায় এমন কিছু চিরন্তন ও শাশ্বত মৌলনীতি ও বিধান থাকা আবশ্যক, যার মধ্যে দুনিয়ার বড় থেকে বড় কোনো শক্তি পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়।

নতুবা তার 'পশুত্ব শক্তি' ও কু-প্রবৃত্তির তাড়না যুগ পরিবর্তনের ছত্র-ছায়ায় তাকে অন্যায়-অনাচার ও নৈতিক দেওলিয়াপনার সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে। যেখানে গিয়ে সে মানবতার আচরণ মুক্ত হয়ে পশুত্বের কাতারে শামিল হয়ে যাবে। যদি দুনিয়ার প্রত্যেকটি চিন্তা-গবেষণার মৌলনীতি, প্রতিটি নৈতিক বিধান, এবং প্রতিটি আইনগত হুকুমকে 'পরিবর্তনশীল' ঘোষণা করে, ইচ্ছে হলেই পরিবর্তন করার অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে এর পরিণতি ওই নৈতিকতা বিধ্বংসী, মানবতার আত্মহত্যা, বিপর্যয় ও পেরেশানী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, যা বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাগ্য হয়ে আছে।

আর যখন এ সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, সকল গবেষণামূলক মৌলনীতি ও আইনগত বিধি-বিধান পরিবর্তন-পরিবর্ধনযোগ্য না হওয়া উচিত। বরং কতক বিধি-বিধান এমনও থাকা প্রয়োজন যা কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হবে না।

সূচিপত্র

এখন থেকে গেল এ কথা যে, আইনের কোন্ কোন্ বিধানকে অপরিবর্তনশীল আর কোন্ কোন্ বিধানকে পরিবর্তনশীল সাব্যস্ত করা হবে। যদি এ বিষয়টি নিছক বিবেক-বুদ্ধির ন্যস্ত করা হয়, তাহলে এর দুরবস্থার বিবরণ আপনারা পিছনে দেখে এসেছেন। তা ছাড়া এ বিষয়টিকে মুক্ত বিবেক-বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করে আপনি কখনো এমন অপরিবর্তনীয় মৌলনীতি ও বিধান অর্জন করতে পারবেন না, যার উপর সমগ্র দুনিয়ার মানুষ একমত থাকবে। কেননা দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ও চিন্তা গবেষণার ফলাফল, অন্য ব্যক্তির তুলনায় ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

যেমন, কোনো ব্যক্তি বা দল একটি মৌলনীতিকে অপরিবর্তনীয় হিসেবে আখ্যা দিবে; আর অপর ব্যক্তি বা দল অন্য কোনো মৌলনীতিকে অপরিবর্তনীয় হিসেবে আখ্যা দিবে। মূল বিষয়টি সুরাহাবিহীনই থেকে যাবে। সুতরাং এ বিষয়টির সঠিক সমাধান কেবল ওই মহান সত্ত্বা ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষের সকল বাস্তব প্রয়োজনাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তার নফসের ফাঁকিবাজি সম্পর্কেও অবগত এ ক্ষেত্রে তাঁরই দিক-নির্দেশনা অন্বেষণ করতে হবে। আর তাঁর দিক-নির্দেশনা অন্বেষণের পদ্ধতি হলো এই যে, তাঁর নাযিলকৃত গ্রন্থ ও তাঁর প্রেরিত নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিক-নির্দেশনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যা ধারাবাহিকভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

আমরা যখন পবিত্র কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নবুবিয়্যার দিকে প্রত্যাবর্তিত হই তখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, এগুলোর কতক বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর কতক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিছু মৌলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা করেনি। পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিক-নির্দেশনা ও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাত যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো যুগ বা অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং সর্বাঞ্চল ও সর্বদার জন্য তা সার্বজনীন বিধান। তাই যেসব বিধি-বিধানের উপর কালের বিবর্তনের কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। আবার কখনো কখনো সেগুলোর বিধানকে বিস্তারিতভাবেও নির্ধারণ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব বিধি-বিধান কালের বিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হতো; পবিত্র কুরআন ও হাদীস সেগুলোর বিস্তৃত বর্ণনার পরিবর্তে এমন কিছু

সূচিপত্র

ব্যাপক ও সমৃদ্ধ নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যেগুলোর আলোকে প্রত্যেক যুগের বিজ্ঞ আলেমগণ বিস্তারিতভাবে সমস্যার সমাধান নির্ণয় করে থাকেন।

অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেসব বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যেগুলোর ব্যাপারে উম্মাহর ঐক্যমতও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে; তা অকাট্যভাবে 'অপরিবর্তনীয়' এবং সর্বযুগের মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। কেননা কালের বিবর্তনে যদি সেগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হতো, তাহলে পবিত্র কুরআন মাজীদ ও হাদীসে সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হতো না। তবে হ্যাঁ, সেসব বিধি-বিধান পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই এবং সেগুলোর ব্যাপারে উম্মাহর কোনো ঐক্যমতও প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তবে সেগুলোর ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী কেয়াস ও ইজতেহাদ করার অবকাশ রয়েছে। এ ধরনের বিধি-বিধানে কালের বিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে। আর এ ধরনের বিধি-বিধানের ব্যাপারেই উলামায়ে কেরামের এই উক্তি–

الأحكام تتغير بتغير الزمان

'অর্থ্যাৎ কালের বিবর্তনে শরঈ আহকাম পরিবর্তন হয়।'

নতুবা যদি কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধি-বিধানেও কালের বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অবকাশ থাকত, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার জন্য আসমানী গ্রন্থ নাযিল করার এবং নবী-রাসূল প্রেরণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধু এ একটি নির্দেশই যথেষ্ট ছিল যে,"নিজেদের যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিধি-বিধান তৈরি করে নাও।" অতএব, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান শোনার পরও 'কালের বিবর্তন'-এর ওজর পেশ করে অথবা 'কালের বিবর্তন'-এর ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধি-বিধানকে মনগড়া অর্থ সাব্যস্ত করে এবং সেগুলোতে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকে, সে মূলত আসমানী গ্রন্থের অবতরণ এবং নবী-রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কেই বে-খবর।

৭. যুগ পরিবর্তনের অর্থ ঃ زمانے کی تبدیلی کا مطلب

অতঃপর এখানে 'যুগ পরিবর্তন'-এর আসল অর্থটাও বুঝে নেওয়া জরুরী। যুগে যে পরিবর্তন শরঈ বিধানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তা ওই

সূচিপত্র

পরিবর্তন যার দ্বারা হুকুমের ইল্লত[৫৮৪]. বা কার্যকারণ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন, আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ একটি মাস'আলা বর্ণনা করেছেন যে, 'যদি কোনো ব্যক্তি একটি ঘোড়া ভাড়া করে। কিন্তু ঘোড়ার মালিকের সাথে এব্যাপারে চূড়ান্ত করল না যে, সে এতে আরোহণ করে কতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করবে এবং এর মোট ভাড়া কত হবে? তবে এ চুক্তি ফাসিদ ও নাজায়েয হবে। কিন্তু বর্তমানে মিটারযুক্ত গাড়ি আবিষ্কারের পর এ হুকুম আর অবশিষ্ট থাকেনি। আজ মানুষ টেক্সিতে বসার পূর্বে এ ব্যাপারে চালকের সাথে কোনো কথা বলে না। উভয় পক্ষের কারো জানা নেই যে, ভ্রমণের সামষ্টিক ভাড়া কত হবে?

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ চুক্তি জায়েয ও বৈধ। এর কারণ হলো, পূর্ববর্তী ফকীহগণ যে মাস'আলা বর্ণনা করেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী এর ইলত বা কার্যকারণ ছিল– ভাড়া স্থির না হওয়ার কারণে উভয় পক্ষের মাঝে ঝগড়া বাঁধার প্রবল সম্ভাবনা থাকা। এখন যুগ পাল্টে গিয়েছে এবং মিটার আবিষ্কার হবার পর সাধারণ নিয়ম চালু হয়ে গেছে যে, মিটার যে ভাড়া নির্ণয় করে দেয়, উভয় পক্ষ তাতে একমত হয়ে যায়। তাই ঝগড়ার ওই প্রবল সম্ভাবনা আর বাকি থাকল না, যা এ বিষয়টি নাজায়েয হবার ইল্লত ছিল। সুতরাং যুগের পরিবর্তনের কারণে বিধানেরও পরিবর্তন হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে যেখানে হুকুমের ইলত যথাযথ স্থায়ী থাকে, সেখানে শুধুমাত্র যুগের সাধারণ প্রচলনের উপর ভিত্তি করে আহকামের মধ্যে পরিবর্তন করা যাবে না। ইসলামের এধরনের উসূলের কোনো অবকাশ নেই যে, যে যুগে যেই যেই মন্দ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ঘটবে, এগুলোকে জায়েয ও হালাল বলা হবে। আর যেসব সৎকর্ম লোকেরা ছেড়ে দিতে থাকবে, সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করা হবে। কারণ এই হীন মানসিকতার স্রোত শেষ পর্যন্ত ওই 'প্রবৃত্তি পূজা'তে গিয়ে পড়বে, যেগুলো থেকে পরিত্রানের জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন এবং যার দাসত্ব হতে নাজাত দেওয়ার জন্য দু'জাহানের সর্দার নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমন ঘটেছিল।

৮. বিবেক-বুদ্ধির সঠিক কর্মপরিধি ঃ عقل کا صحیح دائرہ کار

আমাদের উল্লেখিত আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, যেসব বিষয় কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে যুগের কোনো প্রচলিত

---

৫৮৪. ইলত শব্দের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার জন্য "শরঈ বিধান হেকমতের উপর নির্ভরশীল নয়" শীর্ষক শিরোনাম অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

সূচিপত্র

দৃষ্টিভঙ্গি বা সমকালীন লোকদের প্রচলিত রীতি দ্বারা ভীত ও প্রভাবিত হয়ে বিবেকের ঘোড়া দৌড়ানো এবং কুরআন ও সুন্নাহকে তছনছ সেগুলোর বাস্তবতা থেকে দূরের ব্যাখ্যা তালাশ করা বা যুগ পরিবর্তনের অজুহাত পেশ করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না।

কারণ কুরআন ও সুন্নাহর যেসব আহকাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলো এমন যে, যুগের বিবর্তনের কারণে বাস্তবেই সেগুলোর উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। চাই যুগের প্রোপাগান্ডা-চেঁচামেচি ও প্রবৃত্তির তাড়না সেগুলোকে যতই আকস্মিক ও অপরিচিত বানিয়ে দিক না কেন? অতএব, এমন ক্ষেত্রে "মনগড়া ব্যাখ্যা" দ্বারা শরঈ আহকামে হস্তক্ষেপ করা বস্তুত সুস্থ বিবেকের কাজ নয়। বরং তা ওই অসুস্থ বিবেকের আনুগত্য, যা কু-প্রবৃত্তির দাস হয়ে থাকে। যার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, এর পরিণতি নিকৃষ্টতম গোমরাহী এবং মানবতা, নৈতিকতা ও ভদ্রতার ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির দাবী হলো, মানব মস্তিষ্ক ও বিবেকের ক্ষমতা ও সীমানার পরিধি জানা এবং এর উপর এমন বোঝা না চাপানো যা সে বহন করতে সক্ষম নয়। এ বিশ্ব জগতে একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ব্যতীত সকল কিছুর যোগ্যতার একটা সীমারেখা রয়েছে। যার পরে সে আর কাজ করতে পারে না।

আর আকল ও বিবেক-বুদ্ধিও এ সৃষ্টিজগতেরই একটি অংশ এবং এর যোগ্যতাও অসীম নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আসমানী গ্রন্থ ও নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সেসব তত্ত্ব বিধানের প্রতিই মানুষকে পথ-প্রদর্শন করেছেন, যেগুলোর অনুধাবনে আকল ও বিবেক হোঁচট খায়। অতএব, এসব আসমানী গ্রন্থ ও নবী-রাসূলগণের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মুকাবিলায় বুদ্ধিগত হেকমত পেশ করা এমন; যেমন কোনো নির্বোধ বিমানের ইঞ্জিনকে রেলগাড়ির নিয়ম অনুযায়ী টেষ্ট করতে শুরু করল!

পরিশেষে এ কথাটিও মস্তিস্কের মধ্যে রাখা দরকার যে, উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য অবশ্যই এই নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রতি ঈমান আনয়নের পর বিবেক-বুদ্ধির কোনো কাজই আর বাকি থাকে না। এর কারণ হলো, মানুষের জীবনে যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোর মধ্যে এমন বিষয়ের সংখ্যা অতি অল্প যেগুলোকে শরীয়ত ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নত, মুস্তাহাব কিংবা হারাম ও মাকরূহ বলে আখ্যায়িত করেছে। আর এগুলোর বিপরীত এমন অসংখ্য কাজ-কর্ম রয়েছে যেগুলোকে 'মুবাহ' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

আর এ মুবাহ্ কাজগুলোর পরিধি হচ্ছে আকল ও বিবেকের বিস্তৃত চারণক্ষেত্র। যেখানে শরীয়ত কোনো হস্তক্ষেপ করে না। এগুলোর কোনটি গ্রহণ করতে হবে এবং কোনটিকে ত্যাগ হবে, তার ভার আকল ও বিবেকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিস্তৃত ময়দানে আকল-বুদ্ধিকে ব্যবহার করে মানুষ বস্তুগত উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চরম শিখরে পৌছতে পারে এবং এ উন্নতি ও আবিষ্কারের সঠিক ফায়দাও অর্জন করতে পারে।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানে হস্তক্ষেপের পরিণতি এ ছাড়া আর কি হয়েছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নতি– যা মানবতার জন্য রহমতের কারণ হবার দরকার ছিল, অথচ তা থেকে মানুষ কেবল যথাযথ কল্যাণ লাভেই বঞ্চিত হচ্ছে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর আযাবের রূপ ধারণ করেছে। এ সকল পরিণতির মূল কারণ একটাই যে, আকল-বুদ্ধির উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে ছিল। আর বস্তুতঃ ওহীয়ে এলাহীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ব্যতীত মানুষের পক্ষে এ বোঝা বহন করা আদৌ সম্ভবই নয়।

ইতিহাস দর্শনের জগদ্বিখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে খালদূন (রহ.) এ সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার যেই কথা লিখেছেন, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

فانهم إداكك ومدركاتك فى الحصر، واتبع ماأمرك الشارع من اعتقادك وعملك. فهواحرص على سعادتك، وأعلم بما ينفعك، لانه من طورفوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك، وليس ذلك بقادح فى العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح. فأحكامه يقيبية لا كذب فيها، غير أنك لاتطمع ان تزن به امورالتوحيد والاخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الاهلية، وكل ماوراء طوره، فان ذلك طمع فى محال.

ومثال ذلك مثال رجل راى الميزان الذى يوزن به الذهب، فطمع ان يزن به الجبال. وهذا لايدرك على ان الميزان فى احكامه غير صادق، لكن العقل يقف عنده ولا يتعدى طوره.

"অর্থ্যাৎ সুতরাং তোমরা তোমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিষয়াবলীকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে নির্ভুল মনে করো না (সকল কিছুর জ্ঞান আমাদের জানা রয়েছে) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত আকীদা ও আমলের আনুগত্য করো। কেননা তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের চেয়েও অধিক শুভাকাঙ্খী এবং তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল অধিক

সূচিপত্র

বুঝেন। তাঁর জ্ঞান তোমাদের জ্ঞানের চেয়ে বহুগুনে উন্নত এবং এমন মাধ্যমে অর্জিত যা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির আওতা থেকে সুদুর প্রসারিত। আর এটা আকল-বুদ্ধি ও তার লব্ধ বিষয়াবলীর জন্য কোনো দোষ নয়। বরং ইহা আকল-বুদ্ধি একটি সঠিক মানদন্ড।

যার বিধি-বিধান সুনিশ্চিত ও মিথ্যা থেকে পবিত্র। তবে এ মানদন্ডটি এত বৃহৎ নয় যে, তোমরা এর দ্বারা মহান আল্লাহর একত্ববাদ, পারলৌকিক বিষয়াবলী, নবুওয়াত ও আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বা এমন আরো বিষয়কে ওজন করতে যাবে, যা আকল ও বিবেকের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইহার উদাহরণ সম্পূর্ণ এমন যে, কোন ব্যক্তি স্বর্ণ মাপার নিক্তি দিয়ে পাহাড় মাপার আকাঙ্খা করল। তখন ও কথা বলা যাবে না যে নিক্তিটি কোট বা মিথ্যা বরং বলা হবে যে, প্রত্যেক পাল্লারই একটি সীমাবদ্ধতা আছে। এটা স্পষ্ট যে, (যখন এটা দিয়ে পাহাড় ওজন করা সম্ভব নয়) তখন এ কথা বলা যাবে না যে, নিক্তিটা ছোট। বরং এটা বলা হবে যে, প্রতিটি মানদন্ডের একটা সীমা ও পরিধি থাকে, যার বাইরে সে আর কাজ করতে পারে না। ঠিক তদ্রূপ আকল-বুদ্ধির মানদণ্ডও একটি বিশেষ স্থানে এসে স্থির হয়ে যায় এবং তার গুন্ডির বাইরে তখন আর অগ্রসর হতে পারে না।"[৫৮৫]

এভাবে কুরআন ও সুন্নাহ বহু বিষয় স্পষ্ট করে বলার পরিবর্তে ফুকাহায়ে কেরামের ইজতেহাদ ও ইস্তেম্বাতের (গভেষণা) উপর ছেড়ে দিয়েছে। যারা এ কাজের সার্বিক যোগ্যতার অধিকারী তাঁদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের মূলনীতির আলোকে বিধি-বিধান আহরণ করা বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করার এক সুবিশাল ময়দান। যার মধ্যে প্রত্যেক যুগের ফকীহগণ স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-গবেষণার পরীক্ষা দিয়ে আসছেন। তবে কুরআন ও সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট বক্তব্যকে উপেক্ষা করে অথবা শরঈ নীতিমালাকে পদদলিত করে নিছক বিবেক-বুদ্ধির ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহ'র নিয়ম-নীতিকে তছনছ করার চেষ্টা করা, স্বর্ণ মাপার নিক্তি দ্বারা পাহাড় মাপার নামান্তর।

পরিশেষ আমরা শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-প্রদত্ত বক্তব্যের এ আলোচনার ইতি টানছি–

"এ উদ্দেশ্য আদৌ নয় যে, চিন্তা ও গবেষণা একটি অহেতুক ও অনর্থক মূল্যহীন কাজ। কিংবা এতে জড়িয়ে পড়া কোনো গোনাহের কাজ। তবে হ্যাঁ, কোনো মানুষের জন্য আমরা এটা জায়েয মনে করি না যে, সে তার

---

[৫৮৫]. মুকাদ্দামা ইবনে খালদূন।

সূচিপত্র

ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিযুক্ত চিন্তাকে মূলনীতি হিসেবে ধরে নিয়ে নবী-রাসূলগণের পাক-পবিত্র এবং সঠিক ও নির্ভুল সর্বোচ্চ শিক্ষাকে জোর করে এর সাথে সামঞ্জস্যশীল করার চেষ্টা করবে। যার প্রতি অনেক সময় স্বয়ং তার হৃদয়ও ভেতর থেকে বিদ্রোহ করে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের বাণী ও বক্তব্যকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধিকে এগুলোর অনুগত করে দিবে। আর তাঁরা যা কিছু ইরশাদ করেছেন সেগুলোকে স্বীয় আত্মিক রোগের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ মনে করে "আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম" বলে দ্ব্যর্থকণ্ঠে সাদরে গ্রহণ করবে।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

'অর্থ্যাৎ আল্লাহর আহবানে সাড়া দেয়ার পর যে সম্পর্কে যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের দলীল প্রমাণ তাদের রব্ব-এর কাছে বাতিল। তাদের প্রতি (আল্লাহর) গযব আর তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।"[৮৬]

[৮৬]. মাওলানা শাব্বির আহমদ (রহ.) রচিত "আল-আকলু ওয়ান-নাকলু" পৃঃ ৯৬, লাহোর : ১৩৯৬ হি।

সূচিপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ باب چهارم

চতুর্থ পরিচ্ছেদ প্রাথমিক যুগের কয়েকজন মুফাসসির ঃ

এ পরিচ্ছেদের সারাংশ ঃ

এতে বিভিন্ন সাহাবা এবং পরবর্তীস্থরের মুফাসসিরীনের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, তাদের অবস্থান এবংপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এতে হযরত ইবনে আব্বাসের; পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য, তার থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাচ্যবিদ সনদ, গোল্ড যিহারের প্রতারণা, প্রচলিত "তাফসীরে ইবনে আব্বাস"-এর মর্যাদাগত অবস্থান বর্ণনাসহ হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কা'ব, এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

তাবেয়ীনদের থেকে হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমা, তার উপর উত্থাপিত আপত্তির হাকীকত, হযরত তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব, ইবনে সিরীন, যায়েদ ইবনে আসলাম, আবুল আলিয়া, উরওয়া ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী, কাতাদাহ, কা'ব আল-কারখী, আলকামাহ, আসওয়াদ, মুররা আল-হামদানী, নাফে, ইমাম শা'বী, ইবনে আবী মুলাইকা, ইবনে জুরাইজ, যাহহাক; প্রমুখের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর "প্রাথমিক যুগের কতেক দুর্বল ও বিতর্কিত মুফাসসিরীন" নামক শিরোনাম কায়েম করেন। এতে তিনি সুদ্দী কাবীরসহ সুদ্দী সগীর, মুকাতিল, রবী ইবনে আনাস, আতিয়্যাহ আল-আওফী, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম, কালবী প্রমুখের ব্যাপারে স্বল্পবিস্তার পর্যালোচনা করেন।

অতপর"পরবর্তীদের তাফসীর গ্রন্থসমূহ" নামক শিরোনামে কতক তাফসীরগ্রন্থের বিবরণ দান এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। সেগুলো হচ্ছে, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে আবুস-সাউদ, তাফসীরে কুরতুবী, রুহুল মা'আনী, পাশাপাশি উর্দূ তাফসীরগ্রন্থ "তাফসীরে বয়ানুল কুরআন" ও "মাআরিফুল কুরআন" -এর ব্যাপারে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

নিম্নে এ পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সূচিপত্র

প্রথম যুগের কয়েকজন মুফাসসির ঃ قرون اولی کے بعض مفسرین

লেখক বলেন আমার ইচ্ছে ছিল, বক্ষমাণ এই গ্রন্থেটিতে তাফসীর শাস্ত্রের বিস্তারিত ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করব। কিন্তু কিছু কিছু কারণে তা মূলতবি করতে হলো। তা ছাড়া এ বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।[৫৮৭] তাই তাফসীর শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না লিখে এ পরিচ্ছেদে আমরা প্রথম যুগের কয়েকজন মুফাসসিরকে নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালাব। তাফসীরের গ্রন্থাদিতে যাদের উদ্ধৃতি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য হলো, তাফসীর অধ্যয়ন করার সময় নিম্নোক্ত আলোচনাগুলো স্বরণে থাকলে এ সব ব্যক্তিবর্গের অভিমত দ্বারা বিশুদ্ধ ও সঠিক সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ঃ حضرت عبداللہ بن عباس

সাধারণত তো সাহাবায়ে কেরামের নিকট একটি দল তাফসীর শাস্ত্রে খেদমতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তবুও তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তার মূল কারণ হলো এই যে, তাঁর তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তির অর্জনের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করেছেন। একাধিক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মাথায় হাত রেখে এ দু'আ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

'ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে দ্বীনের সমঝ দান করুন এবং কুরআন ব্যাখ্যার জ্ঞানও দান করুন।'

অন্য এক সময় এই দু'আ করেছেন–اللهم بارك فيه وانشر منه

'ইয়া আল্লাহ! তাকে বরকত দান করুন এবং তার মাধ্যমে ইলমে দীনের বিস্তৃতি ঘটান।'[৫৮৮]

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে,–

نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ أَنْتَ

'তুমি কুরআনুল কারীমের কতইনা চমৎকার মুখপাত্র।'[৫৮৯]

তাই তো সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ (কুরআনের মুখপাত্র), "الحبر" (উঁচু পর্যায়ের আলেম) ও"البحر" (ইলমের সাগর) উপাধিতে স্মরণ

---

৫৮৭. যেমন, দেখুন : প্রফেসর আবদুস সামাদ সারেম রচিত "তারীখুল কুরআন ওয়া তারীখুত তাফসীর"।
৫৮৮. "আল-ইসাবা" ২/৩২৩ : হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) রচিত
৫৮৯. 'হিলয়াতুল আউলিয়া'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে "আল-ইতকান" ২/১৮৭: আবু নুআইম রচিত

সূচিপত্র

করতেন।[৫৯০] এমনকি বয়সের দিক থেকে ছোট হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর শরণাপন্ন হতেন এবং তাঁর মতকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

তিনি নিজেই বলেন, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর আমি এক আনসার সাহাবীকে বললাম, এখনো তো রাসূলের অনেক সাহাবী জীবিত আছেন। চলুন, আমরা তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞানের কথাগুলো জেনে নেই। তখন ওই সাহাবী বললেন, আপনার কি এ ধারণা হয় যে, কোনো সময়ে মানুষ জ্ঞানের বিষয়ে আপনার মুখাপেক্ষী হবে? (যার প্রস্তুতি এখন থেকে নিতে চাচ্ছেন)।

এভাবে তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। আমি নিজেই এ কাজে নেমে পড়লাম। সাহাবায়ে কেরামের কাছে যেতাম এবং তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে থাকলাম। কোনো ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে যদি আমার কাছে কোনো হাদীস পৌছত, তাহলে ওই ব্যক্তির দরজা পর্যন্ত গিয়ে পৌছতাম। কখনো জানা যেত যে, তিনি দ্বি-প্রহরের বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন আমি আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে সেখানেই দরজার সামনে বসে থাকতাম। বাতাসের ঝটকা আমার মুখে মাটি নিক্ষেপ করে যেত।

যখন ওই ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে দেখতেন, তখন বলে উঠতেন, "রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই! আপনি কেন কষ্ট করে এসেছেন? আমার নিকট খবর পাঠিয়ে দিলেই তো আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে যেতাম।" আমি উত্তর বলতাম, "না, আপনার কাছে আসাটাই তো আমার দায়িত্ব।" তারপর আমি তাঁকে ওই হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতাম। (এভাবে দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হতে থাকে।) ওই আনসারী সাহাবী (যিনি আমার প্রস্তাবে সাড়া দেননি) দীর্ঘ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকেন। এমনকি তিনি আমাকে এমতাবস্থায় দেখেছেন যে, মানুষ আমার চতুর্দিকে ভিড় করে আছে এবং আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে। তখন তিনি বললেন, "এ যুবকটি আমার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ছিল।"[৫৯১]

উবাইদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আবী রাফে' বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবু রাফে' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট আগমন করতেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, অমুক দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি কি আমল করেছিলেন। ইবনে

---

[৫৯০]. প্রাগুক্ত।

[৫৯১]. দেখুন : 'মসনাদে দারেমী' ও 'মুসনাদে হারিস ইবনে আবু উসামা'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে "আল-ইসাবা" ২/৩২৫, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আলামা যাহাবী (রহ.) রচিত "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" ১/৩৮)

সূচিপত্র

আব্বাসের সাথে আরো একজন লোক থাকতেন। যিনি (হযরত আবু রাফে' (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর জবাব) লিখে রাখতেন।[৫৯২]

এভাবে এমন একটি সময় এসেছে যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর নিকট সব সময় ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারীদের ভিড় লেগে থাকতো। আর তিনি তাদের সামনে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর, হাদীসে নববী ও ফিকহী মাসাইল ইত্যাদি আলোচনা করতেন।[৫৯৩]

এসব কারণেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে "ইমামুল মুফাসসিরীন" বলা হয়। আর পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশি রেওয়ায়েত তাঁর থেকেই বর্ণিত।

অবশ্য তাঁর কাছ থেকে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত, তার বিরাট একটি অংশ দুর্বলও বটে। অতএব, তাঁর বর্ণনাকৃত রেওয়ায়েতগুলো থেকে উপকৃত হতে চাইলে সেগুলোকে উসূলে হাদীসের শর্তাবলীতে যাচাই করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখার মতো–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বর্ণনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত হলো যা–

ابوصالح عن معاوية بن صالح عن على بن ابى طلحة عن ابن عباس-এ সনদে বর্ণিত।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর যুগে মিসরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর তাফসীরের বিরাট একটি পান্ডুলিপি এই সনদের সাথে বিদ্যমান ছিল। ইমাম আহমদ (রহ.) এটা সম্পর্কে বলতেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি শুধু এ পা-ুলিপি হাসিল করার উদ্দেশ্য মিসর সফর করে তাহলে এটা বিস্ময়ের কিছুই হবে না।' এ পান্ডুলিপিটি পরবর্তী সময়ে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বহু মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ পান্ডুলিপির উদ্ধৃতি নিজেদের গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে এর বহু বর্ণনা তা'লীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে জারীর (রহ.), ইবনে আবী হাতেম (রহ.) ও আল্লামা ইবনে মুনযির (রহ.) বিভিন্ন মাধ্যমে এই সনদসূত্রেই বহু রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন।[৫৯৪]

---

৫৯২. প্রাগুক্ত।

৫৯৩. দেখুন : 'আল ইসাবা' ২/৩২৫ ও 'আল-ইসাবা'র টীকায় উদ্ধৃত 'আল-ইসতেআব' ২/৩৪৭.

৫৯৪. আল-ইতকান : ২/১৮৮

সূচিপত্র

গোল্ড যিহারের একটি ভুল ধারণা ঃ گولڈزیہر کا ایک مغالطہ

এখানে একটি প্রতারণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করছি যে, প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিশারদ পণ্ডিত গোল্ড যিহার (Goldziher) স্বীয় গ্রন্থ "مذاهب التفسير الاسلامى"-এ ইংরেজদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এ প্রতারণা করেছেন যে,–"স্বয়ং মুসলিম হাদীস সমালোচকগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, আলী ইবনে আবী তালহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে সেসব তাফসীর নিজে শ্রবণ করেননি, যা তিনি ওই কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এ তাফসীরের পাণ্ডুলিপির সম্পর্কে স্বয়ং ইসলামী সমালোচকদের এ সিদ্ধান্ত। যেটাকে সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।"[৫৯৫]

কিন্তু গোল্ড যিহার এ কথা উল্লেখ করেননি যে, হাদীস বিশারদ অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যেখানে লিখেছেন যে, 'আলী ইবনে আবী তালহা তাফসীর সংক্রান্ত এ উক্তিগুলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে শোনেননি', সেখানে তাঁরা তাহকীক ও অনুসন্ধানের পর এ কথাও লিখেছেন যে, 'আলী ইবনে আবী তালহা এসব রেওয়ায়েতের কিছু অংশ মুজাহিদ (রহ.) থেকে এবং কিছু অংশ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) থেকে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) বলেন–

بعد ان عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك

"যখন মধ্যবর্তী মাধ্যমগুলো জানা গেল আর তা নির্ভরযোগ্য, অতএব, রেওয়ায়েতগুলো গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।"[৫৯৬]

২. আলী ইবনে আবী তালহা (রহ.)-এর এ সূত্র ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর রেওয়ায়েতসমূহের আরো বিভিন্ন 'সহীহ' বা 'হাসান' সূত্র রয়েছে। যেমন–

أبو ثور عن ابن جريج عن ابن عباس

অথবা حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن عباس.

অথবা قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

অথবা

---

[৫৯৫]. গোল্ড যিহার কর্তৃক রচিত "মাযাহিবুত তাফসীরিল ইসলামী" আরবী অনুবাদ আবদুল হালীম নাজ্জার : পৃ: ৯৮

[৫৯৬]. আল-ইতকান : ২/১৮৮, আরো দেখুন : তাহযীবুত, তাহযীব : ৭/৩৩৯

সূচিপত্র

ابن اسحاق عن محمد بن ابى محمد عن عكرمة اوسعيد به جبير عن ابن عباس.....وغير(الاتقان)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যেসব রেওয়ায়েত নিম্নোক্ত সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দুর্বল।

(الف) محمد بن السائب الكلبى عن ابى صالح عن ابن عباس.

আর যখন মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান আস-সুদ্দী আস-সগীর কালবী থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করে, তাহলে ওই সনদকে মুহাদ্দিসগণ 'سلسلة الكذب' বা মিথ্যার ধারাবাহিকতা বলে আখ্যায়িত করেন। মুফাসসিরগণের মধ্য হতে সা'লাবী (রহ.) ও ওয়াহেদী (রহ.) এ সূত্র থেকে অনেক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন।

(ب) ضحاك بن مزاحم عن ابن عباس

এ সনদটি দুর্বল হওয়ার কারণ হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে যাহ্হাক-এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই। আর যদি যাহ্হাক থেকে বর্ণনাকারী بشر ابن عمارة হয়, তাহলে এ সনদ আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ بشر ابن عمارة দুর্বল। আর যদি যাহ্হাক থেকে বর্ণনাকারী 'جويبر' হয়, তাহলে এর দুর্বলতা আরো বেড়ে যায়। কারণ যুওয়াইবির অত্যন্ত দুর্বল।

(ج) عطية العوفى عن ابن عباس

আতিয়্যাহ্ আওফীর দুর্বল হবার কারণে এ সনদটিও দুর্বল হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য কেউ কেউ এটাকে 'হাসান' বলেন। কেননা ইমাম তিরমিযী (রহ.) আতিয়্যাহ'র বর্ণনাকে হাসান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আতিয়্যাহ আওফীর আলোচনায় এর বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।

(د) مقاتل بن سليمان عن ابن عباس

এ সনদটিও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের দুর্বলতার কারণে মাজরূহ।[৫৯৭] মুকাতিলের বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

مروجہ تفسیر ابن عباس کی حیثیت

প্রচলিত "তাফসীরে ইবনে আব্বাস"-এর মর্যাদাগত অবস্থান ঃ

৪. আমাদের এ যুগে "تنوير المقياس فى تفسير ابن عباس" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেটাকে বর্তমানে সাধারণতঃ "تفسير ابن عباس" নামে

[৫৯৭]. এই পুরো আলোচনাটি আল-ইতকান : ১/১৮৮-১৮৯ হতে সংগৃহীত।

আখ্যায়িত করা হয় এবং উর্দূ ভাষায়ও এর তরজমা প্রকাশিত হয়েছে.। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর দিকে এর সম্বন্ধ করাটা সঠিক নয় । কারণ এ গ্রন্থটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত[৫৯৮]–

محمد بن مروان السدى عن محمد بن السائب الكلبى عن ابى صالح عن ابن عباس.

আর আমরা আগেই বলে এসেছি যে, এই সনদটিকে মুহাদ্দিসগণ 'سلسلة الكذب' বা মিথ্যার ধারাবাহিকতা বলে আখ্যা দিয়েছেন । কাজেই এর উপর নির্ভর করা যায় না ।

হযরত আলী (রা) ঃ حضرت علی

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর স্থান অনেক শীর্ষে । প্রথম তিনজন খলীফা যেহেতু তাড়াতাড়ি ইন্তেকাল করে চলে গিয়েছিলেন; তাই তাঁদের তাফসীর বিষয়ক রেওয়ায়েত খুব কমই উদ্ধৃত হয়েছে । পক্ষান্তরে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ইলম চর্চায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন । তাই তাঁর থেকে বহু রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে । ইলমে তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে আবুত তুফাইল (রহ.)-এর এই উক্তি দ্বারা অনুমান করতে পারবেন । তিনি বলেন–

"আমি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কে খুতবা দিতে দেখেছি । তিনি বলছিলেন, তোমরা আমাকে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর । কেননা আল্লাহর শপথ! কুরআনুল কারীমের এমন কোনো আয়াত নেই, যার ব্যাপারে আমি জানি না যে, তা রাতে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি দিনে? ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি পাহাড়ে?[৫৯৯]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) যেহেতু জীবনের শেষাংশে কূফায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন, তাই তাঁর ইলম কূফাতেই বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তাঁর অধিকাংশ রেওয়ায়েত কূফাবাসীদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । যেহেতু

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ঃ حضرت عبداللہ بن مسعود

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)ও সে সকল সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বহু তাফসীর বর্ণিত হয়েছে । এমনকি তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েত হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর রেওয়ায়েত থেকেও অধিক । হাফেয ইবনে জারীর (রহ.) প্রমুখ তাঁর এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন যে–

---

৫৯৮. দেখুন : "তানভীরুল মিকইয়াস" ১ম পৃষ্ঠা ।
৫৯৯. আল-ইতকান : ২/১৮৭

সূচিপত্র

والذى لا إله غيره مانزلت اية من كتاب الله الا وانا أعلم فيمن نزلت واين؟ نزلت ولوأعلم مكان احد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لاتينه

"অর্থ্যাৎ কসম! ওই সত্ত্বার, যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই। কুরআনুল কারীমের এমন কোনো আয়াত নাযিল হয়নি, যার ব্যাপারে আমি অবগত নই যে, আয়াতটি কার সম্পর্কে ও কোথায় নাযিল হয়েছে? আমি যদি এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান পাই, যে কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন এবং তার নিকট সওয়ারী পৌছতে সক্ষম হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তার নিকট যাব।"[৬০০]

প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত মাসরূক ইবনুল আযদা' বলেন–

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের নিকট একটি সূরা পাঠ করতেন। আর দিনের বেশির ভাগ সময় এর তাফসীর ও এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বর্ণনায় ব্যয় করে দিতেন।"[৬০১]

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মাসরূক (রহ.) আরো বলেন–

"আমি বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছি। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সকল সাহাবায়ে কেরামের ইলম ছয়জন ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চিত ছিল। (তাঁরা হলেন)– ১. হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ২. হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাউসদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ৫. হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ৬. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। অতঃপর আরো চিন্তা করে দেখলাম যে, এই ছয়জনের ইলম মাত্র দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদের একজন হলেন, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আর অপরজন হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।"[৬০২]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ঃ حضرت ابی بن کعب

'হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও সে সকল সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত. ছিলেন, যারা ইলমে তাফসীর ও ইলমে ক্বেরাতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

أقرؤهم ابی بن كعب

'সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্বারী হচ্ছেন, উবাই ইবনে কা'ব।'

---

৬০০. প্রাগুক্ত।
৬০১. তাফসীরে ইবনে জারীর : ১/২৭
৬০২. "মুকাদ্দামাহ নসবুর রাইয়্যাহ" ১/১৩: আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রা.) রচিত

সূচিপত্র

তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ন্যায় ইমামুল মুফাসসিরীন তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন। হযরত মা'মার (রহ.) বলেন–

عامة علم ابن عباس من ثلاثة: عمر وعلى وابي بن كعب رضى الله عنهم

'হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর অধিকাংশ ইলম তিন ব্যক্তি হতে আহরিত। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)।"[৬০৩]

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-ই প্রথম মুফাসসির, যাঁর তাফসীর গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর তাফসীরের বিরাট একটি কপি ছিল। যা রবী' ইবনে আনাস-এর মাধ্যমে আবু যা'ফর রাযী বর্ণনা করতেন। ইমাম ইবনে জারীর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), ইবনে আবী হাতেম (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও ইমাম হাকেম (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ৪০৫ হিজরীতে ইমাম হাকেম (রহ.)-এর ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ায় পঞ্চম শতক পর্যন্তই এ কপিটির অস্তিত্ব ছিল।[৬০৪]

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) প্রমুখদের থেকেও পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর বিষয়ক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়।

সাহাবা–পরবর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ ঃ صحابہ کے بعد

সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন স্থানে দরসে পবিত্র কুরআনুল কারীমের সিলসিলা চালু করেছিলেন। তাঁদের শিক্ষা ও দীক্ষার ফলে তাবেঈদের বিরাট একটি দল যোগ্য হয়ে গড়ে উঠেন। যাঁরা তাফসীর শাস্ত্রকে সংরক্ষণ করতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্য হতে ওই সব ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো, যাদের উদ্ধৃতি তাফসীরের গ্রন্থসমূহে অধিকহারে এসে থাকে।

---

৬০৩. ইমাম যাহাবী (রহ.) রচিত : "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" : ১/৩৮
৬০৪. আল-ইতকান : ২/১৮৯

সূচিপত্র

১. হযরত মুজাহিদ (রহ.) ঃ حضرت مجاهد

তাঁর পুরো নাম আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ ইবনে জাব্‌র[৬০৫] আল-মাখযূমী (রহ.)। (জন্ম : ২১ হিজরী এবং মৃত্যু : ১০৩ হিজরী।) তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। যার সাথে তিনি ত্রিশবার পবিত্র কুরআনুল কারীমের দাওর (শ্রবণ ও পঠন) করেছেন এবং তিনবার তাফসীরের দরস লাভ করেছেন।[৬০৬]

হযরত কাতাদা (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন–أعلم من بقي بالتفسير مجاهد

"তাফসীর শাস্ত্রে জীবিত আলেমগণের মধ্যে মুজাহিদ (রহ.) সবচেয়ে বড় আলেম।"

আর খুসাইফ (রহ.) উক্তি হলো– أعلمهم بالتفسير مجاهد

"মুজাহিদ (রহ.) তাফসীর শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় আলেম।"[৬০৭]

কথিত আছে যে, তাঁর তাফসীর সমগ্র মিসরের 'খুদাইবিয়া' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৬০৮]

হযরত মুজাহিদ (রহ.) তাবেঈ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে খুব মূল্যায়ন করতেন। হযরত মুজাহিদ নিজেই বলেন–

صحبت ابن عمر. واني اريد اناخدمه. فكان هويخدمني

'আমি হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর সাহচর্যে ছিলাম। আমি তাঁর খেদমত করতে চাইতাম। কিন্তু উল্টো তিনি আমার খেদমত করতেন।"[৬০৯]

একবার হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তাঁর ঘোড়ার রেকাব ধরে বলেছিলেন, "ইস! আমার ছেলে ছালেম ও আমার গোলাম নাফে' যদি তোমার ন্যায় স্মরণশক্তির অধিকারী হতো।"

হযরত মুজাহিদ (রহ.) ১০৩ হিজরীতে সিজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।[৬১০]

২. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) ঃ حضرت سعيد بن جبير

তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

---

৬০৫. তাঁর পিতার সঠিক নাম 'জাব্‌র'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'জুবাইর'। ইমাম নববী রচিত "তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত : ২/৮৩

৬০৬. তাহযীবুত তাহযীব : ১০/৪৩

৬০৭. ইমাম যাহাবী (রহ.) রচিত : "তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায" : ১/৮৬

৬০৮. আবদুস সামাদ সারেম রচিত "তারীখুত তাফসীর" পৃ: ৭৮

৬০৯. হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩/২৮৫-২৮৬

৬১০. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৯/২২৪

সূচিপত্র

জুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ন্যায় সাহাবাগণের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছিলেন।[৬১১]

ইবাদত ও যুহুদ-সাধনায় তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। রাতের বেলায় সালাতে অধিক ক্রন্দন করায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি কিছুটা লোপ পেয়ে যায়।[৬১২] হিজরী ৯৪ সালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে শহীদ করে দেয়। যার ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে একটি তাফসীর লিখেছিলেন। খলীফা সেটাকে রাষ্ট্রীয় খাজানায় সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর তাফসীরটি হযরত আতা ইবনে দীনার (রহ.) [মৃত্যু : ১২৬ হিজরী]-এর হাতে এসে পৌঁছে। এরপর তিনি এ কপির উপর ভিত্তি করে তাফসীরের রেওয়ায়েতগুলোর হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করতেন।[৬১৩]অতএব, হযরত আতা ইবনে দীনার (রহ.) থেকে হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রহ.)-এর সূত্রে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সেগুলোকে "ভিযাদা" বলা হয় এবং তা বেশি একটা নির্ভরযোগ্য নয়।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.)-এর অনেক রেওয়ায়েতই মুরসাল। [অর্থাৎ এর মাঝে সাহাবীর মধ্যস্থতা বিলুপ্ত]। তবে তাঁর মুরসাল নির্ভরযোগ্য। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন–

"সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.)-এর মুরসাল আমার নিকট আতা (রহ.) ও মুজাহিদ (রহ.)-এর মুরসালের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।[৬১৪]

৩. হযরত ইকরিমা (রহ.) ঃ حضرت عکرمہ

তিনি হলেন সেই 'ইকরিমা যিনি মাওলায়ে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি 'বারবারী' গোলাম ছিরেন। হুসাইন ইবনে আবুল হার আল-আম্বারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে এ গোলামটি হাদিয়া হিসেবে পেশ করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সীমাহীন শ্রম-সাধনার মাধ্যমে তাঁকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করেছেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ছাড়াও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত হাসান ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত

---

৬১১. ইমাম নববী রচিত "তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত : ১/২১৬
৬১২. হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪/২৭২
৬১৩. তাহযীবুত তাহযীব : ৭/১৯৮-১৯৯
৬১৪. প্রাগুক্ত : ৪/১৪

সূচিপত্র

উকবা ইবনে আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এবং অন্যান্য আরো কয়েকজন সাহাবী থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন।[৬১৫]

হযরত ইকরিমা (রহ.) নিজেই বলেন–"আমি ইলম অর্জনে দীর্ঘ চল্লিশ বছর সময় অতিবাহিত করেছি।"[৬১৬] এ উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও আফ্রিকা ইত্যাদি দেশ পর্যন্ত সফর করেছেন।[৬১৭]

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, "আমাদের যুগে পবিত্র কুরআন মাজীদের ব্যাপারে ইকরিমা (রহ.)-এর চেয়ে বড় কোনো আলেম বাকি ছিলেন না।"[৬১৮] হযরত কাতাদাহ (রহ.) বলেন, "তাবেঈদের মধ্যে চারজন ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। আতা (রহ.), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.), ইকরিমা (রহ.) ও হাসান বসরী (রহ.)।"[৬১৯]

عکرمہ پر اعتراضات کی حقیقت

হযরত ইকরিমা (রহ.)–এর উপর উত্থাপি অভিযোগের হাকীকতঃ

কোনো কোনো মুহাদ্দিস হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর উপর কিছু আপত্তিও উত্থাপন করেছেন। আর সেই গুলোকে পূজিঁ করে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত গোল্ড যিহার এ আপত্তিগুলোকে ভয়াবহ রূপ দিয়ে এ প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এ প্রসিদ্ধ ছাত্রও তাফসীর বিষয়ক রেওয়ায়েতসমূহের মুকাবিলায় অনির্ভরযোগ্য।[৬২০] অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম গভীর অনুসন্ধান ও যাচাইয়ের পর এ আপত্তি ও অভিযোগগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থের ভূমিকায় এ ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি এ কথা বলেছেন যে, হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর অবস্থার তাহকীক ও তাঁর উপর উত্থাপিত আপত্তিগুলোর যাচাই ও অনুসন্ধান করতে গিয়ে হাদীসের একাধিক ইমামগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। যাদের মধ্যে হাফেয ইবনে জারীর (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ

---

৬১৫. তাহযীবুত তাহযীব : ৭/২৬৪
৬১৬. ইমাম যাহাবী (রহ.) রচিত : "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" : ১/৯০
৬১৭. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৯/২৪৫
৬১৮. তাহযীবুত তাহযীব : ৭/২৬৬ ও মিফতাহুস সাআদাহ : ১/৪১০
৬১৯. উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুযায়ী "তাহযীবুত তাহযীব"।
৬২০. দেখুন : গোল্ড যিহার রচিত : "মাযাহিবুত তাফসীরিল ইসলামী"। আরবী অনুবাদ : ড. আবদুল হালীম নাজ্জার, পৃ: ৯৫

সূচিপত্র

ইবনে নসর মারওয়াযী (রহ.) ও আবু ওমর ইবনে আবদুল বার (রহ.)-এর ন্যায় মনীষীগণও শামিল রয়েছেন।[৬২১]

এরপর হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) বলেন যে, 'ইকরিমা (রহ.)-এর উপর যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়, সেগুলোর ভিত্তি তিনটি বিশেষ অভিযোগের উপর।

(১.) তিনি কিছু ভুল কথা হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

(২.) আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ছিলেন খারেজী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। (৩.) তিনি আমীর-উমারাদের কাছ থেকে হাদিয়া-উপঢৌকন হাসিল করতেন। তৃতীয় অভিযোগটির যে বিষয়, এটি তো এমন কোনো বিষয়ই নয় যে, আমীর-উমারাদের কাছ থেকে হাদিয়া-উপঢৌকন হাসিল করার কারণে তাঁর রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর বাকি রইল দু'টি অভিযোগ।'

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) বিস্তারিতভাবে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি অভিযোগের কোনোটিই তাঁর উপর প্রমাণিত হয়নি। এ ব্যাপারে যতগুলো গল্প-কাহিনী তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) এক এক করে সবগুলো উল্লেখ করে দলীল-প্রমাণ দ্বারা সেগুলো খন্ডন বা সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, তাঁর প্রতি যে মিথ্যার অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। এর ভিত্তি মূলতঃ একটি ভুল বুঝাবুঝি। আর তা হলো এই যে, কখনো কখনো তিনি একই হাদীস দু'জন ব্যক্তি থেকে শ্রবণ করে থাকেন। এক স্থানে এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করতেন। অতঃপর যদি কেউ এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তখন অপর ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করে দিতেন। এতে কতক লোক এ ধারণা করে বসেছে যে, তিনি হাদীস তৈরি করে বলেন। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বর্ণনা সঠিক ছিল। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন–

أرأيت هؤلاء الذين يكذبونى من خلفى افلا يكذبونى فى وجهى؟

"যে সব লোক আমার পেছনে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তারা আমার সামনে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না কেন?"

অর্থাৎ , যদি তারা আমার সামনে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আমি তাদেরকে বাস্তব অবস্থাটি খুলে বলে দেব।

অনুরূপভাবে তার উপর আকীদাগতভাবে খারেজী হবার যে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে সে ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) বলেন যে, কোনো নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়নি। অবশ্য ঘটনা হয়েছে এই যে, তিনি

---

৬২১. হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) রচিত : "ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকা "হাদ্‌য়ুস সারী" ২/১৯২

সূচিপত্র

কোনো কোনো শাখাগত ফিকহী মাস'আলায় এমন রীতি অবলম্বন করেছিলেন, যা খারেজীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাই কেউ কেউ তাঁকে খারেজীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। যেমন ইমাম আযলী (রহ.) বলেন–

عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهما مكى تابع ثقة بربى مما يرميه به الناس به منالحرورية

"ইকরিমা ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মুক্তকরা দাস.। তিনি ছিলেন মক্কার অধিবাসী, নির্ভরযোগ্য তাবেঈ। লোকেরা তাঁর উপর খারেজী হবার যে অভিযোগ আরোপ করে তা থেকে তিনি মুক্ত।"

হাফেয ইবনে জারীর তাবারী (রহ) বলেন–

اگر ہر وہ شخص جس کی طرف غلط مذہب منسوب کر دیا گیا ہو اس نسبت کی وجہ سے ساقط العدالۃ قرار دیا جانے لگے تو اکثر محدثین کو چوڑنا پڑیگا کیونکہ ان میں سے تقریبا ہر ایک کی طرف ایسی باتیں منسوب ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے

"যাদের প্রতি [উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে) ভ্রান্ত মাযহাবের সম্বন্ধ করা হয়েছে, যদি এই সম্বন্ধের কারণেই তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে ধরা হয়, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণকে বর্জন করতে হবে। কারণ আনুমানিক তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিই এমন সব ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা তাঁরা পছন্দ করতেন না।"[৬২২]

এ কারণেই হাদীস শাস্ত্রের প্রায় সকল ইমামই তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.), যিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের যাচাইয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং যিনি সামান্য সন্দেহপূর্ণ হবার কারণে বহু রাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন– তিনিও তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইকরিমা (রহ.)-এর বহু রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং যিনি সামান্য সন্দেহপূর্ণ হবার কারণে বহু রাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন– তিনিও তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইকরিমা (রহ.)-এর বহু রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি হযরত ইকরিমা (রহ.) কে ভালো-মন্দ বলতেন। কিন্তু তিনিও তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইকরিমা (রহ.)-এর রেওয়ায়েত মাকরূন [মিলিত]ভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর ব্যাপারেও বলা হয় যে, তিনি ইকরিমা (রহ.)-কে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনিও স্বয়ং মুয়াত্তা'র হজ্ব শীর্ষক অধ্যায়ে ইকরিমা

---

৬২২. এখানকার সবগুলো উক্তি হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) উদ্ধৃত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : 'হাদয়ূস সারী' ২/১৯২-১৯৬

(রহ.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।[৬২৩] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ.)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি তাঁকে ভালো-মন্দ বলতেন। কিন্তু খালিদুল হাযযা থেকে বর্ণিত আছে যে, "প্রত্যেক ওই হাদীস যার ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) 'সাবাতা আন ইবনে আব্বাস [অর্থাৎ না কথাটি ইবনে আব্বাস থেকে প্রমাণিত] বলবেন, সেটা তিনি ইকরিমা (রহ.) থেকেই শুনেছেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অপছন্দ করার কারণে নাম উল্লেখ করতেন না।"[৬২৪] এব্যাপারে, তাহকীকপূর্ণ কথা এটাই যে, হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য। হাদীসের অধিকাংশ ইমাম নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় তাঁর রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন।

গোল্ড যিহারের আরেকটি বিভ্রান্তি ঃ گولڈزیہر کا ایک مغالطہ

অবশেষে এখানে গোল্ড যিহারের আরেকটি আনুষঙ্গিক বিভ্রান্তি শনাক্ত করা সমীচীন হবে। তিনি এ ঘটনা লিখেছেন যে, হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা এত অল্প সংখ্যক ছিল যে, তাঁর লাশ বহন করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। অপরদিকে একই দিনে আরবের প্রসিদ্ধ কবি কুসাইয়ার উযযা ইন্তেকাল করলে তার জানাযায় কুরাইশদের বিরাট এক জামাত অংশ গ্রহণ করে। এ ঘটনা বর্ণনা করে গোল্ড যিহার এক ঢিলে দু'টি পাখি শিকার করতে চেয়েছেন।

একদিকে এ ধারণা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন যে, তৎকালীন সময়ে সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে হাদীসের ধারক-বাহকের তুলনায় একজন কবির মর্যাদা ছিল অধিক। অপর দিকে এ ভ্রান্তিও ছড়াতে চাইলেন যে, হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর জানাযায় লোক সংখ্যার উপস্থিতি কম হওয়ার একটি কারণ এটাও ছিল যে, মানুষ বংশগত একজন দাসকে মৃত্যুর পরেও একজন খাঁটি আরবীর তুলনায় তুচ্ছ মনে করত।[৬২৫]

কিন্তু গোল্ড যিহারের এই ধ্যান-ধারণা ওই হিংসা ও বিদ্বেষ-পরায়ণতার উপর ভিত্তিশীল, যাচাই-বাছাইহীন কথাকে গ্রহণ করে এর উপর অবান্তর ও ভিত্তিহীন কল্পনা সৌধ নির্মাণ করতে কোনো লজ্জা অনুভূত হয় না। প্রকৃত ঘটনা হলো, প্রথমতঃ এ গল্পটিই একবারে ভুল ও মিথ্যাচার যে, কুসাইয় কবির জানাযায় অনেক লোক জামাত অংশগ্রহণ করেছে আর হযরত ইকরিমার ভাগ্যে খাটিয়া উঠানোর মতো চারজনও ছিলনা! হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) বলেন–

---

৬২৩. ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত "আত তারীখুল কাবীর" ৪/৪৯

৬২৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/২৪৫ ও 'হাদয়ূস সারী' ২/১৯৪

৬২৫. গোল্ড যিহার রচিত "মাহাহিবুত তাফসীরিল ইসলামী" পৃ: ৯৫-৯৬)

সূচিপত্র

والذى نقل انهم شهدوا جنازة كثير وتركوا عكرمة لم يثبت لأن ناقله لم يسم

"এই যে কথাটি বর্ণিত আছে যে, লোকেরা কুসাইয়ারের জানাযায় উপস্থিত হয়েছে আর ইকরিমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এ কথাটি প্রমাণিত নয়। কারণ এটা একজন মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যক্তি বর্ণনা করেছে।"[৬২৬]

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বাস্তবেই হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর জানাযায় লোক সংখ্যা কম ছিল, তবুও হযরত ইকরিমা (রহ.) যে অবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন, তা দৃষ্টে উপস্থিতির সংখ্যা কম হওয়ার বিষয়টি আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, দীর্ঘ দিন যাবত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে রেখেছিল। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তিনি আত্মগোপন করেছিলেন এবং এ অবস্থাতেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। স্পষ্টতই এমতাবস্থায় লোকেরা তাঁর মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে জানতে পারেনি। ফলে বেশি লোক তাঁর জানাযায় শরীক হতে পারেনি। এর থেকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ফলাফল বের করতে পারে যে, জনসাধারণের অন্তরে একজন কবির চেয়েও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ কম ছিল? বরং বিশুদ্ধ ইতিহাসে তো এ কথা বর্ণিত আছে যে, যখন লোকেরা হযরত ইকরিমা ও কবি কুসাইয়ারের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারে, তখন তাঁদের মুখে মুখে এ বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছিল–

مات افقه الناس واشعر الناس

"আজ সবচেয়ে বড় ফকীহ ও বড় কবির ইন্তেকাল হয়ে গেল।"[৬২৭]

অতঃপর প্রখাত পণ্ডিতদের গবেষণার অবস্থা দেখুন! তারা ক্ষুদ্র ও ভিত্তিহীন ছোট্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেমন দাপটের সাথে বড় বড় সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ মানুষের অন্তরে সুন্নাতের 'ধারক-বাহকদের' সম্মান ও মর্যাদা যাচাইয়ের জন্য শুধুমাত্র হযরত ইকরিমা (রহ.)-এর জানাযাই রয়ে গিয়েছিল? তিনি ব্যতীত যে, লক্ষ লক্ষ 'সুন্নাতের ধারক-বাহক' ব্যক্তিবর্গ অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁদের জীবন-মৃত্যুর অসংখ্য ঘটনাবলী থেকে কি এ বিষয়টির উপর কোনো আলোকরশ্মি পড়ে না? অনুরূপভাবে দাসবংশীয় উলামায়ে কেরামের সাথে সাধারণ মানুষের আচরণ জানার জন্য এই একটি ঘটনাই কি তারা ইতিহাসের পাতায় পেয়েছেন? হযরত ইকরিমা (রহ.) ব্যতীত হাজার হাজার দাস যে ইলম অর্জন করার পর খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন এবং স্বয়ং হযরত ইকরিমা (রহ.)ও যে সম্মান ও

---

৬২৬. তাহযীবুত তাহযীব : ৭/২৭৩

৬২৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/২৪৫

সূচিপত্র

মর্যাদা লাভ করেছিলেন, সেসব ঘটনা দ্বারা কি এ বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা মেলে না?[৬২৮]

বাস্তব কথা হলো, কোনো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে প্রাচ্যবিদদের এ জাতীয় অবান্তর অভিযোগ-আপত্তিগুলো উল্লেখ করতেও ইতস্তত হয়। তবুও বিষয়টি এ জন্য আলোচনা করা হলো, যেন তাদের গবেষণার মানদন্ড ও চিন্তা-চেতনার আসল চেহারা পাঠকদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। যারা গবেষণার নামে নিজেদের হিংসা ও বিদ্বেষতার আগুনকে ঠান্ডা করায় মগ্ন রয়েছে।

৪. হযরত ত্বউস (রহ.) : حضرت طاوس

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবদুর রহমান ত্বউস ইবনে কাইসান আল-হিময়ারী আল-জুনদী। যিনি ইয়ামানের 'জুনদ' শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনিও একজন গোলাম ছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত যায়েদ ইবনে আরমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও অন্যান্য আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তবে হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও খুলাফায়ে রাশেদীন (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে তাঁর রেওয়ায়েতগুলো (সাহাবীদের মাধ্যম উহ্য) হিসেবে বর্ণিত। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়াও সমকালীন যুগে তিনি ইবাদত ও যুহুদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি চল্লিশবার হজব্রত পালন করেছেন।

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, "তোমরা যদি ত্বউসকে দেখতে, তাহলে বিশ্বাস করে নিতে যে, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না।" আমর ইবনে দীনারের উক্তি হচ্ছে, "মানুষের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে আমি ত্বউস (রহ.)-এর ন্যায় অধিক সতর্ক আর কাউকে দেখিনি।"[৬২৯]

আল্লামা নববী (রহ.) লিখেন, "তাঁর মর্যাদা, প্রজ্ঞা, ইলমী গভীরতা, তাকওয়া ও পরিশুদ্ধতা, মেধা ও স্মৃতিশক্তি ও সতর্কতার ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত।"[৬৩০]

হাফেয আবু নুআইম ইস্পাহানী (রহ.) স্বীয় হিল্য়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হযরত তউস (রহ.)-এর তাকওয়া-বুযুর্গীর ঘটনাবলী এবং তাঁর মালফূযাত বা মুখ-নিঃসৃত বাণীসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। ১৫০ হিজরী সনে মিনা

---

৬২৮. একটু পরে হযরত ত্বউস (রহ.)-এর জানাযার অবস্থাও আসবে। যেসব সুন্নাতের ধারক-বাহকদের আলোচনা করা হবে, তাঁদের অধিকাংশই দাস ছিলেন।

৬২৯. 'তাহযীবুত তাহযীব : ৫/৯-১০' হতে এ উক্তি গুলো সংগৃহীত।

৬৩০. তাহযীবুল আসমা : ১/২৫১

সূচিপত্র

অথবা মুযদালিফায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ থেকে নিয়ে উলামায়ে কেরামসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন। এমনকি মানুষের ভিড়ের কারণে খলীফার পুলিশ পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালেব (রহ.) তাঁর লাশবাহী খাট লাগাতার নিজ কাঁধে ধারণ করে রাখেন। এভাবে তাঁর টুপি পড়ে গিয়েছিল এবং চাদর ফেটে গিয়েছিল।[৬৩১]

৫. হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ্ (রহ.) ঃ حضرت عطاء بن ابی رباح

প্রকাশ থাকে যে, তাবেঈনদের যুগে "আতা" নামে চারজন বুযুর্গ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। যথা আতা ইবনে আবী রাবাহ্ (রহ.), আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) আতা ইবনুস সায়েব (রহ.) ও আতা আল-খুরাসানী (রহ.)। এঁদের মধ্য হতে প্রথমোক্ত দু'জন সর্বসম্মতভাবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। শেষোক্ত দু'জনের ব্যাপারে কিছু মতবেদ রয়েছে। দীনি গ্রন্থসমূহে শুধু 'আতা' শব্দ উল্লেখ থাকলে এর দ্বারা সাধারণত আতা ইবনে আবী রাবাহ্ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ্ (রহ.)-এর পুরো নাম হলো, আবু মুহাম্মদ আতা ইবনে আবী রাবাহ্ আল-মাক্কী আল-কুরাইশী। তিনি ইবনে খাইসাম কুরাইশীর আযাদকৃত দাস ছিলেন। হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতকালের শেষ দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অন্যান্য সাহাবা ও তাবেঈন হতে ইলম অর্জন করেন। বিশেষ করে ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বীয় যুগে হজের বিষয়ক মাসাইলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।[৬৩২] ইবাদত ও যুহ্দের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবনে জারীর (রহ.) বলেন, "বিশ বৎসর পর্যন্ত মসজিদের মেঝেই ছিল তাঁর শয়ন বিছানা।" মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দীবায বলেন, "আতা (রহ.) হতে উত্তম কোনো মুফতী আমি দেখিনি। তাঁর মজলিস লাগাতার আল্লাহ তা'আলার যিকিরে প্রাণবন্ত থাকতো। এ ধারা কখনো ব্যাহত হতো না। এমতাবস্থায় কোনো ফিকহী মাস'আলা জিজ্ঞাসা করলে চমৎকার জবাব দিতেন।[৬৩৩]

---

৬৩১. হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪/৩
৬৩২. তাহযীবুল আসমা : ১/৩৩৩-৩৩৪
৬৩৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/৯২

সূচিপত্র

তবে যেসব সাহাবায়ে কেরাম থেকে হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ্ (রহ.) বর্ণনা করতেন, তাঁদের সবার থেকে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত নেই। এমনকি হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), যার কাছ থেকে তিনি অধিকতর বর্ণনা করতেন, তাঁর থেকেও মাধ্যম বিহীন শ্রবণ প্রমাণিত নেই।

অনুরূপভাবে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উম্মে হানী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উম্মে কুর্য (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উসামা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), জুবাইর ইবনে মুত্ইম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতেই তিনি বিনা মধ্যস্থতায় রেওয়ায়েত শ্রবণ করেননি। অতএব, এ সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-গণ থেকে তাঁর রেওয়ায়েতগুলো বিনা মাধ্যমে মুরসাল। ইমাম আহমদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর মুরসাল রেওয়ায়েতকে "সবচেয়ে দুর্বল মুরসাল" বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তিনি যেনতেন যে কোনো কারো কাছ থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন।[৬৩৪]

৬. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) : حضرت سعید بن المسیب

তাঁর পূর্ণ নাম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব[৬৩৫] বিন হুয্ন আল-কারশী আল-মাখযূমী। তিঁনি ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর জামাতা। এ কারণে হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর অনেক রেওয়ায়েত তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবাদত ও যুহুদ-তাকওয়ার অবস্থা ছিল এই যে, চল্লিশ বছর যাবত এমন কোনো আযান হয়নি, যা তিনি মসজিদে থেকে শুনেননি।[৬৩৬] তিনি লাগাতার রোযা রাখতেন। জীবনে চল্লিশ বার হজ পালন করেছেন। কখনো কোনো আমীর-উমারার হাদিয়া-উপহার গ্রহণ করেনি। তৈল ইত্যাদির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "কখনো কখনো আমি শুধু একটি হাদীসের সন্ধানে কয়েক দিন-রাত পর্যন্ত সফর করতে থাকতাম।[৬৩৭] হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর শাসনামলের তৃতীয় বছরে তাঁর জন্ম হয়।

তাই অনেক সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে তিনি সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেননি, সেগুলোকে অধিকাংশ তিনি মাধ্যমহীন (মারসাল হিসেবে) বর্ণনা

---

৬৩৪. তাহযীবুত তাহযীব : ৭/২০২-২০৩

৬৩৫. শব্দটিকে "মুসাইয়্যিব" ও "মুসাইয়্যাব" উভয়ভাবেই পড়া যায়। "মুসাইয়্যাব" শব্দটি বেশি প্রসিদ্ধ। তবে বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং হযরত সাঈদ নিজে "মুসাইয়্যাব" পড়াকে পছন্দ করতেন না। কারণ মদীনাবাসীদের সাধারণ অভ্যাস ছিল "মুসাইয়্যিব" পড়া। তাহযীবুল আসমা : ১/২১৯

৬৩৬. প্রাগুক্ত : ৪/৮৭

৬৩৭. তাযকিরাতু হুফ্ফায : ১/৫১-৫২

সূচিপত্র

করতেন। কিন্তু তাঁর মুরসাল হাদীসমূহ সেসব আলেমদের নিকটও গ্রহণযোগ্য, যারা মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে মানতেন না। যেমন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে মানতেন না। কিন্তু তিনি বলেন–

إرسال ابن المسيب عندنا حسن

"ইবনে মুসাইয়্যিবের মুরসাল আমাদের নিকট হাসান বা উত্তম।"

এর কারণ এটাই যে, তিনি সর্বদা নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকেই রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন। অনির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েত তিনি বর্ণনা করতেন না।[৬৩৮]

তবে ইমাম নববী (রহ.) এ ধারণাকে খন্ডন করেছেন যে, 'শাফেয়ীদের নিকট তাঁর মুরসাল বর্ণনা সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য।'

বরং তিনি এর পরিবর্তে বলেন যে, আমাদের নিকট তাঁর মুরসাল বর্ণনার বিধান সেটাই, যেটা অন্যান্য বড় বড় তাবেঈদের মুরসাল বর্ণনার বিধান। অর্থাৎ যদি কোনো মুসনাদ বর্ণনা দ্বারা কিংবা অন্য কোনো মুরসাল বর্ণনা দ্বারা অথবা কোনো সাহাবীর উক্তি দ্বারা কিংবা সাহাবা-পরবর্তী অধিকাংশ ফকীহদের উক্তি দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে এটাকে গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় নয়।[৬৩৯] যা হোক, এ আলোচনা হলো, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। হানাফীদের নিকট তাঁর মুরসাল বর্ণনা সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে ৯১ হিজরী থেকে নিয়ে ১০৫ পর্যন্ত বিভিন্ন মতভেদ প্রচলিত রয়েছে।

৭. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) ঃ محمد بن سيرين

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.)। তাঁর পিতা হযরত সিরীন, হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন এবং তাঁর মাতা সাফিয়্যা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর আযাদকৃত বাদী ছিলেন। হযরত সাফিয়্যা যখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর মালিকানায় আসেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিনজন সহধর্মিনী তাঁকে সুগন্ধি মেখে দেন। আঠারোজন বদরী সাহাবী এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)ও ছিলেন। তিনি দুআ করেছেন আর বাকি সাহাবীগণ "আমীন" বলেছেন। হযরত সিরীন (রহ.)-

---

৬৩৮. তাহযীবুত তাহযীব : ৪/৮৫-৮৭

৬৩৯. তাহযীবুল আসমা : ১/২২১, মুকাদ্দামাতুল মাজমূ' শরহুল মুহাযযাব : ১/১০০

এর সন্তানদের মধ্যেও ছয়জন মুহাম্মদ, মা'বাদ, আনাস, ইয়াহ্ইয়া, হাফসা ও কারীমা প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই ছয়জনের প্রত্যেকেই হাদীসের নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত পুত্র ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন। যাঁর আশ্চর্যজনক অবস্থা বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারী প্রবাদতুল্য। হযরত হিশাম ইবনে হাস্সান (রহ.) বলেন, "আমরা ইবনে সিরীনের ঘরে অবস্থান করছিলাম। আমরা দিনের বেলা তাঁর হাসির আওয়াজ শুনতাম। (কারণ তিনি খোশ মেজাজ সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন)। আর রাতের বেলা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতাম।" তাকওয়া ও পরহেযগারীর কারণেই তাঁকে কারাবরণের কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। ওই কারাবন্দী অবস্থায় কারারক্ষী দারোয়ান তাঁকে প্রস্তাব করল যে, 'আপনি দৈনিক রাতের বেলা আপনার ঘরে চলে যাবেন, সকাল বেলা আবার ফিরে চলে আসবেন।' কিন্তু তিনি এ জবাব দিলেন, 'আল্লাহর শপথ! বাদশার খেয়ানত করতে আমি তোমাকে সহায়তা করবো না।'[৬৪০]

তাঁর কারারুদ্ধ অবস্থায়ই প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তাঁর পিতার মনিব হযরত আনাস (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। তিনি ওসিয়্যত করেছিলেন, যেন মুহাম্মদ ইবনে সিরীন তাঁর গোসল দেন। মানুষ তাঁর নিকট এসে এই ওসিয়্যতের কথা উল্লেখ করল। জবাবে তিনি বললেন, "আমি বন্দী অবস্থায় আছি।" লোকেরা বলল, আমরা বাদশা থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি। হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বললেন, "আমার বন্দীকারী তো বাদশা নয়; বরং ওই ব্যক্তি যার হক আদায় করা আমার উপর ওয়াজিব।" লোকেরা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমতি নিল। তখন তিনি গিয়ে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কে গোসল দেন।[৬৪১]

যা হোক, হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) সর্বজন স্বীকৃত তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের ইমাম। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত আছে। যে সকল সাহাবা থেকে তাঁর শ্রবণ হয়নি, তাঁদের থেকে তিনি মাধ্যম বিহীন (মুরসাল হিসেবে)

---

৬৪০. এ পর্যন্ত সবগুলো অবস্থা "তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত" : ১/৮৩ হতে সংগৃহীত।

৬৪১. আবু নুআ'ইম রচিত : "হিলয়াতুল আউলিয়া" : ২/২৬৭

সূচিপত্র

বর্ণনা করেন। তবে তাঁর মুরসাল বর্ণনা সেসব ব্যক্তিও গ্রহণ করতেন, যারা মুরসাল বর্ণনাকে দলীল হিসেবে মানতেন না। যেমন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন–

ومحمد بن سيرين من اورع الناس فى منطقه، ومراسيلة من اصح المراسيل

"আর মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) তাঁর কথাবার্তায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি। তাঁর মুরসাল সমূহ সবচেয়ে বিশুদ্ধতম মুরসাল।"[৬৪২]

১১০ হিজরীর ৯ই শাওয়াল তিনি বসরায় ইন্তেকাল করেন।[৬৪৩]

৮. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) ঃ حضرت زيد بن سلم

তাঁর পুরো নাম হলো, আবু আবদুল্লাহ যায়েদ ইবনে আসলাম আল-উমরী। (মৃত্যু : ১৩৬ হি.)। তিনি পবিত্র মদীনার বাসিন্দা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

তিনি তাফসীর শাস্ত্রের একজন বড় আলেম ছিলেন। সর্বসম্মতভাবে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। মসজিদে নববীতে তাঁর দরসের হালকা বসতো। তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, আমার পিতা যদি কখনো আমাকে তাঁর কোনো শাগরিদের নিকট পাঠাতেন, তখন সে আমার মাথায় চুমু খেয়ে বলতো, "আল্লাহর কসম! তোমাদের পিতা আমাদের কাছে আমাদের পরিবার-পরিজন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাদেরকে এ সংবাদ দেওয়া হয় যে, হয়তো আমাদের পরিবার-পরিজনের কারো মৃত্যু হবে অথবা যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর। আর আমাদেরকে এ এখতেয়ার দেওয়া হয় যে, যার মৃত্যু চাও গ্রহণ করে নাও– তাহলে আমাদের ইচ্ছা ও আশা এটাই হবে যে, যায়েদ ইবনে আসলাম বেঁচে থাকুক।"[৬৪৪]

হযরত আবু হাযেম (রহ.) বলেন, আমরা চল্লিশজন ফুক্বাহায়ে কেরামের সাথে হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর মজলিসে অবস্থান করতাম। আমাদের সবার ক্ষুদ্র একটা অভ্যাস ছিল যে, আমরা অর্থ-সম্পদ দিয়ে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম। এ মজলিসে কখনো এমন

---

৬৪২. মিনহাযুস সুন্নাহ : ৩/৮৬

৬৪৩. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৬

৬৪৪. তাহযীবুত তাহযীব [টীকাসহ] : ৩/৩৯৫-৩৯৬

দু'জন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি, যারা অহেতুক কোনো আলাপ বা ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে।[৬৪৫]

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) কে সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, "তাঁর কোনো খারাপী সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে অধিকহারে তিনি নিজ রায়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমের তাফসীর করতেন।" আর সুফ্ইয়ান ইবনে উ'আইনা (রহ.)-এর উক্তি হলো, "যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) একজন নেককার মানুষ ছিলেন।

তবে তাঁর স্মৃতিশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল।" (তাহযীবুত তাহযীব) এ দু'জন ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর উপর জারাহ্ (সমালোচনা) করেছেন বলে নজরে পড়েনি।

হাফেয যাহাবী (রহ.) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর একখানা তাফসীর ছিল। যেটাকে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) বর্ণনা করতেন।[৬৪৬]

তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) স্বীয় তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুণে গুণান্বিত থাকা সত্ত্বেও দুর্বল।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণনাকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন।[৬৪৭] অতএব, হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর যেসব তাফসীর বিষয়ক রেওয়ায়েত তাঁর পুত্র আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, সেগুলো পুরোপুরি অনির্ভরযোগ্য। তাঁর পুত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সামনে আসছে।

৯. হযরত আবুল আলিয়া (রহ.) ঃ حضرت ابوالعالیہ

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবুল আলীয়া রুফাই' ইবনে মিহরান। আর-রিয়াহী। যিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী। জাহেলিয়াতের যুগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তিনি মুসলমান হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের দু'বছর পর। হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে তিনি সাক্ষাত করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু),

---

৬৪৫. "তাহযীবুল আসমা" : ১/২০০

৬৪৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/১২৫

৬৪৭. দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব : পৃঃ ১৭৮-১৭৯

সূচিপত্র

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন।

তিনি পবিত্র কুরআনুল কারীমের একজন উত্তম ক্বারী ছিলেন। তিনিও রাবাহ গোত্রের একজন নারীর আযাদকৃত দাস ছিলেন।[৬৪৮] কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তাঁকে নিজের সাথে চৌকিতে বসাতেন। অথচ অন্যান্য কুরাইশী লোকেরা নিচে বসতেন। আর তিনি বলতেন, ইলম এভাবেই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।[৬৪৯] উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। হিজরী ৯৩ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৫০] মা-অরাউন নাহার অঞ্চলে তিনিই সর্বপ্রথম আযান দিয়েছিলেন।[৬৫১]

১০. হযরত উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রহ.) : حضرت عروہ بن الزبیر

তিনি ছিলেন হযরত যুবাইর ইবনে আউয়াম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর পুত্র। পবিত্র মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফকীহ'র মধ্য হতে তিনিও অন্যতম। তিনি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর ভাগিনা। এ সুবাদে তিনি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বহু রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাঁকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর মান-মর্যাদা, জ্ঞান-গরিমা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর সবাই একমত।[৬৫২] তাঁর পুত্র হিশাম (রহ.) বলেন, আমার পিতা সর্বদাই রোযা রাখতেন এবং রোযা অবস্থায়ই [৯৪ হিজরীতে) তার ইন্তেকাল হয়। ইবনে শুযাব (রহ.) বলেন, "উরওয়া (রহ.) প্রতিদিন পবিত্র কুরআনুল কারীমের এক চতুর্থাংশ তেলাওয়াত করতেন। রাতের বেলা তাহাজ্জুদ সালাতেও ক্বুরআন তেলাওয়াত করতেন। এ আমলটি সারা জীবনের মধ্যে শুধু ওই রাতেই বাদ গিয়েছে যে রাতে (এক রোগের কারণে) তাঁর পা কাটা হয়েছিল।[৬৫৩]

১১. হযরত হাসান বসরী (রহ.) : حضرت حسن بصری

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু সাঈদ হাসান ইবনে আবীল হাসান ইয়াসার আল-বসরী (রহ.)। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) (কারো কারো মতে জামীল ইবনে কুতাইবা)-এর আযাদকৃত ছিলেন। তাঁর মাতা খাইরাহ্

---

৬৪৮. "তাহযীবুল আসমা" : ২/২৫১
৬৪৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/৫৮
৬৫০. তাহযীবুত তাহযীব : পৃ. ৩/২৮৪
৬৫১. "হিলয়াতুল আউলিয়া" : ২/২২১
৬৫২. "তাহযীবুল আসমা" : পৃ: ৩৩১-৩৩২
৬৫৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/৫৯

সূচিপত্র

হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর আযাদকৃত দাসী ছিলেন। এমনকি তিনি কখনো কখনো হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর দুধও পান করেছেন। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাহাদাতের দুই বছর পূর্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞানও অর্জন করেছেন। ইলম ও প্রজ্ঞায় তাঁর মান-মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর ইবাদত, যুহুদ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মালফূযাত খুবই প্রসিদ্ধ। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন বিরাট বীর মুজাহিদ। একাধিক যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।[৬৫৪]

হযরত মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে তিনি খুরাসানের গভর্নর রবী' ইবনে যিয়াদের কাতেব (লেখক) ছিলেন। তিনি মুরসাল হিসেবে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ যেসব সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদীস শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যস্থতা উল্লেখ করেননি) ।এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য কি-না? এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মাঝে প্রচন্ড মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ সেগুলোকে গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ সেগুলোকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

ইমাম ইবনুল মাদীনি (রহ.) বলেন, "হাসান (রহ.)-এর মুরসাল রেওয়ায়েতগুলো যদি নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হয়, তাহলে তা বিশুদ্ধ এবং অনির্ভরযোগ্যতা খুবই কম হবে।" ইমাম আবু যুর'আ (রহ.)-এর উক্তি হলো, 'যে সকল হাদীস হাসান বসরী (রহ.) قال رسول صلى الله عليه وسلم (আল্লাহর রাসূল বলেছেন) বলে (মধ্যস্থতা বাদ দিয়ে) বর্ণনা করেছেন, আমি তাহকীক করে সেগুলোকে যথাযথ পেয়েছি। শুধু চারটি হাদীস ব্যতীত (যেগুলোর ভিত্তি আমি খুঁজে পাইনি)। তবে ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর ও আতা (রহ.)-এর মুরসাল বর্ণনাগুলোকে

اضعف المراسيل বা সবচেয়ে দুর্বলতম মুরসাল বলে মন্তব্য করেছেন।[৬৫৫]

১১০ হিজরী সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

১২. হযরত কাতাদাহ (রহ.) ঃ حضرت قتادہ

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবুল খাত্তাব কাতাদাহ্ ইবনে দিআ'মাহ ০ আল-বসরী। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মৃতিশক্তির অবস্থা এমন ছিল যে তিনি নিজেই বলেন, "আমি কোনো মুহাদ্দিসকে দ্বিতীয়বার হাদীস

---

৬৫৪. "তাহযীবুল আসমা" : পৃ: ১/১৬১

৬৫৫. তাহযীবুত তাহযীব : পৃ. ৩/২০২, আতা ইবনে আবী রাবাহ ইবনুল মাদানী ও আবু যুরআ (রহ.)-এর উক্তি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব : পৃ: ২/২৬৬-২৭০

সূচিপত্র

শোনাবার অনুরোধ করিনি। আমার কান এমন কোনো কথা শ্রবণ করেনি, যেটাকে আমার অন্তর আবদ্ধ করেনি।" তিনি আরো বলেন, "পবিত্র কুরআনুল কারীমের এমন কোনো আয়াত নেই, যার ব্যাপারে আমি কিছু না কিছু (রেওয়ায়েত) শুনে রাখিনি।' ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, "কাতাদাহ (রহ.) তাফসীর শাস্ত্রের অনেক বড় একজন আলেম।" এ ছাড়াও আরবী ভাষা, আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও নসবনামা উপর তাঁর অনন্য দখল ছিল। অবশ্য মুহাদ্দিসগণ বলেন, বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো তাদলীস করে ফেলতেন। ১১৮ হিজরী সনে প্লেগ রোগের মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ওয়াসিত শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৫৬]

১৩. হযরত কা'ব আল-কারযী (রহ.) ঃ

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে কা'ব ইবনে সুলাইম ইবনে আসাদ আল-কারযী। উপনাম আবু হামযা বা আবু আবদুল্লাহ। তাঁর পিতা কুরাইযা গোত্রের লোক ছিলেন। বনু কুরাইযার যুদ্ধের সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে তাঁর নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারযী (রহ.) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত বারা ইবনে আযেব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত কা'ব ইবনে উযরা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যা'ফর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-সহ আরো বহু সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন, "তিনি নির্ভরযোগ্য ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আলেম ছিলেন।" ইমাম আযলী (রহ.)-এর উক্তি হলো, "তিনি নির্ভরযোগ্য ও সৎ ব্যক্তি ছিরেন এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের আলেম ছিলেন।" আওন ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন যে, "আমি তাফসীর বিষয়ে তাঁর চেয়ে বড় আলেম আর দেখিনি।"[৬৫৭] আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, "তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত।" প্রাথমিক জীবনে তিনি কূফার অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবার পবিত্র মদীনায়

---

৬৫৬. এ সবগুলো কথা 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায : পৃ: ১১৫-১১৭ হতে সংগৃহীত।
৬৫৭. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/৪২২

সূচিপত্র

প্রত্যাবর্তন করেন। হিজরী ১০৮ হতে ১২০ সনের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৫৮]

১৪. হযরত আলকামাহ্ (রহ.) ঃ حضرت علقمہ

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু শুবাইল আলকামাহ্ ইবনে কায়েস ইবনে আবদুল্লাহ আন-নাখঈ। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমনিতে তিনি অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকেই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। এমনকি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই তিনি তাঁর সাদৃশ্য ছিলেন। এ জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাঁর উপর এবং আসওয়াদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা যায়। তিনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের ক্বারী ছিলেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীম শুনতেন। একদা এক রাতেই তিনি পুরো কুরআন খতম করে ফেলেন। তিনি সর্বসম্মত নির্ভরযোগ্য রাবী। বিশেষ করে ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি অনেক উঁচু মাকামের অধিকারী। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে হিজরী ৬২ হতে ৭৩ পর্যন্ত বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।[৬৫৯] তিনি অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের বুযুর্গ ছিলেন। নিজের ঘরোয়া কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। নিয়মিত দরসের মজলিস করা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, 'এই বিষয়টা আমার পছন্দনীয় নয় যে লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলবে আর একে অপরকে বলবে, "ইনি আলকামাহ"। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বাসস্থান ছাড়া শুধু পবিত্র কুরআনুল কারীমের একটি কপি এবং একটি ঘোড়া উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন।[৬৬০]

১৫. হযরত আসওয়াদ (রহ.) ঃ حضرت اسود

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু আমর আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কায়েস আন-নাখঈ (রহ.)। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। হযরত আলকামাহ (রহ.)-এর ভাগিনা ও হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মামা। আল্লামা নববী (রহ.)

---

৬৫৮. "তাহযীবুল আসমা" : ১/৯০
৬৫৯. তাহযীবুত তাহযীব : ৭/২৭৮
৬৬০. "হিলয়াতুল আউলিয়া" : ২/১০০

সূচিপত্র

বলেন, "তাঁর নির্ভরযোগ্যতা ও মান-মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত।" ইবাদত ও যুহুদের ক্ষেত্রে খুবই প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, তিনি নিজের জীবনে আশিবার হজ অথবা উমরা করার জন্য হারামাইন শরীফাইন সফর করেছেন। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান প্রতিদিন সাতশত রাকাত সালাত আদায় করতেন। এতদসত্ত্বেও বলা হতো যে, হযরত আসওয়াদের পরিবারে তিনিই ইবাদতে সবচেয়ে কম মেহনত করতেন।[৬৬১]

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেন, "হযরত আসওয়াদ (রহ.) রমযান মাসে প্রতি দুই রাতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের এক খতম করতেন। মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে কিছুটা সময় শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। রমযান ব্যতীত অন্যান্য সময়ে প্রতি ছয় রাতে পবিত্র কুরআন মাজীদের এক খতম দিতেন।" রোযা এত বেশি রাখতেন যে, শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে যেত। হযরত আলকামাহ (রহ.) তাঁকে বলতেন, "নিজের শরীরকে এত কষ্ট দাও কেন?" তিনি উত্তরে বলেছেন, "এ শরীরের পরকালীন আরামই চাচ্ছি।" আবার কখনো কখনো জবাবে বলতেন, আবু শুবাইল! আখেরাতের বিষয়টা খুবই ভয়াবহ।[৬৬২] হিজরী ৭৫ সনের কাছাকাছি কোনো একসময়ে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

১৬. মুররা আল-হামদানী (রহ.) : مرة الهمداني

তাঁর পুরো নাম হলো, আবু ইসমাঈল মুররা ইবনে শুরাহীল আল-হামদানী আস-সাকসাকী আল-কূফী। তিনি তাঁর যুগে "أمرة الطيب" ও "أمرة الخير" উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনিতে তো তিনি 'মুখাযরিমীন'দের অন্তর্ভুক্ত।[৬৬৩] তাই বহু সাহাবী থেকে তিনি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। যেমন, হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) প্রমুখ। তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে তিনি বেশি ইলম অর্জন করেন। তাই তাফসীর গ্রন্থসমূহে হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর তাফসীর বিষয়ক বর্ণনাগুলোর অধিকাংশই তাঁর বর্ণিত। তিনি সর্বজনস্বীকৃত নির্ভরযোগ্য।

---

৬৬১. 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/৪৮ ও 'তাহযীবুল আসমা' : ১/১২২

৬৬২. "হিলয়াতুল আউলিয়া" : ২/১০৩-১০৪

৬৬৩. মুখাযরিমীন ওই সকল ব্যক্তিদেরকে বলা হয়, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষাত করেননি।

তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর আধিক্যের অবস্থা ছিল এমন যে ঐতিহাসিকগণ লিখেন, "তিনি এত বেশি সিজদা করেছেন যে মাটি তাঁর কপাল খেয়ে ফেলেছিল।" তাঁর দৈনন্দিন সালাতের পরিমাণ কেউ কেউ ৫০০ শত রাকাত আর কেউ কেউ ৬০০ রাকাত বলেছেন।[৬৬৪] হাফেয যাহাবী (রহ.) লিখেন যে, "তাফসীর বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। আনুমানিক হিজরী ৯০ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৬৫] তবে এ কথা স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তাফসীরের গ্রন্থসমূহে তাঁর তাফসীরের বেশির ভাগই সুদ্দী থেকে বর্ণিত। যার আলোচনা দুর্বল রাবীদের শিরোনামে আসছে।

১৭. হযরত নাফে' (রহ.) ঃ حضرت نافع

তাঁর পুরো নাম হলো, আবু আবদুল্লাহ নাফে' ইবনে হরমুয। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নাফে' ইবনে কাউস। তিনি নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন তাবেঈ। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত আবু লুবাবাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত রাফে' ইবনে খাদীয (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইলম অর্জন করেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাগরিদদের মধ্যে দু'জন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একজন হলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পুত্র হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) আর অপরজন হলেন, তাঁর গোলাম হযরত নাফে' (রহ.)। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, "তাঁর মান-মর্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর সবাই একমত।"ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন,"সবচেয়ে অধিক সহীহ সনদ হচ্ছে– عن نافع. عن ابن عمر।"[৬৬৬]

স্বয়ং হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন– لقد من الله علينا بنافع (আল্লাহ তা'আলা নাফে'-এর মাধ্যমে আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) লিখেন– لايعرف له خطأ في جميع ماروا (তাঁর বর্ণিত কোনো রেওয়ায়েতেই কোনো ভুল-ত্রুটি পাওয়া যায়নি।[৬৬৭]

---

৬৬৪. তাহযীবুত তাহযীব : পৃ: ১০/৮৮
৬৬৫. 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' : ১/৬৩
৬৬৬. তাহযীবুল আসমা : ২/১২৩-১২৪
৬৬৭. তাহযীবুত তাহযীব : ১০/৪১৩-৪১৫

সূচিপত্র

ইমাম মালেক (রহ.) হযরত নাফে' (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। তিনি বলেন, "হযরত নাফে' অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ একটি কালো চাদর পরিধান করতেন এবং খুব কম কথাবার্তা বলতেন।" হযরত নাফে' (রহ.) নিজেই বলেন, "আমি ত্রিশ বছর যাবৎ হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর খেদমত করেছি। অতঃপর ইবনে আমের (রহ.) তাঁকে প্রস্তাব দেন, তিনি যেন ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমাকে তাঁর হাতে বিক্রি করে দেন। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) আমাকে বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, না-জানি ইবনে আমেরের দিরহাম আমাকে কোন ফিতনায় নিপতিত করে। যাও, তুমি মুক্ত।" হিজরী ১১৭ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৬৮]

১৮. হযরত শা'বী (রহ.) ঃ حضرت شعبی

তাঁর পূর্ণ নাম আবু আমর আমের ইবনে শুরাহীল আশ-শা'বী আল-হিময়ারী। তিনি কূফার প্রসিদ্ধ ফকীহ তাবেঈদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় পাঁচশত সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত করেছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ প্রখর। জীবনে কখনো হাদীস লিখে মুখস্ত করেননি। তিনি বলতেন, "যে কেউ আমাকে কোনো কথা শোনাতো, সাথে সাথে তা আমার মুখস্ত হয়ে যেত।"

তাঁরই উক্তি হচ্ছে, "যে বিষয় আমার সবচেয়ে কম মুখস্থ, তা হলো কবিতা। এতদসত্ত্বেও আমি যদি চাই তবে একমাস ব্যাপী কবিতা শোনাতে পারবো এবং কোনো কবিতা পুনরাবৃত্তি করতে হবে না।" তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বিশিষ্ট উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মান-মর্যাদার ব্যাপারে সকলেই একমত। ইমাম আহমদ (রহ.) ও ইমাম আযলী (রহ.) বলেন, তাঁর মুরসাল রেওয়ায়েতগুলোও সহীহ। কারণ তিনি কেবল সহীহ রেওয়ায়েত গুলোকেই মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করতেন।[৬৬৯]

১৯. হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (রহ.) ঃ حضرت ابن ابی ملیکہ

তাঁর পুরো নাম হলো, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকা আত-তামীমী আল-মাক্কী। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রহ.)-এর খেলাফতকালে মক্কা মুকার্‌রমার কাযী ও মসজিদুল হারামের মুয়াজ্জিন ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত ইবনে যুবাইর (রহ.) তাঁকে তায়েফের কাযী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বহু সাহাবায়ে কেরাম

---

৬৬৮. 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' : ১/৯৪

৬৬৯. প্রাগুক্ত ১/৭৪-৮২

সূচিপত্র

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি ত্রিশজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছি।"[৬৭০] তায়েফে অবস্থান কালে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছ থেকেও উপকৃত হয়েছেন। হাফেয যাহাবী (রহ.) বলেন–

كان إماما فقيها حجة قصيحا مفوها متفقا على ثقته

সংক্ষেপে বলতে হয় তার ইমামত ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত। হিজরী ১১৭ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৭১]

২০. হযরত ইবনে জুরাইজ (রহ.) حضرت ابن جریج

তাঁর পুরো নাম হলো, আবুল ওলীদ আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে জুরাইজ আল-কুরাইশী আল-মাক্কী। তিনি তাবে-তাবেঈনদের মধ্য হতে হযরত তউস (রহ.), হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ্ (রহ.), হযরত মুজাহিদ (রহ.), হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (রহ.) ও হযরত নাফে' (রহ.) প্রমুখ তাবেঈগণের শাগরিদ ছিলেন।

বিশেষ করে হযরত আতা (রহ.)-এর সাহচর্যে তিনি সতের বছর ছিলেন। হযরত আতা (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনার পরে আমরা কাকে মাসাইল জিজ্ঞাসা করবো? তখন হযরত আতা (রহ.) তাঁর প্রতি ইশারা করে বললেন,

اگر یہ نوان زندہ رہے تو ان سے "এ যুবক যদি জীবিত থাকে, তাহলে তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবে।" এ কারণেই হযরত আতা (রহ.)-এর রেওয়ায়েত গুলোর ব্যাপারে তাঁকে اثبت الناس (সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য) বলা হয়েছে। তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, তিনি দ্বীনি ইলমের প্রথম রচয়িতা। যিনি দ্বীনি ইলমের সর্বপ্রথম বিন্যাস সাধন করেন।

যেমন, তিনি বলেন, مادون العلم تدوینی احدا (আমার পূর্বে কেউ আমার ন্যায় দ্বীনি শিক্ষার বিন্যাস সাধন করেননি।" ইবাদত ও যুহুদের বেলাও তিনি ছিলেন উঁচু মাপের একজন বুযুর্গ। প্রত্যেক মাসের তিনদিন ব্যতীত বাকি সবগুলো দিন রোযা রাখতেন।[৬৭২] ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) বলেন, "যখনই আমি ইবনে জুরাইজ (রহ.)-কে সালাত আদায় করতে দেখতাম, তখন আমার ইয়াকীন হয়ে যেত যে, তাঁর অন্তর মহান আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত।"[৬৭৩]

---

৬৭০. তাহযীবুত তাহযীব : ৫/৩০৭

৬৭১. 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' : ১/৯৫-৯৬

৬৭২. তাহযীবুত তাহযীব : ৬/৪০৩-৪০৬

৬৭৩. তাহযীবুল আসমা : ২/২৯৭

সূচিপত্র

অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাঁকে সিকাহ নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য কতক উলামা থেকে সামান্য সমালোচনাও পাওয়া যায়। যেমন, ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ابن جريج حاطب الليل (অর্থাৎ ইবনে জুরাইজ রাতের কাঠুরে, সব ধরনের রেওয়ায়েতকেই তিনি গ্রহণ করেন)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, "যুহরী (রহ.)-এর বর্ণনার তুলনায় তাঁর বর্ণনা কিছুই নয়।"

(অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়)। কারণ তিনি কখনো কখনো দুর্বল রাবীদের কাছ থেকে তাদলীস করতেন। তাই মুহাক্কিক আলেমগণের সিদ্ধান্ত হলো যে, যেসব রেওয়ায়েত তিনি স্পষ্টভাবে حدثنى অথবা اخبرنى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন সেগুলো তো ঠিক আছে। তবে যেসব রেওয়ায়েত عن শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন সেগুলো সংশয়পূর্ণ। তবে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তাই তো সিহাহ্ সিত্তার কিতাবগুলোতে তাঁর বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।[৬৭৪]

২১. হযরত যাহ্হাক (রহ.) ঃ حضرت ضحاك

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবুল কাসেম যাহ্হাক ইবনে মাযাহিম আল-হেলালী। তিনি খোরাসানের অধিবাসী। "যাহ্হাক" শব্দের অর্থ "অধিক হাস্যকারী।" তাঁর যাহ্হাক এ জন্য রাখা হয়েছে যে, তিনি দুই বছর মাতৃগর্ভে অবস্থান করেছেন। ভূমিষ্ঠের সময় তাঁর দাঁত উঠা অবস্থায় ছিল আর তিনি হাসছিলেন।[৬৭৫]

তিনি সাহাবায়ে কেরামের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে কোনো সাহাবী থেকে তাঁর বর্ণনা সন্দেহপূর্ণ। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকেও তাঁর বর্ণনা সহীহ মত অনুযায়ী মুরসাল। আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা (রহ.) বলেন, "হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে যাহ্হাক (রহ.)-এর সাক্ষাত ঘটেনি।

অবশ্য 'রায়' নামক স্থানে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে এবং তাঁর নিকট থেকে তিনি তাফসীরের ইলম হাসিল করেছেন।[৬৭৬] অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তাঁকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শুধু হযরত শু'বা (রহ.) ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রহ.) তাঁকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু প্রথমতঃ এ দু'জন ব্যক্তি

---

৬৭৪. তাহযীবুত তাহযীব : ৬/৪০৩-৪০৬

৬৭৫. মিফতাহুস সাআদাহ : ১/৪০৪, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/২২৩

৬৭৬. তাহযীবুত তাহযীব : ৪/৪৫৩

সূচিপত্র

রিজাল শাস্ত্রে সমালোচনার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অত্যন্ত কঠোর।[৬৭৭] দ্বিতীয়তঃ হয়তো তাঁদের সমালোচনার উদ্দেশ্য এই যে, কোনো সাহাবীর সাথে যাহ্হাক (রহ.)-এর সাক্ষাত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবী থেকে সরাসরি বর্ণনা করতেন। নতুবা আসলে তিনি নির্ভরযোগ্য। তার সম্পর্কে হাফেয যাহাবী (রহ.) বলেন–

وثَقَهُ أحمَد وابن معين وأبوزرعة وغيرهم وضعفه يحيى القطان وشعبة ايضاوهو قرى فى التفسير

"অর্থ্যাৎ ইমাম আহমদ (রহ.), ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.), ইমাম আব যুর'আ (রহ.) ও অন্যান্যরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া কাত্তান (রহ.) ও শু'বা (রহ.) তাঁকে দুর্বল বলেছেন। তাফসীর বিষয়ে তিনি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী বর্ণনাকারী।"[৬৭৮]

আল্লামা ইবনে হাযার (রহ.) লিখেন–صدوق كثيرالارسال

'তিনি সত্যবাদী। তবে অধিকহারে মুরসাল বর্ণনা করতেন।"[৬৭৯] আমরা এ কথা পেছনে উল্লেখ করে এসেছি যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যেসব রেওয়ায়েত তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মুহাদ্দিসগণ সেগুলোকে দুর্বল বলেছেন। তবে তাফসীর বিষয়ক তাঁর নিজস্ব উক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য। হিজরী ১০২ হতে ১০৬ সনের মধ্যবর্তী যে কোনো এক সময় তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

قرون اولی کے ضعفا یا مختلف فیہ مفسرین

প্রথম যুগের কতিপয় দুর্বল ও বিতর্কিত মুফাসসির বৃন্দু ঃ

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত হযরতগন যাদের সিকাহ ও বিশস্ত হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগন প্রায় একমত এবং যাদের আলোচনা তাফসীর বিষয়ক উক্তি ও বর্ণনায় অধিক হারে আসতে থাকে। তাঁরা ব্যতীত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) ও হযরত কা'ব আহবার (রহ.)-এর বিস্তারিত আলোচনা "ইসরাঈলী বর্ণনা"-এর শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখন তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগের সেসব ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি তুলে ধরছি, যাদেরকে হয়তো দুর্বল আখ্যা দেওয়া হয়েছে অথবা তাদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

---

৬৭৭. দেখুন : মাওলানা আবদুল হাই লাখনুভী (রহ.) রচিত "আল-আজবিবাতুল ফাযেলা" : পৃ: ১৬১-১৮০ (শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর সম্পাদনাসহ)

৬৭৮. ইমাম যাহাবী কৃত : "আল-মুগনী ফিয্যু'আফা" : ১/৩১২

৬৭৯. তাকরীবুত তাহযীব : ১/২৭৩

সূচিপত্র

১.সুদ্দী কাবীর ঃ شدی کبیر

তাফসীরের কিতাব সমূহে "সুদ্দী" নামে দু'জন ব্যক্তি প্রসিদ্ধ আছেন। পৃথক পৃথকভাবে উভয়ের আলোচনা করা সমীচীন।

(১.) আবু মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু কারীমা সুদ্দী আল-কূফী। (মৃত্যু : ১২৭ হি.)। তাঁকে "সুদ্দী কাবীর" বলা হয়। তাফসীর গ্রন্থসমূহে যখন শুধু "সুদ্দী" শব্দ লিখা হয়, তখন সাধারণতঃ তিনিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন। তাঁকে সুদ্দী বলার কারণ হলো যে, কূফার জামে মসজিদের দরজায় একটি দেওড়ী ছিল। তিনি সেখানে বসে উড়নার ব্যবসা করতেন। (দরজার সামনের দেউড়ীকে আরবীতে 'সুদ্দাহ্' বলা হয়) এ জন্য তাঁকে সুদ্দী বলা হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআন মাজীদ তাফসীরের পাঠন-পাঠনের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তাই তো তাফসীর গ্রন্থসমূহ তাঁর উক্তি ও রেওয়ায়েত দ্বারা ভরপুর। তবে তাফসীর শাস্ত্র ও রেওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু নির্ভরযোগ্য, এ ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যেমন, হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাইদ কাত্তান (রহ.) বলেন–

لاباس به ماسمعت احد ابذکره الابخیر (তাঁর রেওয়ায়েতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি যাকেই তাঁর আলোচনা করতে শুনেছি, ভালো বলতেই শুনেছি)।"[৬৮০] ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, "তিনি নির্ভরযোগ্য।" ইমাম ইবনে আদী (রহ.) বলেন–

له احادیث وهوعندی مسعقیم الحدیث صدوق لاباس به (আমার দৃষ্টিতে তিনি হাদীস বিষয়ে সঠিক ও সত্যবাদী। তাঁর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই)।" ইমাম আজালী (রহ.) বলেন–

ثقة عالم بالتفسیرروایة له (তিনি তাফসীরের নির্ভরযোগ্য আলেম ও রাবী)।" ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁকে সৎ ব্যক্তি বলেছেন।[৬৮১]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনিও তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। কেননা তিনি স্বীয় গ্রন্থ "তারীখে কাবীর"-এ তাঁর ব্যাপারে কোনো সমালোচনা উদ্ধৃত করেননি। বরং ইসমাঈল ইবনে

---

৬৮০. শুধু সহজ-সাধ্যের জন্য আমরা এখানে মুহাদ্দিসগণের উক্তিগুলোর ভাব-অনুবাদ করলাম। নতুবা এখানকার সবগুলো শব্দই পারিভাষিক। উসূলে হাদীসের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিগণ এ শব্দগুলোর যথাযথ মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম। উর্দূ [বা বংলা] ভাষায় এর হুবহু অনুবাদ সম্ভব নয়।

৬৮১. তাহযীবুত তাহযীব : ১/৩১৩-৩১৪

খালেদ (রহ.)-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে সুদ্দী শা'বী (রহ.) অপেক্ষা বড় আলেম।" এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তানের উপরোল্লিখিত উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন যে, "আমি যাকেই তাঁর আলোচনা করতে শুনেছি, ভালো বলতেই শুনেছি)।"

ইমাম বুখারী (রহ.) এ দু'টি উক্তি বর্ণনা করার পর নিজে কোনো মন্তব্য বা সমালোচনা করেননি।[৬৮২] ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নিকটও তিনি সুদ্দী নির্ভরযোগ্য। কেননা তিনি তাঁর সহীহ মুসলিম-এ তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

অপর দিকে অন্যান্য বহু আলেম তাঁর সমালোচনা করেছেন। যেমন, ইমাম শা'বী (রহ.)-এর কাছে কেউ সুদ্দী সম্পর্কে বলেছিলেন– ان السدى قداعطى حظا من علم القرأن (সুদ্দী কুরআনুল কারীমের বিরাট ইলম প্রাপ্ত হয়েছেন)। এ উক্তির জবাবে ইমাম শা'বী (রহ.) বলেছেন– قداعطى حظا من جهل القران (সুদ্দী কুরআনুল কারীম হতে মূর্খ হওয়ার বিরাট ইলম প্রাপ্ত হয়েছে)। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) তাঁকে দুর্বল আখ্যায়িত করে বলতেন–

فى حديثه ضعيف (তাঁর হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে)।

ইমাম আবু যুর'আ (রহ.) তাঁকে "লায়্যিন" তথা "নরম" বলতেন। যা নির্ভরযোগ্যতার নিম্ন পর্যায়কে বুঝায়। ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন– يكتب حديثه ولايحتج به (তাঁর হাদীস লিখে রাখা যাবে, কিন্তু দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। ছাজী (রহ.) বলেন– (তিনি সত্যবাদী তো বটে; তবে বিতর্কিত)। ইমাম উকাইলী (রহ.)-এর উক্তি হলো– ضعيف وكان يتناول الشيخين [তিনি দুর্বল। আর তিনি শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর বদনাম করতেন)। ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন– لايحتج بحديثه (তাঁর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না)।

ইমাম জূযজানী (রহ.) বলেন– كذاب شنام (সে মিথ্যুক ও প্রতারক)।[৬৮৩] ইমাম ফালাস (রহ.) হযরত আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেন যে,"তিনি দুর্বল।" আর হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ মারওয়াযী (রহ.) বলেন–

سمعت من السدى فماقمت حتى سمعته يشتم ابابكر وعمر. فلم اعدالیه

---

৬৮২. ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত "আত-তারীখুল কাবীর" : ১/৩৬১

৬৮৩. তাহযীবুত তাহযীব : ১/৩১৩-৩১৪

"আমি সুদ্দী থেকে হাদীস শুনেছি। কিন্তু আমি তাঁকে তখনই ত্যাগ করেছি, যখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর বিরুদ্ধে তাঁকে গালমন্দ করতে শুনেছি। এরপর থেকে আমি আর তাঁর নিকট যাইনি।"[৬৮৪]

হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) সুদ্দী সম্পর্কে গোটা আলোচনার এই সারমর্ম বের করেছেন যে–صدوق يهم ورمى بالتشيع

"সুদ্দী সত্যবাদী। তবে বর্ণনা উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে তাঁর সন্দেহ হয়ে যেত। আর তাঁর প্রতি শিয়া মতাদর্শী হওয়ার অভিযোগও ছিল।"[৬৮৫]

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় صدوق (সত্যবাদী) শব্দটি এমন ব্যক্তির জন্য বলা হয়, যিনি মিথ্যুক তো নন; তবে তাঁর স্মরণশক্তিও মান-সম্পন্ন নয়। অতএব, সুদ্দীর সঠিক অবস্থান হলো এই যে, স্মরণশক্তির দিক থেকে তিনি মুহাদ্দিসগণের মানে উত্তীর্ণ হন না। অপর দিকে তাঁর প্রতি শিয়া মতাদর্শী হবার অভিযোগও রয়েছে। তবে তাঁকে "মিথ্যুক" একমাত্র ইমাম জূযজানী (রহ.)-ই বলেছেন।

২.সুদ্দী সগীর ঃ

২. সুদ্দী নামে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান সুদ্দী। তিনি আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।[৬৮৬] সুদ্দী কাবীরের তুলনায় তাঁর বর্ণনা খুবই অল্প। সুদ্দী কাবীর থেকে তাঁর নাম পার্থক্য করার জন্য তাঁকে 'সুদ্দী সগীর' বলা হয়। তিনিও কূফার অধিবাসী। রেওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত। তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কালবী (রহ.)-এর শাগরিদ।

(একটু পরেই যার আলোচনা আসছে)। সুদ্দী সগীর সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন لا يكتب حديثه البتة (তাঁর হাদীস কখনো লেখা যাবে না)। ইমাম ইবনে মাঈনের উক্তি ليس ثقة (তিনি নির্ভরযোগ্য নন)। ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন– ادركته وقد كبر فتركته (আমি তাঁকে এমন সময়ে পেয়েছি যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই আমি তাঁকে ত্যাগ করেছি)।

হাফেয যাহাবী (রহ.) তাঁর ব্যাপারে বলেন–

تركوه وانهمه بعضهم بالكذب

---

৬৮৪. ইমাম যাহাবী রচিত "মীযানুল ই'তেদাল" : পৃ. ২৩৬-২৩৭

৬৮৫. তাকরীবুত তাহযীব : ১/৭২

৬৮৬. "তারিখে বাগদাদ" : ৩/২৯১: আল্লামা খতীব (রহ.) রচিত

"মুহাদ্দিসগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর কেউ কেউ তাঁর প্রতি মিথ্যাবাদী হওয়ার অভিযোগও আরোপ করেছেন।"[৬৮৭] অন্য এক স্থানে তাঁর ব্যাপারে লিখেছেন- واه بمرة (চরম পর্যায়ের অহেতুক রাবী)।[৬৮৮] ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন- متروك الحديث।[৬৮৯] আবু আলী সালেহ ইবনে মুহাম্মদ বলেন- ضعيفا وكان يضع الحديث (তিনি দুর্বল। অধিকন্তু তিনি মনগড়া হাদীসও বানাতেন)।[৬৯০]

পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর তাফসীর "তানভীরুল মিকইয়াস ফী তাফসীরে ইবনে আব্বাস"-এর প্রচলিত কপিটি এই সুদ্দী সগীর থেকেই বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) তার সনদকে "سلسلة الكذب" বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই এটার কোনোই নির্ভরযোগ্যতা নেই।[৬৯১]

৩.মুকাতিল ঃ مقاتل

মুকাতিল নামেও দু'জন প্রসিদ্ধ আছেন। একজন হলেন, আবু বুসতাম মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান (রহ.)। আর অপরজন হলেন, আবুল হাসান মুকাতিল ইবনে সুলাইমান। উভয়ে বলখ শহরের অধিবাসী। উভয়ে একই যুগের এবং একই উসতায থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। এ জন্য অনেক সময়ই তাঁদের নিয়ে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। তাঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান) গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য এবং বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু তাফসীর গ্রন্থসমূহে তাঁর উদ্ধৃতি খুবই কম আসে। তাফসীর গ্রন্থসমূহে যখন শুধু "মুকাতিল" লিখা হয়, তখন এর দ্বারা শেষোক্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ মুকাতিল ইবনে সুলাইমান) উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন। কারণ তিনিই মুফাসসির উপাধিতে খ্যাত। তাফসীর গ্রন্থসমূহে তাঁর রেওয়ায়েত ও উক্তিই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই এখানে একটু বিস্তারিতভাবে তাঁর আলোচনা তুলে ধরলাম।

---

৬৮৭. "মীযানুল ই'তেদাল" : ৪/৩২-৩৩, "আল-মুগনী ফিয্যু'আফা" : ২/৬৩১

৬৮৮. "মীযানুল ই'তেদাল" : ১/২৩৭

৬৮৯. ইমাম নাসাঈ রচিত "কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরুকীন" ও ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত "তারীখুস সগীর" পৃ : ৩০৩

৬৯০. "তারিখে বাগদাদ" : ৩/২৯২: আল্লামা খতীব (রহ.) রচিত।

৬৯১. আল-ইতকান : ২/১৮৯

সূচিপত্র

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান (মৃত্যু :১৫০ হি.) একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাফসীর গ্রন্থসমূহে যার উদ্ধৃতি অধিকহারে এসে থাকে। কতিপয় আলেম তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাঁর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। প্রশংসাকারীদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) রয়েছে। তিনি বলেন–

الناس عيال على مقاتل فى التفسير (তাফসীরের ক্ষেত্রে লোকেরা মুকাতিলের মুখাপেক্ষী)। অনুরূপভাবে হযরত বাকিয়্যাহ (রহ.) বলেন, "মুকাতিলের ব্যাপারে হযরত শু'বা (রহ.)-কে অনেক প্রশ্ন করা হতো, আমি সব সময় তাঁকে মুকাতিলের ভালো আলোচনা করতেই শুনেছি।" হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান তাঁকে 'জ্ঞানের সমুদ্র' বলতেন।

কিন্তু উপযুক্ত কয়েকটি প্রশংসাবাণী বাদ দিয়ে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণই তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

তাঁর প্রতি প্রথম অভিযোগ হচ্ছে যে, তিনি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। হযরত ওয়াকী' (রহ.) বলেন, "আমরা একবার মুকাতিলের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তিনি নিজেই আমাদের শহরে এসে গেলেন। আমরা তাঁর নিকট গেলাম। কিন্তু আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী পেলাম। তাই তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি।"

ইমাম জূযজানী (রহ.) তাঁর ব্যাপারে লিখেন– كان كذاباجسورا (খুবই ভয়াবহ মিথ্যুক)। ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন– ليس بثقتة (তিনি নির্ভরযোগ্য নন)। অন্য এক স্থানে তিনি লিখেন ليس بشئى (তিনি কিছুই নন)। ইমাম আমর ইবনে আলী ফালাস (রহ.) লিখেন– متروك الحديث (হাদীস প্রত্যাখ্যাত ও মিথ্যাবাদী)। ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন– اصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه (হাদীস বিশারদগণ তাঁর হাদীস এড়িয়ে চলতেন এবং তাঁকে মুনকির মনে করতেন)। আবদুর রহমান ইবনে হাকাম (রহ.) বলেন, "তিনি গল্পকার ছিলেন, লোকেরা তাঁর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছে।" আবু হাতেম (রহ.) ও আজালী (রহ.) বলেন–متروك الحديث (হাদীস প্রত্যাখ্যাত)।

ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁকে 'মিথ্যুক' আখ্যা দিয়েছেন। অপর এক স্থানে বলেছেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যা মনগড়া হাদীস সম্বন্ধকারীদের মধ্যে চার ব্যক্তি বেশি প্রসিদ্ধ। তাদের মধ্য হতে একজন হলো, মুকাতিল।" ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, "তিনি كذب বলেন।"

ইমাম হাকেম (রহ.) লিখেন– ليس بالقوى عندهم (তিনি উলামায়ে কেরামের নিকট শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য নন)। আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস (রহ.) বলেন, "মুকাতিল আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং আমাদেরকে হযরত আতা (রহ.)-এর সনদে কয়েকটি হাদীস শোনালেন। আবার ওই হাদীসগুলোই যাহ্হাক (রহ.)-এর সনদে বর্ণনা করে শোনালেন। অতঃপর ওই হাদীসগুলোই আমর ইবনে শুআইব (রহ.)-এর সনদে শোনালেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এ রেওয়ায়েতগুলো কার কাছ থেকে শুনেছেন?

তখন প্রথমে তিনি বললেন যে, এ তিনজনের কাছ থেকেই শুনেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! হাদীসগুলো আমি কার কাছ থেকে শুনেছি, আমার তা স্মরণ নেই।"[৬৯২] ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর ব্যাপারে বলেন–لاشئ البتة (তিনি একদম কিছুই নন)।[৬৯৩] আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) তাঁর ইবাদতের প্রশংসা করতেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করতেন না।[৬৯৪]

দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি 'মুজাস্সামাহ' মতাদর্শীদের মধ্য হতে ছিলেন। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীকে মাখলূকের গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবার আকীদা পোষণ করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দাবী করতেন)।

আব্বাস ইবনে মাস'আব মারওয়াযী (রহ.) বলেন, "মুকাতিল ইবনে সুলাইমান মূলতঃ বলখের বাসিন্দা ছিলেন। অতঃপর 'মারভ' চলে আসেন। এখানে এসে তিনি জামে মসজিদে কাহিনী বর্ণনা শুরু করেন। এখানেই তাঁর এবং জাহম ইবনে সফওয়ান (জাহ্মিয়্যা ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা)-এর সাথে তর্ক-বহস অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেন।" ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, আমাদের এখানে পূর্ব দিক হতে দু'টি নিকৃষ্ট মতবাদদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

একটি হলো জাহমের মতবাদ। (যা 'মুআত্তিলা'র থেকে ছিল।" ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আরো বলেন, "জাহম আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকেই প্রায় বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আর মুকাতিল আল্লাহর গুণাবলীকে সাব্যস্ত করতে

---

৬৯২. এ সবগুলো কথা "তাহযীবুত তাহযীব : ১০/২৮২-২৮৫" হতে সংগৃহীত।

৬৯৩. আত-তারীখুল কাবীর : ৪/১৪

৬৯৪. মিফতাহুস সা'আদা : ১/৪০৪

সূচিপত্র

গিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর মাখলূকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আখ্যা দিয়েছে।"[৬৯৫] আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) তাঁকে যঈফদের কাতারে শামিল করে লিখেন–

مقاتل بن سُليمان البلخى المفسر هالك كذبه وكيع والنسائى

"বলখের মুফাসসির মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। ইমাম ওয়াকী (রহ.) ও নাসাঈ (রহ.) তাঁকে মিথ্যুক বলেছেন।"[৬৯৬] হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) মুকাতিলের সামগ্রিক অবস্থার সারকথা বের করেছেন এই যে–

كذبوه وهجروه ورمى بالتجسيم (উলামায়ে কেরাম তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রেওয়ায়েতকে বর্জন করেছেন। উপরন্তু তাঁর উপর 'মুজাস্সামাহ' আকীদা পোষণ করার অভিযোগও রয়েছে)।

এতো কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও তাফসীল গ্রন্থসমূহে অধিক হারে তাঁর উক্তিগুলো উল্লেখ করা হয়। এর কারণ মূলতঃ এই যে, যদিও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর উপর আস্থা রাখা যায় না। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। আর যেহেতু তিনি তাফসীর শাস্ত্রকেই স্বীয় জীবনের সবচেয়ে ব্যস্ততা বানিয়ে ছিলেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্র থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, তাই তাঁর তাফসীরে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান মিলে যায়। তাই তাঁর জ্ঞান বিষয়ক কথাগুলো মুফাসসিরগণ উল্লেখ করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কয়েকজন গবেষক আলেমের উক্তি হলো এই ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, "তাঁর নিকট বিভিন্ন গ্রন্থ ছিল। যেগুলো তিনি অধ্যয়ন করতেন। তবে আমার ধারণা, কুরআনের কিছু জ্ঞান তাঁর ছিল।"[৬৯৭]

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেন–

انما جمع مقاتل تفسير الناس وفسر عليه من غير سماع

---

[৬৯৫]. "তাহযীবুত তাহযীব" উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুসারে।

[৬৯৬]. আলামা যাহাবী (রহ.) রচিত : "আল-মুগনী ফিয্ যু'আফা" : ২/৬৭৫

[৬৯৭]. তারীখুল বাগদাদ : ১৩/১৬১। খতীবে বাগদাদী (রহ.) এই ঘটনাটিও উলেখ করেছেন যে, একদিন খলীফা মানসুর উপবিষ্ট ছিলেন। একটি মাছি বারবার এসে তাঁর চেহারায় বসছিল। এমনকি তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে মুকাতিল ইবনে সুলাইমান এসে উপস্থিত হলেন। মানসুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি জান, আলাহ তাআলা মাছিকে কেন সৃষ্টি করেছেন?" মুকাতিল বললেন, "হ্যাঁ জানি, এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে জালেম লোকদের লাঞ্ছিত করেন।" মানসুর নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। (১৩/১৬০)

"মুকাতিল বিভিন্ন লোকের তাফসীর সংগ্রহ করে সেগুলো অনুযায়ী তাফসীর করেছেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে এই তাফসীরগুলো সরাসরি শ্রবণ করেননি।"

আব্বাস ইবনে মুস'আব মারওয়াযী (রহ.) বলেন–

كان حافظا للتفسير لا يضبط الاسناد

"তাফসীরের হাফেজ ছিল; কিন্তু সনদ স্মরণ থাকতো না।"

নু'আইম ইবনে হাম্মাদ (রহ.) বলেন, "আমি সুফইয়ান ইবনে উ'আইনা (রহ.)-এর নিকট মুকাতিলের একটি কিতাব দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তাফসীরের ক্ষেত্রে মুকাতিলের বর্ণনা উদ্ধৃত করেন? তিনি উত্তরে বললেন, না। তবে আমি তা থেকে সাহায্য নেই।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) তাঁর তাফসীর দেখে বলেছেন, "এর মধ্যে তো বিরল-বিস্ময়কর ইলম ও জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু আহ! যদি এগুলোর সনদও সহীহ হতো।" হযরত হাম্মাদ ইবনে আমর বলেন, "যেসব কথা তিনি বর্ণনা করেন যদি এগুলোকে ইলম বলা সঠিক হয়, তাহলে তিনি কত বড় আলেম!" ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, "তিনি ইহুদী-নাসারাদের থেকেও কুরআনের জ্ঞান হাসিল করতেন, যা তাদের কিতাবের অনুকূলে।" আর খলীলী (রহ.) বলেন, "তাফসীর বিশারদদের কাছে তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং তিনি ছিলেন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাঁকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।"[৬৯৮]

অতএব, মুকাতিলের তাফসীরের উপর বর্ণনাভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা কোনোভাবেই ভরসা করা উচিত হবে না। তবে ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-কাহিনী, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি ও সাধারণ তথ্যগত জ্ঞানের দিক থেকে অনেক মূল্যবান কথা তাঁর তাফসীরে পাওয়া যায়। যা থেকে মুহাক্কিক আহলে ইলম কিছু না কিছু উপকৃত হতেও পারেন। এ উদ্দেশ্যে সাধারণ মুফাসসিরগণ সেগুলো উল্লেখ করে দেওয়াটাকে খারাপ মনে করেননি।

৪.হযরত রবী' ইবনে আনাস (রহ.) ربيع بن انس

তাঁর নাম রবী' ইবনে আনাস আল-বাকরী আল-হানাফী। তিনি মূলতঃ বসরার অধিবাসী। পরবর্তীতে খোরাসান চলে আসেন। এ কারণে তাঁকে বসরীও বলা হয় এবং খোরাসানীও বলা হয়। তিনি হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু),

---

৬৯৮. তাহযীবুত তাহযীব : ১০/২৮০-২৮৪, মীযানুল ই'তেদাল : ৪/১৭৩। মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের ব্যাপারে আমরা যতগুলো উদ্ধৃতি তাহযীবুত তাহযীব হতে সনদ বিহীন উলেখ করেছি, সেগুলোর সনদের জন্য দেখুন : তারীখে বাগদাদ : পৃ: ১৬০-১৬৯

সূচিপত্র

আবুল আলীয়া (রহ.) ও হাসান বসরী (রহ.) প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আজলী (রহ.), ইমাম আবু হাতেম (রহ.) ও ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁর জন্য "صدوق" অথবা "ليس به بأس" শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৬৯৯] যা নির্ভরযোগ্যতার নিম্ন পর্যায়। অবশ্য হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন– كان يتشيع فيفرط (তিনি শিয়া মতাদর্শী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি করতেন)। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, "আবু জাফর রাযী তাঁর যেসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন মানুষ সেগুলো থেকে বিরত থাকে। কারণ তাঁর রেওয়ায়েতে অনেক 'ইযতেরাব' রয়েছে।"[৭০০] হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) তাঁর ব্যাপারে সারকথা এই উল্লেখ করেছেন যে–

صدوق له اوهام رمى بالتشيع

"তিনি সত্য বলেন। তবে একে তো তাঁর বর্ণনায় সংশয় হয়ে যেত, দ্বিতীয়তঃ তাঁর শিয়া মতাদর্শী হবার অভিযোগ রয়েছে।"[৭০১]

৫. আতিয়্যাহ আল-আওফী : عطية العوفى

তাঁর পুরো নাম হলো, আবুল হাসান আতিয়্যাহ ইবনে সা'দ ইবনে জুনাদাহ আল-আওফী আল-জাদলী। (মৃত্যু : ১১১ হি.)। তিনি ছিলেন কূফার বাসিন্দা। ছিলেন তাবেঈ। তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁকে 'দুর্বল" বলেছেন।[৭০২] অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (রহ.) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রহ.), হুশাইম (রহ.), আবু হাতেম (রহ.), ইবনে আদী (রহ.), জূযজানী (রহ.), ইবনে হিব্বান (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও ছাজী প্রমুখও তাঁকে দুর্বল বলেছেন। শুধু ইবনে সা'আদ (রহ.) এতটুকু কথা লিখেছেন–

---

৬৯৯. তাহযীবুত তাহযীব : ৩/২৩৯, ইনে আবী হাতেম (রহ.) রচিত : আল-জরহু ওয়াত তা'দীল : ১/৪৫৪

৭০০. তাহযীবুত তাহযীব : ৩/২৩৯

৭০১. তাকরীবুত তাহযীব : ১/২৪৩

৭০২. ইমাম নাসাঈ (রহ.) রচিত : "কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরুকীন", ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত "আত-তারীখুস সগীর" : পৃঃ ৪০১সহ।

له احاديث صالحة ومن الناس من لايحتج به

"তার ভালো ভালো হাদীস রয়েছে। তবে কেউ কেউ এগুলো দ্বারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।" আর ইমাম আবু যুর'আ (রহ.) তাঁকে "ليّن" (লায়্যিন) বলেছেন। যা নিম্ন পর্যায়ের নির্ভরযোগ্যতা। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (রহ.)ও তাঁকে صالح বলেন। এটাও হালকা ধরনের নির্ভরযোগ্যতা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপর চারটি অভিযোগ রয়েছে। প্রথম অভিযোগ হলো, তিনি রেওয়ায়েতের সনদে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। ইমাম আহমদ (রহ.) ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যে, তিনি কালবী (রহ.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন। কিন্তু যেহেতু কালবী দুর্বল ও অভিযুক্ত (যেমন সামনে আসছে) তাই তিনি কালবীর জন্য নিজের পক্ষ হতে 'আবু সাঈদ' উপনাম নির্বাচন করে নিয়েছিলেন।

আর কালবী থেকে তিনি যেসব রেওয়ায়েত শ্রবণ করতেন, সেগুলোকে তার কালবী নামের পরিবর্তে 'আবু সাঈদ' উপনাম দ্বারা বর্ণনা করতেন। আর যেহেতু আতিয়্যাহ আওফী প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রহ.)-এর নিকট থেকে কিছু কিছু হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, তাই অজ্ঞ লোকেরা মনে করতো যে, এ রেওয়ায়েতও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। অথচ বাস্তবে তা হতো কালবীর রেওয়ায়েত।[৭০৩]

তাঁর উপর দ্বিতীয় অভিযোগ হলো যে; তিনি শিয়া ছিলেন। তৃতীয় অভিযোগ হলো যে, রেওয়ায়েত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি ভুল করতেন। চতুর্থ অভিযোগ হলো যে, তিনি মুদালিস ছিলেন। হাফেয ইবনে হাযার (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেন

صدوق يخطئى كثيرا وكان شيعيا مدلسا

"তিনি সত্যবাদী। তবে খুব বেশি ভুল করে থাকেন। তিনি শিয়া মতাদর্শী ছিলেন এবং তাদলীস করতেন।"[৭০৪] হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) দুর্বল বর্ণনাকারীদের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করে লিখেন– تَابِعِى مشهُور مجمع على ضعيفه

"তিনি প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। তাঁর দুর্বলতার উপর সকলেই একমত।"[৭০৫] অবশ্য ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর কোনো কোনো বর্ণনাকে হাসান হিসেবে

---

৭০৩. তাহযীবুত তাহযীব : ৭/২২৫-২২৬

৭০৪. তাকরীবুত তাহযীব : ২/২৪

৭০৫. "আল-মুগনী ফিয্ যু'আফা" : ২/৪৩৬

সূচিপত্র

আখ্যা দিয়েছেন।[৭০৬] কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর পরিভাষায় 'হাসান' দ্বারা সেসব হাদীসই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যার সনদের মধ্যে মিথ্যাচারিতায় অভিযুক্ত কোনো রাবী না থাকে এবং তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়।[৭০৭] তাই তাঁর হাসান বলা দ্বারা ওই অভিযোগ খণ্ডিত হয় না, যা আতিয়্যাহ্ আওফীর উপর উত্থাপন করা হয়েছে।

عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم

৬.আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.)

তাঁর পুরো নাম হলো, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম আল-আদভী আল-মাদানী। (মৃত্যু : ১৮২ হি.)। তিনি পূর্বে উল্লিখিত হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর পুত্র। তাঁকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। শুধু ইমাম ইবনে আদী (রহ.)-এর উক্তি হলো–

له احاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعض وهو ممن يكتب حديثه

"তাঁর কাছ থেকে অনেক 'হাসান' হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি এমন রাবীদের অন্তর্ভুক্ত, মানুষ যাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন। তাঁর হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।" এ ছাড়া হাদীস সমালোচক সকলেই তাঁকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) লিখেন– ضعفه على جدا। আলী ইবনে মাদানী তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।[৭০৮] ইমাম নাসাঈ (রহ.) লিখেন– ضعيف (তিনি দুর্বল)।[৭০৯] ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, "যায়েদ ইবনে আসলাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সব পুত্রই দুর্বল রাবী।" ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন খুবই সৎ। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল।" ইমাম ইবনে খুযাইম (রহ.) বলেন–

لَيسَ هُوَ مِمَّن يَحتَجُّ أهلُ العلمِ بِحَدِيثِهِ لِسُوء حِفظِهِ وَهُوَ رَجُل صِناعَتُهُ العِبَادَةُ وَالتَّقشُفُ

"তিনি ঐসকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত নন, যাদের হাদীস দ্বারা আহলে ইলম দলীল পেশ করতে পারেন। কারণ তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল। তাঁর আসল কাজ ছিল ইবাদত ও যুহুদ।" ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন–.

كَانَ يَقلِبُ الاخبارَ. وَلايَعلَمُ. حتى كَثُرَ ذَلكَ فِي رَوايته من رفع المراسيل وباسناد الموقوف فاستحق الترك

---

৭০৬. আল-ইতকান : ২/১৮৯

৭০৭. দেখুন : ইমাম তিরমিযী (রহ.) রচিত "আল-ইলাল"।

৭০৮. "আত-তারীখুল কাবীর" ৩/২৮৪: ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত।

৭০৯. "কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরুকীন", ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত "আত-তারীখুস সগীর" : পৃ. ২৯৬ সহ।

সূচিপত্র

"তিনি অজ্ঞতাসারেই রেওয়ায়েতকে ওলট-পালট করে দিতেন। এমনকি তাঁর বর্ণনাসমূহে এ রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, তিনি মুরসালকে মারফূ এবং মাওকূফকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এ জন্য তিনি পরিত্যগ যোগ্য।" ইমাম তাহাভী (রহ.) বলেন–

حديثه عند اهل العلم بالحديث فى النهاية من الضعف

"হাদীস বিশারদ আলেমগণের দৃষ্টিতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সবচেয়ে দুর্বল।" এতদ্ব্যতীত ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.), দারাওয়ারদী (রহ.), মা'আন (রহ.), ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.), ছাজী (রহ.), হাকেম (রহ.), আবু নুআইম (রহ.) ও জূযজানী (রহ.) হতেও আবদুর রহমান সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা বর্ণিত আছে। আর আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) লিখেছেন– ... (আবদুর রহমান দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন)।[৭১০] তাই আল্লামা ইবনে হাযার (রহ.) তাঁর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি দুর্বল।[৭১১]

৭.কালবী : ك

তার পুরো নাম হলো, আবুল নযর মুহাম্মদ ইবনুস সায়েব ইবনে বিশ্‌র ইবনে আমর ইবনে আবদুল হারেস ইবনে আবদুল উযযা আল-কালবী।(মৃত্যু : ১৪৬ হি.)। তিনি বনু কল্‌ব গোত্রের লোক। তিনি ছিলেন কূফার অধিবাসী। ইতিহাস, বংশধারা ও তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ। তার দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতার উপর সকল আলেম একমত। শুধু ইমাম ইবনে আদী (রহ.) এতটুকু লিখেছেন–

له غير ماذكرت احاديث صالحة وخاصة عن ابى صالح وهو معروف بالتفسير وليس لأحد أطول من تفسيره وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه فى التفسير واما فى الحديث فله مناكير

"আমি তাঁর যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি, সেগুলো ছাড়াও তাঁর অন্যান্য হাদীসগুলো সঠিক আছে। বিশেষ করে সেসব হাদীস যা আবু সালেহ থেকে বর্ণিত। তিনি (কালবী) তাফসীর শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর তাফসীরের ন্যায় এত বড় আর কারো তাফসীর নেই। কোনো কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর

---

৭১০. তাহযীবুত তাহযীব : ৬/১৭৫-১৭৯, মীযানুল ই'তেদাল : ২/৫৬৪।

৭১১. তাকরীবুত তাহযীব : ১/৪৮০

সূচিপত্র

রেওয়ায়েত মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে হাদীস্‌শাস্ত্রে তাঁর রেওয়ায়েত মুনকার হিসেবে গণ্য।"

কিন্তু ইমাম ইবনে আদী (রহ.) ব্যতীত সকল আহলে ইলম তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

তাঁর প্রতি সবচেয়ে জঘন্য অভিযোগ ছিল 'মিথ্যা রেওয়ায়েত বর্ণনা করার।' মু'তামের ইবনে. সুলাইমান (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, "কূফায় দু'জন মিথ্যুক ছিল। তাদের একজন হলো, কালবী।" তাফসীরের ক্ষেত্রে তার অধিকাংশ রেওয়ায়েত আবু সালেহ থেকে বর্ণিত। আবু জিনাব কালবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, "আবু সালেহ শপথ করে বলেছেন যে, আমি কালবীকে তাফসীর বিষয়ক কোনো কথাই শোনাইনি।"

আর সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, একবার স্বয়ং কালবী এ কথা স্বীকার করেছে যে, "আমি সালেহ থেকে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যেসব রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছি, সেগুলো মিথ্যা। তুমি সেগুলো বর্ণনা করো না।' হযরত সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহ.) হতে কতিপয় হাদীস কালবীর সনদে বর্ণিত আছে। এতে কেউ কেউ এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, সুফ্‌ইয়ান সাওরীরর মতো মুহাদ্দিস যখন কালবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন কালবী নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য রাবীই হবেন। কিন্তু হযরত আবু হাতেম (রহ.)-এর হাকীকত খুলে বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করা ছিল না; বরং তিনি কখনো কখনো বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য তাঁর মজলিসে কালবীর রেওয়ায়েত শোনাতেন। কিন্তু মজলিসে উপস্থিত কেউ কেউ সেগুলোকে কালবীর সনদে হযরত সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহ.) হতে বর্ণনা করে দিয়েছে।"[৭১২] হযরত কুররা ইবনে খালেদ (রহ.) বলেন, "মানুষের সাধারণ ধারণা ছিল যে, কালবী মিথ্যা বলেন।"

তাঁর প্রতি দ্বিতীয় অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি কট্টরপন্থী শিয়া মতাদর্শী ছিলেন। হযরত আবু জয্ (রহ.) বলেন, "আমি কালবীকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন। তখন নবীজী কোনো কাজে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেখানে বসা ছিলেন। হযরত

---

৭১২. এ সকল উক্তি তাহযীবুত তাহযীব থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। অবশ্য আল্লামা হাফেয যাহাবী (রহ.) স্বয়ং সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার লোকদেরকে বললেন, 'তোমরা কালবী থেকে বিরত থাক।'তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি তো তার থেকে বর্ণনা করেন? তখন তিনি এর উত্তরে বলেছেন, "আমি তার সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারি।" মীযানুল ই'তেদাল : ৩/৫৫৮

জিবরাঈল (আ.) ওই ওহী হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর উপর নাযিল করে দেন"! আবু জায (রহ.)-এর এ উক্তিটি প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইয়াযীদ ইবনে যুরাই'-এর সম্মুখে বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন, "আমি কালবী থেকে এ কথা তো শুনিনি তবে আমি তাকে বুক চাপড়িয়ে বলতে শুনেছি, 'আমি সাবাঈ' 'আমি সাবাঈ' ।"[৭১৩]

এই উক্তিটিই হাফেয যাহাবী (রহ.) হযরত হাম্মাম (রহ.) থেকেও বর্ণনা করেছেন যে, "আমি তাকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, 'আমি সাবাঈ' ।"

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, "কালবী সাবাঈ ছিলেন এবং তিনি সেসব লোকদের একজন যারা বলে, 'হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর মৃত্যু হয়নি। তিনি আবার পৃথিবীতে আসবেন। পৃথিবী যখন অন্যায়-অত্যাচারে ভরে যাবে, তখন তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা এ পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দিবেন। এরা যখন কোনো মেঘখন্ড দেখে তখন বলে উঠে, 'আমীরুল মুমিনীন' এতে রয়েছেন' ।"[৭১৪]

সারকথা হলো, কালবী প্রাথমিক যুগের মুফাসসিরগণের মাঝে সবচেয়ে দুর্বলতম মুফাসসির। ইমাম আহমদ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, কালবীর তাফসীর অধ্যয়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, না। হাফেয যাহাবী (রহ.) কালবী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার পর লিখেন যে–

لايحل ذكره فى الكتاب فكيف الاحتجاج به؟

"তার বর্ণনা কিতাবে উল্লেখ করাই সঠিক নয়। তাহলে সেগুলো দ্বারা দলীল পেশ করা ঠিক হবে কীভাবে?"[৭১৫]

পরিশেষে বিনোদনের জন্য কালবীর একটি রসাত্মক ঘটনা উল্লেখ করছি। কালবী নিজেই বলেন, "আমি স্মরণশক্তির এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছি, যা আর কেউ হয়তো করতে পারেনি। আর ভুলেরও এমন দৃষ্টান্ত রেখেছি, যা আর কেউ হয়তো করতে পারেনি। আমি ছয় বা সাত দিনে পুরো কুরআন মুখস্ত করে ফেলেছিলাম।

---

৭১৩. তাহযীবুত তাহযীব : পৃ: ১৭৮-১৮১
৭১৪. মীযানুল ই'তেদাল : ৩/৫৫৮
৭১৫. প্রাগুক্ত : ৩/৫৫৯

সূচিপত্র

আর ভুলের বিস্ময়কর ঘটনা ছিল যে, একদিন আমি দাড়ি পরিপাটি করার জন্য মুষ্টিবদ্ধ করে ধরি। ইচ্ছা ছিল মুষ্টির নীচের অংশ কাটব। কিন্তু ভুল করে মুষ্টির উপর দিক থেকে সব দাড়ি কেটে ফেলি।"[৭১৬]

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণত তাফসীর গ্রন্থসমূহে আরো অনেক ব্যক্তির নাম রয়েছে। কিন্তু যেসব ব্যক্তিত্বের আলোচনা এ অধ্যায়ে করা হয়েছে, তাফসীরের উদ্ধৃতিতে তাঁদের নাম খুব বেশি উদ্ধত। এ কথা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, পরবর্তী সবগুলো তাফসীর গ্রন্থের মূল উৎস তাঁরাই। অধিকাংশ তাফসীরই তাঁদের রেওয়ায়েত ও উক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

তাই তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলে ইনশাআল্লাহ ওই সকল মুফাসসিরগণের তাফসীর অধ্যয়ন করা সহজ হবে, যারা রেওয়ায়েতের মাধ্যমে তাফসীর করার রীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন, তাফসীরে ইবনে জারীর, তাফসীরে দুররে মানসূর ও তাফসীরে ইবনে কাসীর ইত্যাদি। অথবা যেসব তাফসীরে সনদবিহীন পূর্ববর্তী তাফসীর বিশারদদের উক্তি ও অভিমতসমূহ বর্ণনা করা হয়। যেমন, রূহুল মা'আনী,তাফসীরে কুরতুবী এবং পরবর্তী কালের মুফাসসিরগণের তাফসীর সমূহ।

পরবর্তীদের কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থসমূহ ঃ متأخرین کی چند تفسیریں

আমরা ইতিপূর্বে এ অধ্যায়ের শুরুতে বলে আসছিলাম যে, আমরা বক্ষ্যমান গ্রন্থে ইলমে তাফসীরের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু প্রাথমিক যুগের কতিপয় মুফাসসিরের পরিচিতির উপর ক্ষান্ত করেছি, যাদের রেওয়ায়েত ও উক্তি-অভিমতের উপর পুরো তাফসীর শাস্ত্রের ভিত্তি। পরবর্তী যুগে পবিত্র কুরআন মাজীদের যেসব তাফসীর লিখা হয়েছে এবং উম্মতের উলামায়ে কেরাম যেসব দিক থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের খেদমত করেছেন, তা একটি ব্যাপক আলোচ্য বিষয়। এর জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। এমন দাবী তো কেউ করতে পারবে না যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের হক পুরোপুরিভাবে আদায় হয়ে গেছে।

তবে এ কথাও আপন স্থানে অনস্বীকার্য সত্য যে, নববী দ্বীপ-শিখার ধারক-বাহক উম্মতে মুহাম্মদী এ মহাগ্রন্থের খেদমত করতে গিয়ে শুধু শ্রম-ঘামই ঝরায়নি; বরং প্রেম ও ভালোবাসার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। তাই

---

[৭১৬]. সাফদী (রহ.) রচিত "আল-ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত" ৩/৮৩, মীযানুল ই'তেদাল : ৩/৫৫৬। কিন্তু খতীবে বাগদাদী (রহ.) এ ঘটনাটি কালবীর পরিবর্তে তার পুত্র হিশাম ইবনে কালবীর দিকে সম্বন্ধ করে বর্ণনা করেছেন। তারীখে বাগদাদ : ১৪/৪৬

তো নির্দ্বিধায় এ দাবী করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর বুকে না কোনো গ্রন্থের এত ব্যাখ্যা রচনা হয়েছে, আর না তার এত অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। না সার্বিক দিক থেকে তার এত খেদমত করা হয়েছে। অথচ এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো যুগেই আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

মোটকথা, আজ সেসব খেদমতের ফলেই পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে উপকৃত হওয়া অনেক অনেক সহজ। যে কেউ কোনো আয়াতের তাফসীর জানতে চায়, তার জন্য সমগ্র গ্রন্থাগার প্রস্তুত। আর যদি শুধু সেসব তাফসীর গ্রন্থেরই পরিচিতি তুলে ধরা হয়, যা বর্তমানে সচরাচর পাওয়া যায়, তার জন্যও স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনার দরকার হবে।

তবে এখানে কিছু সেসব তাফসীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই, যেসব তাফসীর ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অনুগ্রহে ধন্য করেছে, যা ভুলে যাওয়ার মতো নয়। এমনকি যা অধমের কাছে পূর্বসূরীদের তাফসীর বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারকথা বলে মনে হয়।

যখনই কোনো আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কোনো জটিলতা দেখা দিয়েছে; তখন অধম সেগুলোর প্রতিই ঝুঁকে পড়েছে। যেগুলোর ব্যাপারে আমার নগণ্য ধারণা হলো যে, আমাদের মতো লোক, যারা সুবিশাল কলবের তাফসীর গ্রন্থসমূহ নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন করতে পারি না, তাদের জন্য এগুলো অনেকটাই অন্যান্য গ্রন্থের অপূর্ণতা কাটিয়ে দিবে।

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর : تفسير ابن كثير

প্রকাশ থাকে তাফসীর শাস্ত্রের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে তাফসীরে ইবনে কাসীর। এটি হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনুল খতীব আবু হাফস ওমর ইবনে কাসীর আশ-শাফেয়ী (রহ.)। (মৃত্যু : ৭৪৭ হি.)-এর কর্তৃক রচিত। এ গ্রন্থটি চার ভলিয়মে প্রকাশিত। এটিকে 'তাফসীরে ইবনে জারীর'-এর সারসংক্ষিপ্ত বলা চলে। এ গ্রন্থটি রচনা করার ক্ষেত্রে হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) রেওয়ায়েত ভিত্তিক বর্ণনার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি প্রথমে এর সারকথা বর্ণনা করেন। তারপর এর বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন (রহ.)-এর যত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, সেগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন।

সূচিপত্র

কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ রেওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীরের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যেমন– হাফেয ইবনে জারীর (রহ.), ইবনে মারদূইয়া (রহ.) ও ইবনে মাযাহ (রহ.) প্রমুখ তাফসীর বিষয়ক রেওয়ায়েতগুলোকে শুধু সংকলনই করেছেন, সেগুলোর যাচাই-বাছাই করেননি।

কিন্তু হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, তিনি একজন মুফাসসির হওয়ার পাশাপাশি একজন উঁচু মানের মুহাদ্দিস এবং রেওয়ায়েতের সমালোচনা বিষয়েও যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। যেমন, তিনি প্রথমতঃ সেসব দুর্বল ও বানোয়াট রেওয়ায়েতসমূহ ছাটাই করেছেন, যা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়ে আসছিল। দ্বিতীয়তঃ যেসব দুর্বল রেওয়ায়েত তিনি উল্লেখ করেছেন, সাধারণতঃ সেগুলোর সনদগত দুর্বলতার উপরও সতর্ক করেছেন। (দেখুন, ১/৭৭, ২১৩, ৩/১৭, ২১; ২৪, ৮৯, ৪/৫০৮, ৫১৯, ৫২০, খ, ৪র্থ প্রভৃতি।)

সাধারণত রেওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীরগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনায় ভরপুর। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত সতর্কতাপূর্ণ এবং স্বচ্ছ ও নিরেট কুরআন-হাদীসের উপর নির্ভরশীল। যারা বিস্তারিত বর্ণনা স্বয়ং তাঁরই ভাষায় "ইসরাঈলিয়াত" শিরোনামে আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর গ্রন্থে ইসরাঈলী বর্ণনা বেশী করেননি। আর যেখানেই বর্ণনা করেছেন, সেখানেই সাথে সাথে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, "এটা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত।" যেমন, সূরা সফফাতে তিনি এমন কিছু 'আছর' উলেখ করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে, জবাই'র নির্দেশিত ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.) এবং এরপর লিখেছেন, 'আল্লাহই ভালো জানেন।'

অথচ বাহ্যত এ সবগুলো রেওয়ায়েত হযরত কা'আব আহবার (রহ.) থেকে উদ্ধৃত। ... এসব রেওয়ায়েতে সব ধরনের এবং এ কথাগুলোর একটি অক্ষরও এই উম্মতের জন্য প্রয়োজন ছিল না।" (৪/১৭)

সারকথা হলো নরম গরম কথা মিশ্রিত রেওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীরে ইবনে কাসীর সবচেয়ে বেশি সতর্কতাপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য একটি তাফসীর। তবে যা হোক কিছু কিছু অর্থ এই নয় যে, এ তাফসীরে উল্লিখিত সবগুলো রেওয়ায়েতই সহীহ। বরং কোনো কোনো স্থানে হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.)ও দুর্বল রেওয়ায়েতকে কোনো সতর্কবাণী ছাড়াই উদ্ধৃত করে গেছেন। যেমন, সূরা তাওবার আয়াত– وَمِنهُم مَن عَاهَدَ اللهَ الخ....এর

তাফসীর করতে গিয়ে হযরত সা'লাবাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যে রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন, অথচ হাদীসবেত্তাগণের নিকট সেটা দুর্বল। (২/৩৭৪)

এছাড়া যেসব মুফাসসিরগণকে দুর্বল বলে আমরা পেছনে আলোচনা করেছি, যেমন– মুকাতিল, কালবী, আতিয়্যাহ আল-আওফী প্রমুখ– তাদের কিছু কিছু উক্তিসমূহও তিনি অধিক হারে উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণতঃ সেসকল উক্তিই কোনো সমালোচনা ছাড়া গ্রহণ করেছেন, যা কোনো শরঈ দলীল পরিপন্থী নয়। কাজেই সেগুলোর মান সনদযুক্ত রেওয়ায়েতের ন্যায় নয়; বরং মুফাসসিরগণের নিজস্ব উক্তির মাত্র।

২. তাফসীরে কাবীর ঃ تفسير كبير

আমাদের আলোচিত তাফসীরের দ্বিতীয় গ্রন্থটি হলো ইমাম রাযী (রহ.) রচিত "তাফসীরে কাবীর"। এর প্রকৃত নাম হচ্ছে "مفاتيح الغيب"। তবে "তাফসীরে কাবীর" নামে তা সর্বাধিক পরিচিত। এটি ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে জিয়াউদ্দীন ওমর আর-রাযী (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) কর্তৃক রচিত। যেমনিভাবে রেওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীরে ইবনে কাসীর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও নযীরবিহীন তাফসীর, তেমনিভাবে জ্ঞান-প্রজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীরে কাবীরেরও জুড়ি নেই। কেউ কেউ তাফসীরে কাবীরের ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন–

فِيهِ كُلُّ شَئْىءٍ إِلاَّ التَفسِيرَ

"তাফসীর ব্যতীত এতে সবকিছুই রয়েছে।"[৭১৭]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ অনবদ্য গ্রন্থের ব্যাপারে এ মন্তব্যটি মারাত্মক জুলুম। কেননা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মর্মোদ্ধারে এ তাফসীরের কোনো তুলনা হয় না। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. প্রত্যেক আয়াতের তাফসীর, ব্যাকরণগত তারকীব ও শানে নুযূলের সাথে সম্পৃক্ত পূর্বসূরীদের যত মত ও উক্তি রয়েছে, ইমাম রাযী (রহ.) সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সুবিন্যস্ত আকারে পূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে বর্ণনা করেন। যার দ্বারা সহজেই জানা যায় যে, এ আয়াতের তাফসীরে কতগুলো কি কি উক্তি রয়েছে? অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ বিষয়গুলো সাধারণতঃ বিক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যেগুলো থেকে সারমর্ম উদ্ধার

---

৭১৭. আল-ইতকান : ২/...., আমার মত অনুযায়ী এ বাক্যটি যদি কোনো তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে তা হলো আমাদের যুগের তানতাভী (রহ.) রচিত "তাফসীরে জাওয়াহিরী"।

সূচিপত্র

করতে অনেক সময় লেগে যায়। কিন্তু তাফসীরে কাবীরে এসবগুলো কথা একত্রে সুবিন্যস্ত আকারে পাওয়া যায়।

২. পবিত্র কুরআন মাজীদের বর্ণনানীতির মর্যাদাগত অবস্থান ও শ্রেষ্ঠত্বকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

৩. আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব ফিকহী মাসাইল রয়েছে, সেগুলোকে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের সাথে আলোচনা করেছেন।

৪. আয়াতের মধ্যে কোন বাতিল ফেরকা ও বিবেকপূজারীরা কোনো বিকৃতি সাধন করে থাকলে সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সেগুলোকে খতম করেন। এভাবে এতে জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, মুজায্সামাহ, ইবাহিয়্যাহ ও তাঁর সমকালীন যুগের সকল বাতিল ফেরকার খণ্ডন করেছেন।

৫. এভাবে তাফসীরে কাবীরের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে আয়াতের ইতিপূর্বে খুবকমই সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে খুবই কম। বাস্তব কথা হলো, আয়াতের পূর্বা-পর সূত্র ও সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি যেসব কারণ বর্ণনা করেন, সাধারণতঃ সেগুলো এতই সাবলীল, হৃদয়স্পর্শী ও যুক্তিযুক্ত যে, এতে হৃদয়-মন শুধু প্রশান্তই হয় না; বরং পবিত্র কুরআনুল কারীমের মাহাত্ম্যের প্রতিও অস্বাভাবিক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

৬. কুরআনী আয়াত ও ইসলামী বিধানের রহস্য ও প্রজ্ঞার উপরও অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছেন।

মোটকথা হলো, তাফসীরে কাবীর অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ একটি তাফসীর। আর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত হচ্ছে যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের মর্ম অনুধাবনে যখনই কোনো জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি, তখন তাফসীরে কাবীর এ ব্যাপারে আমাকে অসাধারণভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষ সাধারণতঃ এর দীর্ঘ বর্ণনা দেখে ঘাবড়িয়ে যায়। (যেমন সূরা ফাতেহার তাফসীর আনুমানিক ১৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে)। কিন্তু এ দীর্ঘতা শুরুর দিকে। শেষের দিকে এতটা নয়। এর দ্বারা উপকৃত হতে পারলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাতের অমূল্য রত্ন হস্তগত করা যায়। তবে এ তাফসীরে সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে।

(ক) ইমাম রাযী (রহ.) সূরা ফাতাহ্ পর্যন্ত এ তাফসীর লিখেছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। সূরা ফাতাহ্ ব্যতীত অপর একজন আলেম

সূচিপত্র

কাযী শিহাবুদ্দীন ইবনে খলীল আল-খাওলী আদ-দিমাশকী (মৃত্যু : ৬৩৯ হি.) অথবা শায়খ নাজমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কামূলী (মৃত্যু : ৭৭৭ হি.) অবশিষ্ট তাফসীর সমাপ্ত করেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, ইমাম রাযী (রহ.)-এর বর্ণনা ও রচনাশৈলী তিনি এমনভাবে অক্ষুণ্ন রাখেন যে, কারো যদি এ তথ্য জানা না থাকে, তাহলে সে কখনো এ সন্দেহ করতে পারবে না যে, এটা ইমাম রাযী (রহ.) ব্যতীত অন্য কারো রচনা।

(খ) তাফসীরে কাবীরের রেওয়ায়েত গুলো অপরাপর অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের ন্যায় নরম গরমের সম্ভার।

(গ) তবে-সীমিত কয়েকটি স্থানে ইমাম রাযী (রহ.) জমহুর মুফাস্‌সিরীন-থেকে পৃথক মত ও পথ অবলম্বন করেছেন। [যেমন–

لم يَكْذِبْ إبراهيمُ إلا ثلاثَ كَذِبَاتٍ অর্থাৎ "ইবরাহীম (আ.) তিনটি স্থান ছাড়া কখনো মিথ্যা বলেননি" এ সহীহ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন)। অতএব, যেখানেই তিনি 'তাফার্‌রুদ' বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন, পাঠকবৃন্দের সেখানে জমহুর উলামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে।

৩. তাফসীরে আবি-সাউদ ঃ تفسير إبي السعود

এই তাফসীর গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ নাম হলো"..." إرشادالعقل السليم الى مزيا القران الكريم"এটি কাযী আবুস সাউদ মুহাম্মদ ইবনে মুহামমদ আল-আমাদী আল-হানাফী (মৃত্যু :৯৫১ হি.)-এর রচনা। ইলমী গভীরতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও কুরআন বিষয়ক গবেষণা২য় নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। এ গ্রন্থটি -৬ খন্ডে সমাপ্ত করেন। খুবই সংক্ষেপে এতে পবিত্র কুরআনুল কারীমের হৃদয়স্পর্শী তাফসীর করা হয়েছে। এর সচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নযমে কুরআন, আয়াতের মধ্যকার সম্পর্কে ও বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিস্ময়কর তথ্যাদি পাওয়া যায়। যা ফলে পবিত্র কুরআন মাজীদের মর্ম বুঝা অতি সহজ হয়ে যায় এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের মু'জিযাভিত্তিক বর্ণনার বৈশিষ্ট ও মাহাত্ম্য বুঝে আসতে থাকে।

৪. তাফসীরে কুরতুবী ঃ تفسير القرطبي

তাফসীরটির পূর্ণ নাম হলো, "الجامع الأحكام القران" (আল-জামিউ লি আহকামীল কুরআন)। এটি স্পেনের প্রসিদ্ধ ও মুহাক্কিক আলেম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবী বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী (রহ.) (মৃত্যু : ৬৭১ হি.) কর্তৃক রচিত। ফিকহের ক্ষেত্রে

সূচিপত্র

তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-এর অনুসারী ছিলেন। মূলতঃ এ গ্রন্থটির বুনিয়াদী আলোচ্য বিষয় তো ছিল পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে ফিকহী আহকাম ও মাসাইল গবেষণা করে বের করা। কিন্তু এর আওতায় তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা, কঠিন শব্দগুলোর তাহকীক, ই'রাব, বালাগাত ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনা সমূহকে তাফসীরের সাথে বেশ সংযোজন করেছেন। বিশেষ করে প্রাত্যাহিক জীবনে পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে যে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়, সেগুলো খুব স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটির ভূমিকাও বেশ দীর্ঘ এবং উলূমুল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন। এ তাফসীর গ্রন্থটি ১২ খন্ডে লিখিত এবং পূণঃ পূণঃ প্রকাশিত হয়েছে।

৫. রূহুল মা'আনী ঃ روح المعانى

এ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ নাম "روح المعانى فى تفسير القران العظيم والسبع المثانى" (রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবইল মাসানী)। এটি বাগদাদের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা মাহমূদ আলূসী হানাফী (রহ.)। (মৃত্যু : ১২৭০ হি.) কর্তৃক রচনা। এ তাফসীরটি ৩০ ভলিউমে বর্তমানে ১৫ বলিউম প্রকাশিত। যেহেতু এ তাফসীরটি একেবারে শেষ যুগের রচিত, তাই তিনি এতে পূর্ববর্তী তাফসীর গ্রন্থসমূহের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সংকলন করার চেষ্টা করেছেন। ফলে এতে ভাষা-সাহিত্য, নাহুসরফ, বালাগাত, ফিকাহ্, আকাইদ, কালাম, দর্শন, জ্যোতিষবিদ্যা, তাসাওউফ ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তিনি চেষ্টা করেছেন যাতে আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ইলমী দৃষ্টিকোণ তৃষ্ণার্ত না থাকে। হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রেও আল্লামা আলূসী (রহ.) অন্যান্য মুফাসসিরগণের তুলনায় অধিক সতর্কবান ছিলেন। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থটিকে পূর্ববর্তী তাফসীর গ্রন্থসমূহের সারাংশ বলা। বর্তমানে পবিত্র কুরআন তাফসীরের কোনো কাজই এর সহায়তা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।

উল্লেখিত পাঁচটি তাফসীর আমার ক্ষুদ্র রুচি অনুযায়ী এমন পর্যায়ের যে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু এ গ্রন্থগুলোর অধ্যয়নের উপরই নির্ভর করে তাহলে ইনশাআল্লাহ সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিতে তাকে অপরাপর অন্যান্য তাফসীরগ্রন্থ থেকে বিমুখ করে দিবে।

তবে এ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। পরবর্তীতে আমার শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিননূরী (রহ.)-এর একটি

সূচিপত্র

প্রবন্ধ মাধ্যমে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে আমার অভিমতের স্বপক্ষে অনেকটা সমর্থন পাওয়া গেল। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। তিনি তাঁর "ইয়াতিমাতুল বয়ানে" নামক মূল্যবান প্রবন্ধে লিখেন–

"যেহেতু আমাদের প্রিয় জীবন একেবারে সংক্ষিপ্ত, কালের -আপদ অধিক, আর আমাদের এ যুগে হিম্মতও নিস্তেজ এবং দুর্বল হয়ে গেছে... এ জন্য আমি আমার প্রিয় তালেব ইলম ভাইদেরকে এমন চারটি তাফসীর গ্রন্থ চিহ্নিত করে দিতে চাই, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু এগুলোর উপরই তুষ্টতা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

১. প্রথম তাফসীরে ইবনে কাসীর ...যার সম্বন্ধে আমাদের উসতায (হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)) বলতেন যে, যদি কোনো কিতাব অন্য কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিতে পারে, তাহলে তা হচ্ছে তাফসীরে ইবনে কাসীর। যা তাফসীরে ইবনে জারীর থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

২. দ্বিতীয় ইমাম রাযী (রহ.) কর্তৃক রচিত "তাফসীরে কাবীর"। যার ব্যাপারে আমাদের উসতায (রহ.) বলতেন যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের কঠিন বিষয়গুলোর মধ্য হতে এমন কোনো কঠিন বিষয় আমি পাইনি, ইমাম রাযী (রহ.) যার আলোচনা পর্যালোচনা করেননি হৃদয় প্রশান্তিদায়ক।

তবে এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো কোনো সময় কঠিন বিষয়গুলোর সমাধান পেশ করেননি। আর এক্ষেত্রে বলা হয়েছে فيه كل شئى الا التفسير 'এ কিতাবে তাফসীর ছাড়া বাকি সবই আছে' বস্তুত তাঁর মান-মর্যাদাকে খাটো করে দেখানো ছাড়া কিছুইনা। আর সম্ভবতঃ এটা এমন কোনো ব্যক্তির উক্তি যার উপর রেওয়ায়েতের প্রভাব ছিল তার নিকট পবিত্র কুরআন মাজীদের সূক্ষ্ম বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কোন দৃষ্টিই ছিল না।

৩. তৃতীয় হলো তাফসীরে রুহুল মা'আনী। আমার কাছে এটি পবিত্র কুরআন মাজীদের এমন তাফসীর, যেমন সহীহ বুখারীর জন্য ফাতহুল বারী। তবে ফাতহুল বারী তো এক মাখলূকের রচিত একটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা। তাই বুখারীর ব্যাখ্যার যে ঋণ উম্মতের উপর ছিল তিনি তা পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কালাম তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে সে বিধায়, কোনো মানুষ এর হক আদায় করতে পারেনা।

৪. তাফসীরে আবুস-সাউদ। যার মধ্যে নয্‌মে-ছন্দময়ী কুরআনকে অত্যান্ত সুন্দর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে যত্ন দেওয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

আর তা অনেক ক্ষেত্রে যমখশরীর তাফসীরে কাশ্‌শাফ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।"[৭১৮]

উল্লেখিত ইবারতে তাফসীরে কুরতুবীকে বাদ দিয়ে বাকি চারটি তাফসীর গ্রন্থের আলোচনা ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে করা হয়েছে, যা আমার ক্ষুদ্র উপলব্ধিতে এসেছিল। হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) ও তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ হযরত বিননূরী (রহ.)-এর মতামতের সাথে আমার মতামতের এই অভিন্নতার উপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার শোকর আদায় করি।

(উর্দু তাফসীর সমূহ)

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত আলোচনাটি ছিল আরবী তাফসীর গ্রন্থের ব্যাপারে। আর উর্দূ ভাষায় হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কর্তৃক "তাফসীরে বয়ানুল কুরআন" স্বীয় বর্ণনা শৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনাহীন একটি তাফসীর। এর কদর ও মূল্যায়ন সঠিক অনুমান তখনই হবে, যখন কেহ তাফসীরের বিশাল বিশাল গ্রন্থগুলো ঘাঁটাঘাঁটির পর এর দিকে নজর দিবে।

কিন্তু এর ভাষা ইলমী ও পরিভাষাভিত্তিক হওয়াতে সাধারণ উর্দূ ভাষাভাষীদের তা বুঝতে খুবই কষ্টকর। আর এ প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখে আমার মুহ্তারাম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) "মা'আরিফুল কুরআন" নামে আট খন্ড সম্বলিত একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।

যার মধ্যে বয়ানুল কুরআনের ব্যাখ্যা ও সহজীকরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে সুস্পষ্ট পবিত্র কুরআনুল কারীমের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমান যুগের জীবনোপকরণের সুন্দর বর্ণনাগুলো স্থান পেয়েছে। আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি গুলোর উপর কুরআনী গবেষণার আওতায় মাস'আলার পর্যালোচনাও রয়েছে।

এ যাবৎ উর্দূতে রচিত যতগুলো তাফসীর প্রকাশ হয়েছে, তন্মধ্যে এটিই একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার মধ্যে (সালফে সালেহীন) 'পূর্বসূরী বুযুর্গদের' মত ও পথ নির্দেশনা পূর্ণাঙ্গরূপে সংরক্ষণের পাশাপাশি বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীকেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহান আল্লাহর শোকরিয়া এ তাফসীরটি সর্ব সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সীমাহীন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

---

[৭১৮]. মুশকিলাতুল কুরআন-এর ভূমিকা "ইয়্যাতিমাতুল বয়ান"-এর সার-নির্যাস পৃঃ ২৩-২৪

পরিশেষে দুআ করছি, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে যেন আমাদেরকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বুঝার তাওফীক দান করুক। এবং এর সঠিক মর্ম অনুধাবনের সক্ষমতা দান করুন। এবং এর তেলাওয়াত, তদানুযায়ী আমল এবং এর প্রচার ও প্রকাশের অর্পিত দায়িত্ব আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

اللهُمَّ أنس وَحشتى.فى قبرى اللهُمَّ ارحمنى بالقران العظيم وَاجَعَله امَامَا وَنُورا وَهَدى ورحمة اللهُمَّ عَلمنِى منه ماجهلت وَذكرنى منه مانسيت وارزقنى تلاوته اناء الليل واناء النهار وجعله لى حجة يارب العالمين

ولله الحمد اولا واخرا وصلى الله يتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه أجمعين

ইয়া আল্লাহ! আমার কবরের নিঃসঙ্গতা দূর করুন। ইয়া আল্লাহ! কুরআনে আজীমের বরকতে আমাদের প্রতি রহম করুন এবং ইহাকে ইমাম, জ্যোতি হেদায়েত ও রহমত বানান। ইয়া আল্লাহ! আমরা যা জানিনা সেগুলো এবং যা ভূলে যাই সেগুলো স্বরণ করিয়ে দিন, সকাল সন্ধায় কুরআনে কারীমে,তেলায়াতে তাওফিত দান করুন। এবং ইহাকে আমার জন্য হুজ্জাত বানিয়ে দিন। আগে পরে সকল প্রসংশা আপনার জন্য মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর নাযিল করুন দূরূদ ও সালাম এবং তার পরিবার পরিজন এবং তার অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

দারুল উলূম, কোরঙ্গি, করাচী-১৪

আহকার

মুহাম্মদ তাকী উসমানী

জুম'আ রজনী ১৫ রবিউস সানী ১৩৯৬ হি.